অলৌকিক নয়, লৌকিক

তৃতীয় খণ্ড



অলৌকিক নয়, লৌকিক

(৩য় খণ্ড)

প্রবীর ঘোষ (প্রথম পর্ব)

পিনাকী ঘোষ (দ্বিতীয় পর্ব)



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ALOUKIK NOY, LOUKIK (VOLUME THREE)

PRABIR GHOSH (PART-I)
PINAKI GHOSH (PART-II)

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
মাঘ, ১৩৯৮

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অঙ্গসজ্জা : বঙ্কিমচন্দ্র শী

লেজার টাইপসেটিং :
পেজমেকার্স
২৪বি, লেক রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম : ৭০ টাকা
PRICE : SEVENTY ONLY

যুক্তিবাদী আন্দোলনের চার সৈনিক

ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

ডাঃ আবিবলাল মুখোপাধ্যায়

ডাঃ বিরল মল্লিক

ও

ডঃ দিলীপ বসু'কে

প্রচ্ছদ ঃ
যুক্তিবাদী

প্রচ্ছদেব আলোকচিত্র ঃ
গোপাল দেবনাথ

প্রচ্ছদে লেখকদ্বয়ের আলোকচিত্র ঃ
কুমাব বায

গ্রন্থেব আলোকচিত্র ঃ
তাপসকুমার দেব

অলঙ্করণ ঃ
রঘু মুখার্জি

ভূমিকা

ভূত আর ভবিষ্যৎ—এই হল আমাদের যত গণ্ডগোলের জায়গা। ভূত কথাটার দুটো মানে—একটা হল অতীত, আরেকটা হল প্রেত-প্রেতিনী ইত্যাদি। যে মানুষ বেঁচে আছে সে নিজের অতীতটা বেশ কিছুদূর দেখতে পায়, সেটুকু অনেকাংশে তার স্পষ্ট অভিজ্ঞতার জগৎ; পুরোটা হয়তো নয়। এইভাবে সে তার জন্মের ঘটনায় গিয়ে পৌঁছোয়—সেই হল তার চেতন-জীবনের প্রথম মুহূর্ত। মার পেটের উষ্ণ তরল অন্ধকারের স্নান থেকে হঠাৎ সে এসে পড়ল পৃথিবীর কড়া আলোয়—পাঁজর চিরে সে তীব্র একটা চিৎকার ছড়িয়ে দিল 'অযমহং ভো'। কিন্তু তার আগে? বিজ্ঞান মানুষকে বলে দিচ্ছে তার আগে জননীজঠরে তার ভ্রূণাবস্থা। তার আগে? সেখানেও বিজ্ঞানীর উত্তর—পিতার শরীর থেকে মার জরায়ুতে প্রবিষ্ট ঘনতরল নির্যাসের অজস্র জীবনকণিকার মধ্যে ছিল তার অস্তিত্ব। আর তার আগে? বিজ্ঞানে তারও উত্তর আছে।

কিন্তু বিজ্ঞান এই উত্তর বার করেছে নেহাতই হাল আমলে, পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস কয়েক লক্ষ বছর গড়িয়ে যাবার পর। তার আগের মানুষেরা সে উত্তর জানত না। এখনও কোটি কোটি মানুষ এ সব উত্তর জানে না। যারা জানে, তারা অধিকাংশই আবার বিজ্ঞানের এ উত্তর মানে না, মানতে চায় না। এখানেও 'ভূত'-এর প্রভাব—অতীতের অজ্ঞতার বিমূঢ় উত্তরাধিকার। লক্ষ বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষেরা যেকথা বিশ্বাস করে এসেছে, যে অন্ধতা লালন করেছে, বিচিত্র অলীক কল্পনা দিয়ে যে অজ্ঞতার প্রাসাদ তৈরি করেছে, তাকে এক কথায় গুঁড়িয়ে দিই কী করে? ছোট্ট একটি ভোঁতা পিন দিয়ে একটি মস্ত বেলুন ফাটিয়ে দিয়ে তার বেলুনজন্ম ঘোচানো সম্ভব হল, বিজ্ঞানের ঝকঝকে ছুরি দিয়ে অন্ধবিশ্বাসের নাড়ী কাটা সম্ভব হল না।

ফলে 'এলেম আমি কোথা থেকে'—এই ভূতজিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত ভৌতিক বিশ্বাসে

নিযে যায আমাদের। জন্মের আগে ভূত, তার আগে আরেক জন্ম ; আবার জন্মের পরেও ভূত, তারপরে আবেক জন্ম। জন্মান্তরবাদ—তার সঙ্গে ভূতজীবনের পর্যায় খানিকটা এইরকম—

জন্ম$_{১}$ + ভূত$_{১}$ + জন্ম$_{২}$ + ভূত$_{২}$ + জন্ম$_{৩}$ + ভূত$_{৩}$ .....জন্ম$_{২}$ + ভূত$_{২}$ জন্ম$_{১}$ কবে হল তা অবশ্য জানি না, শেষ জন্ম কবে হবে তাও জানি না। তবে সেখানেও ভূত থাকবে অর্থাৎ ভবিষ্যতেও ভূত।

ভূতরা যদি স্বর্গের কালা-আদমি হয় তো খাস বিলিতি বা আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ অভিজাতবর্গ হলেন দেবতারা। আমাদের কল্পজন্মান্তর অতিক্রম করে তাঁরা থাকেন, টুক টুক করে অমৃতপান করেন আর উর্বশী ঘৃতাচীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন। তাঁরা দিব্যি সুখবিলাসী জীব। আমাদের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের সুতো নাকি তাঁদের হাতে। দানিকেন সাহেব এই সব দেবতাদের কীর্তিকলাপ এই পৃথিবীর বুকেও দেখেছেন। যাই হোক, আমাদের অতীতের অতীতেও নাকি এঁরা ছিলেন, আর ভবিষ্যতের ভবিষ্যতেও থাকবেন। এঁদের মধ্যে অন্ত্যজ ছোটলোক ওই ভূতেরা—তাদের মত ক্ষমতা নেই। তাবা শুধু ভয়টয দেখায়—ভালো কিছু করার মুরোদ তাদের কোথায় ? দেবতারা দিব্যি পূজো পায়, কিন্তু ভূতেরা পায় ওঝার ঝাঁটার বাড়ি। কেন যে ভূতেরা স্বর্গে প্রোলেতারীয বিপ্লব আবম্ভ করেনি জানি না।

অতীত যদি বা কিছুটা জানলাম, ভবিষ্যত তো আদৌ জানি না। পরের মুহূর্তে যদি মরে পড়ে যাই বাস্তায় ? সন্তান যদি পরীক্ষায ফেল করে ? যাকে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী কবার কথা ভাবছি সে যদি 'আর কারে ভালবাসে'? দুরবিন দিযে স্থানগতভাবে দুবের জিনিস দেখতে পাই, কিন্তু কালগত দূরত্বের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে কিছুই দেখতে পাই না অস্পষ্ট অনুমানের বাইরে। কাজেই ছোট্রে জ্যোতিষীর কাছে। এই হাতুড়ে গোবদ্যি দেয হাতুড়ের ওষুধ—পলা, গোমেদ, নীলা—ভবিষ্যৎ অপঘাতের টোটকা। নইলে, ছোট্রে প্রভু বা গুরুর কাছে—যে কেত্তনের নেশায আচ্ছন্ন করে, আবাব আবেক শিষ্য মন্ত্রীকে বলে ছেলের চাকরির ব্যবস্থাও করে হয তো। অলৌকিক ভূতের ব্যাখ্যা করে দানিকেন, ভবিষ্যতের অলৌকিক ব্যাখ্যা করে গ্রহ-গোবদ্যি আব নোস্ত্রাদামুসেব দল ভবিষ্যৎ-বদ্যিদেব পযসা গুনে দাও, গুরুদেরও পযসা গুনে দাও। 'বিশ্বাসে মিলায কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূব।' এই প্রশ্নটা কেউ করে না, কৃষ্ণ যদি সর্বশক্তিমানই হবে তাহলে তর্কে সে ধরা দেবে না কেন ?

কিন্তু স্বর্গের দেবতাদেব নিযেই শুধু খুশি না আমরা, আমরা পৃথিবীর মানুষদেরও দেবতা বানিযে ছাড়ি—'মা', 'বাবা', 'দাদা', 'ঠাকুর' এইসব উপসর্গ নিযে হাজিব হন তাঁরা। ধর্মের বিশাল ব্যাবসাতে তাদের মনোহারি মালপত্রও সাজানো থাকে।

সাক্ষব মানুষ যদি পৃষ্ঠা পাঁচেক নৃতত্ত্ব আর পৃষ্ঠাদশেক বিজ্ঞান পড়ে, তাহলেই তার

বুঝতে পারা উচিত ধর্ম নামক কী বিপুল এক অলংকৃত অন্ধতা হাজার হাজার বছর ধরে তার চোখে ঠুলি পরিয়ে তার পকেট কেটে এসেছে। আর পনেরো পাতা ইতিহাস পড়লে সে বুঝতে পারবে কীভাবে রাজকীয় স্বার্থ আর লোলুপতা শাসকের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ধর্মকে ব্যবহার করেছে শোষণের ছদ্মবেশী অস্ত্র হিসেবে। যুক্তির এই দীক্ষা স্কুলকলেজের ডিগ্রি থেকে অর্জন করা যায় না। হয়তো এর জন্যেও আর এক গুরু দরকার—রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'-এর জ্যাঠামশায়ের মতো এক গুরু। এমন এক গুরু যিনি দেখিয়ে দেবেন ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে চোরাকারবারি ধর্মের সংগঠিত সাম্রাজ্যের প্রান্তে সব বুনোদের বস্তি—জ্যোতিষ, তুকতাক, আর হাজারো কুসংস্কারের জঙ্গল।

এক পাল্টা গুরুর সম্প্রদায় তৈরি হোক দেশে। তাঁরা বলবেন না, 'মেনে নাও, মেনে নাও, মেনে নাও।' তাঁরা বরং বলবেন, 'প্রশ্ন করো, প্রশ্ন করো, প্রশ্ন করো। বিচার করো, পরীক্ষা করো, প্রত্যেকটা কথা যাচাই করে দ্যাখো। যা প্রত্যক্ষ যাচাই করা যাবে না, বিজ্ঞান আর যুক্তির আলোতে তার সংগত অনুমান তৈরি করো, পরোক্ষ প্রমাণ নাও। আমি বলছি বলে সব মেনে নিয়ো না। আমি তোমার হাতে প্রশ্নের দীপশিখা তুলে দিচ্ছি, তুমি তা থেকে মুক্তবুদ্ধির আগুন জ্বালো। ভূতকে ভাগাও, ভগবানকে ভোলাও, ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের ভুলভুলাইয়াকে ভেঙ্গে ফ্যালো।'

শ্রী প্রবীর ঘোষ এই পাল্টা গুরুর সম্প্রদায় তৈরির মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন—এ তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত মিশন—এর জন্য তিনি শুধু অর্থ নয়, প্রাণও দিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে তাঁর পাশাপাশি আরও অনেকে এগিয়ে এসেছেন এখন। ফলে এককালে যারা ছিল ফেরারি ফৌজ, তারা এখন প্রকাশ্য উপত্যকায় কুচকাওয়াজ করছে, যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত এক বাহিনী। তারা প্রবন্ধ লিখছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করছে, বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে তথাকথিত অলৌকিকতা আর অন্ধবিশ্বাসের বস্ত্রহরণ করছে, এমন কী নাটকও নামাচ্ছে। এর ফলে পরিবারের মধ্যে নিঃসঙ্গতার ঝুঁকি আছে, সমাজে গোষ্ঠীতে ভুল বোঝার সুযোগ আছে, সংগঠিত ধর্ম ও বিশ্বাস-ব্যবসায়ীদের প্রত্যাঘাতের ভয় আছে।

তবু এই ভয়হীনের দল ক্রমশ বড় হচ্ছে—দেশের পক্ষে এইটে বড় আশার কথা। প্রবীরবাবুর প্রয়াস সার্থক হোক ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, বিজ্ঞান মঞ্চ বা গণবিজ্ঞান জাঠা এই সমবেত মুক্তবুদ্ধির অভিযানে সকলকে ডাক দিক—ধর্ম, গুরু, জ্যোতিষ, ভূতপ্রেত, আত্মা, অমঙ্গলের যাবতীয় অন্ধতা বিধ্বস্ত হোক। কেবল জেগে থাক ঋজু ও স্পর্ধিত মানুষ। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান বৌদ্ধ নয়—শুধু মানুষ। তার মাথা স্বর্গ ছাড়িয়ে মহাকাশ ছোঁয়, তার হাত সমস্ত বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে যায়, তার পা দাঁড়িয়ে থাকে প্রজ্ঞা ও বিচারবোধের কঠিন মাটিতে। সেই দিনের উল্লাস কামনা করে আমি শ্রীপ্রবীর ঘোষকে তাঁর বিস্ময়কর কাজ ও গবেষণার জন্য অভিনন্দন

জানাই, অভিনন্দন জানাই তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান পিনাকী ঘোষকে। আমার আয়ুষ্কালের মধ্যেই আমি তাঁদেব এই গৌরবময় প্রয়াসের ব্যাপক সার্থকতা দেখে যেতে চাই। আমাব বেঁচে থাকার গোড়ায় প্রাণ সিঞ্চন করুক এই প্রত্যাশা।

১০. ২ ১৯৯২

ডাঃ পবিত্র সরকার

উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কিছু কথা

মগজ ধোলাই প্রসঙ্গে
রাজনীতিকদের জ্যোতিষ ও রাজনীতি

তাবৎ ভারতবাসীদের চেতনাকে প্রভাবিত করার মত একটি ঘটনা ঘটল ২১ জুন '৯১। ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নবসিমহা রাও ওই দিন শপথ নিলেন পাঁজিপুঁথি দেখে রাহুর অশুভ দৃষ্টি এড়াতে ১২টা ৫৩ মিনিটে।

পি. ভি নরসিমহা রাও সুপণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যক, বহুভাষাবিদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকাবী, রাষ্ট্রেব কাণ্ডারী। এমন একজন বিশাল মাপের মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রেব প্রতি যখন অগাধ আস্থা পোষণ কবেন, তখন সাধারণ মানুষেরও জ্যোতিষশাস্ত্রেব প্রতি আস্থা বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষযে দ্বিধাগ্রস্থ বহু মানুষই এরপর শাস্ত্রটিকে অস্বীকার করাটা কিঞ্চিৎ মূঢ়তা বলেই মনে করতেই পাবেন। অসাধারণ মানুষের বিশ্বাস সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রভাবিত হলে সাধারণ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে জন্মকালেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হযে গেছে। জীবনেব প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আগে থেকেই ঠিক হযে রয়েছে। এ অমোঘ, অব্যর্থ।

নির্ধাবিত কথার অর্থ—যা ঠিক হয়েই রযেছে; যার পরিবর্তন সম্ভব নয। জ্যোতিষীরা দাবি কবেন, জ্যোতিষশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যে শাস্ত্র নির্ধাবিত পথে বিচাব করে একজন মানুষেব, পূর্বনির্ধাবিত ভাগ্য গণনা করা যায।

মজাটা হলো এই, সাধারণ মানুষ যখন শ্রীনরসিমহা রাওযের জ্যোতিষ পরামর্শ মেনে শপথ গ্রহণ করার ঘোষণায শ্রীবাওকে জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী বলে মনে করছেন, তখন শ্রীনরসিমহা রাও কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপব সামান্যতম আস্থা প্রকাশ করে ভাগ্যের দোহাই দিযে বসে থাকেননি। শ্রীশবদ প'ওযারকে

প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করার জন্য বিড়লা, হিন্দুজা, আম্বানিদের মত বিশাল শিল্পপতিদের দোরে দোরে ঘুরেছেন। নিজের দলের সাংসদদের সমর্থন আদায় করতে নাকি প্রত্যেক সমর্থক সাংসদকে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছেন শ্রীশরদ পাওয়ারের শিবির, যাতে সামিল হয়েছিলেন কির্লোস্কার, বাজাজ, নুসলি ওয়াদিয়া, গুলাবচাঁদ প্রমুখ শিল্পগোষ্ঠী। শ্রীনরসিমহার পক্ষে সিংহভাগ সাংসদদের সমর্থন নিশ্চিত করতে শ্রীনরসিমহার সমর্থক শিল্পগোষ্ঠিই নাকি অর্থ জুগিয়েছেন। এ-সবই এই বইটির পাঠকদের কাছে পুরোন খবর হয়ে গেছে। কারণ এই খবর তামাম ভারতবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল '৯১-এর ২০, ২১, ২২ জুন। শ্রীনরসিমহা সত্যিই যদি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর নিত্যকার দুপুরের ভাত-ঘুমকে নির্বাসনে পাঠিয়ে শ্রীশরদকে রুখতে শিল্পপতিদের কাছে হত্যে দিয়ে পড়তেন না, পাওয়ার দখলের জন্য প্রাণকে বাজি রেখে লড়াই চালাতেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্বাস করে, ভাগ্যকে বিশ্বাস করে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার রুটিনই বজায় রাখতেন। ভাগ্য যখন পূর্বনির্ধারিত, তখন যে কোনও প্রচেষ্টাই তো অর্থহীন। প্রধানমন্ত্রী হওয়া যদি ভাগ্যে নির্ধারিতই থাকে, তবে কে তাকে খণ্ডাবে? এতো অমোঘ, অব্যর্থ। আর ভাগ্যে যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়া লেখা না থাকে, তবে কোনও চেষ্টাতেই তা হবে না। প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বঞ্চিত হলে সে বঞ্চনার কারণ অবশ্যই ভাগ্য; যে ভাগ্য জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে গেছে।

মহা-বিস্ময় জাগে যখন দেখি সুপণ্ডিত, ধুরন্ধর রাজনীতির্বিদ শ্রীনরসিমহা রাও কথা ও কাজে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা প্রচার করছেন। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি, নিজের ভাগ্যের লিখনের প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না রেখে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কেন এই দ্বিচারিতা? তবে কী ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ শ্রীরাও চান তাঁর শাসনকালে বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য নিজ-ভাগ্যকেই দায়ী করুক? তাই কী ডংকা বাজিয়ে জ্যোতিষবিশ্বাসের পক্ষে তাঁর প্রচার? তাঁর এই স্ববিরোধী চরিত্রের কথা দেশবাসীরা যদি তোলে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন? তখন কী উপদেশ দেবেন, "হে দরিদ্র-ভারতবাসী, হে মূর্খ-ভারতবাসী, আমি যা বলি তাই কর, যা করি তা কর না।"

যে শিল্পপতি, ধনীদের দেওয়া সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে শ্রীরাওয়ের দল ক্ষমতায় এসেছে, যে শিল্পপতিদের পছন্দের মানুষ হিসেবে শ্রীরাও নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করার চিন্তা নিশ্চয়ই শ্রীরাও বা তাঁর দল কখনই করবে না, করতে পারে না। তেমনটা করলে শ্রীরাও এবং তাঁর দলের সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। ১৯৯০-এর নভেম্বরে চন্দ্রশেখর যখন প্রধানমন্ত্রী হন এবারের চেয়েও বেশি টাকার খেল হয়েছিল। সে-বারও কিংমেকার শিল্পগোষ্ঠীরাই চন্দ্রশেখরকে পছন্দ করেছিলেন বলেই চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। শিল্পপতিরা নিশ্চয়ই তাঁদেরই কৃপা করবে, তাঁদের পিছনেই অর্থ ঢালবে, শাসনক্ষমতায়

বসাবে, যাঁরা শিল্পপতিদেব একান্তই বিশ্বস্ত। অতএব এইসব শাসকগোষ্ঠী ধনকুবেরদেব যে বিরোধীতা করতে পারে না, করার সাধ্য নেই এ-কথা অতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে।

সংসদীয় নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতা দখলের দিকে এগোতে চাইলে, লোকসভায় বা বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য আসন পেযে দাপট বজায় রাখতে চাইলে সেই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে বিপুল অর্থ ঢালতেই হবে। বর্তমানে নির্বাচন মানেই এক রাজসূয় যজ্ঞ। বিশাল প্রচার ব্যয, বিগিং, বুথদখল, ছাপ্পা ভোট এ-সব নিযেই এখনকাব নির্বাচন। এ এক স্বাভাবিক প্রক্রিযা হযে দাঁড়িযেছে। এরজন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মাসলম্যানদের পিছনেও বইযে দিতে হয় অর্থের স্রোত। এই শত-সহস্র কোটি টাকা গরীব খেটে খাওযা মানুষদের এক-টাকা দু-টাকা বা পাঁচ-টাকা চাঁদায তোলা যায না। তোলা হযও না। নির্বাচনী ব্যযের শতকরা ৯৯ ভাগেবও বেশি টাকা যোগায ধনকুবেররা। বিনিময়ে তারা এইসব দলগুলোর কাছ থেকে পায স্বস্তিতে শোষণ চালাবার গ্যারান্টি। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো কৌশল হিসেবে খেটে খাওযা মানুষদেব কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিলেব জন্য চাঁদা আদায করে দেখাতে চায "মোরা তোমাদেরই লোক।"

এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন মাঠে মযদানে, পত্র-পত্রিকায, বেতারে, দূরদর্শনে, গরীবি হটানোব কথা বলেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন, মেহনতি মানুষেব হাতিযার বলে নিজেদের ঘোষণা করেন, তখন কিন্তু এইসব তর্জন গর্জনে শোষকশ্রেণীর সুখনিদ্রায সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটে না। শোষকশ্রেণী জানে তাদের কৃপাধন্য, তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের এইসব বজ্রনির্ঘোষ স্রেফ ছেলে ভুলোন ছড়া ; সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষকে ভুলিযে রাখার এ এক কৌশল। হুজুরের দল চায এ-ভাবেই তাদের ক্রীড়নক রাজনৈতিক দলগুলো শোষিতদের আপনজনেব মুখোশ পরে শোষিতদেব বিভ্রান্ত করুক, যাতে তাদের সম্মিলিত ক্ষোভ দানা বেঁধে বিস্ফোরিত হতে না পাবে। এই সমাজ-ব্যবস্থা টিকিযে বেখে শোষণ কাযেম রাখাব স্বার্থেই শোষণকারীদের দালাল রাজনৈতিক দলগুলো শোষিত সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই কবে নানা ভাবে।

হুজুবদের কৃপাধন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার মধুব লোভে সব সমযই চায ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে।

বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে শোষকশ্রেণীর দালালির অধিকার লাভের প্রতিযোগিতা।

ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই চায মানুষ অদৃষ্টবাদী হোক, বিশ্বাস করুক পূর্বজন্মের কর্মফলে, ঘুরপাক খাক নানা সংস্কারের

অন্ধকারে। এমন বিশ্বাসগুলো শোষিত মানুষগুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য দায়ী করবে নিজের ভাগ্যকে, কর্মফলকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে। শোষিত মানুষগুলোর চিন্তা চেতনা যদি স্বচ্ছতা পায়, ওরা যদি অন্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে, তবে তো ওদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে প্রতিটি বঞ্চনার পিছনেই রয়েছে এই সমাজেরই কিছু মানুষ, এই সমাজেরই কিছু নিয়ম-কানুন ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও শোষণ। শোষিত মানুষ যদি বুঝতেই পারে তাদের বঞ্চনার কারণের মূলে ভাগ্য, কর্মফল বা ঈশ্বরের কৃপাহীনতা দায়ী নয়, দায়ী সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা, তখন তাঁরা বঞ্চনামুক্ত হতে একদিন নিশ্চয়ই এই সমাজ ব্যবস্থাকেই পাল্টাতে চাইবে। সমাজের মূল ধরে টান দেবে। এতে শোষকশ্রেণী ও তাদের কৃপাধন্য দালালদের অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে। এটা খুব ভালোমত জানে এবং বোঝে বলেই শোষকশ্রেণী ও তাদের দালালদের নানা পরিকল্পনা প্রতিনিয়তই চলছে। চলছে নানা ভাবে মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি।

শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতেই মগজ ধোলাই চলছে

সময় এগোচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে খসে পড়ছে অনেক সংস্কার, অনেক মূল্যবোধ। মানুষ অনেক পুরোন ধ্যান-ধারণা বিদায় দিচ্ছে। মানুষের এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধনীরাও শোষণের নানা নতুন নতুন কৌশল বের করছে, বের করছে গরীব মানুষগুলোর মগজ ধোলাইয়ের নানা প্যাঁচ-পায়জার। এইসব কূট কৌশল যেমন ধনীদের ভাড়া করা কিছু বুদ্ধিমান মানুষদের মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে, তেমনই কিছু কিছু বুদ্ধিমানদের কাছে সে-সব ধরাও পড়ে যাচ্ছে। এইসব বিক্রি না হওয়া বুদ্ধিমানদের কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন বঞ্চিত মানুষদের ঘুম ভাঙাতে। তাঁদের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছে নানা সংগঠন, নানা গোষ্ঠি। এইসব সংগঠন ও গোষ্ঠি বঞ্চিতদের ধোলাই করা মগজ আবার ধোলাই করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে নতুন চিন্তা, জাগিয়ে তুলছে নতুন চেতনা, গড়ে উঠছে নতুন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

হুজুরের দল অবশ্যই এই অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে এক সময় বঞ্চিত মানুষগুলোর সোচ্চার দাবী ও ক্ষোভকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য-পাট ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেয় না। ওরা অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তোলে, প্রতিআক্রমণ চালায়। শোষকরা ভালমতই জানে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে দাবিয়ে চলার মত পুলিশ ও সেনা রাষ্ট্র-শক্তির নেই। তাই নানা কৌশলে চেষ্টা করে শোষিত ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে দমিয়ে রাখতে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশলের সাহায্য নিতে।

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, তার পুরোটা যেহেতু ধনী হুজুরের দলই জোগায় তাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা

দখলকারী রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তি হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের বিশ্বস্ত যো-হুজুরের দল।

এরই সঙ্গে হুজুরের দল আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর বিবেক কিনতে বাজারে নেমে পড়ে। টপাটপ বিক্রিও হয়ে যায় অনেকেই। শোষিত মানুষগুলোর মগজ ধোলাই করতে হুজুরের দল নামিয়ে দেয় রাষ্ট্রশক্তি, রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের। নেমে পড়ে সরকারী ও ধনী মালিকানাধীন প্রচার-মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। মগজ ধোলাই করা হতে থাকে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ভাবে। পাশাপাশি তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা জনমানসে বাড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রয়োজনে জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িক নানা চিন্তাকে উস্‌কে দেওয়ার নানা কৌশলও টপাটপ্ বের করতে থাকে হুজুরের উচ্ছিষ্টভোগী পরামর্শদাতা ও দালালের দল। ভক্তিরসের বান ডাকান হতে থাকে নানা ভাবে। অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করতে সুক্ষ্ম বুদ্ধির কৌশলেই কাজ হয়। জ্যোতিষ ও প্যারাসাইকোলজিস্ট নামধারী প্রবঞ্চকের দল রাষ্ট্রশক্তির আসকারায় তাঁদের উদ্ভট সব চিন্তা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে নিজেদের আখের গোছাবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের মগজ ধোলাই করে ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। প্রতিটি ক্লাব, গণসংগঠন, লাইব্রেরি, স্কুল, কলেজকে কুক্ষিগত করে নিজেদের ইচ্ছেমত সাংস্কৃতিক চেতনা মাথায় ঢোকাতে কখনও রাজনৈতিক দলগুলোকে কাজে লাগায় হুজুরের দল। কুক্ষিগত করার জন্য লোভ, ভয়, বলপ্রয়োগ ইত্যাদিকে পাথেয় করে রাজনীতি পেশার মানুষগুলো। কখনও বা সাহায্যের বদান্যতায় সংস্থাগুলোর ইচ্ছেমত চলার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। আবার কখনও বা ওইসব সংস্থার নেতাদের বিবেক কিনেই সংস্থাকে পকেটে পুরে ফেলে হুজুরের দল। কখনও নিজেদের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে ওই ধরনের সাজান আন্দোলন শুরু করা হয়; আন্দোলনে সামিল মানুষদের বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টায়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রশক্তি আন্দোলনকারীদের দেশের সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে জাতীয়তাবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্রপন্থী, ইত্যাদি ছাপ মেরে দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকারী, বেসরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোর নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে শোষিত মানুষদের এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দেশের শোষিত মানুষরাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। কখনও বা সওদা হতে না চাওয়া উন্নত শির, বিপদজনক নেতার চরিত্র-হননের নানা প্রচেষ্টা চালান হয় সাজান আন্দোলনকারীদের সাহায্যে। কখনও বা নেতাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে গুলিবিনিময়ের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়। অথবা গল্প ফাঁদা হয় পতিতাপল্লী রেইড করতে গিয়ে ধরাপড়া নেতার গুলি বিনিময় এবং মৃত্যুর।

এই যে কথাগুলো লিখেছি, এর একটা কথাও কল্পনাপ্রসূত নয়। যখনই কোনও দরিদ্র শোষিত জনগোষ্ঠি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে, আঘাত হেনেছে হুজুরদের দুর্গে, তখনই সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে শোষকশ্রেণী ও তার সেবক রাষ্ট্রশক্তি এই পদ্ধতিগুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করে চলেছে।

যারা শোষণ করছে তারা চায়, যাদের শোষণ করছি তাদের এমন নানা নেশায়

ভুলিয়ে রাখব, মাতিয়ে রাখব যে তারা নিজেরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকবে যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কোন দিনই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আন্দোলনকে জয়ী দেখতে চাইলে হুজুরের দল ও তাদের রক্ষার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার আন্দোলন ধ্বংস করতে কী কী কৌশল গ্রহণ করে থাকে সে বিষয়ে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। সম্ভাব্য আক্রমণ বিষয়ে অবহিত থাকলে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা এবং পাল্টা আক্রমণ চালান সহজতর হয়।

শোষকশ্রেণী বা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন যাঁরা চালাবেন তাঁদের এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিটি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট নজর রাখে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার। সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রয়েছে বহু বিভাগ। আমাদের সরকারের ইন্টেলিজেন্ট ডিপার্টমেন্টেরই রয়েছে তিরিশের ওপর বিভাগ বা সেল। ছাত্র, রাজনৈতিকদল, ডাকাত অপরাধ, নকশাল সংগঠন ইত্যাদি প্রত্যেকটা বিভাগের জন্যে রয়েছে সেল। গোয়ান্দারা এইসব সংগঠনগুলোর ওপর নজর রাখেন। এ-ছাড়াও গোয়েন্দাদপ্তরের ও বিভিন্ন থানারই রয়েছে নিজস্ব ইনফর্মার। এই ইনফর্মাররা প্রতিটি সেলেই তথ্য যোগাচ্ছে অর্থের বিনিময়ে। এরা সরকারী চাকরি করে না। এদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে এক একজন বড় পুলিশ অফিসারদের হাতে থাকে সরকারী খরচে নিজস্ব বিশ্বস্ত ইনফর্মার। এরা কোথায় নেই? কোনও সংগঠন সরকারের পক্ষে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে সন্দেহ করলেই তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনফর্মার। এ-ছাড়া গোয়েন্দারাও নজর রাখেন। সুতরাং বহু আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিষয়েই সরকার ও শোষকশ্রেণী সব সময়ই ওয়াকিবহাল। বিভিন্ন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝে তাকে রুখতে সরকার হাজির করে নানা কৌশল।

এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য কৌশল হলো, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে নিজের প্রয়োজনীয় খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়া।

মানুষের চিন্তাধারাকে কোনও একটা বিশেষ খাতে বওয়াতে, চিন্তায় কোনও বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে গাঁথতে যে পদ্ধতিটি এখনও সবচেয়ে বেশি সফল বলে স্বীকৃত, তা হলো অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সুযোগ পেলেই মিথ্যেকেও বার বার নানা ভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করতে থাকা। কোনও একটি মিথ্যে বিশ্বাসকে মানুষের মাথায় সত্যি বলে ঢোকাতে হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার কর ওই বিশ্বাসে তোমার এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির রয়েছে অগাধ আস্থা ও অচল ভক্তি। সফল রাজনীতিকদের এসব বিষয় জানতে হয়, নইলে শিল্পপতিদের কাছে কলকে পাওয়া যায় না। ওরা ধৈর্য ধরে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণকে মাঝে মধ্যেই জানাতে থাকে ওদের জ্যোতিষ-বিশ্বাস ও জ্যোতিষ নির্ভরতার কথা, ঈশ্বর বিশ্বাস ও অলৌকিক ক্ষমতাবান ধর্মগুরুদের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তির কথা। এতে কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মগুরুর শিষ্যদের ভোট প্রভাবিত হয়, জনসাধারণের মধ্যে জ্যোতিষ ও ভাগ্য-নির্ভরতা বাড়তে থাকে। কর্মফলে বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, গুরুনির্ভরতা ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেতে থাকে। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ আত্মনিবেদন করতে জানে, আত্মসমর্পণ করার মধ্য দিয়ে দুঃখ ও বঞ্চনাকে ভুলতে জানে কিন্তু লড়াকু হতে জানে

না। যে মানুষ লড়াকু নয়, তাকে আবার ভয় কী ?

মার্কসবাদের সঙ্গে অপরিক্ষিত এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসনির্ভর জ্যোতিষশাস্ত্রের চূড়ান্ত বিবাদ থাকলেও কিছু কিছু মার্কসবাদী মন্ত্রী কিন্তু জ্যোতিষীদের সম্মেলনে হাজির হন প্রধান অতিথি, সভাপতি ইত্যাদি হয়ে। ওইসব সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী-টানীও পাঠান। মেহনতি মানুষের বন্ধু ওইসব মার্কসবাদী দলগুলো তাদের দলের মন্ত্রীদেব এমন মার্কস-বাদ-ই কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকাব ফতোযা জারি করেন না কেন ? কেন এমন অদ্ভুত আচরণ ? ওইসব কার্যকলাপ কী শুধুই মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত চ্যুতি বা নীতিভ্রষ্টতার নিদর্শন ? না কী ক্ষমতার শাঁসে জলে থাকার পরিণতিতে সাধাবণ মানুষের চেতনাকে অদৃষ্টবাদী করে তোলার কূট কৌশল ?

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন ওইসব তথাকথিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদ বিরোধী চরমবাস্তববাদী। 'ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবেই', বলে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দলই নির্বাচনের লড়াইতে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না।

মিটিং, মিছিল, প্রচাবের বিশাল ব্যয, কর্মী, পেশীশক্তি, আগ্নেযাস্ত্র যোগাড়, বোমের স্টক, জালিযাতির নব-নব কৌশলকে কাজে লাগানোর প্রযাস, বুথ দখল ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিরোধী প্রার্থীকে টেক্কা দিয়েই জেতার চেষ্টা কবে।

পরিবেশ নিয়ে মগজ ধোলাই

একটি মিথ্যেকে বার বার সাজিযে গুছিযে প্রচার করতে করতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায, যার ফলে মিথ্যেটাই মানুষের বিশ্বাসে সত্যি হিসেবে জ্বল জ্বল করে। এই সত্যটাকেই মাথায বেখে তাবৎ রাজনীতিকরা পরিবেশ দূষণ নিয়ে প্রচাবে নেমেছেন। কত টাকা উড়ছে সেমিনারে, ওযার্কশপে, গাছ বিলি করতে, গাছ পুঁততে, কত লক্ষ মিটার দুর্মূল্য ফিল্ম, কত টন নিউজপ্রিন্ট খরচ হযেছে তার হিসেব রাখা ভার। কিন্তু প্রতিনিযত প্রচারে ফল পাওযা গেছে দারুণ। এখন পরিবেশ বলতে তামাম দেশবাসীর মাথায শুধু ভেসে ওঠে প্রাকৃতিক পবিবেশের ছবি। কিন্তু পরিবেশ বলতে কী শুধুই প্রাকৃতিক পবিবেশ ? মানুষেব ওপর শুধুই কী প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রভাব ফেলে ?

যারা পরিবেশ বলতে শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা সাধারণ মানুষের মাথায ঢোকাতে চাইছে, তারা ভালমতই জানে 'আর্থ-সামাজিক ও 'সমাজ-সাংস্কৃতিক' নামের দুটি বিশাল প্রভাবশালী পবিবেশের কথা, মানবজীবনে যাদেব প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিপুল প্রভাবের সাম্প্রতিকতম উদাহবণ বাশিযা সমেত পূর্ব-ইউবোপের দেশগুলো থেকে

মার্কসবাদের বিদায়। ওইসব মার্কসবাদী দেশে দীর্ঘ দিন ধবে নানা ভাবে পাচাব করা হয়েছে মার্কিন সংস্কৃতি, উত্তেজক মার্কিন সংস্কৃতি, ভোগসর্বস্ব মার্কিন সংস্কৃতি। মার্কসবাদী দেশগুলোর সমাজ-সাংস্কৃতিক পবিমণ্ডলে ভেসে আসা উদ্দাম মার্কিন সংস্কৃতি মানুষগুলোকে মানসিকভাবে নেশাগ্রস্থ কবেছে, ক্ষুধার্ত করেছে। আর তাইতেই একের পব এক ধস নেমেছে।

'সংস্কৃতি' মানুষকে এগিযে নিযে যেতে সাহায্য করে। 'সংস্কৃতি' প্রগতির ধারক। মানবতাবাদী জীবনবোধের উপাদানই হলো সংস্কৃতি। যে 'সংস্কৃতি' এইসব ধাবাব বিপবীতগামী তা 'অসংস্কৃতি'। ভাবতবর্ষের সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, দুবদর্শনে, যাত্রায, নাটকে সর্বত্র এক অসংস্কৃতির ঢল নেমেছে। কারণ এইসব সৃষ্টিব পিছনে মানুষকে এগিযে নিযে যাওযার কোনও প্রযাস নেই। ববং রযেছে ভোগসর্বস্ববাদ, অবাধ যৌনতা, হত্যা-হানাহানি-ধর্ষণ, দুজ্ঞেযবাদ, অদৃষ্টবাদ, ঠাকুব দেবতার রমবমা, ধর্মীয সংস্কার সৃষ্টি ইত্যাদির মধ্য দিযে মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রীক কবে তুলে বৃহত্তর শোষিত জনসমষ্টিকে পিছিয়ে রাখার প্রযাস।

কোনও কোনও সমাজ সচেতন গোষ্ঠি কোনও কোনও জাযগায শোষিত মানুষদের যখন বোঝাচ্ছে তাদের বঞ্চনার কাবণগুলো আকাশেব গ্রহ-নক্ষত্র বা স্বর্গের দেবতা নয, বঞ্চনার কারণ এই সমাজব্যবস্থা, যখন এই অসাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব মুক্ত করতে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছে তখন বাংলাভাষার জনপ্রিযতম সাহিত্য পত্রিকায দুই ঔপন্যাসিকের কলম ঝলসে উঠল ওইসব সমাজ-সচেতন যুক্তিবাদী গোষ্ঠিব বিবুদ্ধে। কলমচিরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে, অলৌকিক ক্ষমতাবানদেব পক্ষে সোচ্চার হলেন।

যাঁরা সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেই নারাজ, তাঁরা কী বলবেন। দেশ জুড়ে এই যে ধর্ম নিয়ে উম্মাদনা, হানাহানি এ-সব কোন্ পরিবেশের ফল ?

ধর্ম নিযে এমন উন্মত্ততা তো একদিনে গাছেব পাকা ফলটির মত টুপ করে এসে পড়েনি। সাম্প্রদাযিক দল বলে আজ যাদের গাল পাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সেই সাম্প্রদাযিক দলটি তো হঠাৎ কবে উজ্জীবিত হযে ওঠেনি। ভাবতবর্ষেব মাটিতে ধর্মের চাষ, ধর্মের ফসল উৎপাদন ও ধর্মব্যবসা দীর্ঘ দিন ধবেই চলছিল। সাম্প্রতিক কযেক বছবে বাবোযাবী দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর রমরমা বেড়েছে। অনেক মার্কসবাদীই দলেব নির্দেশে পুজো কমিটিতে ঢুকে জনসাধারণেব মধ্যে কাজ কবতে নেমে পড়েছেন। এই নতুন শক্তিব আগমনে পুজোর বাজেট বেড়েছে চড়চড় করে। ফুটপাত আর সরকারী জমির দখল নিযে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মস্তানেবা শনি-শীতলাব দোকান খুলেছে। রাজনীতিকবা পুজো উদ্বোধন, জ্যোতিষ-মহাসম্মেলন উদ্বোধনে হাজির থেকে পোঁতা বিষবৃক্ষের বীজে সাব ঢেলেছেন, জলসিঞ্চন করেছেন. বাবা 'তারকনাথ', সন্তোষী মা' ছবির কৃপায পাড়ায পাডায যুবক-যুবতীদের উদাত্ত

অংশগ্রহণে মাইক, আলো, দেবদাবুপাতা ও বাঁক-শোভিত চত্ত্ববের সংখ্যা বেড়েছে। বাঁক কাঁধে শ্লীল, অশ্লীল, শ্লোগান দিতে দিতে যুবক-যুবতীরা ছুটে চলে তারকেশ্বরে। 'জয় সন্তোষী মা' ছবির কৃপায় মা সন্তোষীর জাঁক-জমক বাড়ে। দূরদর্শনে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' দেশবাসীকে ভাবাবেগ ও ভক্তিরসের তীব্র নেশায় বুঁদ করে রাখে। 'সতী মন্দির' রাজস্থানের ব্যাপার. পশ্চিমবাংলার মাটিতে বসবাসকারী রাজস্থানী ভোটাবের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এই অংক মাথায় রেখে ভোটারদেব কাছে প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে তাবড রাজনীতিকরা ঘোষণা করেন, মৃতকে নিয়ে স্মৃতি-সৌধ হতে পাবে, কিন্তু মৃতকে পুজো? এ তো কুসংস্কার। এই কুসংস্কারের আবর্জনা আমরা পশ্চিমবাংলায় জমতে দেব না। এই রাজনীতিকরাই আবার রামকৃষ্ণ, রামঠাকুর, অনুকূলচন্দ্র, লোকনাথের পুজো নিয়ে নীরব থেকে পরোক্ষ মদত দিয়েছেন। এইসব মৃত ধর্মীয়নেতাদের ভক্ত-সংখ্যা বিশাল এবং তাদের ভোটাধিকার আছে বলেই কী এইসব রাজনীতিকদের প্রগতিশীল বুলিব ফানুস চুপসে যায়?

"আত্মা অবিনশ্বর" এই যুক্তিহীন বিশ্বাস যতদিন মানুষের মনে থাকবে ততদিন সতী-মন্দির সহ নানা মৃত বাবাজী মাতাজীদের মন্দিরও থাকবে তাঁদের আশীর্বাদ লাভের আশায়। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসে বলা হয়েছে 'আত্মা' মানে 'চিন্তা' 'চেতনা' 'চৈতন্য' বা 'মন'। শরীরবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও জেনেছি 'চিন্তা' 'চৈতন্য' 'চেতনা' বা 'মন' হলো মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজকর্মেব ফল। মানুষ মারা গেলে তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোও মারা যায়। তারপব এক সময় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোব অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায় সমাধিব মাটির তলায়, আগুনে পুড়ে, পচে অথবা কোনও প্রাণীর পাকযন্ত্রে হজম হয়ে। মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর অস্তিত্বই যখন থাকে না তখন সেই অস্তিত্বহীন স্নায়ুকোষের কাজকর্মের ফল হিসেবে 'চিন্তা' 'চেতনা' 'চৈতন্য' বা 'মন'-এর অস্তিত্বও যে আর থাকতে পাবে না, এই সাধারণ যুক্তির কথাটুকু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিকদের অজানা থাকাব কথা নয়। ধরে নিলাম শিক্ষার সুযোগ না পাওযা, অশিক্ষিত সমাজবিরোধী মাফিয়া নেতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু শক্তিমান রাজনীতিক আছেন যাঁরা শক্তিপ্রয়োগের বিষয যতটা বোঝেন, 'চিন্তা' 'চেতনা' 'মন' ইত্যাদির কথা ততটাই বোঝেন না। কিন্তু এর বাইবে যে সংখ্যাগুরু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা রয়েছেন তাঁদেরকেও মাথা-মোটা ভাবলে ভুলই করা হবে। সবগুলো মাথা-মোটার পেছনে অর্থ ব্যয করে তাদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনলেই বা লাভ কী? ওইসব মাথা-মোটারা কী দেশের দরিদ্র শোষিত মানুষদের মগজ ধোলাই করে বঞ্চনাব থেকে উঠে আসার সম্ভাবনাময় প্রতিবাদের কণ্ঠকে রোধ করতে পাববে? পারবে না। তাহলে তো রাতারাতি শোষকশ্রেণীর গণেশ উল্টোবে. ধুরন্ধর এইসব ধনীর দালাল রাজনীতিকরা 'চিন্তা' 'চেতনা' 'মন' 'আত্মা' 'অদৃষ্টবাদ' কর্মফল ইত্যাদি খুব ভাইমতই বোঝেন। বোঝেন বলেই জানেন, দরিদ্র মানুষগুলোব চেতনা কতদূব পর্যন্ত এগোতে দেওযা নিরাপদ। ওইসব রাজনীতিক ও তাদের দলের বুদ্ধিজীবিরা ভালমতই জানেন 'আত্মা অবিনশ্বর' এই ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মাথায বদ্ধমূল করতে পারলে সেই সূত্র ধরেই গরীবদেব মাথায ঢোকান যায, 'এই জন্মে এই যে এত কষ্ট পাচ্ছি, এসব গত জন্মেব

কোনও পাপের ফল, এজন্মে দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, রাজপদে (বর্তমানে রাজনীতিকদের পায়ে) ভক্তি রেখে, কোনও হিংসার আশ্রয় না নিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া এই জীবনের দুঃখগুলোকে মেনে নিয়ে সুশীল হয়ে চললে আগামী জন্মে ভাল ফল পাব।'

শিল্পপতিদের মালিকানাধীন বিশাল বিশাল ঝাঁ-চকচক্ কাগজগুলোতে বিশাল বিশাল মাইনেয় বিশাল বিশাল লেখক পোষা হচ্ছে। পত্রিকার মালিক নিত্য রুটিন মাফিক পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন পেপার পলিশি। আর সেই পেপার পলিশিকে মাথায় রেখেই কলম চালাচ্ছেন, কলম চালাতে হচ্ছে মাইনে করা তা-বড় লেখকদের।

পেপার পলিসি কী? পত্রিকার মালিকগোষ্ঠির স্বার্থরক্ষার কৌশলই, পত্রিকার কৌশল। পত্রিকার মালিকের স্বার্থ কখনও ব্যক্তিগত, যেখানে আর এক পত্রিকাগোষ্ঠির তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার কখনও শ্রেণীগত, যেখানে সামগ্রীকভাবেই ধনীকশ্রেণীর স্বার্থ মিলেমিশে আছে। পত্রিকার মালিক এই দুই ধরনের স্বার্থেই তাঁর মাইনে করা লেখকদের কাজে লাগিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মগজ ধোলাই করে।

এ-যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমনি হাজারো উপায়ে হাজারো ফন্দিতে মুঠোবন্দী করে রেখেছে হুজুরের দল, হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতেই। দেশের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের এই বিশাল দূষণ নিয়ে, পচন নিয়ে নীরব কেন সেইসব রাজনৈতিক দল যারা গরীবি হটাতে চায়, যারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার? যারা দেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী? ওদের নীরবতার একটাই অর্থ— ওরা চায় এই সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে, তাই তো পরিবেশ বলতে শুধুমাত্র 'প্রাকৃতিক পরিবেশ'র কথা আমাদের মাথায় ঢোকাতে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার প্রচার চালিয়েই যাচ্ছে।

দেশপ্রেম নিয়ে ভুল ধারনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে

সিনেমায়, যাত্রায়, নাটকে, গল্পে-উপন্যাসে যখনই দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে, সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করতে বার বার বোঝান হয়েছে, দেশ মানে 'ধরতি', 'দেশের মাটি' 'দেশের নদী-পাহাড়'। দেশের মাটিকে এক খাবলা তুলে নিয়ে শপথ নিচ্ছে দেশপ্রেমিকরা এবং তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে।

বার বার প্রচারে যে কথাটা আমাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে এবং হচ্ছে, তা তো বাস্তব সত্য নয়। 'দেশপ্রেম' মানে কখনই দেশের মাটিকে ভালবাসা হতে পারে না।

দেশপ্রেম মানে 'দেশবাসীর প্রতি প্রেম'। কিন্তু তামাম দেশবাসীকে তো এক সঙ্গে প্রেম বিলোন যায় না। হুজুরের দলকে প্রেম বিলোলে মজুরের দলকে অপ্রেম বিলোতে হয়। আর মজুরের দলকে প্রেম বিলোন মানেই হুজুরের দলকে অপ্রেম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময নয, সে চিন্ময। মানুষ যদি প্রকাশমান হয তবে দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলযজশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে বটান ততই জবাবদিহির দায বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দেশ তো উপাদান মাত্র, তা নিযে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায শুকিযে, ফল যদি যায মবে, মলযজ যদি বিষিযে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয বন্ধ্যা, তবে কাব্য কথায দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"

এক শতাব্দী আগে ববীন্দ্রনাথ যে পরম সত্যটি অনুভব করেছিলেন, উপলব্ধি কবেছিলেন, সেই উপলব্ধি ও অনুভবে এখনও যদি বুদ্ধিজীবীরা পৌঁছতে না পেবে থাকেন, তবে এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের হয নির্বোধ অথবা অতি বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ 'ধান্দাবাজ' বলতে হয়।

আজ 'দেশপ্রেম' বলতে দেশের মাটিকে দেশের ভূখণ্ডের চৌহদ্দিকে চিহ্নিত করাটাই প্রচলিত সংস্কার হযে দাঁড়িযেছে। তাই দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন কবে যখন কোনও মানবগোষ্ঠি হুজুবেব শোষণেব বিবুদ্ধে বুখে দাঁড়ায, তাদের শোষণের থাবা থেকে বেবিযে আসতে চায, তখন মগজ ধোলাইযের কল্যাণে অমনি চারদিক থেকে নিপীড়িত মানুষগুলোই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সুরে সুর মিলিযে 'গেল গেল' রব তুলে ছুটে আসে, এবং যা নয তাই বলে গাল পাড়তে থাকে। এরপব ওইসব আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাঁসিল। আমাদের সমাজে প্রকৃত দেশপ্রেমের কোনও ঐতিহ্য নেই, আর সেই ঐতিহ্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য তথাকথিত দেশপ্রেমীরা সদা-সতর্ক, সদা-তৎপর। এ-দেশেব ঐতিহ্যে দেশপ্রেমিক বলতে চিত্রিত রাণাপ্রতাপ, শিবাজী থেকে শুরু কবে ঝান্সির রানী, বাবো ভুঁইযাব মত ভিড় করে আসা বহু চবিত্র। এঁদের ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বকেই বিকৃত ভাবে আমাদের সামনে বার বাব হাজিব কবা হযেছে ও হচ্ছে দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে। ধনীকশ্রেণীব অর্থপুষ্ট, ধনীক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতিকদেরই 'ভারতরত্ন' বলে ভূষিত করার ঐতিহ্যই আমবা বহন করে চলেছি। হুজুরের প্রতি প্রেমময এইসব ভাবতবত্নবা যদি দেশপ্রেমিক হন, তাহলে দেশদ্রোহী কারা? এই ঐতিহ্য অনুসাবী হিসেবে আমবা তাই নিপীড়িতদেব স্বার্থবক্ষাকারীদেরই 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত কবেই চলেছি।

'দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি'— এই সত্যকে মাথায় রেখেই আমাদের 'দেশপ্রেমী'ও 'দেশদ্রোহী' শব্দগুলোর সংজ্ঞা খুঁজতে হবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে গোলপাকান চিন্তা

'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দটির সঙ্গে এখন আমরা বড় বেশি রকম ভাবেই পরিচিত হয়ে

উঠেছি ব্যাপক ও লাগাতার প্রচারের দৌলতে। আমরা অনেকেই এই প্রচারের আবর্তে প্রভাবিত হয়ে ভাবতে শুরু করেছি 'বিচ্ছিন্নতা' এক ধরনের নৈরাশ্যতাড়িত অভিব্যক্তি।'বিচ্ছিন্নতা'র এই নেতিবাচক আবেদন আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করায় আমরা 'বিচ্ছিন্নতা' বা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে অচেতন বা সচেতন ভাবে কিছুটা বিরক্ত বা বিরূপ হয়ে উঠি। সরকার যে 'জনগোষ্ঠি' বা আন্দোলনকারীদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে ঘোষণা করে, তাদের সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করি। আমরা ভাবতে থাকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের দেশ-মাতৃকার অঙ্গহানী ঘটাতে চাইছে। এ-ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরো বেশি বেশি হতে থাকলে আমাদের দেশের তো অস্তিত্বই থাকবে না। 'দেশকে আমরা টুকরো হতে দেব না' —এই মানসিকাতাই তখন আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

'বিচ্ছিন্নতা' কী? সকলের থেকে স্বতন্ত্র, সকলের থেকে আলাদা, সকলের সঙ্গে না মানিয়ে নিতে পারা।

কোনও অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ 'বিচ্ছিন্ন' হতে বাধ্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যাবাসেলসাস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগর-এর মতন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আগমনের কথা লেখা আছে, যাঁরা প্রত্যেকেই সমাজে ছিলেন একাকী। এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথমত চিন্তার স্ববিরত্বকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়কার সমাজের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠি থেকে। সে-কালের বিচ্ছিন্ন মানুষদের সঠিক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিল না সে-সময়কার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠির। আজ সেই সব বিচ্ছিন্ন মানুষরাই এ-যুগের মানুষদের কাছে আর্দশ ও প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন।

যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হওয়ার তীব্র আকুতি, সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশমুখী চেতনা, সুস্থ আত্মবিকাশের চেতনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই মুনষ্যত্বের কাম্য, সভ্যতার কাম্য।

যে সমাজ আগাপাছতলা ডুবে আছে দুর্নীতির পঙ্কিলতায়, যে সমাজে শাসন ক্ষমতায় বসতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হয় ধনকুবেরদের দোরে দোরে, যে সমাজে বৈষম্য ও শোষণ লাগাম ছাড়া, সেই সমাজ থেকে কোনও জনগোষ্ঠি যদি বেরিয়ে যেতে চায়, তবে তাদের সেই উচ্চশির স্পর্ধিত সংগ্রামকে অভিনন্দন জানানই প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের একমাত্র অভিব্যক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু সেই 'উচিত'টাই ঘটছে না শাসকশ্রেণীর সুনিপণ মগজ ধোলাইয়ের কল্যানে।

শক্তিমান বহু সাহিত্যকের কলমে এমন বহু চরিত্র উঠে এসেছে যারা 'স্যাডিস্ট' ধ্বংসকামী, বিকারগ্রস্ত, নৈরাশ্যতাড়িত, অসুস্থ, বিচ্ছিন্নতার শিকার এক মানসিক

রোগী। এদের কেউ কেউ যৌন উশৃঙ্খলার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে। আর এইসব সাহিত্যিকদের সৃষ্ট ওইসব চরিত্রগুলো দু-মলাটের বাইরে দূরদর্শনের ও সিনেমার পর্দাতে হাজির হয়ে আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে আমরা একটা ধরনা পোষণ করতে শুরু করেছি 'বিচ্ছিন্নতা' একটা সামাজিক ব্যধি। আমরা ভুলে থেকেছি ব্যাধিগ্রস্থ সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শবাদী তরুণদের স্বাভাবিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামও 'বিচ্ছিন্নতা'।

কোনও জনগোষ্ঠির বৃহত্তর অংশ যখন তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে অথবা শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বিযুক্ত হতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই জন-জাগরণকে সামাল দেওয়ার সাধ্য রাষ্ট্রশক্তির থাকে না।

যে আন্দোলনে শরিক হয়েছে একটি জনগোষ্ঠির প্রায় প্রতিটি পরিবার, সেই আন্দোলনকে শেষ করতে হলে সেই জনগোষ্ঠির প্রতিটি পরিবারকেই শেষ করতে হয়। যা সীমিত সেনা ও পুলিশের সাহায্যে সম্ভব নয়।

ওই জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধ ঘোষণা করে ধ্বংসের আগুনে প্রতিবাদী প্রতিটি পরিবারকে শেষ করে দিয়ে শ্মশানের স্তব্ধতা আনাও এ-যুগে সম্ভব নয়। আধুনিকতম যোগাযোগের কল্যাণে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। এইভাবে একটি জনগোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করতে গেলে পৃথিবীর বহু প্রান্ত থেকেই এমন নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদের ঝড় উঠবেই। আর তাই পৃথিবীর বহু দেশেই বিভিন্ন গোষ্ঠির জনজাগরণের কাছে পিছু হটতে হয়েছে শাসক ও শোষকশ্রেণীকে।

এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে বহু দৃষ্টান্ত। আমাদের খুব কাছের দেশ শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি সংগ্রামী তামিল জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে পুলিশ, সেনা এমন কী প্রতিবেশীদেশ ভারতের সেনা নামিয়ে সমস্ত রকম ভাবে দমননীতি চালিয়েও দমন করতে পারেনি তামিল জনগোষ্ঠির সংগ্রামকে।

আমাদের দেশেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। হাতের কাছেই দুটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব ও কাশ্মীর, সেখানে জনসমষ্টির সিংহভাগের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন থাকায় আন্দোলন ধ্বংস করতে গিয়ে সর্বাত্বক চেষ্টা সত্বেও সরকার এমন নিদারুণভাবে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ ওসব জায়গায় আন্দোলন ধ্বংস করতে হলে প্রায় সমগ্র জনসমষ্টিকেই ধ্বংস করতে হয়; যা অসম্ভব। অসম ও অন্ধ্রে একইভাবে যত বেশি বেশি করে স্থানীয় মানুষরা আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন ততই এই আন্দোলন ধ্বংস করা সরকারের পক্ষে অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে উঠছে।

শ্রীলঙ্কা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম বা অন্ধ্রের আন্দোলনকে সমর্থন বা অসমর্থন করা এই উদাহরণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য— আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত টেনে এনে বোঝার ব্যাপারটা সহজতর করা। সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে রাখাটাও

প্রয়োজনীয়, বিচ্ছিন্নতার সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়াসে। যখন কোনও জনগোষ্ঠির যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হবে আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের চেতনা, তখন রাষ্ট্রশক্তি ওই জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে জনগোষ্ঠির বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর লেবেল লাগাবে। 'বিচ্ছিন্নবাদী' শব্দটা 'নাস্তিক' শব্দের মতই এমনই এক নেগেটিভ এ্যাপ্রোচ বা নেতিবাচক আবেদনে ভরা দীর্ঘ প্রচারের দৌলতে। ভাবুন তো, একটা শোষণযুক্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে জনগোষ্ঠি শোষণ মুক্ত সমাজ গড়তে চাইবে, নিজেদের শাসন কায়েম করতে চাইবে, তারা তো দেশের মূল জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেই বাধ্য। যে সমাজে শোষক ও শোষিতদের সহবস্থান বিরাজ করছে, সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হযে তবেই কোনও জনগোষ্ঠি গড়ে তুলতে পারে শোষনমুক্ত সমাজ। একটি শোষণমুক্ত জনগোষ্ঠি বহুকে প্রভাবিত করতে পারবে এই পরম সত্যটি মাথায় রেখেই জনগোষ্ঠিকে তাঁবেতে রাখতে সচেষ্ট বা জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায অবতীর্ণ রাষ্ট্রশক্তি এমন ভাবে প্রচার চালাতে থাকে যে সাধারণ মানুষ দেশ বলতে, দেশেব বৃহত্তম নিপীড়িত জনসাধারণ, এই সত্যটি ভুলে গিযে দেশকে একটা ভূখণ্ড একটা ম্যাপ ভেবে ফেলে। ফলে শোষণযুক্ত সমাজব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া রক্তাক্ত শোষিত মানুষগুলোর সংগ্রামকে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে, নীতিগতভাবে সমর্থন জানাবার পরিবর্তে, আমরা শোষিত মানুষরাও ভুল করে অঙ্গহাণীর ব্যথা অনুভব করি। শোসকশ্রেণীর খপ্পর থেকে কিছু মানুষ যে অন্তত মুক্তি পেয়েছে, ম্যাপের ওই বিচ্ছিন্ন অংশটা কিছু কিছু মুক্তিকামী মানুষদের জযেরই প্রতীক, যা আবো অনেক নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, এ-কথা ভুলিয়ে রাখতেই রাষ্ট্রশক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে জুড়ে দিতে সচেষ্ট একটা নেতিবাচক আবেদন।

বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে আদর্শ ও পরিস্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হযেই গড়ে ওঠে বিপ্লবী চেতনা। পবিস্কার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই যুক্তির কাজ, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কাজ।

যুক্তিবাদী আন্দোলন, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন আপাত-নিরীহ এক আন্দোলন, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অসাধারণ শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থাণের বীজ, ঠাসা রয়েছে শোষণমুক্তির বিস্ফোরক বারুদ।

গোল পাকাতে জাতীয়তাবাদ নিয়ে গোলা-গোল কথা

'দেশপ্রেম' ও 'জাতীয়তাবাদ' শব্দ দুটির ব্যাপক ও বহুল অপব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ এতটাই প্রভাবিত যে এই শব্দ দুটিই আজ শোষক ও শাসকশ্রেণীর শক্তিশালী হাতিয়ার হযে উঠেছে। কখনও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতা ঢাকতে, কখনও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটেব অনিবার্য ফল হিসেবে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে

ধূমায়িত ক্ষোভে একগাদা ঠাণ্ডা জল ঢালতে হঠাৎই প্রতিবেশীরাষ্ট্রের জুজু দেখান হতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের সীমান্তে তৎপর হয়ে উঠেছে, আমাদের দেশে নানা নাশকতামূলক কাজ করে বেড়াচ্ছে ওদের দেশের গেরিলা সেনারা। আর দুই প্রতিবেশী দেশের শাসক ও শোষকগোষ্ঠির একই সমস্যা হলে তো কথাই নেই, দুই সরকার গোপন সমঝোতায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে বেতারে দূরদর্শনে দেশপ্রেমের গানের বন্যা বইয়ে দিয়ে এমন গণউন্মদনার সৃষ্টি করে যে, ভিখারীও একদিন উপোস করে থেকে তার একদিনের ভিক্ষে করে পাওয়া অর্থ যুদ্ধখাতে তুলে দেয়, সদ্য বিবাহিতা গা থেকে খুলে দেয় গয়না। দরিদ্র মানুষগুলো আরো বেশি দারিদ্র্যতার পাঁকে ডুবতে ডুবতে স্বপ্ন দেখে তাদের দেশের সেনারা অন্য দেশের লোকদের কিভাবে গুলিগোলায় ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। গরীব মানুষগুলো দেশের স্বার্থে ভুলে যায় ব্যক্তিগত পাওয়া না পাওয়ার ক্ষোভ বঞ্চনার তীব্র জ্বালা।

গরীব দেশগুলো যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে, সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তখন লাভ হয় কাদের? ক্ষতিই বা কাদের? লাভ বিদেশী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের, লাভ দেশী অস্ত্র-দালালদের, লাভ শাসক ও শোষকদের, বহু সংকটময় মুহূর্তে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় বলে। লোকসান পুরোটাই সাধারণ মানুষের। অনেক আন্দোলন, অনেক অবরোধ, অনেক ক্ষোভ যুদ্ধের আগুনে পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় যদি আন্দোলন চালাতে যান, শাসককূল আপনার সামনে পিছনে 'পঞ্চমবাহিনীর' অর্থাৎ শত্রুদেশের গুপ্তচর বলে ছাপ মেরে দেবে। আর জাতীয়তাবাদের গণ-উন্মাদনার জোয়ারে শোষিত মানুষই সেই কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেবে, বিরোধীতা করবে আপনাদের আন্দোলনের।

'জাতীয়তাবাদ' শব্দটার বাস্তবিকই অর্থ কী? আসলে 'জাতিয়তাবাদ' শব্দের কোনও অর্থই হয় না, অর্থ হতেই পারে না। 'জাতি' কথার অভিধানগত অর্থ সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ। যেমন মানবজাতি, উদ্ভিদজাতি, পশুজাতি, নারীজাতি, পুরুষজাতি, আবার ধর্মের অন্তর্গত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন হিন্দুজাতি, মুসলমানজাতি, খৃষ্টানজাতি। আবার সামাজিক বিভাগজাত মানবসমষ্টিও জাতি। যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, চণ্ডাল। এমনিভাবে জাতি-বিভাগ নিয়ে আলোচনা প্রায় অসীম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

'জাতীয়' কথার অর্থ জাতি সম্বন্ধীয়। 'বোধ' কথার অর্থ উপলব্ধি, অনুভব।

তাহলে আমরা 'জাতীয়তাবোধ' কথাটির অর্থ হিসেবে পেলাম 'জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি'। কিন্তু কোন্ জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধি? যে কোনও জাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিই হতে পারে।

শাসকশ্রেণী বা রাজনীতিকরা অথবা তাদের স্নেহধন্য কলমচীরা 'জাতীয়তাবাদী' বলতে ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা বলে ব্যাখা চাপাতে চেয়েছেন। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' ও 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটিকে ব্যবহার করে হিন্দুজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে চাইছে, হিন্দুজাতীয়তাবোধের গণউন্মদনা সৃষ্টি করতে চাইছে। এই বিষয়ে ওরা যে বিশাল সাফল্য পেয়েছে, সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সাফল্য তারই প্রমাণ। 'আমরা বাঙালী' আবার 'জাতীয়তাবাদী' শব্দটিকে প্রয়োগ করে

বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিযে বাঙালীত্ব জাগাবার চেষ্টা করছে।

শাসকশ্রেনী জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারনা সাধারণের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে ধনীজাতীয় মানুষ ও গরীবজাতীয় মানুষদের সহবস্থানের কথা বোঝায়।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে দেশের জন্য, জাতির জন্য একতাবদ্ধ হওযার পক্ষে হাওয়া তোলে। এমন ব্যাপক প্রচারে নিপীড়িত দরিদ্র মানুষগুলো তাদেব শোষকদের চিনতে ভুলে যায়, তাদের শত্রু চিনতে ভুলে যায। ভুলে যায় তাদের কারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করছে, গিলে খাওযার চেষ্টা করছে।

'জাতীযতাবোধ' বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয় উপলব্ধিকে আমবা বুঝি, এবং 'জাতীয়তাবাদ' বলতে যদি মানবজাতি সম্বন্ধীয মতবাদকে বুঝি তাহলেও সেই একই সমস্যা থেকেই যায। এই জাতীয় কোনও মতবাদ দ্বারা সম্পূর্ণ মানবজাতীর মঙ্গল অসম্ভব। মানবজাতির মধ্যেকার শোষকশ্রেণীর মঙ্গল মানেই শোষিত শ্রেণীব অমঙ্গল। আব শোষিত শ্রেণীর মঙ্গলমানেই শোষকশ্রেনীর অমঙ্গল। দুই শ্রেণীর মঙ্গল যেহেতু একই সঙ্গে সম্ভব নয, তাই দুই শ্রেণীর সহবস্থানে মানবজাতির মঙ্গলচিন্তাও অতি অবাস্তব। শোষিত শ্রেণীর মাথার থেকে শোষিত শ্রেণীর চেতনা দূর করতেই এই ধরনের জগাখিচুড়ির মতবাদ গেলানোর নিরন্তন প্রয়াস চালিযে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি।

ধর্ম-নিরপেক্ষতা নিয়ে যে ভুল ধারণা চাপানর চেষ্টা চলছে নিরন্তন

সম্প্রতি ধর্ম-নিরপেক্ষতা নিযে দেশজুড়ে অনেক হৈচৈ হচ্ছে। প্রচুর আলোচনা, প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। শহরে হোডিং পড়েছে, পোস্টার পড়েছে। এই হোডিং পোস্টাবে শহর কলকাতাও ঝলমল করছে। এইসব আলোচনা, লেখালেখি ও হোডিং-পাস্টার পড়ে সাধারণ মানুষ ধর্ম-নিরপেক্ষতা শব্দের সঙ্গে দারুণভাবে পরিচিত হযেছে। জেনেছে 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' কথার অর্থ 'সব ধর্মের সমান অধিকার।'

বিপুল সরকারি অর্থব্যয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা সর্বত্র হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সঙ্গে সম্পর্কীতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকরা মন্দিবে মন্দিরে পুজো দিযে বেড়াচ্ছেন, গুরুদোয়ারায নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে, গীর্জায শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন, দেওয়ালি, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়করা বেতার দূরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে বেহাইযের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছেন।

সাধারণের ভাল লাগছে— 'সব ধর্মের সমান অধিকার' মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদযের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভাল লাগছে জনসাধাবণের— হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ

ধর্মনিরপেক্ষ, এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রীর আমলার। মন্ত্রীরা এরই মাঝে বুঝিয়ে দেন, সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল জ্বালিয়ে রাখতে রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে, ভাব যায় না?

'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোনও পক্ষে নয়। 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ, কোনও ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত। 'Secularism' শব্দের অভিধানিক অর্থ—একটি মতবাদ, যা মনে করে, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

একি। এদেশে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখছি? সেকুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনও প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস হয় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে, নারকোল ফাটিয়ে।

সেকুলার রাষ্ট্রে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের ব্যাপার হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় নীতিতে এই ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস যেন প্রকাশ্যে না এসে পড়ে, এ-বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু ভারতবর্ষে মন্ত্রী, রাজনীতিক ও আমলরা প্রকাশ্যেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মাচার পালন করেন। প্রয়োজনে এইসব রাজনীতিকরা সব ধর্মকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ফলে এইসব রাজনীতিকরাই যখন ধর্ম-নিরপেক্ষতার বড় বড় বুলি কপচায় ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলে তখন এদের দ্বিচারী ধান্দাবাজ চরিত্রই প্রকাশ পায়।

গণতন্ত্র যেখানে বর্বর রসিকতা

আমাদের দেশ বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক' দেশ। এ দেশে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার। সংবিধান সেই অধিকার রক্ষায় সদা সতর্ক। এখানে লৌহযবনিকার অন্তরালে মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয় না। এ-দেশের মানুষ খাঁচার পাখী নয়, বনের পাখির মতই মুক্ত। এদেশে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতির আর ওড়িষ্যার কালাহাণ্ডির মানুষগুলো একই অধিকার ভোগ করে, চুলচেরা সমান অধিকার।

এই ধরনের প্রতিটি কথাকে বর্বর রসিকতা বলেই মনে হয় যখন দেখি, কালাহাণ্ডির মানুষগুলো দিনের পর দিন ক্ষুধার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিল, আর তারই সঙ্গে মৃত্যু ঘটল একটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারের এ-সব আপনজন হারা বহু মানুষের হৃদয়কে

দুমড়ে-মুচড়ে রক্তাক্ত করে। এই রক্তাক্ত হৃদয়গুলোই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, যখন দেখে শোষকশ্রেণীর কৃপায় গদীতে বসা কতকগুলো রাজনীতিক ওই একই সময় রাষ্ট্রপতির গণতান্ত্রিক অধিকারসম্মতভাবে দেওয়া ছত্রিশ কোর্সের ভোজসভায় কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে করতে ভারতবর্ষকে 'সুমহান গণতন্ত্রের দেশ' 'সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ' ইত্যাদি বলে কদর্য বর্বর রসিকতা করছে।

প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারই বিড়লা, আম্বানিদের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ভিখারীটিকে পর্যন্ত। পার্থক্য শুধু রাষ্ট্রশক্তির অকরুণ সহযোগিতায় বিড়লা, আম্বানিদের অধিকারের হাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে ভিখারীর অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেই শুধু ভুলে গেছে রাষ্ট্রশক্তি— এই যা।

১৬ সেপ্টেম্বর '৯১ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটা খবরের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খবরটাকে ছোট্ট করে নিলে দাঁড়ায় এই— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এক বড় কর্তার বাগান আছে ঝাড়গ্রামের জিতুশোল মৌজায়। সেই বাগান থেকে তিনটি আমগাছের চারা চুরি যাওযায় রাজ্য পুলিশবাহিনী তাণ্ডব চালিযেছে ঐ অঞ্চলে। পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে জিতুশোল মৌজার তিনশো গ্রামবাসী জঙ্গলে পালিযে গিযেছেন। একটিও বয়স্ক পুরুষ নেই গ্রামে। তবু গ্রামবাসীদের ওপর চলেছে পুলিশের ভীতিপ্রদর্শন। অনেককেই থানা-লকআপে আটক রেখে দিনের পর দিন পেটান হচ্ছে। আর পুলিশের বড়কর্তার বাগান পাহারা দিতে রাজ্যের জনগণের টাকায পালিত পুলিশ একটি স্থাযী চৌকি বসিযেছে।

একবার উত্তেজিত মাথাকে ঠাণ্ডা করে ভাবুন তো— একটি গরীব লোকের বাগান থেকে তিনটে আমগাছের চারা চুরি গেলে থানায় রিপোর্ট লেখাতে গেলে পুলিশ তার সঙ্গে কী ব্যবহার করবে? আমচারা চোর ধরে দেবার বেযাদপী আবদার শুনে থানার মেজবাবু হয বেজায় রসিকতা ভেবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন, নতুবা বেযাদপটাকে এক দাবড়ানীতে থানা-ছুট করতে বাধ্য করবেন।

কিন্তু রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তার বাগান থেকে মাত্র তিনটি আমচারা চুরি যেতেই গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায অতন্দ্র-প্রহরী পুলিশবাহিনী পাগলা-কুকুরের মতই ঝাঁপিযে পড়লো জিতুশোলের মানুষগুলোর ওপর। পুলিশী অত্যাচারে তিনশো মানুষ জঙ্গলের রাজত্ব থেকে বাঁচতে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। ধরে নিলাম, ওই গ্রামবাসীদের মধ্যেই রযেছে এক, দুই বা তিনজন আমচারা চোর। ধরে নিলাম, পুলিশ তাদের ধরেও ফেলল। ফেলুক, খুব ভাল কথা। তারপর পুলিশের কর্তব্য চোরটিকে বা চোরদের বিচার বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া। অপরাধ প্রমাণে শাস্তি যা দেবার তা দেবে বিচার বিভাগ। ওই বিচারাধীন চোর বা চোরদের পেটাই

করার কোনও অধিকার আমাদের দেশের গণতন্ত্রে তো পুলিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।

জিতুশোল মৌজার এক দুই বা তিনজন সম্ভাব্য অপরাধীর ওপর পুলিশী অত্যাচার নেমে আসেনি, পুলিশবাহিনী বর্বর গুণ্ডামী চালিয়েছিল তামাম গ্রামবাসীদের ওপর। গ্রামবাসীদের একটিই অপরাধ বড় কর্তার বাগান এলাকায় তাদের বাস।

আইন ভাঙা অপরাধ। আইনের রক্ষকদের আইন ভাঙা আরও বড় অপরাধ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ওইসব বর্বর গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে আইন আদৌ কঠিন হতে পারবে? তা যদি না পাবে তবে অত্যাচারিত মানুষগুলো, যুক্তিবাদী মানুষগুলো, অনপুংশক মানুষগুলো কী করে বিশ্বাস করবে—আমাদের দেশের গণতন্ত্রে রাজ্য-পুলিশের বড়কর্তারও একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর সমান গণতান্ত্রিক অধিকার?

পুলিশের সামান্য বড়কর্তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের অধিকারের পার্থক্য যদি এমন আশমান-জমিন হয়, তবে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের সঙ্গে এবং মন্ত্রী বানাবার মালিক অর্থকুবেরদের সঙ্গে গরীব মানুষগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারের পার্থক্য যে সীমাহীন হবে, এই তো প্রকৃত সত্য।

এ-দেশে অনেক বিত্তবানেরাই, অনেক জোতদারেরাই নিজস্ব গণতন্ত্রের হাতকে আরো বেশি দীর্ঘ করতে বাহিনী পোষে। এইসব বাহিনী বা সেনাবাহিনীর নামও নানা বিচিত্র ধরনের—ভূমিসেনা, লোরিকসেনা, ব্রাহ্মর্ষিসেনা, এমনি আরো কত নামেই রয়েছে এইসব সংগঠিত হিংস্র সেনাবাহিনী। সেইসব বাহিনীর হাতে নিত্যই নিপীড়িত, খেটে খাওয়া মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। সামান্য ইছায় এরা গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, লুটে নেয় মহিলাদের লজ্জা। আর নির্লজ্জের মত সরকার দেখেও অন্ধ হয়ে থাকে। এই উগ্রপন্থী নরখাদকদের কঠোর হাতে দমন করতে কখনই তো এগিয়ে আসে না সরকার? কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকারে এই সব সেনাবাহিনী পুষে চলেছে হুজুরের দল? নিপীড়িত মানুষদের দাবিকে দাবিয়ে রাখতে ওদের সেনাবাহিনী পোষা যদি গণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থা না হয়, তবে অত্যাচারিত মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য সেনা গঠন অগণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র—বীরভোগ্যা'র গণতন্ত্র। যার যত বেশি ক্ষমতা, যত বেশি অর্থ, যত বেশি শক্তি, তার তত বেশি বেশি গণতন্ত্র। শোষকদের অর্থে গদীতে আসীন হয়ে শোষক ও শোষিতদের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার বিলান যায় না। শাসক ও শোষকরা শুধু এই অধিকারের সীমা ভঙ্গই করে পরম অবহেলে; আর শোষিতদের অধিকার বার বার লাঞ্ছিত হয়, লুণ্ঠিত হয়—এ অতি নির্মম সত্য। আপনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন; তাহলেই দিনের আলোর মতন পরিস্কার হয়ে যাবে 'গণতন্ত্র' আছে দেশের সংবিধানে ও বইয়ের পাতায়, গরীবদের জীবনে নয়।

যে দেশের মানুষের দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার অধিকার নেই, বেঁচে থাকার অধিকার নেই, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে গ্রহণের অধিকার নেই, শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধে গ্রহণের

অধিকার নেই সেখানে বিড়লা, আম্বানি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর গরীব মানুষগুলোর সমান গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা যারা বলে তারা শয়তানেরই দোসর—এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গণতন্ত্র মানে কী শুধুই ভোট দেওয়ার অধিকার? সেটাই বা ক'জনের আছে? ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, চতুর রিগিং সেই অধিকারে তো অনেক দিনই থাবা বসিয়েছে।

তারপরও যদি ভোট দেওয়ার অধিকারের প্রসঙ্গ টেনে কেউ বলেন এই দেশের মানুষই কখনও ইন্দিরাকে তুলেছেন, কখনও নামিয়েছেন, কখনও রাজীবকে সিংহাসনে বসিয়েছেন, কখনও বা ছুঁড়ে ফেলেছেন, কখনও এনেছেন ভি. পি-কে, কখনও বা পি. ভি-কে; তাঁদের আবারও মনে করিয়ে দেব পরম সত্যটি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে বলব কথাটি—মন্ত্রী যায় মন্ত্রী আসে এদের বহু অমিলের মধ্যে একটাই শুধু মিল—এঁরা প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণীর কৃপাধন্য, পরম সেবক। এরা শোষকদের শোষণ বজায় রাখার ব্যবস্থা করে দেবার বিনিময়ে আখের গোছান।

আর একটি ঘটনার দিকে আপনার দৃষ্টিকে একটু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

১৪ আগস্ট'৯১ আনন্দবাজারে তিনটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, যাদের শুরু একই রকম হলেও পরিণতি ভিন্নতর। সংবাদ এক: সৌদি আরবের এক বৃদ্ধ এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। আদালত ওই বিচারাধীন আসামীকে পনের দিন পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সংবাদ দুই: ওড়িশার জনতা দলের বিধায়ক তথাগত শতপথী একটি নাবালিকাকে ফুসলিয়ে ভুবনেশ্বর থেকে পুরী নিয়ে যান এবং নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে পুলিশ তথাগতকে গ্রেপ্তার করে। ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জনতা দলের শ্রীবিজু পট্টনায়কের হস্তক্ষেপে তাঁর দলের বিধায়ক তথাগতর উপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়। তথাগত অবশ্য গর্বের সঙ্গে স্বীকার করেছেন এমন মেয়ে ফুসলান তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। সংবাদ তিন. ত্রিপুরার মন্ত্রী জহর সাহা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এক অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় মহিলাটির পাড়ার লোকেদের হাতে ধরা পড়েন। জহর সাহাকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার। জহর ঘোষণা করলেন, তাঁকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে না নিলে মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কীত প্রামাণ্য দলিল তুলে দেবেন সংবাদপত্রের হাতে। শঙ্কিত ও জহর ভয়ে কম্পিত মুখ্যমন্ত্রী ওই দিনের সংবাদে জহর সাহাকে 'ধোয়া তুলসী পাতা' বলে ঘোষণা করে ইঙ্গিত দিয়েছেন জহরকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে নেবেন।

আরবের শেখ, তথাগত শতপথী ও জহর সাহার খবর পড়ে যদি ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নাগরিক তার শিক্ষককে প্রশ্ন করে বসে—ভারতবর্ষ কেমন গণতন্ত্রের দেশ, দুর্নীতিপরায়ণ লম্পটরা রাজনীতিক হওয়ার সুবাদে আইনকে লাথি কসিয়ে ফুটবল খেলে আর খুঁটির অভাবে ভাবচেয়ে লঘু অপরাধে জেলে পচে বুড়ো শেখ? কী জবাব দেবেন শিক্ষক? সত্যি কথাটুকু বলতে গেলে যে দরাজ বুকের পাটা

প্রযোজন তা এই চাটুকার ধান্দাবাজ ও ক্লীবে ছেয়ে ফেলা দেশে কতজনের আছে? শিক্ষকরা আজ যদি সত্যির থেকে মুখ ঘুরিযে থাকে, ছাত্ররা যারা দেশের ভবিষ্যত— তারা কী শিখবে?

জানি— দুর্নীতি যেখানে অসীম, দলবাজী যেখানে চূড়ান্ত, অন্যাযের সঙ্গে আপোস যেখানে বেঁচে থাকার শর্ত— সে দেশে সত্যি বলাটা, সত্যি শেখানোটা চূড়ান্ত অপরাধ, 'উগ্রপন্থী' 'দেশদ্রোহী' বলে দেগে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তবু ভবিষ্যৎ প্রজন্মেব কথা ভেবে শিক্ষার মহান দাযিত্ব মাথায তুলে নেওয়া মানুষদেরই তুলে নিতে হবে মানুষ গড়ার দাযিত্ব, নতুন প্রজন্মের মানুষ গড়ার দাযিত্ব।

'জনসেবা' নিয়ে স্বচ্ছতা থাকা অতি প্রয়োজনীয়

গত কয়েক বছবে যুক্তিবাদী আন্দোলন সাধাবণ মানুষেব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশে দ্রুত ছড়িযে পড়তে শুরু কবেছে। সাধারণ মানুষকে কুযুক্তির গারদ ভেঙে স্বচ্ছ চিন্তার জগতে নিযে আসতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের আগুন ছড়িযে দেওযাব কাজে এগিযে এসেছে বহু বিজ্ঞান ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য গোষ্ঠি, লিটিল ম্যাগাজিন প্রমূখ গণসংগঠন। কাজ-কর্মে এবা অনেকেই খুবই আন্তরিক। কুসংস্কার মুক্তির কাজের সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকেই আরো নানা ধরনের সমাজ কল্যানমূলক, সমাজসংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, চক্ষুদান, মরণোত্তর দেহদান, কৃষিজমি পরীক্ষা, হাসপাতালে সাপেকাটা বোগীর চিকিৎসার সুব্যবস্থার দাবি তোলা, জলা বাঁচাও, বৃক্ষবোপন, বিনামূল্যে চিকিৎসাকেন্দ্র, ফ্রি কোচিং সেন্টার, ফ্রি রিডিংরুম এমনি আরো বহুতর সেবামূলক কাজের মধ্য দিযে অনেক মানুষের ভালবাসা ও শুভেচ্ছাও এইসব সংস্থার পাথেয় হযেছে। ফলে এরা সার্থক গণসংগঠন হযে উঠেছে।

জনকল্যাণমূলক কাজেব মধ্য দিযে জনচিত্ত জয করার পদ্ধতিটি আরো সফল ভাবে কাজে লাগিযেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মোআমার-অল-আলক-আল-ইসলামী প্রমূখ বহু ধর্মীয প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের জনকল্যানমূলক কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত রেখেছে। হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, বন্যায বা সাম্প্রদাযিক দাঙ্গায ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মশালা এমনি নানা ধরনের জনকল্যানমূলক কাজকর্মের প্রলেপে সাধারণেব মন জয কবে তাদের আবেগ সিক্ত, কৃতার্থ হৃদযে রহস্যবাদ, দুর্জেযবাদ, ধর্মীয কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল ও রকমাবি ভাববাদী চিন্তাও ঢুকিযে দিচ্ছে। আবেগ সিক্ত, ঋণী, কৃতার্থ মগজ তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে এদের নিপীড়িত মানুষদের বন্ধু হিসেবেই ধরে নিচ্ছে। নিপীড়িত, শোষিত মানুষগুলো এইসব প্রতিষ্ঠানকর্মীদের সেবাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছেন এইসব ভালো-লাগা মানুষগুলোর চিন্তাও।

ভাববাদী শিবিবেব এই ধবনের মগজ ধোলাই কৌশল থেকে শিক্ষা নিযে যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীদেরও প্রযোজনে জনচিত্ত জযেব জন্য নানা জনকল্যানমূলক কাজেব সঙ্গে জড়িত হতে হবে পাল্টা মগজ ধোলাই করতে। যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে

এগিয়ে নিয়ে যাওযাব মধ্যেই সাধাবণ মানুষের চেতনা মুক্তি এবং সেই পথ ধরে সার্বিক শোষণ মুক্তিব স্বপ্ন দেখছেন তাদেব কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে—উপলক্ষ্য যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে জনকল্যানমূলক কাজকর্ম যে শুধু মাত্র উপলক্ষ্যই হতে পারে, এই বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রয়োজন। স্পষ্টতই মনে রাখতে হবে পরম সত্যটি—সেবায আব যাই কবা যাক, সমাজব্যবস্থা পাল্টান যায না, শোষণমুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণমুক্তি ঘটতে পাবে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সমাজসচেতনতা বোধ থেকে। সাধারণ মানুষেব বৃহত্তর অংশ যেদিন বুঝতে শিখবে তাদের বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট নির্ধারিত নয়, পূর্বজন্মের কর্মফল নয, ঈশ্বরজাতীয কোনও কিছুব অভিশাপ নয, বঞ্চনাব কারণ শোষকশ্রেণী, সে-দিন তাদের নিজেদেব স্বার্থেই, বাঁচাব তাগিদেই বঞ্চনামুক্তির জন্য পাথর না পরে, পুজো না দিয়ে আঘাত হানবে শোষকশ্রেণীর দুর্গে।

কিন্তু এই আঘাত হানার প্রসঙ্গে তখনই আসবে যখন শোষিতশ্রেণীর ঘুম ভাঙ্গবে, তারা বঞ্চনার কাবণগুলো বুঝতে পাববে। গবীবদেব ক্ষোভকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ধনীব অর্থে চলছে 'দরিদ্র-নারায়ণ সেবা'। দরিদ্র-নারাযণের সেবা যাদের চিবন্তন লক্ষ্য, তাদেব সেবা বিলোবার জন্য দরিদ্র-নাবাযণেব সববরাহও যে চিবন্তন হওযা প্রযোজন—এই সত্যটুকু আমাদের ভুললে চলবে না। এই সেবামূলক কাজে তাৎক্ষনিক লাভ গবীবদের হলেও ভবিষ্যতেব জন্য পড়ে রইল অনন্ত বঞ্চনাময জীবন।

জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সম্পর্কটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের, শোষণমুক্তিব সংগ্রামের সম্পর্কটা। যাঁরা বুঝতে চাইবেন না, বুঝতে পাববেন না, তাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই পারা সম্ভব নয। এইভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে সাধারণ মানুষেব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতব অংশে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে যেতে দেবে না রাষ্ট্রশক্তি। কাবণ রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ মানুষের চেতনাকে ততদূর পর্যন্তই এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে, যতদূর পর্যন্ত এগোলে তাদের কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। যখনই বিপদের গন্ধ পাবে, তখনই নানাভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। কখনও সংস্থাকে আর্থিক সাহায্যে মুড়িয়ে দিযে লেজুড় করতে চাইবে, কখনও সংস্থা দখল করতে চাইবে নিজের পেটোযা দালালদের নিয়ে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের পাওযা-দেওযার রাজনৈতিক চালেই কিনে নিযে সংস্থাকে পকেটে পুরতে চাইবে, কখনও সংস্থাকে জনসাধাবণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে লাগাতারভাবে প্রচেষ্টা চালিযে যাবে, কখনও সংস্থার সুনাম জনমানসে মলিন করতে সংস্থা-প্রধানের চরিত্রহননেব চেষ্টা করা হবে, কখনও বা সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা হবে সমাজসংস্কারমূলক, জনসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত হওযার জন্য। শেষ পদ্ধতিটি আপাত নিবীহ হলেও মগজ ধোলাইয়ের পক্ষে শাসকশ্রেণীব পক্ষে খুবই কার্যকর অস্ত্র। সেবামূলক বা সমাজসংস্কারমূলক কাজকর্ম যেমন বৃক্ষরোপণ, পবিবেশ দূষণ, রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদিব পক্ষে দীর্ঘমেযাদী ব্যাপক প্রচাব চালান। যে সব ব্যক্তি ও সংস্থা এ-সব কাজে এগিযে আসে বার বাব তাদের মুখ ভেসে ওঠে দূরদর্শনে, গলা ভেসে ওঠে বেতাবে। এগিযে আনা হয আবো সব প্রচারমাধ্যমকে। মন্ত্রীবা বার বাব হাজি হতে থাকেন এইসব সংস্থার

অনুষ্ঠানগুলোতে। মন্ত্রীর সহচার্য, বেতার দূরদর্শনে প্রচার, সব মিলিযে একটা ক্রেজ। একটু একটু কবে আরো বেশি বেশি সংস্থা সমাজসেবা, সমাজসংস্কারের কাজে এগিযে আসতে থাকেন। অনেকেই আরও বেশি বেশি করে অনুভব করতে থাকেন এই ধরনের কাজ কর্মে এগিযে আসার প্রযোজনীযতা।

আসুন আমরা ফিরে যাই 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সময়ে। ইযং বেঙ্গলরা প্রচুর ঝুঁকি নিযে ভয়ংকর সব স্পর্শকাতর বিষয়ের বিরুদ্ধে সমাজসংস্কারে ঝুঁকেছিলেন। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্য বিবাহ, জাত-পাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরব হযেছিলেন। গরুর মাংস প্রকাশ্যে গ্রহণ কবেছিলেন। কিন্তু এর কোনওটাই যে সমাজ-অগ্রগতির সূচক নয তার জ্বলন্ত উদাহরণ ভারতের মুসলমানরা। মুসলমান সমাজে সতীদাহ প্রথা চিরাকলই অনুপস্থিত, বিধবা বিবাহ প্রচলিত, কনের পূর্ণ সম্মতিতে বিয়ে হতে হয় বলে একটা চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপার রযেছে, অপ্রাপ্তবয়স্কার বিযে ইসলামী মতে হতে পারে না, অর্থাৎ মুসলমান সমাজে বাল্যবিবাহ হতে পাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে অপ্রাপ্তবযস্কার বিযে হয, এবং এটা সম্ভব হযেছে শুধুমাত্র হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রভাবে। মুসলমানরা গরুর মাংসই গ্রহণ করে। অর্থাৎ, যে কযটি বিষয ঘিরে গত শতকে বাংলার রেনেসাঁ যুগে সমাজসংস্কারের আন্দোলন গড়ার চেষ্টা হযেছিল তার প্রায সব কটি সংস্কাবেরই উর্ধ্বে ছিল বাংলার মুসলিম সমাজ। কিন্তু তাতে বাংলাব মুসলমান সমাজের শোষণমুক্তি ঘটেছিল কী? না, ঘটেনি। বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগুবু অংশই ছিলেন হিন্দু সংখ্যাগুরু অংশের চেযেও তুলনামূলকভাবে বেশি শোষিত।

সমাজসংস্কার ও সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজের শোষণ মুক্তি ঘটেছে—এমন একটি দৃষ্টান্তও আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকের জ্ঞানের ভাণ্ডারে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, হাজারটা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হাজার মাদার টেরিজা ভারতের শোষিত জনতার শোষণমুক্তি ঘটাতে পারবে না।

এই কথাটাও স্পষ্ট করে বলি—সমাজসেবা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু সমাজ সেবাব মধ্য দিযে ধর্মীব প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সাধারণ মানুষের চিন্তায চেতনায রহস্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, ধর্মীয কুসংস্কার ইত্যাদি ঢুকিযে দিচ্ছে, তাকে বুখতে আমবাও কী পারছি, সমাজ সেবার মধ্য দিযে সাধারণ মানুষের চেতনায স্বচ্ছতা আনতে? যদি পারি, তবেই আমাদেব স্বার্থকতা, নতুবা আমরা সমাজসেবার আবর্তে শাসক ও শোষকশ্রেণীর সুতোর নাড়াতে পুতুল নাচই নেচে যাব।

যুক্তিবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধে কাগুজে যুক্তিবাদীর সৃষ্টি

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রসার প্রতিরোধেব চেষ্টা ধনীকশ্রেণী ও তাদের অর্থে গদীতে বসা সরকার কবে চলেছে এবং করে চলবে। এই প্রতিরোধ একই ভাবে করা হবে না। প্রতিরোধ কখনও হবে অহিংস ভাবে, কখনও সহিংস ভাবে। অহিংস প্রতিবোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মগজ ধোলাইয়ের। কখনও মগজ ধোলাই করা হবে শোষিত মানুষদেব, কখনও মগজ ধোলাই করা হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের।

মগজ ধোলাই করতে শাসকশ্রেণী স্বভাবতই নির্ভর করে উন্নততর মগজদের, বুদ্ধিজীবীদেব। নানাভাবে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের গ্রাস কবে ফেলে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনীকশ্রেণী। এই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি কত রকমভাবেই হয়ে থাকে। কেউ সরকারি জমি চাইতেই পেয়ে গিয়ে কৃতার্থ হয়ে পড়েন। কেউ পান সরকাবি ফ্ল্যাট। কেউ পদ। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে কারু বা মেরুদণ্ড কাদার মতই নরম হয়ে যায। কেউ বা বিশাল পত্রিকা-গোষ্ঠির মালিকেব 'পেপার পলিসি' সার্থক করে তোলাব বিনিময়ে গাড়ি, ফ্ল্যাট, মাঝে-মধ্যে বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে স্টাটাই বজায বাখেন। কেউবা পত্রিকা মালিক গোষ্ঠি বা সরকারেব দেওযা পুরস্কারের কাছে বাঁধা রাখেন নিজের বিবেক। কেউ দূরদর্শনে সিযিল পাশ করাতে বাজনীতিকদের কাছে বিক্রী করেছেন আদর্শ। এমনি কতভাবেই বুদ্ধিজীবীদের বিবেক পুবোপুরি গ্রাস কবে ফেলছে শাসক ও শোষকশ্রেণী।

যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করতে, সাধারণ মানুষের ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীদের, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের মগজ ধোলাই করতে শাসকশ্রেণী কাজে লাগায় তাদের নিজস্ব প্রচার-মাধ্যমগুলোকে এবং ধনীকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী পত্র-পত্রিকাগুলোকে। এই প্রচার মাধ্যমগুলোব প্রধান চালিকাশক্তি ধনীকশ্রেণীর ও বাষ্ট্রশক্তির পেটোযা বুদ্ধিজীবীবা। এইসব শক্তিমান লেখক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার প্রমুখেরা মগজ ধোলাই কবেন নানা শ্রেণীর মানুষদের কথা মাথায় রেখে নানাভাবে। গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে, যাত্রায়, এঁরা হাজিব করছেন অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি, অদৃষ্টবাদ, ভক্তিরসের প্লাবন। আবার দেশের যুবশক্তির মাথা খেতে হাজির করছেন রগরগে উত্তেজনা, অপরাধমূলক কাজকর্ম, যৌনতা, নেশা, খুন-খারাপি, ভোগ সর্বস্ব চিন্তাধারা, ক্যারিয়ারিস্ট চিন্তাধারা। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষগুলো যুক্তিবাদী লেখাপত্তরের চেয়ে এসব খাচ্ছে ভাল। বলতে গেলে গোগ্রাসে গিলছে। যুবসমাজও এইসব উত্তেজক বস্তু খেয়ে মানসিকভাবে ক্ষুধার্থ হয়ে উঠছে, জেগে উঠছে ভোগসর্বস্ব স্বার্থপর দৈত্যটা। ফলে শ্রেণীস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করছে ওরা।

যুক্তিবাদ আন্দোলকর্মী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদেব কাজকর্ম বুঝতে যা করা হচ্ছে, তা হলো—অন্তর্ঘাত। কীভাবে ঘটছে এই অন্তর্ঘাত? আন্দোলনে অন্তর্ঘাত চালাতে সক্ষম পেটোযা বুদ্ধিজীবীবা ক্ষুরধার কলম ধবেন সংস্কাবমুক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদ, যুক্তিবাদ, চার্বাক দর্শন, বস্তুবাদ প্রসঙ্গ, সাম্প্রদাযিকতাব উৎস, নাস্তিকতা, যুক্তিবাদের আলোকে ভাববাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে। বইযের নাম, বিষযবস্তুর টানেই বাষ্ট্রযন্ত্রের পেটোযা লেখক, বহু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীব মন জয কবে

তাদের চেতনার অন্দরে ঢুকে পড়েন ট্রয়ের ঘোড়ার মতই। তারপর এইসব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আপনজন বুদ্ধিজীবীরা অন্তর্ঘাত শুরু করেন আন্দোলনকর্মীদের মাথায় অনবরত ভ্রান্ত চিন্তা ও অসচ্ছ চিন্তা ঢুকিয়ে। রাজনৈতিক দল, রাজনীতিক ও বড় বড় পত্র-পত্রিকা এইসব ভারি ভারি প্রবন্ধ লিখিয়েদের বিষয়ে লাগাতারভাবে সুক্ষ্ম ধারণা সাধারণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে থাকে—ওঁরা চিন্তাবিদ, ওঁরা বিশিষ্ট, ওঁরা অসাধারণ পণ্ডিত, ওঁরা প্রগতিশীল। প্রগতিশীলতার সিলমোহরে দেগে দেওয়া ওই সব বুদ্ধি বেচে খাওয়া মানুষগুলো কী প্রসব করেন? তারই একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ'। কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বইটির 'টাইটেল পেজ'-এ ছাপা আছে—"অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে রামমোহন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু"। সম্পাদকীয়তে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখছেন, "অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঙ্গমনীষার ইতিহাসে একের পর এক মানুষের আবির্ভাব; তাঁদের যে-অভিযান তা যেমনই দুঃসাহসিক তেমনই প্রখর প্রতিভার পরিচয়। রামমোহন রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখুন। বুকের বল ফেরত পাবেন। এই সব দীপ্ত মেধাবীরা কিন্তু প্লেটোর ঐ অসুর দলে পড়েন। ধর্মান্ধতার উর্ণজাল ছিন্নভিন্ন করে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল জ্বেলে, যুক্তিনিষ্ঠ নির্মল চিন্তার হাতিয়ার হাতে বিজ্ঞানের সমর্থনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন।"

ধর্মান্ধতার উর্ণজাল কে ছিন্ন করেছিলেন? রামমোহন রায়? সত্যেন্দ্রনাথ বসু? রামমোহন রায় তো স্বয়ং এক ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙে কালের করাল গ্রাসে। অথবা নিশ্চিহ্ন হয় কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। নিরাকার ঈশ্বরকে ওভাবে মুছে ফেলা যায় না। এমনই এক ঈশ্বর-চিন্তা জনমানসে প্রথিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন, যেখানে ঈশ্বর থাকবেন অনেক নিরাপদে।

রামমোহন রায়ের রচনাটির আগে যে সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন তাতে রামমোহন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতাকামী ও সাধারণতন্ত্রী আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।"

বাস্তব সত্য যে অন্য কথা বলে। বামবুদ্ধিজীবী হিসেবে আই. এস. আই. ছাপ মারা সুপণ্ডিত দেবীপ্রসাদবাবু কী অস্বীকার করতে পারবেন যে নিচের তথ্যগুলো ভুল বা মিথ্যে?

রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হলো এই—

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের অপার করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য কর।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা কর। ওই বিদ্রোহীদের

নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এসো।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদেব জয়গান কর। ইংরেজদেব প্রতি অনুগত্য প্রকাশ কর।

(৬) সংবাদপত্রেব মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত কব।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানীর ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন কর।

রামমোহনীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেবীপ্রসাদ 'ইংরেজ' শব্দের পরিবর্তে 'শাসক' শব্দটি রামমোহনের নীতিবাক্যগুলোতে বসিয়ে নিয়ে গ্রহণ করেছেন বলেই কী অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষদের মস্তক চর্বণের জন্যেই তাঁর এই মিথ্যাচারিতা?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে পরম ঈশ্বরভক্ত এবং অলৌকিক ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন, তা আচার্যদেবের সামান্য হালফিল জানা মানুষদের যেখানে অজানা নয়, সেখানে দেবীপ্রসাদবাবুর মত এমন সুপন্ডিতের তো অজানা থাকার কথা নয়? সম্পাদক হিসেবে দেবীবাবু কী তবে না জেনেশুনেই শুধুমাত্র সুন্দর কিছু শব্দবিন্যাসেব তাগিদেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বঙ্গমণীষা বলে অবহিত কবলেন? সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যদি অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চবিত্র বলে দেবীপ্রসাদবাবুর মনে হয়ে থাকে, তবে দেবীবাবু নিশ্চয়ই অন্ধকার ও অযুক্তিব ধারক-বাহক হিসেবে অবহিত করবেন সেইসব মানুষদের, যাঁরা অন্ধভাবে ঈশ্বর ও অলৌকিকতাকে মেনে নিতে নাবাজ; যাঁরা অন্ধবিশ্বাস ও অযুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন!

'প্রতিরোধ'-এ এমন আবো অনেকের রচনাই স্থান করে নিয়েছে যাঁরা রামমোহনীয চিন্তায উদ্বুদ্ধ, যুক্তিহীন চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। এরপর 'প্রতিরোধ' কাদের প্রতিবোধের জন্য প্রকাশিত, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা বাখে না।

দেবীপ্রসাদের মত 'ট্রয়ের ঘোড়া' শুধুমাত্র অন্তর্ঘাত চালিযে প্রতিবোধ গড়ে তোলে না, এরা অশ্বমেধের দিগ্‌বিজয়ী ঘোড়ার ভূমিকাও পালন কবে একের পব এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব দুর্গে ধস নামিয়ে। এইসব অশ্বমেধের ঘোড়াদের অগ্রগতি রোধ করতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই, যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীদেরই।

যুক্তিবাদী আন্দোলন যখন বাস্তবিকই দ্রুত ছড়িযে পড়ছে বহু থেকে বহুতর মানুষদেব মধ্যে শহবে গ্রামে সর্বত্র, ঠিক তখনই সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হলো এই 'প্রতিরোধ'। প্রকাশক কারা? আমেরিকার CSICOP নামক একটি সংস্থাব পূর্ব-ভারতেব এজেন্সি নেওযা একটি স্ব-ঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন মাসিক পত্রিকা-গোষ্ঠি। তৃতীয বিশ্বেব দেশগুলোতে অত্যাচারিত দরিদ্র মানুষগুলোর চেতনাকে ঠেকিযে রাখতে আমেরিকার ধনীকশ্রেণী মেকি বিজ্ঞান-আন্দোলন গড়ে তুলতে তৈরি কবেছে 'কমিটি ফর সাইন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন অফ ক্লেমস অফ দ্য প্যারানরমাল' সংক্ষেপে 'CSICOP' নামেব একটি সংস্থা। সেই কুখ্যাত সংস্থার দালালদের ওপর বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের ভরসা রাখা আর চোরেদের কাছ থেকে টাকা নেওযা নাইটগার্ডদের ওপর পল্লীবাসীর ভরসা রাখা একই ব্যাপার। সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর কবারও উৎস মানুষ— তা ওই প্রত্রিকার কাজকর্মেই প্রকট।

এদেশের রাজনীতিতে আমরা তথাকথিত মগজবানদের আরো হাস্যকর ও লঘু আচরণ দেখলাম'৯১-এর গোড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এলেন অন্ধতা ও অযুক্তিবিরোধী একটি তথ্যচিত্র করতে। গরীব মানুষদের জন্য গরীব মানুষদের ট্যাক্সের টাকায় তৈরি করা হলো 'আলোর উৎস সন্ধানে'। বিপুল অর্থ ব্যয়ে তৈরি এই তথ্যচিত্রের সাহায্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে আলো দেখাবার ভার তুলে দেওয়া হলো এক গ্রহরত্নধারী তথাকথিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অভিনেতা কাম চিত্র-পরিচালককে। অযুক্তি ও অন্ধকারে ডুবে থাকা এমন এক পরিচালক আলো দেখাবেন? এও কি বিশ্বাসযোগ্য? যিনি অস্বচ্ছ চিন্তায় ডুবে আছেন, তিনি সাধারণ মানুষকে দেবেন স্বচ্ছ চিন্তার দিশা? দেশের কী করুণ অবস্থা ভাবুন। অন্ধ পথ দেখাচ্ছে অন্ধকে। আরো মজার ব্যাপার দেখুন;-ওই পরিচালক তথ্যচিত্রটিতে হাজির করলেন কাঁদের? বুদ্ধির ব্যাপারী দেবীপ্রসাদবাবুকে এবং ভূত-ভগবানে পরম বিশ্বাসী এক যুক্তিবাদীর ভেখধারী জাদুকরকে। আরো লক্ষ্যণীয়— CSICOP-র দালাল পত্রিকাগোষ্ঠি দেবীবাবুর মতই ওই জাদুকরের অনেক লেখা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে তাকে যুক্তিবাদী হিসেবে সাধারণ মানুষের সামনে ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকারীদের সামনে হাজির করতে চেয়েছে। আমরা কী তবে ধরে নেব এদের সকলের অবস্থান বেড়ার একই দিকে? অথবা এইসব বুদ্ধিজীবীদের পকেটে পুরতেই সংগ্রামের হাতিযার সরকার পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করলেন? না কী এ-সবই স্বজনপোষণের বিস্ময় ফল? কিংবা সুচিন্তিতভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীদের চিন্তা-চেতনাকে গুলিয়ে দিতেই বেড়ার একই দিকে অবস্থান করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে?

কথায় ও কাজে সরকারকে এক ও অভিন্ন দেখতে চাওয়াটা একজন ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে নিশ্চয়ই অন্যায় নয়? মুখোশ ছিঁড়তে চাওয়াটা নিশ্চয়ই বেয়াদপী নয়?

যুক্তিবাদবিরোধী অমোঘ অস্ত্র 'ধর্ম'

যুক্তিবাদবিরোধীতার প্রকৃত উৎস কোথায়—এই বিষয়ে আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। যুক্তিবাদ আন্দোলনের পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনতে হলে কে প্রধান শত্রু, কোন্ কোন্ শক্তি তার সহায়ক, কী তার শক্তিশালীতম অস্ত্র এ-সব বিষয়ে পরিষ্কার, স্পষ্টভাবে জানতে হবে।

যুক্তিবাদবিরোধিতার প্রধান উৎস অবশ্যই শোষকশ্রেণী। তার সহায়ক শক্তি বহু। শোষকশ্রেণীর কৃপাধন্য হওয়ার মত মানুষের অভাব নেই এই সমাজে। তবে কৃপা পাওয়ার জন্য কিছু ক্ষমতা চাই বই কী, তা সে বুদ্ধিবলই হোক, কী বাহুবলই হোক। প্রধান সহায়ক শক্তি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা, সরকার—যারা শোষকদের অর্থে নির্বাচন জিতে এসে গদীতে বসে মুখে গরীব-দরদী এবং কাজে ধনীক-তোষণের ভূমিকা গ্রহণ

করে। শত্রু শিবিরের অমোঘ অস্ত্রটির নাম ধর্ম, প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম। হিন্দু, ইসলাম খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, শিখ, পার্শী ইত্যাদি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতিষ্ঠানিক রূপ বা সংগঠনিক রূপ। 'প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম' হলো এইসব ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতিষ্ঠানিক রূপের ভিত্তিমূল। এই প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম বা তথাকথিত ধর্ম অবশ্যই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির প্রতিবন্ধক, জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অন্তরায়, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা এবং তাই শোষকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম হাতিয়ার।

(ঈশ্বর, পরমপিতা, পরমব্রহ্ম বা ওই জাতীয় চিন্তার ধারক-বাহক তথাকথিত ধর্ম যে আক্ষরিক অর্থেই যুক্তিবিরোধী, প্রগতির অন্তরায়, জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার প্রতিবন্ধক, পুরুষকার বিরোধী, কুসংস্কারের স্রষ্টা—এ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা ও তথ্যপ্রমাণ হাজির করা প্রয়োজন, তা সবই নিয়ে হাজির হবার ইচ্ছে রইল চতুর্থ খণ্ডে। 'কিছু কথা' এমনিতেই কলেবর বৃদ্ধির ফলে 'কিছু বেশি-কথা' হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং একটা গোটা বই লেখার মত তথ্য এখানে হাজির করি কী করে?)

'ধর্ম' ক্যানসারের চেয়েও মারক, পারমাণবিক বোমার চেয়েও ধ্বংসকারী। শোষকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করতে না পারলে চেতনা-মুক্তির যুদ্ধ জয় অধরাই থেকে যাবে—এই পরম সত্য প্রতিটি চেতনা-মুক্তির আন্দোলনকারীকে বুঝতেই হবে।

মানব সমাজের প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের এক বিপজ্জনক দিক হলো ধর্মের ভিত্তিতে মানবসমাজ বহু গোষ্ঠিতে বিভক্ত। ফলে শোষিত মানুষগুলোও আর একাট্টা থাকে না, বহু ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠি-ভাগের সুযোগ নেয় শঠ রাজনীতিকরা। শঠ রাজনীতিকরা ও রাজনৈতিক দলগুলো নিজ স্বার্থেই ধর্মান্ধতার অবসান চায় না। চাইতে পারে না। তারা নিপীড়িত মানুষদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে অথবা ভোট কুড়োবার স্বার্থে বঞ্চিত মানুষগুলোকে 'মুরগী লড়াই'তে নামায়। নিপুণ কুশলী প্রচারের ব্যাপকতায় সাধারণ মানুষ ভুলে যায়, যে কোনও ধর্মের যে কোনও জাতপাতের কালোবাজারীর একটাই পরিচয় হওয়া উচিত—কালোবাজারী, শোষক। যে কোনও ধর্মের যে কোনও জাতপাতের দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকদের একটিই পরিচয়—দরিদ্র, শোষিত। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষগুলো যখন নিজেদের মধ্যে জাতপাত বা ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন লাভের ক্ষীরটুকু জমা হয় শাসক ও শোষকের ঘরেই। গরীব মানুষদের বিরুদ্ধে গরীব মানুষদের লড়িয়ে দেবার জন্যে ধর্মের বিপুল প্রভাবের কথা মনে রেখেই শোষকশ্রেণী ধর্ম নামক অস্ত্রটিকে আরো শক্তিশালী করার গবেষণায় রত।

ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে পূর্বজন্ম, কর্মফল, ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তারই ফলে ধর্মবিশ্বাসী বঞ্চিত মানুষগুলো

তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে আসল খল-নায়কদের দায়ি না করে দায়ি করেছে কল্পনার ভগবানের অভিশাপকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে। দুঃখে, অপমানে, সব হারাবার যন্ত্রণায়, ক্ষুব্ধতায় খান্ খান্ হতে গিয়েও ভেঙে না পড়ে পরমপিতা জাতীয় কারো চরণে সব ক্ষোভ, সব দুঃখ-যন্ত্রণা ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করেছে—মোরে সহিবারে দাও শকতি।

ধর্মের সমর্থক অনেকেই বলেন—পরমপিতাজাতীয় কারো কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে রয়েছে অপার শান্তি, সহ্য করার শক্তি।

পুরুষকারহীন মানুষই জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় পরমপিতাজাতীয়ের কারও কাছে আত্মসমর্পণ করে পরিত্রাণ পেতে চায়। আপসপন্থী মানুষই শান্তি খোঁজে আত্মসমর্পণে। কাদা-নরম মেরুদণ্ডী মানুষই নিজ শক্তিতে প্রতিরোধ না গড়ে আঘাত সহ্য করার শক্তি খোঁজে পরের শ্রীচরণে।

ধর্মের সমর্থক অনেকে এ-কথাও বলেন—ধর্মই সমাজকে ধারণ করে রয়েছে, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলেছে।

প্রাচীনকালে যখন রাজনৈতিক সংহতি, আইনের শাসন ছিল দুর্বল, তখন ধর্ম দিয়ে সমাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, হয়ত বা তার কিছু প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাও অসম্ভব হয়ে পড়ে—তা সে দেশের মানুষ যতই ধর্মভীরু হোক না কেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ টানছি। ১৯৮৮ সালে আমাদের দেশের ১০০জন অপরাধীর ওপর একটা অনুসন্ধান চালিয়েছিল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। বিভিন্ন ধরনের এই অপরাধীই বিশ্বাস করত ঈশ্বরের অস্তিত্বে, বিশ্বাস করত পাপ-পূর্ণে। বিশ্বাস করত পাপের ফল নরক-যন্ত্রণা। এই বিশ্বাস কিন্তু অপারাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদে সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে দুর্নীতির স্রোত; যে দেশে হত্যাকারী, নারী-ধর্ষক, গুণ্ডা, ছেনতাইবাজ, চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকলে সাত-খুন মাপ হয়ে যায়; যে দেশে গুণ্ডা-বদমাইশ পকেটে না থাকলে রাজনীতি করা যায় না, সে দেশের মানুষ দু-বেলা ঠাকুর প্রণাম সেরে, নমাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবেই। এতক্ষণ উদাহরণ হিসেবে যে ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের কথা বললাম, এটা বুঝতে নিশ্চয়ই সামান্যতম অসুবিধা হয়নি সমাজসচেতন পাঠক-পাঠিকাদের।

প্রগতিবিরোধী চিন্তা এবং কুসংস্কারের উৎস ধর্ম, অধ্যাত্মচিন্তা। তাই কুসংস্কারমুক্ত

সমাজ গড়তে গেলে ধর্মকে আঘাত দিতেই হবে। ধর্মকে আঘাত না দিয়ে যাঁরা কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা হয় কল্পনাবিলাসী, নতুবা হুজুর শ্রেণীর চতুর দালাল ;শোষিত মানুষের আপনজন সেজে তাদের বিভ্রান্ত করে হুজুর-মজুর সম্পর্ককে বজায় রাখতে সচেষ্ট। এ তো বিষবৃক্ষেব গোড়াকে বাঁচিয়ে রেখে আগা কাটতে কাঁচি চালান। এই সত্যকে ভুললে তো চলবে না—শোষণমুক্ত সমাজ গড়ারই একটি পর্যায়, একটি ধাপ শোষিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্তি, শোষিত মানুষদের চেতনা-মুক্তি, যার আর এক নাম—সংস্কৃতিক বিপ্লব।

যে সব সংস্থা ও ব্যক্তি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে, মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বাঁধছে, নাটক নিযে হাজির হচ্ছে, সভা কবে বক্তব্য রাখছে, হাতে-কলমে ঘটিযে দেখাচ্ছে বাবাজী-মাতাজীদের নানা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা, ফাঁস করছে ওঝা গুণীনদের নানা কারসাজি— তাঁরা অবশ্যই খুব ভাল কাজ করছেন। অবশ্যই এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু কুসংস্কারের গোড়া ধরে টান দিতে হলে যে তথাকথিত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষদেব সামনে তুলে ধবতে হবে একথাও মনে বাখতে হবে। সঠিক রণকৌশলের স্বার্থে তত্ত্বগতভাবে ধর্ম বিষয়ে জেনে নিতে হবে। তারপব ঠিক করতে হবে রণনীতি। কোথায, কখন, কী পরিস্থিতে তথাকথিত ধর্মকে কতটা আঘাত হানব, কাদেরকে কেমনভাবে বোঝালে তথাকথিত ধর্মের স্বরূপ ফলপ্রসূ হবে সেটা নিতান্তই কৌশলগত প্রশ্ন। সে প্রসঙ্গ নিযেও আপাতত বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না ; তুলে রাখলাম পরবর্তী খণ্ডেব জন্য। কারণ এই খণ্ডের মূল আলোচ্য বিষয় ধর্ম।

আমরা বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘদিনেব বহু অন্ধ-সংস্কার, বহু স্পর্শকাতব সংস্কাব নিয়ে বোঝাতে গিযে উপলব্ধি কবেছি ওঁরা বোঝার চেষ্টা কবেন, ওঁরা ঝোঝেন, ওঁরা বিষযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সংস্কার-মুক্তির লড়াইতে আমাদের সঙ্গে এগিযে আসেন, আমাদের নেতৃত্ব দেন। ওঁরা দেশী-বিদেশী পুঁথি পড়ে, ভাল বলতে কইতে বা লিখতে পারার সুবাদের ছাত্রনেতা থেকে জননেতা হননি, ওঁরা বুদ্ধি-বেচা ও ডিগবাজি খাওযা শেখেন নি। ওঁরা লড়াই করতে করতে লড়াকু হয়েছেন, ওরা জীবনসংগ্রামের মধ্য দিযে শিক্ষা নিযেছেন। ওরা জানতে বুঝতে শিখতে অনেক বেশি আগ্রহী, অনেক বেশি আন্তরিক। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা নিয়ে 'সব জানি', 'সব বুঝি' করে 'কূযোব ব্যাঙ' হয়ে থাকতে নারাজ। সংগ্রাম যখনই মযদানে নেমে আসে, নেমে আসে রান্নাঘরে বেয়োনেটের ফলা তখন মধ্যবিত্ত নেতাদের সীমাবদ্ধতা পঁচা ঘাযের মতই ফুটে ওঠে। বঞ্চনার শিকার শ্রমিক-কৃষক লড়াকুরাই তখন নিজেদের অভিজ্ঞতাব মূল্যে সঠিক পথ নির্দেশ করেন। তাঁরা নেতৃত্বে চলে আসেন। তাঁরা ইতিহাস ঘেঁটে নজির খোঁজেন না, তাঁরা নজির তৈরি করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ওঁদের হাতে নেতৃত্ব চলে যেতে থাকলে সবচেযে মুশকিল হয় শাসক শোসকশ্রেণীর। ওঁদের নেতাদের কেনা যায় না মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেরিযে আসা নেতাদের মত। এখানেই শাসক-শোষকদের মুশকিল।

আজ আমাদের সমিতির বহু শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক-শ্রেণীর বঞ্চিত বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন। ওঁদের লড়াইযের সাথী হিসেবে

পেয়েছি, ওঁদের অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার ফলেই। সুতরাং যাঁরা মনে করেন বঞ্চিত মানুষদের ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত করলে আমরা বঞ্চিত মানুষদের থেকে বিছিন্ন হয়ে যাব, তাঁরা এ-কথা বলেন হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব থেকে, নতুবা তাঁরা কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলতে চান এবং বাঁচিয়ে রাখতে চান কুসংস্কারের গোড়াটিকেই।

আমরা মনে করি, ধর্ম মানে শনি, শীতলার পুজো বা দরগার সিন্নি নয়। আগুনের ধর্ম যেমন 'দহন', তলোয়ারের ধর্ম যেমন 'তীক্ষ্নতা', মানুষের ধর্ম তেমনই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। তাই মন্দিরে পুজো না করে, মসজিদে নামাজ না পড়ে, গীর্জায় প্রার্থনা না করেও মানুষের প্রগতিকামী, মনুষ্যত্বের বিকাশকামী যুক্তবাদীরাই প্রকৃত ধার্মিক। এই স্বচ্ছতা নিয়ে নিজ স্বার্থেই শ্রমজীবী শোষিত মানুষদের আজ তথাকথিত ধর্ম ও সেই ধর্ম থেকে সৃষ্ট ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সময় হয়েছে।

যুক্তিবাদী আন্দোলন নিয়ে প্রহসন কত দিন চলবে?

কয়েক বছর আগে কিছু বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান সংস্থা ব্যাপক ভাবে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান- মনস্কতা গড়ে তুলতে গড়ে তুলেছিল একটি সমন্বয় কেন্দ্র, 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ'। কিন্তু তারপর এই সমন্বয় কেন্দ্রের নেতাদের কার্য-কলাপ রহস্যময় কোনও কারণে লক্ষ্যচ্যুত হলো। অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সুস্থ মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য— এই সত্য ভুলে থেকে সমাজের অসুস্থতার মধ্যেই দলে ভারি হওয়াকেই নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করল। তারই সূত্র ধরে গণবিজ্ঞান সমন্বয়কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ২৫. ৩. ৯০ এক সার্কুলার জারি করেছেন, স্মারক নং ৮। ওই সার্কুলারটি পাঠান হয়েছে বেশ কিছু সাইন্স ক্লাবকে। সার্কুলারের শুরুতেই বলা হয়েছে কুসংস্কার ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'গণবিজ্ঞান সমন্বয়কেন্দ্র' এই বিষয়ে এতদিনকার কাজের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে কিছু সিদ্ধান্ত পৌঁচেছে।

কী সেই সিদ্ধান্ত? তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কিছুটা এখানে তুলে দিলাম :

"আন্দোলনের ক্ষেত্রে কুসংস্কারকে অন্ততঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা অবশ্যই প্রয়োজন। যথা জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকারক ও তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিকারক নয়। তাৎক্ষণিকভাবে যে-সব কুসংস্কার ক্ষতিকারক নয় সেগুলো মূলতঃ বস্তুনিরপেক্ষ-বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে এর অনুশীলনমুখীতার চাইতে এগুলির তত্ত্বমুখীনতা অপেক্ষাকৃত বেশী। কখনই বলা যায় না যে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে না। অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু যেহেতু এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তার সাফল্য সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে তথা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যাপক মানোন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত সেহেতু এ আন্দোলন এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে তাৎক্ষণিক ভাবে ক্ষতিকারক কুসংস্কার সমূহ প্রধানতঃ মানুষের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবশীল। বলতে বাধা নেই এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন পূর্বোক্ত শ্রেণীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অপেক্ষা

জরুরী। দ্বিতীয়ত : এই আন্দোলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিকাশলাভ না করলে পূর্বোক্ত আন্দোলনও শক্তিশালী হতে পারে না।"

গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্র তাদের নবমূল্যায়নে কী কী সিদ্ধান্তে পৌঁছল একটু দেখা যাক।

১। কুসংস্কার অবশ্যই দুই প্রকার। এক : তাৎক্ষণিক ক্ষতিকারক নয় যেমন অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাস ইত্যাদি সংক্রান্ত কুসংস্কার। দুই : তাৎক্ষণিক ক্ষতিকারক যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক কুসংস্কার।

২। স্বাস্থ্যবিষয়ক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই বেশি জরুরী।

৩। অদৃষ্টবাদ, কর্মফলে বিশ্বাস, অলৌকিত্বে বিশ্বাস, ভূত বা ঈশ্বর বিশ্বাসজাতীয় কুসংস্কার দূর করা যেহেতু দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার, তাই বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারমুক্ত করার আন্দোলনের এখন প্রয়োজন নেই।

৪। সমাজের বহু মানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদ, কর্মফল, ঈশ্বরবাদ, অলৌকিকবিরোধী কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলন ছড়িয়ে না পড়লে আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারবে না; এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন অলৌকিক-বিশ্বাসজাতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন নেই।

৫। আগে অলৌকিকতা বিরোধী, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ-বিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে ভুল পথ নেওয়া হয়েছিল।

গণবিজ্ঞান-সমন্বয়কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-র দ্বিতীয় সম্মেলনে (৬-৭ অক্টোবর ১৯৯১) সম্পাদকের যে ছাপান বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "আজকের দিনে কোন পদ্ধতি রীতিনীতি বা ধারণাকে কুসংস্কার বললেও মনে রাখা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারটির জন্মলগ্নে অবশ্যই থাকবে এক অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি, হতে পারে তা অবৈজ্ঞানিক। এই সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আজকের সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্য মৌলিক। আজকের সমাজের সব কিছুরই ধারক রক্ষক সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা যা অতীতে ছিল না। অতএব আজকের দিনে সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হবে।"

বাঃ, বাঃ, সত্যিই বড় বিচিত্র এই প্রস্তাব। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞান-আন্দোলন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের নেতারা আবিষ্কার করলেন, কুসংস্কারমুক্তির জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আমাদের আজকের সমাজে 'শূন্য'। শোষিত মানুষদের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের দাবী রাখতে হবে শোষকশ্রেণীর তল্পিবাহক রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থাৎ সরকারের কাছে। আমরা তেমন জোরালভাবে দাবী রাখতে পারলে সরকার শোষিত মানুষগুলোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে শোষকদের সঙ্গে নিয়ে বানপ্রস্থে চলে যাবে।

এ কথা ভুলে থাকার কোনও অবকাশ নেই, যাঁরা নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন, সেই সমাজের উপযুক্ত মানুষ গড়ার দায়িত্বও তাঁদেরই। আদর্শ সমাজ গড়তে আদর্শ মানুষ গড়া দরকার। নতুবা যে আদর্শের জন্য বহু ত্যাগের সংগ্রাম, তাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। একদিন সংগ্রামী মানুষগুলোই ক্ষমতার অপব্যবহারে বপ্ত হয়ে উঠবে। শুরু

হবে নযা শোষণ। তখন মনে হবে এত রক্তক্ষযেব পর যা হলো সে তো শুধুই ক্ষমতার হস্তান্তর, মহত্তর আদর্শ-সমাজ গড়ে উঠল কই?

গণবিজ্ঞান-সমন্বযকেন্দ্রের সম্পাদকের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলোতে সমাজ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও আনাড়িপনা ফুটে উঠেছে, তা কী না বোঝার মূর্খতা থেকে? না কি গুলিযে দেবার শয়তানি? এই সিদ্ধান্তগুলো যে শোষক ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বার্থ রক্ষাকারী এবং শোষিত মানুষদের শোষণমুক্তিব চিন্তা ধারার বিরোধী এটুকু বুঝে নেওযা যেহেতু শযতান ও উন্মাদ ছাড়া আর কারও পক্ষেই সামান্যতম কঠিন নয়, তাই এই বিষয নিযে আরও বিস্তৃত আলোচনায যাওয়া একান্তই অপ্রযোজনীয বিবেচনায বিরত বইলাম। গণবিজ্ঞান-সমন্বযকেন্দ্রের নেতারা অনেকের দ্বারা নিশ্চযই অভিনন্দিত হযেছেন বছবের সেরা ডিগবাজি খেযে ভারতীয রেকর্ড দখল করে। একটি বিনীত অনুবোধ জানাই বর্ষশ্রেষ্ঠ চুটকী প্রতিযোগিতায সম্পাদক সিদ্ধান্তটি পাঠান, পুরস্কার অবধারিত। তিন নম্বর সিদ্ধান্তটি কী অসাধারণ রসিকতার নিদর্শন বলুন তো—কুসংস্কার দূব কবা যেহেতু দীর্ঘ প্রক্রিযার ব্যাপার, তাই এই প্রক্রিযা শুরু করা উচিত সবার আগের বদলে সবার পরে।

যাঁরা গণবিজ্ঞান-সমন্বযকেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে একটি বিছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছেন, তাঁদের আরো একটু সতর্ক ও সচেষ্ট হতে অনুবোধ করব। তাহলেই দেখতে পাবেন সবের মধ্যেই এক যোগসূত্র। এই সমন্বয় কেন্দ্র সেই CSICOP র দালাল পত্রিকাগোষ্ঠির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই কাজে নেমেছে।

ভাবতে খুবই ভাল লাগছে যুক্তিবাদী আন্দোলন, সাংস্কৃতিক পবিবেশ পাল্টে দেওযাব আন্দোলন সত্যিই সমাজেব বিভিন্ন শ্রেণীকেই আন্দোলিত কবেছে। গ্রামগঞ্জেব নিপীড়িত মানুষরা যেভাবে আন্দোলনের শরিক হচ্ছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে, এবং যে দ্রুততার সঙ্গে এই আন্দোলন ব্যাপকতা পাচ্ছে তাতে আন্দোলিত হুজুর শ্রেণী ও তাদের তল্পিবাহকরাও। হুজুবদের থাবার ভেতর যেসব পত্র পত্রিকা ও প্রচাব মাধ্যম বযেছে তার সবগুলোকেই কাজে লাগানো হযেছে আন্দোলন রুখতে, সংস্কাবের শিকল ভাঙার অভিযান রুখতে, নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশকে রুখতে। এই সমস্ত পত্রপত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম 'মুক্তচিন্তা', 'গণতন্ত্র', এবং 'সামাজিক ন্যাযবিচার'-এর কোনটিতেই বিশ্বাস করে না। এবং বিশ্বাস করে না বলেই এ তিনটি শব্দই তারা বেশি করে বলে।

আমাদের দেশের হুজুবের দল ও তাদের অর্থপুষ্টরা সাধারণ মানুষের চেতনা-মুক্তির এই আন্দোলনে দেখতে পেযেছে অশনি সংকেত। তাইতেই তারা সাধারণ মানুষদের চিন্তাকে নিজেদের পছন্দ মত ছাঁচে ঢালতে চাইছে। চাইছে বিভিন্নভাবে আক্রমণে আক্রমণে দানা বেঁধে ওঠা আন্দোলনকে ধ্বংস করতে। চাইছে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের পাল থেকে হাওযা কেড়ে নিতে। আর তাই নানাভাবে কাজে নেমে পড়েছে আমাদের বাষ্ট্রশক্তি, ধনকুবের গোষ্ঠি, নানা প্রচার মাধ্যম এবং বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি। আমাদেব মত শোষণযুক্ত একটা বিশাল দেশেব পরিবর্তনের প্রতিক্রিযা আন্তর্জাতিক হতে বাধ্য। তাই ভারতের আভ্যন্তবীন ব্যাপার ভেবে বসে থাকতে বাজি নয পৃথিবীর কিছু কিছু মোড়ল দেশ।

এইসব ধারণা যে কোনও সন্দেহপ্রবণ মানুষের চিন্তার ফসল নয, তারই উদাহরণ

ছড়িয়ে আছে আপনাব আমাব দৃষ্টির সামনেই। একটু সজাগ থাকুন, অনেক-অনেক উদাহরণ নজরে পড়বে।

C.S I.C.O.P.র দোসর আমেরিকার The Nature পত্রিকার সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতবর্ষে পৃথিবীব সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান জাঠা বা Science mission অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিজ্ঞান জাঠা বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী প্রচারের দায়িত্বও গ্রহণ করেছে 'নেচার' পত্রিকা। এই বিজ্ঞান জাঠার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে ১৬ নভেম্বব '৯১ কিছু সাইন্স ক্লাবকে নিয়ে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতার বিড়লার শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায়। স্বপ্নময় প্রাসাদে এয়ারকণ্ডিশনের মিঠে ঠাণ্ডা খেতে খেতে বাজ্য সরকারের একটি অতি স্নেহধন্য বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংস্থার কিছু নেতা ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের কিছু নেতা বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রযোজনীযতা ও ২০ কোটি টাকা বাজেটের সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান জাঠাব মহৎ তাৎপর্য বুঝিযে বললেন। বাজ্য প্রস্তুতি কমিটিব নেতাবা জাঠা কমিটির একটি তালিকা পেশ করলেন ও পাশ করালেন। সভাপতি করা হলো এক বিজ্ঞান পেশার অধ্যাত্মবাদে পরম বিশ্বাসীকে, যিনি একই সঙ্গে ধর্মগুরুর জন্মদিনে প্রণাম জানিয়ে বক্তৃতা দেন, গীতা, ভগবৎ পাঠের আসর মাতিয়ে রাখেন এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কার্য-নির্বাহী সভাপতি কবা হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি, দুর্গা পুজো কমিটিব সভাপতিব আসনেও জাঁকিয়ে বসেন। সম্পাদক করা হলো বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার জনৈক প্রাক্তন ডিবেকটরকে। ইতিপূর্বে উনি বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত সময দিতে পারেন নি বিড়লার চাপান গুরুদাযিত্ব পালন কবতে গিয়ে। চাকরি থেকে অবসর নেবাব পব উনি নাকি সিদ্ধান্ত নিযেছেন, এবার থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন। জানি না, তাঁব এমন এক জনদরদী অসাধারণ সিদ্ধান্তের জন্যই প্রস্তুতি কমিটি তাঁর হাতে সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন কিনা ; না, বিড়লা গোষ্ঠির নির্দেশেই সম্পাদকেব দাযিত্ব তুলে দিতে বাধ্য হযেছেন ? এমনটা ভাবার পেছনে অবশ্যই যুক্তি আছে। কারণ, ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কনভেনশনেব সভাপতি ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল আমাকে সে রাতেই জানিযেছিলেন জাঠার টাকার একটা মোটা অংশ জোগাচ্ছেন বিড়লা, টাটাবা। (আশা রাখি ডাঃ শীল ভবিষ্যতে কারো চাপে পড়ে এমন কথা বলবেন না— "যা বলেছি, তা বলিনি।" তেমন চাপে যদিও বা বলেন, অবশ্যই প্রমাণ কবতে সক্ষম হবো-তিনি একথা বলেছিলেনই)। অবশ্য এ-সব টাকা নাকি ওঁরা যোগাচ্ছেন যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে। নির্বাচনসর্বস্য রাজনৈতিকদলগুলোর নির্বাচনী তহবিলের কাযদায় জনগণের কাছ থেকে অবশ্য দু-পাঁচ টাকা কবে চাঁদা নেওযা হবে দেখাতে—মোরা তোমাদেরই লোক, বড়লোকদেব দালাল নই।" সভাপতি ও সম্পাদক-পদ ছাড়া বাকি পদগুলোর সাম্রাজ্য প্রায় সমান দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন গণবিজ্ঞান-সমন্বয় কেন্দ্রের কিছু নেতা এবং রাজ্য সবকাবের অতি স্নেনধন্য বিজ্ঞান সংস্থার নেতারা। তবে ওই সংস্থার নেতারা সকলে এবার ওই সংস্থাব নাম কবে কমিটিতে ঢোকেন নি, ঢুকেছেন অন্যান্য সংস্থার নাম করে। এমনটা করার কাবণ প্রথম বিজ্ঞান জাঠার দায়িত্ব গতবার ওই স্নেহধন্য সংস্থাটি পেয়েছিল। এবং ওদের বিরুদ্ধে ভারতের একাধিক প্রদেশের

বিজ্ঞান—প্রতিনিধিরা এমন কী পশ্চিমবাংলার কিছু বিজ্ঞান-ক্লাবও বহু অনিয়ম ও দাদাগিরির অভিযোগ এনেছিলেন দ্বিতীয় বিজ্ঞান-জাঠা বিষয়ক কনভেনশনে।

একবার সুস্থ মাথায় যুক্তি দিয়ে ভাবুন তো, বাস্তবিকই কী এমন ঘটতে পারে, বিড়লা টাটার মত ধনীক গোষ্ঠি ও ধনীক গোষ্ঠির অর্থে নির্বাচনে জিতে শাসন ক্ষমতায় বসা সরকার এবং আমেরিকার সুবিখ্যাত পত্রিকাগোষ্ঠি বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিজ্ঞান-জাঠার মধ্য দিয়ে শোষিত জনগণের ঘুম ভাঙাবার গান শোনাবেন, সংস্কারমুক্তি ঘটাবেন, জাতপাতের পাঁচিল ভেঙে ফেলবেন, বোঝাবেন ; "তোমাদের বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট নয, পূর্বজন্মের কর্মফল নয, ঈশ্বরের কোপ নয, একদল অতিস্বার্থপর লোভি, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের শোষণের কারণেই তোমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বঞ্চনা, বঞ্চনা, এবং বঞ্চনা।"

হুজুরের দল ও তাঁদের তল্পিবাহকরা কী বাস্তবিকই পাগল হয়ে গেছে যে, নিজ অর্থ ব্যয়ে বঞ্চিত মানুষদের বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী করে নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়বে ?

উত্তর : না, না এবং না।

বিজ্ঞান-জাঠার অর্থ বিনিয়োগকারীরা চাইছেন ব্যাপক প্রচারের ঝড় তুলে, যুক্তিবাদী আন্দোলন ও বিজ্ঞান আন্দোলনের যে মূললক্ষ্য বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ গড়ার আন্দোলন, সেই লক্ষ্যকে বিপথে পরিচালিত করতে ব্যাপক পাল্টা প্রচার রাখবেন, "বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।"

জাঠার চালিকাশক্তি চাইছে, আন্দোলনকর্মীদের একটা বিশাল অংশকে জনসেবার কাজে আটকে রেখে আন্দোলনকে ব্যহত করতে। বিজ্ঞান-জাঠা কুসংস্কার-বিরোধিতায় নামবে কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই। অদৃষ্টবাদ, আত্মা, পূর্বজন্ম, প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম, ইত্যাদি শোষক দলের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ারগুলোর বিরুদ্ধে 'জাঠার মাঠা খাওয়া' নেতারা কখনই সামান্যতম আঘাত হানার চেষ্টা করবে না, করতে পারে না, যেমন হুজুরের অর্থে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত অর্থে কখনই হুজুরের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ করতে পারে না। যা পারে, সেটা হলো, শোষিত মানুষদের বিভ্রান্ত করতে, শোষিত মানুষদের বন্ধুর অভিনয় করতে। বিজ্ঞান-জাঠাও এর বাড়তি কিছুই করতে পারবে না। ওদের কুসংস্কারবিরোধীতা সীমাবদ্ধ থাকবে গুটিকতক ম্যাজিক ও অলৌকিক রহস্য ফাঁসের মধ্যেই। এই কলমচীর প্রতিটি কথার সত্যতা আপনারা মিলিয়ে নেবেন আপনাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে। জানি এ-লেখা বিজ্ঞান-জাঠার ঠিকা পাওয়া নেতারা অনেকেই পড়বেন-বার বার পড়বেন, ওঁদের বুদ্ধিজীবীরা আবার মানুষের মগজ ধোলাই করে নিজেদের কার্যক্রমের মহত্ত্বতা

সাধারণকে বোঝাতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু যুক্তির কূট কচকচালি যতই সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন, বাস্তবে শাসক, শোষক ও বিদেশী শক্তির সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কখনই তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে না, হবে না। পরিচালিত হবে অবশ্যই তাদেরই স্বার্থ রক্ষার্থে।

বিশাল অর্থ ও বিশাল প্রচারের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞান-জাঠার ঝড় তুলে এইসব বিজ্ঞান আন্দোলনের মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের দল শোষিত মানুষদের চেতনা-মুক্তির গতিকে হয়তো সামান্য সময়ের জন্য স্তিমিত করতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবেই; জয় শোষিত মানুষদের হবেই। সেদিনের বিজ্ঞান-জাঠা কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা বিপ্লব বসু দ্বিধাহীন ভাষায় জাঠায় টাকার উৎস জানতে চেয়ে বলেছিলেন, "টাকা খরচ না করলে আজকাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী জোটে না।" অর্থের বিনিময়ে কর্মী হয়তো জোটে, কিন্তু এইসব ভাড়াটে সেনা দিয়ে আদর্শ-সচেতন মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জেতা যায় না।

নিপীড়িত ভারতবাসীদের দিকে দিকে জেগে ওঠার খবরে শোষক ও শাসকরাও আজ উদ্বেল। তাই বিপুল অর্থের বিনিময়ে নেতা কিনতে নেমে পড়েছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া এইসব নেতাদের প্রত্যেককেই কলটেপা পুতুলের মতই ব্যবহার করা শুরু করেছে ধনকুবের গোষ্ঠি ও রাষ্ট্রশক্তি। একদা সংগ্রামী এইসব নেতাদের কৃতদাসের হাটে বিক্রি হতে দেখে হৃদয় ব্যথিত হয়। এঁদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যাঁরা অনুরোধ জানান, তাদের জানাই এমন মুখোশধারী বন্ধুদের নিয়ে আন্দোলন গড়তে চাইলে আন্দোলন ধ্বংসের জন্য শত্রুর প্রয়োজন হয় না।

এমন অবক্ষয়, এমন দুর্নীতি, এমন নিলামের হাটে বিবেক কেনা-বেচা দেখার পরও আমরা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। আমরা স্বপ্ন দেখি তরতাজা আদর্শবাদী জীবন-পণ করা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা গোত্রান্তরিত তৃণভোজি এইসব নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে সংগঠনকে আবার করে তুলবে বঞ্চিত মানুষদের সংগ্রামের সাথী।

জানি এত দীর্ঘ আলোচনার পরও কিছু কিছু সাংস্কৃতিক-আন্দোলন কর্মীদের মনে হবে যে সব বিজ্ঞান ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি, চ্যুতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হলো, তাদের ভালো কী কিছুই নেই? সবই খারাপ? তারাও তো সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সমাজের জন্যে কিছু না কিছু করছে, তবে কেন তাদের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে না?

ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— এমনি কত প্রতিষ্ঠানই তো চালায় অনেক ভেজালদার, মুনাফাখোর শোষকরা। সমাজের জন্য ওরাও তো কিছু করেছে। তাই বলে আপনি আমি কী ওদের সঙ্গে নিয়ে ওদেরই বিরুদ্ধে (ওরাই শোষণের স্বার্থে

সংস্কারগুলো চাপিয়ে রেখেছে) সংগ্রামে নামার কথা চিন্তা কবব পাগলের মত? একই কারণে রাষ্ট্রশক্তির দালাল মুখোশধারী এই সব আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামের চিন্তা একেবারেই পাগলামী। এইসব মুখোশধারীরা অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার বা জ্যোতিষীদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ অন্তর্ঘাতের জন্যেই এইসব বিক্রি হয়ে যাওয়া নেতারা তাদের সংস্থাগুলোকে কাজে লাগায়। নিরপেক্ষতার নামাবলী চাপিয়ে যাঁরা শোষকশ্রেণীর মুখোশধারী দালালদের এবং শোষিত শ্রেণীর সংস্কারমুক্তি আন্দোলনে সংগ্রামরতদের একই পর্যায়ে ফেলেন, তাঁরা প্রকারান্তরে ওইসব দালালদেরই উৎসাহিত করেন। দালালরা উল্লসিত হয় এই ভেবে, কী অনায়াসে পঙ্গু করে দিয়েছি কিছু সম্ভাব্য সংস্কার-মুক্তির যোদ্ধাকে। ওইসব সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে-দিনই সংগ্রামে নামা সম্ভব যে-দিন ওরা হুজুরের শিবির পরিত্যাগ করবে। আর এ-সবই নেতৃত্ব বদলের আগে কখনই সম্ভব নয়—মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ কী কখনইও মানুষ মারা ছাড়ে, না মরা পর্যন্ত? ওইসব শোষকদের দালালদের সঙ্গে যাঁরা শোষিত মানুষদের জন্য মিলিজুলি আন্দোলন চালাতে বলেন, তাঁদের অনেকেরই অজানা, ওইসব দালালরাই ধনতন্ত্রের স্পর্ধিত পদচারণার প্রধান ভিত্তিমূল। অনেকে জানেন, তবু বলেন—আন্দোলনে ক্যানসারের বীজ ঢোকাতেই এমনটা বলেন।

আর একটা দিকে আপনাদের মনযোগ আকর্ষণ করতে চাইছি। হুজুরের দল ও তাদেব সহায়ক শক্তি মেকি আন্দোলন গড়ে তুলে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াশের পাশাপাশি যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বকেও নানাভাবে আঘাত হানতে সচেষ্ট হয়েছে। সেই আঘাত অতি পরিকল্পিত। স্লো-পয়জনের মতই নেতার মৃত্যু ঘটাতে ধীবে অথচ নিশ্চিতভাবে কার্যকর। গত দেড় বছর ধবে একটা ঘটনার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, সেটা হলো বেশ কিছু সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ও পত্র-পত্রিকায গল্পে, উপন্যাসে, ধারবাহিক উপন্যাসে এমন একটি করে চরিত্র আমদানী করা হয়েছে এবং হচ্ছে, যেখানে চরিত্রটি আমাকে লক্ষ্য কবেই সৃষ্টি বলে অনেক পাঠক-পাঠিকাই অনুমান কবছেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এমনটা হলে আমার এবং আমাদের সমিতির ভাললাগারই কথা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালভাগছেও। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালোলাগার পরিবর্তে শঙ্কার উদয় হচ্ছে, কারণ সে-সব ক্ষেত্রে চরিত্রটিকে করা হচ্ছে একজন যুক্তিহীন, অক্ষম যুক্তির, বোকা, হাসির খোরাক হিসেবে; সেই সঙ্গে নানাভাবে চরিত্রহননের চেষ্টা তো আছেই। শঙ্কার কারণ, এই পরিকল্পিত প্রয়াশের পিছনে রয়েছে যুক্তিবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাব অতি চতুর প্রয়াশ, সাধারণ মানুষকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা। শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতে, জনজাগরণ রুখতে জনআন্দোলনের নেতাদের প্রতি মনকে বিষিয়ে তোলাব জন্য লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং প্রচার যন্ত্রগুলোকে কাজে লাগানর এই ব্যাপক ও নীরব প্রয়াশকেই বলা হয় 'অপাবেশন আমেরিকান স্টাইল'। যথেষ্ট কার্যকর এই স্টাইলেই আক্রমণ হানা শুরু হয়েছে আন্দোলন রুখতে।

সম্প্রতি একটি মফস্বল শহরের এক 'গল্পপাঠের মেলা'য় জনৈক প্রগতিশীল হিসেবে পবিচিত এক লেখক তার স্বরচিত একটি গল্প পড়তে গিয়ে শ্রোতাদের তীব্র প্রতিবাদেব মুখে পড়ে বানের জলে খড় খুটোব মতই ভেসে যান। শ্রোতাদের ক্ষোভের কারণ,

গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রটির সঙ্গে আমার এমন কিছু স্থূল মিল রাখা হয়েছে যাতে চরিত্রটি আমাকে চিন্তা করেই আঁকা বলে অনেকেই মনে করবেন এবং লেখক, চরিত্রটির চরিত্রহনন করেছেন পাকা খেলুড়ের মতই। ওই লেখক একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেকে এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন —রাজনৈতিক দলের নির্দেশেই লেখক এমন একটা গল্প লিখে মফস্বল শহরের এই গল্প মেলায় সেটি পড়ে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়া ওরা দেখেছেন, এবং সেটা তাদের পক্ষে মোটেই সুখকর হয়নি, বরং যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন। এমনটা ভাবার কারণ, বছরখানেক আগে ওই লেখকের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক দলের নিজস্ব দৈনিক পত্রিকার তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল আমার চরিত্রহনন করে জনগণ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে ; সমিতির সাধারণ কর্মীদের থেকে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মীদের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে। আর সেই জন্যে বেশ কয়েকটি দিন প্রচুর গুরুত্ব সহকারে, প্রচুর নিউজপ্রিন্ট খরচ করে তারা চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা বা 'ইয়েলোজর্নালিজম' চালিয়ে গিয়েছিল। এ-সবই করা হয়েছিল রাজনৈতিক দলটির মুষ্টিমেয় কিছু নেতৃত্বের চাপে। সেবার ওদের সেই নোংরা প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল সাধারণ মানুষদেব সোচ্চার প্রতিবাদের ঝড়ে। একই সঙ্গে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ ও ধিক্কার জানিয়েছিলেন ওই রাজনৈতিক দলেরই বহু সুস্থ-চিন্তার কর্মীরা-নেতারা ও দলের সঙ্গে সম্পর্কীত শ্রমিক, কৃষক, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন। সে এক ইতিহাস।

হুজুরের দল ও তার উচ্ছিষ্টভোগীরা আমাকে তথা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে আক্রমণ চালানয এ টুকু অবশ্যই বুঝেছি, আমরা সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথেই এগুচ্ছি।

এও জানি আন্দোলনকে আঘাত হানা এখানেই বন্ধ হবে না, হতে পারে না। আঘাত আসবেই, তবে সফদার হাসমি বা শংকর গুহ নিয়োগীকে হত্যা করে যে ভুল ওরা করেছে, সে ভুলের ফাঁদে আবার পা ফেলবে না। হয়তো আচমকা গ্রেপ্তার করা হবে আমাকে। দুরাত্মার কখনও ছলের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও হবে না। আনিত হবে চুরি, ছেনতাই রাহজানী, হত্যা, স্মাগলিং, শ্লীলতাহনী ইত্যাদি নিদেন পক্ষে গোটাপঞ্চাশেক অভিযোগ— যেমনটি পশ্চিমবাংলার আর সব রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রেও আনা হয়েছে।

কিন্তু যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এ-ভাবে তাকে কিছুতেই শেষ করা যাবে না। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে আজ বহু মানুষ, ধান্ধাহীন নিবেদিত-প্রাণ, লড়াকু বহু মানুষ। কাবাগাবের গাবদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরে মানুষের তীব্র ইচ্ছে। তাই

বার বার প্রতিবার আন্দোলনের নেতাদের কারাগারে বন্দী করার শাসক-চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে দেশে দেশে। জনরোষে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে ওরা। ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা যদি রাষ্ট্রশক্তি এখনও না নিয়ে থাকে, তবে চরম মূল্যে আবার সেই শিক্ষা নিতে বাধ্য করবে জনশক্তি।

আন্দোলনে জোয়ার আনতে একটু সচেতনতা, একটু আন্তরিকতা

যুক্তিবাদী আন্দোলনকে যাঁরা জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস করে নিয়েছেন, যাঁদের কাছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন বেঁচে থাকার ভাত রুটি, যাঁরা আদর্শের বারুদ ঠেসে শরীরের খোল ভরিয়ে রেখেছে, যাঁরা বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রেমে লায়লা কী মজনু— প্রেমের মূল্য তো তাঁদের দিতে হবেই। প্রেম করব কিন্তু মূল্য দেব না ; এ হয় না, হতে পারে না। সে মানব মানবীর প্রেমই হোক আর দেশপ্রেমই হোক। আদর্শের প্রতি এই প্রেম, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি এই প্রেমই আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করে,

আদর্শের বারুদে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় নিজের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু শরীরও। এমন আদর্শে নিবেদিত প্রাণ সারা শরীরে বারুদ ঠাসা মানুষ ইতিহাসের পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসে না। এরা তৈরি হয়। আদর্শ এদের তৈরি করে।

এরা আবেগতাড়িত হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ অবস্থায় টপ্ করে প্রাণ দিয়ে ফেলে না। এরা উত্তেজনাহীন, আবেগহীন অবস্থাতেও নিজ আদর্শে অবিচল। আবারও বলি, এমন মানুষ তৈরি হয়েছে আদর্শকে সামনে রেখেই। আত্মোৎসর্গ ব্যাপারটা এইসব আদর্শবাদীদের কাছে দৈনন্দিন আর দশটা কাজকর্মের মত এতই স্বাভাবিক যে, এর মধ্যে তারা কোনও বিশেষ বীরত্ব বা বিশেষ মাত্রা আছে বলে মনে করে না। নিছক কল্পনা থেকে এসব কথা লিখছি না। এসব কথা কলম থেকে উঠে এসেছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে। আন্দোলন করব, শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে আক্রমণ করব, অথচ আক্রান্ত হব না এমন বোকার মত প্রত্যাশা রাখি না। আক্রান্ত হয়েছি, হচ্ছি, হবো।

আজ এক চরম যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে যুক্তিবাদ নিয়ে আন্দোলন খেলায় সামিল না হয়ে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে থাকলে আঘাত আসবেই। এই আন্দোলন যাদের স্বার্থকে আঘাত করবে, যাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে, তারা যে আঘাত হানবেই এবং সে আঘাত হবে অবশ্যই নিষ্ঠুর ভয়ংকর! এই আন্দোলনে প্রয়োজন ব্যাপক জনসমর্থন। শোষিত

জনগণ যে-দিন তাঁদের নিজেদের যুক্তিতে বুঝতে পারবেন কুসংস্কারের সঙ্গে শোষণের সম্পর্কটা, সে-দিন যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে, তাতে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্যন্ত আন্দোলিত হবে। সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করতে হুজুরের তল্পিবাহক সরকার ময়দানে নামবেই নানাভাবে। নামবে অত্যাচার, কুৎসা, চরিত্রহনন, ব্ল্যাক-মেইলিং ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে। আজকাল সরকার আর শত্রুদের বিরুদ্ধে শুধু মাইনে করা সেনা, পুলিশ নামায না। হাজির করে গোয়েবেলস-এর মিথ্যেকে লজ্জা পাইয়ে দেওয়া নানা ফন্দিফিকির, ষড়যন্ত্র। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্বে আপনি এগিয়ে এলে হঠাৎই এক রাতে দেখতেই পাবেন পুলিশ আপনার আস্তানায়। তারপর ভ্যানে তোলা। গুলির শব্দ, আর্তনাদ, সব শেষ। তারওপর, রাত দুপুরে পুলিশের কোনও বড়কর্তা পত্রিকার অফিস ও সংবাদ মাধ্যমগুলোকে ফোনে দারুণ একটা খবর শোনাবেন ; কোনও পতিতার ঘরে এক সমাজ বিরোধীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে আপনার মারা যাওয়ার খবর। অথবা ছড়ান হতে পারে অন্য কোনও গপ্পো যা সাধারণ মানুষ চেটে পুটে খাবেন, সেই সঙ্গে খাওযা হবে আন্দোলনেরও কিছুটা। ষড়যন্ত্রের শিকারে কত রকমভাবেই না খেলে বিশাল প্রভাবশালী রাষ্ট্রক্ষমতা। সরকারের একান্ত ইচ্ছেয় সাধুকে চোর বানান কঠিন কী?

আপনার আমার দাবি জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনার আমার বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পুলিশ ও প্রশাসন এগিয়ে আসবে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের ওপর নির্ভর করে আমাদের আন্দোলন এগোবে এমন অদ্ভুত চিন্তা করলে এখনই সচেতন হওযার প্রযোজন আছে। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বাস্তব সত্যকে বুঝতেই হবে। বুঝতে হবে হুজুরের দলের সঙ্গে হুজুরদের অর্থে জেতা সরকার-গঠণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্ক এবং সরকারের সঙ্গে পুলিশ ও সেনার সম্পর্ক। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যাঁদের জন্য আন্দোলন, যাঁদের নিয়ে আন্দোলন, তাঁরাই আমাদের আন্দোলনের শক্তি। আমরা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যখনই আক্রান্ত হয়েছি জনরোষ আক্রমণকারীদের ভাসিযে নিয়ে গেছে, তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। আজ যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এমন বহু মানুষ তৈরি হয়েই গেছেন, যাঁরা প্রয়োজনে অবলীলায় নিজের হৃদপিণ্ড পেতে দিতে পারেন শত্রুর গরম সীসায় বিদীর্ণ হতে। দেশপ্রেমই তাঁদের এমন করে গড়েছে।

তবু এরপরও একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলার থেকেই যায়, সেটা হলো— আন্দোলন এগোয় উত্থান পতনের পথ ধরে, আন্দোলন অনেক উত্থান পতনের সমষ্টি। আন্দোলনের সংকট মুহূর্তে, প্রয়োজনে পিছু হটার মুহূর্তে এই সত্যটা স্মরণে রাখলে লড়াই করার প্রেরণা পাওয়া যায়, উজ্জীবীত হওযা যায়, হারতে হারতেও হারাকে জেতায রূপান্তরিত করা যায়।

আন্দোলনে যতই বেশি বেশি করে বঞ্চিত মানুষরা অংশ নেবে ততই আন্দোলন ধ্বংসে আক্রমণ তীব্রতর করবে রাষ্ট্রশক্তি। খেটে খাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে খেটে খাওযা মানুষদের কাজে লাগাতে উগ্রপন্থী ছাপও মারা হবে লড়াকু আপোষহীন আন্দোলনকর্মীদের বুকে পিঠে। উগ্রপন্থীদের নির্মূল করার প্রশ্নে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত

রাজনৈতিক দল ও তাদের পকেটের বুদ্ধিজীবীরাই প্রচণ্ড সোচ্চার। বিপজ্জনক মৌতেকের জোয়ারে বলিষ্ঠ সত্যটুকু প্রকাশ করতে ভয় পায় অনেকেই। জেনে-বুঝেও এইসব শঙ্কিত কণ্ঠগুলো যা বলতে পারে না, তা হলো— উগ্রপন্থীরা তো উল্কার মতন আকাশ থেকে এসে খসে পড়েনি। অবহেলিত বঞ্চিত মানুষগুলোর অধিকার দাবীর ক্ষেত্র থেকে উঠেছে এই সমস্যা। উগ্রপন্থী মারতে হবে শুনলে জনসাধরণের অর্থে পোষা সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা জিঘাংসা, কিলার ইনস্টিংক্ট। তারপর তারা আন্দোলনকারী জনগোষ্ঠির ওপর যে অত্যাচার চালায় তা নাৎসি অত্যাচারকেও হার মানায়। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির যাঁরা মানুষ নন, তাঁদের একথা শুধু কলমে লিখে বোঝান যাবে না।

এখানে একটি ছোট্ট উদাহরণ টানছি, ৯১-এর অক্টোবর হারারে মিলিত হয়েছিল কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র-প্রধানেরা। বহু দেশের প্রধানরাই ছিলেন ঋণভিক্ষু। ব্রিটেন ও কানাডা প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল-ঋণপ্রার্থী দেশগুলোর মানবাধিকার রক্ষার রেকর্ড দেখে ঋণ দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশই। কারণ একটাই— রেকর্ড ঘাটলে দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবাধিকার বঞ্চিত হচ্ছে না বলে চোখের জলে বুক ভাসান এইসব দেশের ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়— মানবাধিকারকে অতি বর্বরতার সঙ্গে নিষ্পেষিত করার অপরাধে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও দেবেন তাঁদের তাই সচেতন থাকতে হবে, বুঝতে হবে আন্দোলনের শত্রু-মিত্রকে। আন্দোলনকর্মী ও নেতাদের আন্তরিকতা, তাঁদের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি সমুদ্র-গভীর প্রেমই দিতে পারে আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য। এই আন্তরিকতা ও প্রেমের মাঝখানে কখনই আসতে পারে না আপসমুখী কোনও চিন্তা। এই আপসমুখী মানসিকতার দ্বিধাই আপনাকে হিসেবী পা ফেলতে শেখাবে, ক্যারিয়ার গোছাতে শেখাবে। প্রেম কখনও হিসেবি পা ফেলতে শেখায় না।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের সচেতন থাকতেই হবে তাঁদের নেতাদের কাজকর্মের বিষয়ে, যাতে চ্যুতি ঘটলে নজর না এড়ায়।

আন্দোলনকে বিপথে চালিত করতে শোষক ও শাসকরা নানাভাবে প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব এবং কুসংস্কার-মুক্তির কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত সংস্থাতে থাবা বসাতে চাইবেই। চাইবেই তাদের মত করে কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলন খেলায় সাংস্কৃতিককর্মীদের মাতিয়ে রাখতে। সাধারণ মানুষের চেতনা রোধ করতে ওরা এমনটা করবেই। আর সেইজন্য অতি সরলীকৃত পদ্ধতিটি হলো— সংস্থার নেতাদের চিহ্নিত কর, তাদের কিনে পকেটে পুরে ফেল।

যে নেতা নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, তাকে আপনারা— আন্দোলনকর্মীরাই চিহ্নিত

করুন, বিচ্ছিন্ন করুন আন্দোলন থেকে। আপনার আমার যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা থাকে, তবেই বুঝতে পারব নেতৃত্ব আমাদের অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে কী না।

কোনও অপছন্দের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে রাষ্ট্রশক্তি সেই আন্দোলনে ঢুকিয়ে দেয় ট্রয়ের ঘোড়া। যাদের অন্তর্ঘাতে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যায়। সব দেশের ইতিহাসেই ছড়িয়ে রয়েছে এমন বহু উদাহরণ। বহু থেকে একটিকে তুলে দিচ্ছি। নকশালপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে কোনও কৌশলেই হোক মিশে গিয়েছিল সমাজবিরোধী গোষ্ঠি। আর সমাজবিরোধীদের প্রয়োগ করা হয়েছিল ওই আন্দোলন ধ্বংস করবার কাজে। এ বিবরণ রঞ্জিত গুপ্তেরই দেওযা, যিনি নকশাল দমনকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে পরিচিত।

নকশালপন্থার সমর্থন বা অসমর্থন আমার এই উদাহবণ টেনে আনার উদ্দেশ্য নয। উদ্দেশ্য আন্দোলনকারীদের সামনে দৃষ্টান্ত এনে বোঝার ব্যাপারটা আরো 'জল-ভাত' করে দেওয়া।

কুসংস্কার-মুক্তি আন্দোলনকে এগিযে নিয়ে যেতে যে-সব বিষযগুলো মাথায় রাখা প্রাথমিকভাবে প্রযোজনীয সেগুলো হলো :

১। সাংস্কৃতিক জগতে শাসক ও শোষকদের একচেটিযাপণা বন্ধ করতে হবে। নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদেরও সমস্ত রকমভাবে চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগাতে। যে-সব গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যম মানুষকে আকর্ষণ করে, তার প্রতিটিকে কাজে লাগিযেই আমরা আমাদেব চিন্তা-চেতনাকে পৌঁছে দেব, প্রতিটি মানুষের মধ্যে। মানুষ যেখানে, সেখানেই আমাদের পৌঁছতে হবে আমাদের চিন্তধারাকে পৌঁছে দেবার স্বার্থেই। পরিস্কারভাবে মাথায় রাখতে হবে, আমরা গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমগুলোকে আন্দোলনের স্বার্থে কাজে লাগাব, কিন্তু গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমগুলো যেন হুজুর শ্রেণীর স্বার্থে আমাদের কাজে না লাগাতে পারে।

যাঁরা মনে করেন বৃহৎ পত্র-পত্রিকায না লেখাটাই বুঝি লড়াকু মানসিকতার পরিচয় তারা ভুল করেন, সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দেবার লক্ষ্য থেকেই সরে যান। সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হযে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠি মাত্র হযে পড়েন। সব সময এমন চিন্তা যে ভুল ধারণা থেকে উঠে আসে, তাও নয়। অনেক তথাকথিত লড়াকু মানুষদের চিনি, যাঁরা বড় পত্রিকায লেখা প্রকাশ করাটা প্রতিক্রিযাশীলতার লক্ষণ বলে সোচ্চারে ঘোষণার পাশাপাশি গোপনে বড় পত্রিকায় 'লাইন' করার চেষ্টা করেন স্রেফ নিজের লেখা ছাপাতে। এঁদের অনেকেই নিজের বিবেক বিক্রি করেছেন লেখা ছাপানোর প্রতিশ্রুতি কিনতে। যাঁদের লেখায় ধার নেই, পাঠক-পাঠিকাদের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত টেনে নিযে যাওয়ার আকর্ষণী ক্ষমতা নেই, তাঁরা বিবেক জামিন রাখতে চাইলেও কেনার খদ্দের জোটে না। এই অক্ষমতা থেকেও অনেক সময় আসে বড় প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি বৈবাগ্য। এ যেন ভিখারীর বৈরাগ্য, নপুংসকেব ব্রহ্মচর্য।

বড় পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেলে আমরা নিশ্চযই নেব। কিন্তু তা বিবেক জামিন

রেখে অবশ্যই নয়। সুযোগ নেব আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শকে পৌঁছে দেবার স্বার্থেই। বড় পত্রিকার মধ্য দিয়ে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে, এটুকু মাথায় রেখেই বলছি সাধারণ মানুষের ধোলাই করা মগজকে পাল্টা ধোলাই করার সামান্যতম সুযোগ ছাড়াও উচিত হবে না।

এরই পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব লেখক তৈরি করতে, সম্পাদক তৈরি করতে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বাড়াতে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে, তাঁদের ভাববাদ-বিরোধী লেখা-পত্তরের সঙ্গে পরিচিত করাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলে নিশ্চয়ই তারা পারবে ভাববাদ-বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি প্রকাশ করতে ; তা সে যতই অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, যত কৃশ কলেবরেই হোক না কেন। এখান থেকেই আমরা জ্বালাব মনুষ্য চেতনায় জ্ঞানের আলো। এখান থেকেই আমরা তৈরি করব আমাদের নিজস্ব 'রবীন্দ্রনাথ,' আমাদের নিজস্ব 'সত্যজিৎ'।

সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের লেখাপত্তর, বক্তব্য, নাটক ইত্যাদিকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কম্যিউনিকেশন বা যোগাযোগ বাড়াতে হলে আমাদের লেখাপত্তরকে এতটাই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে পাঠক-পাঠিকারা আপন তাগিদে ওইসব লেখাপত্তর পড়তে উৎসাহিত হন। যে মানুষদের সামনে পৌঁছতে চাইছি, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চাইছি। তাদের ভাললাগা না লাগার খবরও আমাদের রাখতে হবে ; বুঝতে হবে তাদের মনস্তত্ত্ব।

রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মী নাটক, গল্প, উপন্যাস মানুষকে সাধারণভাবে টানতে পারছে না। পুজো প্যাণ্ডেলে মার্কসবাদী সাহিত্যের স্টলে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ভিড় যতটা থাকে ক্রেতাদের ভিড় ততটা থাকে না। এর একটাই কারণ, সাধারণ মানুষকে এসব আকর্ষণ করতে পারছে না। এই জাতীয় অনেক বইই ভাবি ভারি শব্দে এতই ভারাক্রান্ত যে সাধারণ মানুষ সভয়ে ও-সব লেখাপত্তর এড়িয়ে চলেন।

আমরা 'ছোটি-বাড়ি বাঁতে'এর মতন অতি সফল টি.ভি. সিরিয়াল দেখেছি, যেখানে হাঁচি কাশি টিকটিকির ডাকের মতন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য এসেছে জমাটি কাহিনীর সঙ্গে। আমরা 'রজনী' হিন্দি টিভি সিরিয়ালের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জনের ইতিহাসও জানি। রজনীর বিপুল জনপ্রিয়তায় নায়িকা প্রিয়া তণ্ডুলকরকে তাঁর পরিচিত মানুষরাও ডাকতে শুরু করেছিলেন রজনী নামে। সেখানেও এসেছে বুজরুকের ভাণ্ডাফোড় করার কাহিনী। জ্ঞান দিচ্ছে বলে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। গ্রহণ করেছে। বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাই এগুলোকে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে।

ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের গল্প আমরা জানি, আমাদের ভাববাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের অবস্থাও অনেকটা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মত। আমাদের না আছে একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, না একজন বিভূতি বাঁড়ুর্যে। ফলে আমাদের অনেকের হাতেই নিপীড়িত মানুষের কথা বেরিয়ে আসছে শ্লোগান হয়ে। পরমান্ন রাঁধতে গিয়ে আমরা যদি লঙ্গরখানার খিচুড়ি রেঁধে বসি, তাহলে মানুষ মুখে তুলবে কেন ?

শহরে গ্রামে যেদিকেই তাকান দেখতে পাবেন সিনেমা ও ভিডিওব রমবমা ব্যবসা। শহরের বস্তিবাসী থেকে গ্রামেব গরীব চাষার প্রধান বিনোদন এই সিনেমা, ভিডিও। ওরা হলে এসে ভুলে যেতে চায় ওদের সমস্ত বঞ্চনার কথা, দৈনন্দিন দুঃখ দারিদ্রের কথা। ওরা আসে সব কিছু ভুলে কিছুক্ষণের আনন্দে ডুবে থাকতে। হতদরিদ্র মানুষগুলোকে নিযে তোলা সিনেমা তাই গরীব মানুষদের তেমন টানে না।

'রজনী'তে গরীবদের নিযে অনাকর্ষণীয় কোনও প্যানপ্যানানি ছিল না, ছিল সমাজের নানা সমস্যা এবং সেইসব সমস্যাকে এড়িযে যাওয়ার চেষ্টা না করে মোকাবিলা করার শিক্ষা।

'ছোটি বড়ি বাঁতে' তে পাঁজি— পুথি-মঘা-ত্র্যহস্পর্শ-বারবেলা মান্য করা, বৃহস্পতিবার ও শনিবার ক্ষৌরকর্ম না কবা, পিছু ডাক, হাঁচি, টিকটিকিব ডাক ইত্যাদি মেনে চলাকে হাসির খোরাক করা হযেছে এবং দর্শকবা তা দারুণভাবে উপভোগ করেছে। এই সিরিযালেব চবিত্রগুলো কিন্তু শোষিত মানুষদেব প্রতিনিধিত্ব কবেনি। কিন্তু সিরিযাল থেকে উঠে এসেছিল আমাদেবই কথা। এই ধরনের কুসংস্কাব মেনে চলাটা নেহাৎই হাসিব খোরাক হওযা— এই প্রচার লাগাতারভাবে চালাতে পাবলে এই সব কুসংস্কার না মানাটাই বহু মানুষের 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হযে দাঁড়াত।

আমার এই বক্তব্যেব মধ্যে দিযে গল্পে উপন্যাসে নাটকে গরীব অত্যাচারিত মানুষদের চবিত্রগুলোকে নিযে আসা নিযে সামান্যতম বিরোধীতা করছি না। এইসব চরিত্র-চিত্রণ করতে গিযে বিষযবস্তু আকর্ষণ হাবালে আমাদেব উদ্দেশ্য সাধিত হবে না— এই সত্যটুকুব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবাতে চাইছি শুধু। বলতে চাইছি— লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষযে স্পষ্ট ধারণা থাকলে নানা আকর্ষণীয ভাবেই হাজিব কবা যেতে পাবে আমাদেব বক্তব্য।

২। সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপবিসীম। আমাদের দেশেব জনসমষ্টির সিংহভাগই বই পড়ার মত লেখা-পড়ার সুযোগলাভে অক্ষম। এদেব কাছে আমবা আমাদের লেখাপত্তর নিযে হাজির হতে পাবব না। আমরা সাধারণ মানুষেব চেতনাকে এগিযে নিয়ে যাওযাব জন্য শুধুমাত্র আমাদের লেখাপত্তবেব ওপর নির্ভব করলে দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি পিছিয়েই থেকে যাবে। সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে আমবা কাজে লাগাতে পারি নাটক, যাত্রা, গান, এবং 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতাব বহস্য ফাঁস করে।

আমরা সকলের কাছেই হাজির হবো। যেখানেই মানুষ, সেখানেই হাজির হবো। যে সংস্থাই আমন্ত্রণ জানাক, আমরা যাব— তা সে দক্ষিণ, অতিদক্ষিণ, বাম, অতিবাম— যেই ডাকুক না কেন। যুক্তিবাদ প্রসাবে ব্রতী সংস্থাগুলোব একটু জরুরী কাজ হবে তাদের এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ক্লাবগুলোব সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেব সহায়তায নানা অনুষ্ঠানের আযোজন কবে জন-চেতনাকে এগিযে নিযে যাওযার চেষ্টা করা এবং একই সঙ্গে এই আন্দোলনকে এগিযে নিযে যাওযার জন্য আবো নতুন নতুন মানুষকে এই আন্দোলনের শবিক করা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। ভাববাদী বইপত্তবেব তুলনায ভাববাদ-বিরোধী বা যুক্তিবাদী বই পত্তবের সংখ্যা

অতি নগণ্য। ভাববাদী মানসিকতা ঠেকাতে ও যুক্তিবাদী চেতনা বাড়াতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাজির করতে হবে যত বেশি কবে সম্ভব যুক্তিবাদী বইপত্তর। এই দায়িত্ব পালন করতে হবে আপনাকে আমাকে প্রতিটি দেশপ্রেমিককে। আসুন আমরা আজই কেন প্রতিজ্ঞা করি না— শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে যে সংস্কার-মুক্তির প্রয়োজন তারই স্বার্থে আমরা বেঁচে থাকার জন্যেই প্রয়োজন ভেবে সংস্কার-মুক্তির বই কিনব, বই পড়ব, বই পড়াব এবং বই উপহার দেব।

৪। যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল সংস্থা ও গণসংগঠনগুলোর একান্ত কর্তব্য হওযা উচিত কর্মীদের তৈরি করে তোলার জন্য নিরন্তর 'স্টাডি ক্লাস' করা। কীভাবে স্টাডি ক্লাসগুলো চালাতে হবে, এই নিযে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করেছি বলে আবার বিস্তৃত আলোচনায গেলাম না।

৫। কোনও সাংস্কৃতিক বা যুক্তিবাদী সংস্থা কোনও ধরনের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলে বা কোনওভাবে আক্রান্ত হলে তাঁরা সমমনোভাবাপন্ন মানুষ ও সংস্থাগুলোব সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করে তাদের পবামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করুন। একইভাবে কোনও আক্রান্ত সংস্থা যোগাযোগ করলে সমস্ত বকমভাবে আপনারা প্রত্যেকে তাদের পাশে দাঁডিযে লড়াই-এ জয ছিনিযে নিযে আসুন। যদি সংস্কাবেব শেকল ভাঙতে গিযে আক্রান্ত হন—অঙ্গীকাববদ্ধ বইলাম আমাদের সমিতি তার সমস্ত শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিযে লড়বে।

৬। গণ-সংগঠণগুলোর কর্মীদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, এবং এমন প্রক্রিযার মধ্যে দিযে এগুতে হবে যাতে নেতৃত্বের চ্যুতি, ভ্রান্তি বা বিপথগামীতার ক্ষেত্রে সদস্যরা নেতাদের সমালোচনা করতে পিছ-পা না হয।

৭। সমালোচনা যিনিই করবেন তাঁকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে সমালোচনার লক্ষ্য যেন হয সংগঠনের উন্নতি এবং আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি।

সমালোচনা হবে খোলাখুলি এবং অবশ্যই সংগঠনের মধ্যে। কোনও বিষযে আলোচনায় মতপার্থক্য অবশ্যই থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতই প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে সংগঠনের স্বার্থে। সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই শুধু নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হওযার পর সংগঠনের বাইরে কেউ এই বিষয়ে সমালোচনা কবলে সেটা সংগঠন-বিবোধী কাজ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সংগঠনেব বাইরে সামালোচনাকারীকে প্রয়োজনে সংগঠনের স্বার্থেই সংগঠন থেকে বের করে দিতে হবে, তা সেই সমালোচক সংগঠনের যত উচ্চ-পদাধিকারীই হোন না কেন।

মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার দরুণ অনেক সমযই সমালোচনা হযে পড়ে দাযিত্বজ্ঞানহীন ; কখনও সমালোচনা উঠে আসে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে, কখনও ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে। সমালোচনা হওযা উচিত সংগঠনের স্বার্থে ইতিবাচক। শুধুমাত্র নেতিবাচক বা নাকচ কবে দেবার সমালোচনা অর্থহীন হযে পড়ে, যদি না পরিবর্ত পথনির্দেশ দেওযা হয। দাযিত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা সংস্থায বিশৃঙ্খলাই শুধু টেনে আনতে পাবে।

৮। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে স্পষ্ট স্বচ্ছ ধারণা থাকলে কোনও শক্তির সাধ্য নেই মগজ ধোলাই করে বিপথে চালিত করে। সংগঠনের প্রয়োজনেই নেতৃত্বের অবশ্য কর্তব্য আন্দোলনকর্মীদের ধাপে ধাপে শিক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ করে তুলে প্রত্যেককে এক একজন সংগঠক, সংগ্রামী করে তোলা। তাঁদের দৃঢ় মতাদর্শগত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া। মতাদর্শগত ভিতই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে আন্দোলনকর্মীদের চালিত করবে।

৯। সংগঠন যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠবে তাঁরাই সংগঠনকর্মী বা আন্দোলনকর্মী। আর নেতা তিনি, যিনি নিজে যে কোনও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং আন্দোলনকর্মীদের বিশ্লেষণ-পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দিতে সক্ষম। এরই পাশাপাশি নেতাকে হতে হবে সৎ, আবেগহীন, আত্মবিশ্বাসী, বিনয়ী, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে সক্ষম, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন ও কৌশলগত দিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

ভারি ভারি নাম বা বড় বড় ডিগ্রী দেখে নেতা বাছবেন না। নেতা বাছুন কাজের মানুষ বিচার করে। যে যত বেশি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে, যত বেশি আন্তরিক হবে, ততই সে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই নেতৃত্বের গুণগুলোকে অতি স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করে নেবে।

১০। আন্দোলনকর্মীদের মধ্যে অনেক সময়ই এই জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে— আমাদের আন্দোলনকে আঘাত করতে যদি রাষ্ট্রশক্তিই হাজির হয়, তবে কী আমরা আন্দোলনকে শেষ জয় এনে দিতে পারব ? অথবা কখনও যদি এমন প্রশ্ন হাজির হয়, গোটা ভারত বা গোটা পৃথিবীর মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হয়ে তাদের শোষণের পদ্ধতিগুলো ধরে ফেলে বর্তমান সমাজ-কাঠামোটাই পাল্টে দিতে লড়াইয়ে সামিল হবে, অধিকার ছিনিয়ে নিতে সোচ্চার হবে— এ এক অবাস্তব কল্পনা নয় তো ? তখন প্রশ্নকর্তাদের দৃষ্টির কুয়াশা কাটিয়ে আলো দেখাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরুন আমাদেরই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সংগ্রামী ইতিহাস। বুঝিয়ে দিন আন্দোলনের শরিক যেখানে কোনও জনগোষ্ঠির বৃহত্তর অংশ, সেখানে আন্দোলন শেষ করার সাধ্য পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রশক্তিরই নেই। একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠিকে যুক্তিবাদী চেতনার আলোকে আলোকিত করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কোনও কাজ নয়। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করুন ; আন্দোলনকর্মীরা উদ্দীপ্ত হলে জনগণকে সচেতন করা, সংগঠিত করার কাজটা অতি সহজ হয়ে যায়।'

১১। সাধারণ ভাবে ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব ধ্যান ধারণা শোষকশ্রেণী তাদের তাঁবেদার রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে প্রচার করে চলেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি হাজির করুন। ওদের যুক্তিকে সুযোগ পেলেই আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক চিন্তাগুলো পৌঁছে দেবার চেষ্টা করুন। এতদিনকার কুযুক্তির বিরুদ্ধে কোনও সুযুক্তি হাজির হয়নি বলেই সাধারণ মানুষ মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়েছেন। সুযুক্তি পেলে সাধারণ মানুষ তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন, আমাদের সমিতির অভিজ্ঞতা তাই বলে।

১২। শুধু নাকচ বা বর্জনের ওপর কোনও কিছুর স্থায়ী ভিত গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমান সমাজের নেতিবাচক দিকগুলোর নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, জনমত গড়তে হবে। কিন্তু তারই পাশাপাশি ইতিবাচক, গঠনমূলক পথও দেখাতে হবে।

আমাদের অশ্রদ্ধা পুরনো সবকিছুর প্রতি নয়, আমাদের অশ্রদ্ধা যুক্তিহীনতার প্রতি। আমাদের শ্রদ্ধা যা নতুন তার প্রতি নয়, আমাদের শ্রদ্ধা যুক্তির প্রতি।

১৩। যুক্তিবাদী আন্দোলন সঠিক পথে চললে যাদের স্বার্থে এই আন্দোলন আঘাত করবে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তারা প্রত্যাঘাত হানবেই। এই প্রত্যাঘাত বোখার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ। তারই পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে সংগঠন যদি বাস্তবিকই সংগ্রামী মানুষদের নেতৃত্ব দিতে যায়, তবে সেই সংগঠনের অনেক কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীযতা বক্ষা কবতে হবে।

গোপন সংগঠন সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা সাধাবণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন সংগঠনের কযেকজন নেতা আত্মগোপন করলেই বুঝি 'গোপন সংগঠন' হয। গোপন সংগঠন চোবের মতন লুকিয়ে লুকিযেও করতে হয় না। সংগঠনের গোপনীযতা রক্ষাব জন্য এ-সব কোনও কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বরং সাধারণভাবে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা আত্মগোপন করলে সাধারণ কর্মীদের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হযে পড়েন। আর আত্মগোপনকারী নেতা গণ-সংগঠনেব কাজ চালাতে গেলে ধরা পড়বেনই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিযে, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সংবাদিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি বহু পেশার মানুষেব সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য একদল কর্মী তৈরি করতে হবে। এঁরা বিভিন্ন পেশার মানুষ হতে পারেন, এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে প্রতিটি লড়াইতে জনসমর্থন পাওযা সহজতর হবে।

১৪। গণ-সংগঠনসর্বস্ব আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে-সব অসুবিধে দেখা দিতে পারে, সেগুলো নিযেও অবশ্যই সচেতন থাকা প্রযোজন :

ক) আন্দোলন তীব্রতর হলে শোষক ও শাসকশ্রেণী সমস্ত গণ-সংগঠনগুলোকেই চরবৃত্তির কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। গণ-সংগঠনের নেতাদেব লোভ, ভয, ইত্যাদির দ্বারা কিনে ফেলার চেষ্টা চলে।

খ) গণ-সংগঠনের অনেক নেতৃত্বই কম ত্যাগ ও কম ঝুঁকি নিযে বেশি রকম আত্মপ্রচাবে উৎসাহী হযে পড়ে।

গ) সরকাবী-বেসরকারী সাহায্য ও প্রচারেব মোহে বাঁধা পড়ে অনেক নেতৃত্বই কথায ও কাজে দুই মেরুতে অবস্থান করতে শুরু কবেন। নেতা বিক্রী হযে যাওযায সংগঠন ভুল পথে চালিত হতে থাকে, প্রকৃত আন্দোলনের শত্রুতা করতে থাকে।

ঘ) গণ-সংগঠনের নেতারা অনেক সময যুক্তিবাদী আন্দোলনের আদর্শগত দিকটা

আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ না করে কিছুটা হুজুগেও যুক্তিবাদী আন্দোলনের শরিক হতে এগিযে আসতে পারে। আর হুজুগে আন্দোলনে ঢুকে পড়া গণ-সংগঠনের নেতারা যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে।

১৫। আন্দোলনের স্বার্থে সমমনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব, যুক্তিবাদী আনেদালনে সামিল সংস্থাগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা। সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে প্রতিটি আক্রমণের, প্রতিটি সমস্যার মোকাবিলায সমস্ত সংগঠন একত্রিত হতে পারবে অতি দ্রুত। সকলে কাঁধে-কাঁধ মিলিযে লড়লে লড়াই জেতা, সমস্যা ডিঙিযে যাওয়া সহজতর হয়।

ভারতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি বহু সংগঠনেব সমন্বযকারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। আরও বেশি বেশি কবে সংগঠন এগিযে এলে প্রত্যেকের কাছেই উদ্দেশ্য পৌঁছন সহজতর হবে।

কোনও সংগঠনের স্বাধীনতায হাত না দিযেই যুক্তিবাদ প্রসাব, কুসংস্কাব-মুক্তি, মরণোত্তর দেহদান, স্বাক্ষবদান, প্রগতিশীল নাটক, গান এবং আবো কিছু 'কমন' কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা একত্রিক হযেছি। আমাদেব সম্মিলিত ও পবিকল্পিত প্রযাসই এমন একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে পাবে, যাতে বর্তমান সমাজের মূল কাঠামোই আন্দোলিত হতে পারে, নাড়া খেতে পারে। আর তারপর—আন্দোলনে সামিল জনগণই সৃষ্টি করবে এক নতুন ইতিহাস, জাগরণের ইতিহাস।

১৬। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে জোরদার করতে আসুন না কেন, প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারকামী মানুষ ও সংস্থা বছবের একটি দিনকে, ১মার্চ দিনটিকে 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালন করে যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করি। এই দিনটিতে আমরা প্রতেকে অন্ততঃ সংস্কার মুক্তির সহায়ক, যুক্তি নির্ভর কিছু লিখি, কিছু পড়ি, অথবা কিছু আলোচনা করি। সাংস্কৃতিক আন্দেলনে অগ্রনী সংস্থাগুলো ওই দিনটিতে নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে নিশ্চযই যুক্তিবাদী আন্দোলনে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করতে পারি। '৯২-এর ১মার্চ ভারত ও বাংলাদেশের এক হাজারটির ওপর সংস্থা 'যুক্তিবাদী দিবস' পালন করবে. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যুক্তিবাদী মানুষও ওই দিনটি 'যুক্তিবাদী দিবস' হিসেবে পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনি আমিই পারি ১মার্চকে আক্ষরিক অর্থে 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস' করে তুলতে।

আমি অতি-সচেতনভাবেই মনে করি, এ-দেশের বর্তমান সমাজের হুজুর-মজুব সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থাই আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে সবচেযে বড় বাধা। আর এই শোষক-শোষিতের সামাজিক কাঠামো টিঁকে রযেছে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অসংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তাকে পরিপুষ্ট করে। সমাজ-বিজ্ঞান ও বাস্তব-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নিয়ে সুগভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি অবশ্যই বেরিযে আসে—অন্ধ-বিশ্বাসজাত কুসংস্কার ও অসংস্কৃতির পরিমণ্ডল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে এদেশের আর্থিক কাঠামো এবং শোষক-শোষিতের শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে, এবং এরা পরস্পর পরস্পবের পরিপূরকও বটে। অর্থাৎ এ-দেশের আর্থিক কাঠামোকে নিম্নস্থ কাঠামো বা ভিত্তি-কাঠামো (infrastructure) আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে উপরি কাঠামো

(superstructure) বলে ভাবলে ভুলই ভাবা হবে। অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ভ্রান্ত-চেতনাপ্রসূত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এ-দেশে অবশ্যই ভিত্তি-কাঠামোর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির তিনটি খণ্ডেই ঘুরে-ফিরে বারবার এসেছে ; এত যুক্তি হাজির হয়েছে যে আবার নতুন করে এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি হাজির করার অর্থ হয়ে দাঁড়ায়—পাঠক-পাঠিকাদের বোধশক্তির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা। এই তিন খণ্ড আলোচনার শেষে নিশ্চয়ই এখন আমরা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—

হুজুর-মজুর সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ গঠনের আগে এবং পরে এ-দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব একইভাবে প্রয়োজনীয় ; প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ধরে রাখতেই এর প্রয়োজন।

কোনও কোনও পাঠক-পাঠিকার মনে হতে পারে 'কিছু কথা' শিরোনামে লেখা ভূমিকাটিতে 'মগজ ধোলাই' প্রসঙ্গ নিয়ে এত বিস্তৃত আলোচনা কতটা প্রাসঙ্গিক ? যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে আলোচনাকে টেনে আনাই বা কতটা সঙ্গত হয়েছে ? শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের কারো কাছে এমন আলোচনা ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিয়ে থাকলে আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ; সেই সঙ্গে কৈফিয়ৎ হিসেবে জানাচ্ছি, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটিকে শুধুমাত্র অলৌকিক রহস্য-জাল ছিন্ন করার তথ্যে ঠাসা বই করতে চাইনি। আমার চাওয়াটা এর চেয়ে আরও কিছু বেশি। তাই যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে যে বিষয়গুলো নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করা একান্ত প্রয়োজন মনে করেছি, যে বিষয়গুলো নিয়ে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্তই আবশ্যক বিবেচনা করেছি, সে-সব বিষয়ের অনেক কিছুই 'কিছু কথা'য় এনেছি ; বাকি আনব পরবর্তী খণ্ডেও। প্রথম খণ্ডের 'কিছু কথা' দিয়ে যে সচেতন পরিক্রমা শুরু করেছি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের 'কিছু কথা' তার সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পর্কযুক্ত।

আমার লেখা থেকে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযোদ্ধারা উপকৃত হলে আমিই হবো পৃথিবীর সুখীতম মানুষ।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এ-দেশ ও এ-দেশের বাইরের সহযোদ্ধা ও সহমতের সাথীদের। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের উদ্দেশ্যেও, যাঁদের প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে ও সমিতিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে, গতিশীল রেখেছে।

ক্ষমাপ্রার্থী তাঁদের কাছে, যাঁদের কাছ থেকে নিয়েছিই শুধু, কিন্তু দিতে পারিনি চিঠির উত্তরটুকুও। পত্র-লেখক-লেখিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ—চিঠির সঙ্গে অনুগ্রহ করে একটি জবাবী খামও পাঠাবেন।

এমন কিছু চিঠির উত্তর দিতে পারিনি, যার উত্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। পরবর্তী খণ্ডে সে-সব উত্তর নিয়ে নিশ্চয়ই হাজির হবো।

সংগ্রামের সাথী, প্রেরণার উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

যুক্তিবাদী আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন জয়যুক্ত হবেই।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা—৭০০ ০৭৪

এক

পত্র-পত্রিকায় সাড়া জাগানো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে

২২ মে ১৯৯১ 'বর্তমান' পত্রিকায় রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর খবরের সঙ্গেই প্রথম পৃষ্ঠাতেই যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল আরও একটি খবর। শিরোনাম ছিল—"কলকাতার জ্যোতিষী বলেছিলেন"। ভেতরের খবরটা ছিল এই রকম :

> *স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনী পর্ব মেটার আগেই দেশে বিরাট ও চাঞ্চল্যকর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবে। অন্তত তার যে একটা চেষ্টা হবে তা একেবারে নিশ্চিত। কলকাতার জ্যোতিষী প্রয়াগ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গত ১২ মে স্থানীয় এক ইংরেজি দৈনিকে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছিল।*

প্রকাশিত এই খবরটি জনগণকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল, প্রভাবিত করেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন প্রয়াগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততারই প্রমাণ। বাস্তব-সত্য কিন্তু অন্য কথাই বলে। ১২ মে '৯১ The Telegraph পত্রিকায় প্রয়াগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনোত্তর ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে প্রয়াগবাবু স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন—"Rajiv Gandhi will head the country as the Prime Minister." অর্থাৎ রাজীব গান্ধী হবেন প্রধানমন্ত্রী। এই কথার মধ্যেই প্রয়াগবাবুর জ্যোতিষবিচার দিয়েছিল রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। কিন্তু ২১ মে শ্রীপেরুমপুদুরের বিস্ফোরণ রাজীব গান্ধীর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারান্টিকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল।

এরপর স্বাভাবতই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যে প্রশ্নটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা হলো, তবে কেন প্রয়াগবাবুর চূড়ান্ত ভুলকে একান্ত নির্ভুল বলে প্রচার করা হয়েছিল ? কেন ? কেন ? বারবার ঘুরে-ফিরে এ-প্রশ্ন আসবেই। এই মিথ্যাচারিতার পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। কী সেই উদ্দেশ্য ? এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে চাই নামী-দামী জ্যোতিষীদের আরো দু-একটি সাড়া জাগান তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাদের কৌশলগত দিকের সঙ্গে।

২৪ আগষ্ট '৮৮ যুগান্তর পত্রিকায় একটি জব্বর খবর প্রকাশিত হয়েছিল

ভবিষ্যৎবাণী মিলল

বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষী মুরারিমোহন বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সংস্কৃতশাস্ত্রে অধ্যাপনার জন্য জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পণ্ডিত শাস্ত্রী যে ভবিষ্যৎবাণী করেন তা এবার মিলে গেছে।

খবরটা জনমানসে এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সে বছর দমদম সেন্ট মেরিজ স্কুলে কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, "কোন্ বিখ্যাত জ্যোতিষী জিয়ার মৃত্যু এবং বিহারের সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্প সম্পর্কে নিখুঁৎ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?"

আমাদের 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের বহু অনুষ্ঠানেই এই নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো সেই সময়। আমরা উত্তরে ২৬ আগস্ট যুগান্তরে পাঠান চিঠির প্রতিলিপিটি পড়ে শোনাতাম। এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর ফাঁক আর ফাঁকিটুকু কোথায় বোঝাবার জন্যে চিঠির কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :

প্রিয় সম্পাদক ২৬ ৮.৮৮

'পাঠকদের মতামত' বিভাগ

যুগান্তর

২৪ আগস্ট যুগান্তর পত্রিকায় 'ভবিষ্যৎ মিলিল' শিরোনামে যে খবরটি পরিবেশিত হয়েছে, জনস্বার্থে খবরটি আরও একটু বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা মাথায় রেখেও বলছি, সংক্ষিপ্ত তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় খবরটি পড়লে জনসাধারণের প্রাথমিকভাবে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক—জ্যোতিষী মুরারি মোহন বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রীর এই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততারই প্রমাণ।

বিজ্ঞান যখন জ্যোতিষশাস্ত্রকে অপ-বিজ্ঞান বলে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টায় পরাবিদ্যাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ, তখন এই ধরনের একটি সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা হিসেবে আপনারাও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সহমত হবেন, জনস্বার্থে প্রকৃত সত্যটি একান্তভাবেই প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আপনারা অনুগ্রহ করে জানান (১) পণ্ডিত ও জ্যোতিষী মুরারিমোহন বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রী কবে কোথায় প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? (২) ভবিষ্যদ্বাণীতে কী জিয়ার মৃত্যু দিনটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন? (৩) ভূমিকম্পের দিন এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলোর কথা কী উল্লেখ করেছিলেন?

কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিব মৃত্যু বা প্রাকৃতিক দুযোর্গ ঘটে যাওয়ার পবে-পরেই অনেক জ্যোতিষী কোনও ছোটখাট পত্র-পত্রিকায় অথবা নিজস্ব কোনও পত্র-পত্রিকায় নিজের নামে ভবিষ্যদ্বাণী ছাপতে দিয়ে দেন। তবে পত্র-পত্রিকার প্রকাশকাল হিসেবে অবশ্যই ছাপা হয় ঘটনা ঘটার আগের কোনও তারিখ।

সত্যানুসন্ধানে উৎসাহী যুক্তিবাদী হিসেবে খোলা মনে আমরা শ্রীশাস্ত্রীর দাবির পরীক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। শ্রীশাস্ত্রীকে প্রকাশ্যে পাঁচজনের মৃত্যু দিন ঘোষণা করতে অনুরোধ করছি। (১) তৃপ্তি মিত্র (২) সত্যজিৎ রায় (৩) রাজীব গান্ধী (৪) জ্যোতি বসু (৫) বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং।

আশা রাখি শ্রীশাস্ত্রী সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাঁর ঘোষণার মধ্য দিয়েই জনসাধারণ প্রকৃত সত্যকে জানতে পারবেন। পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণীই সঠিক হলে আমাদের সমিতি খাঁটি যুক্তিবাদী মানসিকতাব পরিচয় দিযে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্বীকার কবে নিয়ে ভবিষ্যতে জ্যোতিষ-বিরোধীতা থেকে বিরত থাকবে এবং সমিতির সম্পাদক হিসেবে আমি মুরারিবাবুকে প্রণামী হিসেব দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

প্রবীর ঘোষ
সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪

’৯১-অতিক্রান্ত, পাঁচজনেব দু'জন আমাদের মধ্যে নেই। তবু মুরারিমোহন শাস্ত্রী ও অন্যান্য জ্যোতিষীদেব জন্য আমার এবং আমাদের সমিতিব চ্যালেঞ্জ খোলাই রইল। যে-দিন মুরারিবাবু বা অন্য কোনও জ্যোতিষী আমাদেব সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিযে আসবেন সে-দিনই অন্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম এনে পাঁচের ঘাটতি পূরণ করে দেব।

জানি, নিরেট বোকা ছাড়া কোনও জ্যোতিষীই এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতে এগিযে আসবেন না. কাবণ, বিভিন্ন আলোড়নসৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে যাওযার পর যে-সব জ্যোতিষীরা বিজ্ঞাপন দিযে বা প্রচাব মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগিযে নিজেদের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে প্রচার করেন, তাঁরা খুব ভালমতই জানেন তাঁদেব দৌড় কদ্দুব। এব পরেও কোনও জ্যোতিষী যদি বাস্তবিকই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে এগিযে আসেন, তবে তাঁকে পবাজয স্বীকার করতেই হবে।

আর, এর পরও যদি কেউ কূট প্রশ্ন তোলেন—কিন্তু কোনও জ্যোতিষী যদি পারেন?

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, পবাজিতের বান্দা হযে থাকব জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকাব প্রণামী তো রইলই। আমাদেব সমিতিও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে রা-টি কাটবে না—এ আমাদেব কার্যকারী সমিতির সিদ্ধান্ত। কী, সব মন-পসন্দ তো? পাঠক-পাঠিকার প্রতি একটি বিনীত আন্তরিক অনুবোধ—বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস কবে যাঁদেব আপনি বিখ্যাত কোনও ঘটনাব বা বিখ্যাত কোনও ব্যক্তিব মৃত্যুর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বক্তা বলে মনে করছেন, তাঁকেই আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অনুবোধ করুন, দাবি জানান বা বাধ্য করুন—দেখতেই

পাবেন ওঁরা এক একটি কী ধুরন্ধর প্রতারক। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে যত বেশি সংখ্যক নামী-দামী জ্যোতিষীরা এগিয়ে আসবেন, ততই এই বক্তব্যের সত্যতা বেশি করে প্রমাণিত হবেই।

'৯১-এ ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেল। তারপরই অমৃতলাল হৈ হৈ করে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়লেন। অমৃতলাল কে? না, অমৃতলাল এমনই একজন জ্যোতিষী, যিনি প্রচারে তামাম পূর্ব-ভারতের যে কোনও জ্যোতিষীর চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। অমৃতলালের বহু বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নামী-দামী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার পুরো পাতা জুড়ে। শহর কলকাতার বুকে বহু হোর্ডিং দাঁড়িয়ে আছে অমৃতলালের বিজ্ঞাপন ধারণ করে·

"সব জ্যোতিষী বারবার
অমৃতলাল একবার
করতে গ্রহের প্রতিকার
Metal Tabletএর জুড়ি ভার।"

অমৃতলালের আরও একটা পরিচয় আছে। তিনি জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক "The Sunday"-তে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখেন।

নির্বাচন নিয়ে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বিজ্ঞাপনের বোমাটি অমৃতলাল ফাটালেন ২২ জুন, ১৯৯১-এর আনন্দবাজার পত্রিকায়। "পঃ বঙ্গের ক্ষেত্রে অমৃতলালের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল একশভাগ" শিরোনামে ঢাউস বিজ্ঞাপন দিলেন। আর সেই বিজ্ঞাপনের ঠেলা সামলাতে আমাদের জেরবার অবস্থা। ইতিমধ্যে যেখানেই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে অনুষ্ঠান করতে আমাদের সমিতি গিয়েছে, সেখানেই কিছু কিছু শ্রোতা ও দর্শক আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন—"নির্বাচন নিয়ে অমৃতলালের ভবিষ্যদ্বাণী যে একশ ভাগ খেটে গেল, সে বিষয়ে আপনারা কী বলেন?" অনেকে তো বিজ্ঞাপনটি পর্যন্ত হাজির করেছেন আমাদের সামনে। বিজ্ঞাপনটি কী বিপুলভাবে জনগণকে প্রভাবিত করেছে—ভাবুন তো?

১৮ মে ১৯৯১ 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় অমৃতলালের নির্বাচনী-ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষই বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছিল। অতএব, ভবিষ্যদ্বাণীটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং পত্রিকার প্রকাশ কাল হিসেবে ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগের তারিখ ছাপা হয়েছিল—এই যুক্তি অমৃতলালের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে খাটে না। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু, ভবিষ্যদ্বাণীর কোন্ অংশ মিলল? মিলল, সি. পি. এম. পশ্চিমবঙ্গে শাসনক্ষমতায় আসবে, এবং জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হবেন—এই অংশটুকু।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় নির্বাচনের আগে বহু কাগজে নানা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মতামত। প্রতিদিনই বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা পড়ি। মনে পড়ে না, এমন কেউ মত প্রকাশ করেছেন—পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম.

ক্ষমতায় আসতে পারবে না ? আর সি. পি. এম. ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে জ্যোতি বসুকে সরিয়ে অন্য কাউকে আনা হবে—এমন উদ্ভট মতামতও কেউই প্রকাশ করেননি। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, মুখ থেকে দুধের গন্ধ না যাওয়া পশ্চিমবাংলার বালক-বালিকারাও জানত সি. পি. এম. ক্ষমতায় আসছে। যে কথা সকলেরই জানা, সে কথাটাই বলে অমৃতলাল আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঢাউস-ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে জানাতে লাগলেন— কী বিস্ময়কর তাঁর নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী।

সত্যিই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অমৃতলাল। অমৃতলাল ১৮মে সংখ্যার 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় দীপ্ত ঘোষণা রেখেছিলেন, (১) "রাজীব গান্ধীর পক্ষে সময়টা শুভ।" (২) "শনি পঞ্চমে, বৃহস্পতি একাদশে। ফলে, রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ প্রবল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেনই।" (৩) "কংগ্রেস নির্বাচনে দলগতভাবে প্রথম স্থানে থাকবে। আসন পাবে ২৭০টিরও বেশি।" (৪) "বি. জে. পি. গতবারের তুলনায় তেমন খারাপ ফল করবে না। আসন সংখ্যা অবশ্য কিছুটা কমতে পারে।" (৫) "জনতা পার্টির কন্যা রাশি। বর্তমানে দলটির বৃহস্পতি একাদশে ও শনি পঞ্চমে অবস্থান করছে। ফলে আগের তুলনায় দলের আসন সংখ্যা কিছুটা বাড়তেও পারে।"

এইসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবে যে রূপ পেল, তা হল—(১) রাজীব গান্ধীর পক্ষে সময়টা ছিল সবচেয়ে খারাপ। কারণ, নির্বাচন চলাকালীন তাঁর মৃত্যু ঘটে। (২) রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হননি। হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ সে সময় তিনি মৃত। (৩) কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২৭০-এর বেশি না হয়ে হয়েছে ২০০-টিরও কম। (৪) বি. জে. পি-র লোকসভার আসন সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বেড়েছে। (৫) জনতা পার্টির আসন সংখ্যা প্রচণ্ড রকম কমেছে।

এই পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি চূড়ান্তভাবে মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলালের জ্যোতিষবিদ্যার গ্যাস বেলুনটি গেছে ফেটে। প্রমাণিত হয়ে গেছে, আরও পাঁচটা জ্যোতিষীর মতনই তাঁর জ্যোতিষ-বিদ্যাও বুজরুকিতে ভরা।

এর পরেও কেউ কেউ বলতে পারেন—১৯৯১-এর নির্বাচনের ব্যাপারে অমৃতলালের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা সত্যি, কিন্তু একবারের ব্যর্থতা চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রমাণ নয়। তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই ১৯৮৯-এর ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অমৃতলালের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে।

২৪—৩০ নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পরিবর্তন'-এ অমৃতলালের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে অমৃতলাল জানিয়েছিলেন, "বিরোধী দলগুলির বিশেষত বি. জে. পি-র অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হবে। ভোটে তাদের আসন দারুণভাবে কমবে। সুতরাং বিরোধী জোট যেখানে মন্ত্রিসভা গড়তেই পারবে না সেখানে সেই মন্ত্রিসভার আয়ু নিয়ে কোন প্রশ্নই আসে না।"

কিন্তু বাস্তবে শাসকদল কংগ্রেসেরই ভরাডুবি হয়েছিল। বি. জে. পি-র আসন সংখ্যা বেড়েছিল অভূতপূর্ব ; বেড়ে ছিল ভোটও। আর শাসকদলকে হারিয়ে বিরোধী দলই মন্ত্রীসভা গড়েছিল।

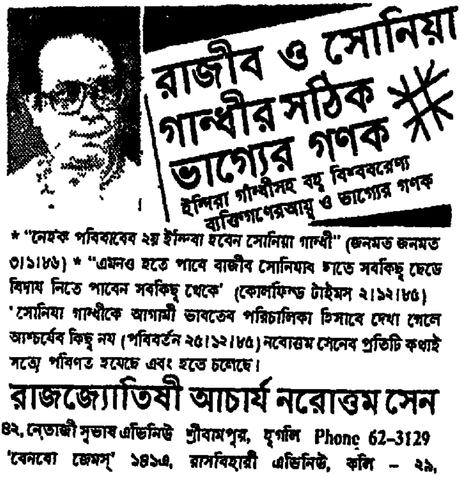
অমৃতলাল এও জানিয়েছিলেন "কংগ্রেস (আই)-এর আগামী লোকসভায় সদস্য সংখ্যা ৩৫০—৪০০ হতে পারে।"

হায় অমৃতলাল। হায় আপনার ভবিষ্যদ্বাণী।

অমৃতলাল আবার ঐ সাক্ষাৎকারে ভি. পি. সিং, চন্দ্রশেখর, হেগড়ে, এন টি. রামা রাও, জ্যোতি বসু ও রাজীব গান্ধীর জন্ম বিচার করে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন, "আগামী কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন রাজীব গান্ধী।"

জ্যোতিষ বিচার'কে হাস্যকর প্রমাণ করে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ভি. পি. সিং।

আর একজনের প্রচারও সম্প্রতি বহু মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে। তিনি হলেন 'রাজজ্যোতিষী আচার্য নরোত্তম সেন'. বহু পত্র-পত্রিকায় বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনে নিজের ছবি ছেপে তার পাশে বিশাল বিশাল হরফে ঘোষণা রাখছেন "রাজীব ও সোনিয়া গান্ধীর সঠিক ভাগ্যের গণক।"



নরোত্তম সেন-এর প্যাডে যে পরিচয় ছাপা হয়েছে তা যথেষ্ট দীর্ঘ। লেখা আছে 'ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি'-র অধ্যক্ষ ; জোতিষসাগর (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ; জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত শিরোমণি (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ; জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ; রত্নাচার্য ; সামুদ্রিক রত্ন, আয়ুর্বেদ জ্যোতিষরত্ন (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) ; সংখ্যাতত্ত্ব শিরোমণি ; মন্ত্র জ্যোতিষাচার্য ; লেখক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বীকৃত নবযুগসৃষ্টিকারী জ্যোতিষী।"

আসুন দেখা যাক তিন তিনটি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এবং বহু উপাধিলাভে সম্মানিত, পৃথিবী কাঁপানো জ্যোতিষী নরোত্তম সেন রাজীব গান্ধীর সম্বন্ধে কী সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন?

২৪—৩০ নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যা 'পরিবর্তন' পত্রিকায় "জ্যোতিষীদের চোখে নির্বাচন" শিরোনামের এক সাক্ষাৎকারে নরোত্তম সেন '৮৯-এর ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে

জানিয়েছিলেন, "রাজীব গান্ধী সহ অন্যান্য নেতাদের জন্মচক্র বিচার করে দেখেছি যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) খুব বড় মাপের ধাক্কা খেলেও কেন্দ্রে পুনবায তারাই সরকার গঠন করবে।"

কিন্তু নরোত্তম সেনের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিহাসে পরিণত করে কংগ্রেস (আই) '৮৯-এর নির্বাচনে হেরেছিল। ভি. পি'-র নেতৃত্বে বিরোধী মোর্চা গদী দখল করেছিল।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর অনেক জ্যোতিষী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দাবি করতে শুরু করেছেন, তাঁরা রাজীব গান্ধীর মৃত্যু বিষযে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁদের পরিচিতজনেদের কাছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর আগেই পত্রিকায প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিষীর হাজির করা স্বাক্ষীর কথা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত সত্যের প্রমাণ নয—এটা যুক্তিবাদী মাত্রেই স্বীকার করবেন। বিভ্রান্তি দেখা দেয ২১ মে-র আগে প্রকাশিত কোনও পত্রিকায ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশিত হতে দেখলে। এমন উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা অনুসন্ধান চালালেই দেখতে পাবেন পত্রিকাটির প্রকাশকাল পরিবর্তনের পরিপূর্ণ সুযোগ জ্যোতিষীদের ছিল।

উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত 'অ্যাসট্রোলজিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করা হযেছিল নির্বাচন চলাকালীন রাজীব গান্ধীর জীবন সংশয অনিবার্য। ম্যাগাজিনটি নাকি প্রকাশিত হযেছিল ১০ মে ১৯৯১-এ। এই খবরটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্রিকাই যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অ্যাসট্রোলজিক্যাল ম্যাগাজিনের জুন সংখ্যায় ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশিত হযেছিল। পত্রিকাটির অ্যাসোসিয়েট এডিটর গাযত্রী দেবী বাসুদেব অবশ্য দাবি করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীটি পত্রিকাটির জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও জুন সংখ্যাটি প্রকাশিত হযেছিল ১০ মে। জুন মাস শুরু হওয়াব ২১ দিন আগেই তাঁরা জুন সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলেন, এমন অদ্ভুত দাবি কী আদৌ গ্রহণযোগ্য? এর পরও কেউ কোনও কূট প্রশ্ন তুললে তাঁকে অনুরোধ জানাব গাযত্রী দেবীকে আমাদেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে অনরোধ করুন। বাস্তব সত্য প্রকাশিত হবে।

প্রতি বছরই পঞ্জিকা এবং ছোট-বড় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায রাষ্ট্রীয রাশিফল প্রকাশিত হয। ফল গণনা করেন কযেক শত জ্যোতিষী। অক্টোবর ৯১-এ উত্তব ভারতে বিশাল এলাকা নিযে ভূমিকম্প হলো। মারা গেল হাজাবের ওপর মানুষ। আহত হলেন হাজাব হাজার। গৃহহীনের সংখ্যা আরো বহুগুণ। কিন্তু ১৯৯১-এর কোনও পঞ্জিকাতেই তো লেখা ছিল না অক্টোবরে উত্তব ভারতে ভযাবহ ভূমিকম্প হওযার কোনও হদিশ। জানি, এব পব কিছু কিছু জ্যোতিষী-নামধারী প্রতারকের আবির্ভাব হবে বিজ্ঞাপনে, যারা জানাবে—উত্তর ভারতের ওই ভূমিকম্প নিযে তাদের নিখুঁত গণনাব 'গুল গপ্পো'।

ভূপালে শোচনীয় গ্যাস দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিলেন। কয়েক লক্ষ মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। অথচ এমন একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার সামান্যতম উল্লেখ ছিল না কোনও জ্যোতিষীদের বিচার করা 'রাষ্ট্রীয় ফল'-এ। আর মজাটা হলো এই, দুর্ঘটনার পর বহু জ্যোতিষীই সাধারণ মানুষদের স্রেফ প্রতারিত করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন কারণ অনুসন্ধানে। আবিষ্কারও করে ফেললেন—কোন্ কোন্ গ্রহ অবস্থানের জন্য এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপর তাঁদের অনেকে এও ঘোষণা করলেন—এই ভূপাল দুর্ঘটনার খবরও নাকি ওই সব জ্যোতিষীদের অজানা ছিল না। জ্যোতিষীরা যদি দুর্ঘটনার খবরটা জ্যোতিষ গণনার দৌলতে আগাম জানতেনই, তবে ভূপালবাসীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী তাঁদের কণ্ঠ থেকে আগে কেন উচ্চারিত হয়নি ? জেনেশুনেও নীরব ছিলেন বলে আজ যে সব জ্যোতিষী দাবী করছেন, তাঁরা স্পষ্টতই হয় নির্ভেজাল মিথ্যাচারি, নতুবা ভূপাল দুর্ঘটনায় নিহত ও পঙ্গু জীবনগুলোর জন্য নীতিগতভাবে পুরোপুরি দায়ী।

একইভাবে জ্যোতিষীরা রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ফল জানাতে গিয়ে জানাতে পারেননি রাশিয়ার চেরনোবাইল পারমাণবিক কেন্দ্রের সাম্প্রতিকতম ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবর, যার ভয়াবহ পরিণতি হিরোশিমা, নাগাসাকির চেয়ে কম ধ্বংসকারী নয়। জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ গণনা করার সত্যিই কোনও ক্ষমতা বাস্তবে থাকলে তাঁরা সে বছরের রাশিয়ার রাশিফল বিচার করতে গিয়ে এত বড় ঘটনার হদিশ পেলেন না কেন ?

হদিশ জ্যোতিষীরা পান। তবে একটু দেরিতে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। তারপর কত না কূট কচকচানি—কোন্ গ্রহ-নক্ষত্রের কেমন কেমন অবস্থানের জন্য এমনটি ঘটল ! আবার কিছু কিছু জ্যোতিষী ঘটনাটির বিষয়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে দাবি করে কিভাবে জনসাধারণকে প্রতারিত করেই চলেছে সে নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

ভাবলে অবাক হতে হয়, এই সব প্রতারকেরা কি নিশ্চিন্তে সমাজের বুকে জাঁকিয়ে বসে প্রতারণা চালিয়েই যাচ্ছে, এবং সরকার (তা সে যতই সংগ্রামী ও প্রগতিবাদী বলে স্বঘোষিতই হোক না কেন) এই বিষয়ে অদ্ভুত রকম উদাসীন ও নীরব থাকছে। কখনও কোনও জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে কোনও রাজ্য সরকার আদালতে প্রতারণার অভিযোগ এনেছে এমন কথা আমাদের জানা নেই। আবার এই সব সরকারের মন্ত্রীরাই যখন প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, তখন এইসব নেতাদের স্বভাবতই মনে হয় সং অথবা শয়তানের দোসর।

এইসব রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই নিজেদের নীরবতার পক্ষে যে অকাট্য যুক্তিটি দেখান

তা হলো—জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জ্যোতিষ-বিশ্বাস মিলেমিশে এমনই একাকার হয়ে গেছে যে, জ্যোতিষীদের আঘাত করতে গেলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের বিশ্বাসকেই আঘাত করতে হয়। আর এমন আঘাত করার অর্থ সাধারণ মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

এমন যুক্তির অবতারণা যাঁরা করে থাকেন তাঁদের সিংহভাগই তথাকথিত মার্কসবাদী। একটি মার্কসবাদী দল পশ্চিমবঙ্গে ব-কলমে একটি বিজ্ঞান সংস্থা চালায়। সেই বিজ্ঞান সংস্থা তো সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে আছে—কোনও জ্যোতিষী বা অবতারদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও বক্তব্য তারা রাখবে না। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কতটা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ভোটার তোষণের জন্য, কতটা নির্বাচনের পিছনে তহবিল ভরিয়ে দেওয়া বেনিয়া বা হুজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে, সে কূট কচকচালিতে না গিয়েও এই সিদ্ধান্তে আমরা অবশ্যই নির্দ্বিধায় পৌঁছতে পারি—এইসব বহুরূপীরা মুখে কুসংস্কার মুক্তির কথা যতই বলুক, বাস্তবে সাধারণ মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে রাখতে চায়। এরা অবশ্যই চায়, সাধারণ মানুষ তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে দায়ি করুক পূর্বজন্মের কর্মফলকে, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

আমাদের দেশে ধর্মবিশ্বাসে চালিত হয়ে নরবলি ছিল, ছিল সতীদাহ প্রথা। এগুলোর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের সময় কিছু মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে নিশ্চয়ই আঘাত করা হয়েছিল। সেই আঘাত হানা যদি যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে থাকে, তবে নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থে, কুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ চেতনার মানুষ গড়ার স্বার্থে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত হানার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই আদৌ ধোপে টেকে না, টিকতে পাবে না। অবশ্য সাধারণ মানুষের চেতনাকে বেশিদূর পর্যন্ত এগোতে দেওয়া বিপদ্‌জনক মনে করে যদি এই যুক্তি হাজির কবা হয়ে থাকে, তবে অন্য কথা, কারণ এই সত্যটা তাঁদের অজানা নয়—

যুক্তি আনে
চেতনা
চেতনা আনে
সমাজ-পরিবর্তন।

দুই

অশিক্ষা, পদে পদে অনিশ্চয়তা এবং পরিবেশ মানুষকে ভাগ্য-নির্ভর করে

অদৃষ্টবাদ যেখানে অশিক্ষা থেকে উঠে আসে

গীতা যে উঠোনে পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন, সেটাকে 'বারো বস্তি এক উঠোন' বললেই বোধহয় ঠিক হয়। গীতার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন একটি মহিলা। গীতার আশে-পাশে আরো জনা দশেক মহিলা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছেন। এঁরাও বারো বস্তিরই বাসিন্দা, এঁদের কয়েকজনের কোলে-কাঁখে হাড়-জিরজিরে পেট-ফোলা শিশু। অপুষ্টি ও অতিমাত্রায় পরিশ্রম হাত ধরাধরি করে মহিলাদের যৌবনকে বরণ করেছে।

"লেখাপড়া শিখে কী করব? চাকরী করতে তো আর আমরা যাব না। ভাগ্যে আমাদের যা লেখা আছে, তা লেখাপড়া শিখে কি খণ্ডাতে পারব?" গীতার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন যে রুগ্ন প্রবীণা মহিলা, তিনিই আমাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন।

ঘটনাটা বছর দু'য়েক আগের। আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের কিছু বস্তিতে। ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করছিলাম এই অঞ্চলের একটি মহিলাগোষ্ঠির মধ্যে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলতে। উদ্দেশ্য ছিল, ওঁদের লেখাপড়া শেখার ও পাশাপাশি কুসংস্কারমুক্ত করার চেষ্টা। আর তখনই অনেকেই এই ধরনের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে। এই মহিলারা রাতের ঘুমকে বাক্সবন্দী করে বউবাজার স্ট্রিট ও তার আশ-পাশের গলিগুলোর পুরুষমানুষগুলোর দিকে নজর রাখেন। বিকেল না হতেই রাস্তাগুলোয় বাড়ি ফেরতা উথাল-পাথাল মানুষের ঢেউ, চলেছে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে। শুধু মানুষ আর মানুষ। রঙ মেখে নিজের শরীরটাকে আকর্ষনীয় করতে যতটা সম্ভব দামী পোশাক পরেন এঁরা। দেখে বোঝার উপায় থাকে না, বাড়িতে এঁরাই পরেন এক টুকরো ত্যানা কাপড়। এঁদের বাড়ির ছেলেরা মা'য়ের দুধ না ছাড়তেই নেমে পড়ে পেট চালাবার যুদ্ধে। এত নিপীড়ন ও বঞ্চনার পরও এঁদের কারও কোনও অভিযোগ দেখিনি সমাজের কারও প্রতি। নিজেরই ভাগ্যফল বলেই সব কিছুকে মেনে নিয়েছেন।

তিন বছর আগের আর একটি ঘটনা। ঘটনাস্থল বিহারের সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রাম। ওই গ্রামে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ। খবর পেয়ে

গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম গ্রামবাসীদের পান করার একমাত্র জল তীব্র দুর্গন্ধে ভরা, রঙ কালচে শ্যাওলা মতন। এমন সর্বনাশা মড়কের খবর আমাদের কাছে পৌঁছলেও সরকারি প্রশাসকের কানে পৌঁছয়নি। টিকিটির দেখা মেলেনি স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদের। তৈরি নরকে একটি করে তাজা মানুষ অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবাদহীনভাবে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। গ্রামের মানুষ রোগীদের দূরের হাসপাতালে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। ধরেই নিয়েছিলেন, ভাগ্যে যাঁদের মৃত্যু লিখেই রেখেছেন 'বোঙ্গা', তাঁকে বাঁচাবার সাধ্য কোনও মানুষেরই নেই।

সুন্দরবনের ভয়ংকর সৌন্দর্য নিয়ে কাব্য করা যতটা সোজা, সুন্দরবনের মানুষগুলোর ভয়ংকর দারিদ্র্যতা ও লাঞ্ছনাভরা জীবন নিয়ে কাব্য করা ততটাই কঠিন। এখানকার মহিলা-পুরুষ মা বাচ্চারা পর্যন্ত কাকভোরেই নদী আর খাঁড়িগুলোতে নেমে পড়ে মাছ ধরতে। দিনান্তে তাই বেচে জোটে একবেলা পান্তার খোরাকি। মাছ ধরতে গিয়ে কখনও কখনও ধরা পড়ে কামটের কামড়ে। ধারাল ক্ষুর দিয়ে কাটার মতই জলের তলায় নিঃসাড়ে পা কেটে নিয়ে যায় হাঙর, স্থানীয় মানুষেরা যাকে বলে কামট। এর পর কেউ কেউ পা হারিয়ে জান বাঁচায়, কেউ কেউ মারা যায় অবিরাম রক্তক্ষরণে। কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রক্ত নেই, তাই কামটের কামড়ের পর মৃত্যুটাই এখানে স্বাভাবিক। যদিও কামটে কামড়ের ঘটনা এখানে আকছারই ঘটছে, কিন্তু তবুও সরকার পরম উদাসীন। আর স্থানীয় মানুষগুলো? না, ওরা কোনও দাবি তোলে না, অভিযোগহীন এই মানুষগুলো ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের জীবন।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সাপে-কাটা রোগীদের ক্ষেত্রে। প্রতি বছরই সাপের কামড়ে মারা যায় এ অঞ্চলের বহু মানুষ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে সাপে- কাটা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ইনজেকশন না থাকায় মানুষগুলো বাধ্য হয়েই শেষ চেষ্টা করতে ওঝা-গুণিনদের স্মরণাপন্ন হয়। বিষাক্ত সাপ ঠিক মত বিষ ঢাললে তাকে বাঁচানর সাধ্য ওঝা, গুণিনের হয় না। রোগী মরে। দারিদ্র্যের নগ্ন লাঞ্ছনায় নুয়ে পড়া মানুষগুলো 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে সবই ভাগ্যের লিখন', ধরে নিয়ে ক্ষোভের পরিবর্তে শোক পালন করে।

হিঙ্গলগঞ্জের মাস্টারমশাই শশাংক মণ্ডল ক্ষোভের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন, "সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণে সরকার যত সচেষ্ট, মানুষ সংরক্ষণে তার এক শতাংশ চিন্তাও সরকারের নেই।"

সত্যিই নেই। বাঘ পুষতে, তাদের সময়মত খাবার জোটাতে কত পরিকল্পনা, কত অফিস, কত কর্মচারী। আর মানুষগুলোর জন্যে? সুন্দরবনের হত-দরিদ্র ক্ষুধার্ত জেলে, মৌলে ও বাউলেরা জঙ্গলে যায় বাঁচতে। এর জন্য বন দপ্তরের পাশ নিতে হয়। কাঠ কাটা ও মধু সংগ্রহের জন্য পাশ। তারপর এরা অনেকেই বাঁচতে পাবে না বাঘের থাবা থেকে। গোসাবা, কাটাখালি গ্রামে এমন একটি পরিবার পাওয়া যাবে না, যে পরিবার থেকে কেউ বাঘের পেটে যায়নি।

বাঘের থাবা থেকে যারা বেঁচে ফেরে তাদের জন্য থাবা মেলে বসে থাকে সুন্দরবনের ডাকাত ও মহাজনরা।

গোসাবার ফতেমা বিবি যৌবনে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন বাঘের থাবার তলায়। সব হারিয়েও ফতেমা বিবির চোখ শশাংক মাস্টারের মতন জ্বলে ওঠে না ক্ষোভে। কপাল চাপড়ে

নিজের ভাগ্যকেই দোষে।

ভয়ংকর দারিদ্র্যে নুয়ে পড়া মানুষগুলো পেটে পান্তা, পরনে ত্যানা আর মাথা গোঁজার মতন একটা অন্ধকারময় ঝুপড়ি পেলেই বর্তে যায়। 'শিক্ষালাভের অধিকার', 'চিকিৎসালাভের অধিকার' কথাগুলো ওদের কাছে অর্থহীন বিলাসিতা মাত্র। বঞ্চনার জন্য ওরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে ওদের চোখ বাঘের মতন ভয়ংকর হয়ে জ্বলে ওঠে না। বঞ্চিত মানুষগুলো প্রতিটি বঞ্চনার জন্য নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে বিলাপ করে, চোখের জল ফেলে।

এইসব বঞ্চিত মানুষগুলো অদৃষ্টবাদী হয়েছে অজ্ঞতা থেকে। সমাজে তাদের অধিকারের সীমা না জানায় আর্থিক পরিবেশ বা আর্থসামাজিক পরিবেশই কিন্তু এই দারিদ্র্য ও সেই কারণে অজ্ঞতার জন্য দায়ী।

অনিশ্চয়তা আনে ভাগ্য নির্ভরতা

ভূপাল ভৌমিক আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত একই ইয়ারে। দীর্ঘদেহী। অসুরের মতন স্বাস্থ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মত দৃষ্টি। কথা বলত চোখে চোখ রেখে, উত্তমকুমারের মতন ভরাট গলায়। কথায় তেজ ছিল। তেজ ছিল পড়াশুনোতেও। কলেজের ইলেকশনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এস. এফ. আই. ও পি. এস. ইউ। আমাদের ক্লাশে এস. এফ. আই-এর প্রার্থী ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী)। পি. এস. ইউ ভূপালকে প্রার্থী করার বহু চেষ্টা করেছিল। ভূপাল কি সব নীতির প্রশ্ন নিয়ে পি. এস. ইউ. নেতা মিহির সেনগুপ্তের সঙ্গে একমত হতে না পেরে দু-দলের বিরোধীতা করে নির্দল প্রার্থী হলো। হেরেছিল, তবে লড়াই দিয়েছিল। ভূপালের স্বপ্ন ছিল অধ্যাপক হবে। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষাতেও ভাল রেজাল্ট করেও ভূপাল ওর স্বপ্নকে স্বার্থক করতে পারল না। ভূপাল ওর চোখের সামনে ওর চেয়ে নিরেস রেজাল্ট করা সহপাঠী ও বন্ধুদের কাজ জুটিয়ে নিতে দেখল। মফস্বল কলেজের অধ্যাপক, মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীর একজিকিউটিভ, সাংবাদিক, নিদেন ব্যাঙ্ক বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কেরানির কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল খুঁটি বা ঘুষের জোরে। ভূপাল একটু একটু করে নিরাশায় ভেঙে পড়ছিল। ও প্রায়ই বলত, "আমার ভাগ্যটাই খারাপ। আমার হবে না। কিছু হবে না।" ভূপাল শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। স্থান হয়েছিল পাগলা গারদে।

আমার এক আত্মীয় বি. কম. পাশ এবং ধারাবাহিকভাবে শেষ সুযোগটি পর্যন্ত চ্যাটার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পরীক্ষায় ফেল। এক মন্ত্রীর কল্যাণে জুট কর্পোরেশনে মোটামুটি ভাল পদে কাজ করেন। তিনি নদীয়ার একটি শহরে যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন সপ্তাহে একটি দিন অফিস যেতেন এবং অ্যাটেনডেন্স খাতায় সারা সপ্তাহের সই করে আসতেন। দেশে যখন তীব্র বেকার সমস্যা, বহু শিক্ষিত বেকার যখন এমপ্লয়মেন্ট কার্ড করে ইন্টারভিউ দিতে দিতে চাকরি পাওয়ার বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছেন, ডুবে যাচ্ছেন হতাশায়, তখন একটা অতি সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে এমন একটি মোটা মাইনের ফাঁকি মারা সুখের চাকরি পেয়ে আমার আত্মীয়টি নিজেকে প্রচণ্ড ভাগ্যবান বলে গর্ব করতেন।

আমাব এক স্নেহভাজন ক্যারাটে, জুডো ও যোগ ব্যায়েমের প্রশিক্ষক হঠাৎ এক মন্ত্রীর কৃপায় সল্ট লেকে একটা প্লট পেয়ে যাওয়ায় ভাবতে শুরু করেছিলেন, ভাগ্যটা ওর খুবই ভাল যাচ্ছে।

এবার আসুন একটু সাহিত্যজগতে বিচবণ করা যাক। অনুমাণ করুন তো, কে সেই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল অসাধারণ সাহিত্যিক যিনি '৭৬ সালে আমেরিকার বালটিমোরে অনুষ্ঠিত ৩য় বিশ্ব কবি সম্মেলনে, '৭৭-এ অস্ট্রেলিযার সিডনিতে ৪২-তম বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলনে, '৭৭-এই ফিলিপাইনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় লেখক সম্মেলনে, '৭৮-এ কোরিয়ার সিওল-এ ৪র্থ বিশ্ব কবি সম্মেলনে এবং '৮১-তে সানফ্রানসিসকোতে ৫ম বিশ্ব কবি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ?

আপনাদের চোখের সামনে নিশ্চযই অনেক নামই ভেসে উঠছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অবুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায, নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায, শক্তি চট্টোপাধ্যায, দিব্যেন্দু পালিত, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায, দেবেশ রায, বিমল কর, নবনীতা দেবসেন ; না, হলো না। আপনাদের অনুমাণ মিলল না। উনি হলেন বিশ্বজয়ী সাহিত্যিক ডঃ সুধীব বেরা। ওঁর নাম শোনেননি মনে হচ্ছে ? তবে ওঁব বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম জানাচ্ছি, 'লগ্ন', 'শাহানা', 'সূর্যরাগ', 'অন্যদিন' ও 'অভিজ্ঞান'। কী ? এইসব কাব্যগ্রন্থগুলোব নাম কোনদিনই শোনেন নি ? দেখেননি ? পড়েন নি ? আমিও শুনিনি, দেখিনি, পড়িনি। ডঃ বেরাব লেখা একটি জ্যোতিষ বিষযক চটি বই 'নস্ট্রাডামের ভবিষ্যৎবাণী'-তে ছাপা সুবিশাল জীবনীপাঠে এসব অমূল্য তথ্য জানতে পেবেছি। আবো জনতে পেবেছি তিনি ছিলেন ১৯৭১ থেকে '৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাব সদস্য এবং '৭৫-এ সুপ্রীম কোর্টে প্রধানমন্ত্রীব নির্বাচনী আপীল মামলায শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম কৌঁশুলি। জানি না বাজনীতির কল্যাণেই সাহিত্যিক হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেযেছিলেন কিনা ? তেমনটি ঘটে থাকলে অবশ্য ভাগ্যে বিশ্বাসী, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী হযে পড়াটাই স্বাভাবিক।

আমাদের মতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে, যেখানে পদে পদে অনিশ্চয়তা, সেখানে মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাসী হবে, দৈবকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।

একদিকে লক্ষ কোটি মানুষ যেমন জীবনযুদ্ধে বার বাব ব্যর্থ হযে অদৃষ্টে বিশ্বাসী হযে পড়ে, অন্যদিকে তেমনই শাসকগোষ্ঠির কৃপায, মামা-দাদার জোবে অথবা যে কোনও প্রকার ঘুষের বিনিমযে, কিংবা অন্য কোনও কূট-কৌশলে যখন কিছু সাধাবণ মানুষ হঠাৎই অর্থে, সম্মানে অসাধাবণ হযে ওঠে, তাবাও একে নিজেদের সৌভাগ্য বলেই মনে কবতে থাকে।

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায বহু ক্ষেত্রেই পুরুষকার অর্থাৎ কর্মপ্রযাস জীবন-সংগ্রামে শুধুমাত্র ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত হয, নৈরাশ্যেব কাছে হয নতজানু। আর সেই সময

পরিবেশগতভাবে প্রাপ্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনযুদ্ধে বঞ্চিত, পর্যুদস্ত মানুষগুলো এর জন্য আমাদের সমাজের অন্যায়, অত্যাচারগুলোর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে সেগুলো 'ভাগ্যেরই মার' বলে গ্রহণ করে সমাজে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করতেই পরোক্ষভাবে মদত জুগিয়েছে।

দৃষ্টি ফেরানো যাক খেলোয়াড়, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ্‌দের দিকে। দেখবেন এদের অনেকেই আন্তরিকতার সঙ্গেই ভাগ্যে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস এসেছে তাঁদের জীবনযুদ্ধের অনিশ্চয়তা থেকে। এঁদের কর্মজীবনের উত্থান-পতনকে এঁরা ভাগ্য বলেই ধরে নেন। বহুদিন রানের মধ্যে না থাকা ব্যাটসম্যান রান পেলে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরছে বলে ধরে নেন। অতি সাধারণ আর্থিক অবস্থা থেকে বা দরিদ্রতম জীবন থেকে যখন কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উত্তরণ ঘটে সুপারস্টারে, তখন বিশাল নাম, বিপুল বৈভবের সুখে ডুবে যেতে যেতে সবকিছুই স্বপ্নের মতন মনে হয়। হঠাৎ পাওয়া যে সুযোগের হাত ধরে এতখানি উঠে আসা (তা সে যত কঠিন কঠোর সংগ্রামের জের হিসেবেই আসুক না কেন) তাকে একটি 'ঘটনা' বলে মেনে না নিয়ে 'ভাগ্য' বলে মানতেই মন চায়।

এ-কালের সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী আজ চূড়ান্ত অদৃষ্টবাদী। যে সংগ্রামী মিঠুন এক সময় নিজেকে মার্কসবাদী বলে সোচ্চারে প্রচার করতেন, পরিচয় দিতেন একজন যুক্তিবাদী হিসেবে, তিনিই সাধারণ থেকে অসাধারণে উত্তরণের কারণ হিসেবে ভাগ্যকে চিহ্নিত করলেন অতি অবহেলে। পেলে থেকে পি. কে., সোবার্স থেকে গাভাস্কার, মাইকেল জ্যাকশন থেকে কুমার শানু, এঁদের প্রত্যেকেরই একটি বিষয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আর তা হলো 'ভাগ্য'। এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ভাগ্য-বিশ্বাস এসেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে। এঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সৌভাগ্যকে ধরে রাখতে কখনও জ্যোতিষীর স্মরণাপন্ন হন, কখনও বা অলৌকিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন একটিবার, আন্তরিকতার সঙ্গে দেখুন—পদে পদে এখানে অনিশ্চয়তা। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি বিভৎস, ভয়ংকর দারিদ্র্যের শিকার। এদের যেদিন পেটে ঢোকাবার মতন কোনও বস্তু জোটে (তা সে কোনও বাড়ির এঁটো-পচা খাবার, শামুক, গুগলি, কাকের মাংস, পান্তা, রুটি, মুরগীর নাড়ি-ভুড়ি যাই হোক না কেন) সেদিন জানে না পরের দিন কী খাবে, খেতে পাবে কি না, অথবা কতদিন পরে আবার খাবার জুটবে?

দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সঙ্গে হাত ধরাধরি আপনি যখন আপনার ছেলেটিকে স্কুলে পাঠান, স্কুল থেকে কলেজে পাঠান. তখন নিশ্চয়ই অনেক সুখ স্বপ্ন থাকে। কলেজের পড়া শেষ হলেই স্বপ্নের ছেলে হারিয়ে যায় কোটি কোটি বেকার ছেলের ভিড়ে। বছর ঘোরে, আরো বেশি বেশি করে তরুণ-তরুণী আপনার ছেলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গী হয়। কবে, চাকরি হবে, আদৌ চাকরি হবে কিনা, এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেখানে বেকারের তুলনায় চাকরিতে নিয়োগের সংখ্যা বিশাল সমুদ্রের তুলনায় এক গণ্ডুস জলের মতনই, সেখানে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষদের জীবনও চরম অনিশ্চিত হতে বাধ্য।

অনিশ্চিত জীবনে মুহূর্তের নিশ্চয়তাকেই অজ্ঞ মানুষ 'ভাগ্য' বলে ভুল করেন। এই অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা সব সময় কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বহু শিক্ষিত বলে স্বীকৃত মানুষও অনিশ্চিত পেশায় বা জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

অর্থনীতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে পদে পদে অনিশ্চযতা বেশি বলেই অদৃষ্টবাদী মানুষের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু যে সব উন্নত দেশে পুরুষকাব বা প্রচেষ্টার দ্বাবা মানুষ তার জীবন ধারণের সাধারণ দাবিগুলোকে মেটাতে সক্ষম, সে সব দেশে অদৃষ্টে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাও কম। এইসব উন্নত দেশের অদৃষ্টবাদীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই খেলোযাড়, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক অনিশ্চিত পেশার মানুষ। বাকি অংশ ভাগ্যবিশ্বাসী হযেছে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশেব প্রভাবে।

পরিবেশ আমাদের জ্যোতিষ-বিশ্বাসী করেছে

শ্রদ্ধেয় মেঘনাথ সাহার বক্তব্য থেকে জানতে পারি, তাঁর সংগৃহীত তথ্য অনুসাবে আমাদের দেশেব শতকরা ৯৯ ভাগ পুরুষ ও ১০০ ভাগ মহিলা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী। ইউরোপে ফলিত জ্যোতিষে আস্থাবান পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৫ জন ও মহিলার সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন।

তারপব অনেক বছর অতীত হযেছে। উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশও প্রভাবিত হযেছে। পরিবেশগত ভাবে সে-সব দেশেব মানুষ আবো বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনিষ্ঠ হযে ওঠার সুযোগ পেযেছে। ফলে অন্ধবিশ্বাসেব কাছে আত্মসমর্পণ কবার মতন মানুষের সংখ্যাও কমার কথা। কিন্তু সব সময সব কিছু সরল নিযমে চলে না। মানুষেব স্বাভাবিক চিন্তা বিভ্রান্ত হয প্যারাসাইকোলজিস্টদেব দ্বারা, বিজ্ঞানেব বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগান কিছু মানুষের দ্বারা। এই বিজ্ঞানবিরোধিতা ঠেকাবার রাস্তাও সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে নিচ্ছে বিজ্ঞানই, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষরাই।

আমাদের দেশেব মানুষদের মধ্যে জ্যোতিষ-বিশ্বাসীর শতকরা আনুমানিক হার নিযে কোনও গবেষণা এখনও পর্যন্ত হযনি। তবে অতি সামান্যভাবে আমাদের সমিতি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গেব ওপব কিছু অনুসন্ধান চালিযেছে। অবশ্য আমাদের অনুসন্ধানগুলোর মতামত সংগ্রহীত হযেছিল আমাদের সমিতি পরিচালিত কুসংস্কার বিরোধী শিক্ষণ-শিবিরে অংশগ্রহণকাবীদেব মধ্যে থেকে।

আমাদেব সমিতির কেন্দ্রীয কার্যালযের তরফ থেকে প্রতি মাসে অন্তত একটি করে কুসংস্কার-বিবোধী শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করা হয গ্রামে-গঞ্জে, আধা-শহবে এবং শহরে। এ-ছাডা সপ্তাহেব সোম, বুধ, শুক্র, কলকাতা অফিসে ক্লাশ চলে। এ ছাড়াও অনেক সময কলকাতা অফিসে বাড়তি শিক্ষণ-শিবিব চালান হযে থাকে। যাঁবা আগ্রহ নিযে শিক্ষণ-শিবিবে

বা ক্লাসে নিজেকে যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী হিসেবে তৈরি করার মানসিকতা নিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সাধারণ মানুষদের চেয়ে যুক্তিতে কিছুটা এগিয়ে থাকবেন, কুসংস্কার থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকবেন—এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত। এমনি আন্দোলনকর্মী হতে এগিয়ে আসা মানুষদের মধ্যে থেকে ৩০০০ জনের কাছে একটি ছাপান মতামত-জ্ঞাপনপত্র হাজির করেছিলাম। একটু জানিয়ে রাখি, এঁদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, ছিলেন অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, সাংস্কৃতিককর্মী, শ্রমিক, কৃষক, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ইত্যাদি। মতামত জ্ঞাপনপত্রের একটি প্রতিলিপি এখানে তুলে দিলাম :

প্রশ্ন পড়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তরে √ চিহ্ন দিতে হবে।

১। ঈশ্বরজাতীয় কারও অস্তিত্ব বাস্তবিকই আছে কী ? হ্যাঁ / না
২। ঈশ্বরজাতীযরা কী কখন কখন মানুষেব ওপর ভর করেন ? হ্যাঁ / না
৩। প্ল্যানচেটের সাহায্যে কী আত্মা আনা সম্ভব ? হ্যাঁ / না
৪। ভূত আছে কী ? হ্যাঁ / না
৫। ভূত কী কখন কখন মানুষের ওপর ভর কবে ? হ্যাঁ / না
৬। আত্মা কী অমর ? হ্যাঁ / না
৭। কাবো পক্ষে কী জাতিস্মর হওযা সম্ভব ? হ্যাঁ / না
৮। তুকতাকের বাস্তব অস্তিত্ব আছে কী ? হ্যাঁ / না
৯। মন্ত্রে কী অলৌকিক কোনও কিছু ঘটান সম্ভব ? হ্যাঁ / না
১০। অতীতের কোনও অবতাবের অলৌকিকক্ষমতা ছিল কী ? হ্যাঁ / না
১১। বর্তমানেব কেউ কেউ কী অলৌকিকক্ষমতার অধিকারী ? হ্যাঁ / না
১২। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে হাত দেখে বা জন্ম ছক দেখে কী কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ? হ্যাঁ / না
১৩। 'ভাগ্য' বলে কিছু আছে কী ? হ্যাঁ / না
১৪। গ্রহ-নক্ষত্রবা কী ভাগ্য নিযন্ত্রণ কবে ? হ্যাঁ / না
১৫। সঠিক গ্রহরত্ন পরলে কী ভাগ্যেব পবিবর্তন ঘটান সম্ভব ? হ্যাঁ / না
১৬। ধাতু, শিকড় বা মাদুলি ধারণ কবে কী ভাগ্য পাল্টান সম্ভব ? হ্যাঁ / না
১৭। তামা কী বাত কমাতে সাহায্য কবে ? হ্যাঁ / না
১৮। বিষ-পাথবে কী সাপের বিষ তোলা যায ? হ্যাঁ / না
১৯। মন্ত্রশক্তিব সাহায্যে সাপেব বিষ কী নামান যায ? হ্যাঁ / না
২০। বাটিচালান, কঞ্চিচালান, নখদর্পণ বা চাল-পডা খাইযে কী চোর ধবা যায ? হ্যাঁ / না
২১। 'টেলিপ্যাথির'র অস্তিত্ব বাস্তবিকই আছে কী ? হ্যাঁ / না

১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বব প্রশ্নগুলো সবাসবি জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত। এই পাঁচটি প্রশ্নেব অন্তত একটিতে 'হ্যাঁ'-এব পক্ষে মত প্রকাশ কবেছিলেন ১৩১২-জন অর্থাৎ শতকবা ৪৩.৭৩ জন। ১৭ নম্বর প্রশ্নটি সবাসরি জ্যোতিশাস্ত্র সংক্রান্ত না হলেও 'শরীরে ধাতুব প্রভাব' বিষযে কী ধাবণা উত্তবদাতা পোষণ কবেন, সেটা বোঝা যায। 'হ্যাঁ'-এব পক্ষে মত প্রকাশ

করেছিলেন ২১৪৫জন। অর্থাৎ শতকরা ৭১.৪৯ জন।

যুক্তিবাদী আন্দোলনে এগিয়ে আসা মানুষদের মধ্যে যদি শতকরা ৪৪জন অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হন এবং শরীরে ধাতুর প্রভাব বিষয়ে শতকরা ৭১জন ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী এবং শরীরে ধাতুর প্রভাব বিষয়ে বিশ্বাসীর সংখ্যা যে এর চেয়ে অনেক বেশি হবে, এবং বিশাল সংখ্যকই হবে, এটুকু আমরা নিশ্চয়ই সাধারণ যুক্তি বুদ্ধিতেই অনুমান করে নিতে পারি।

অবশ্য এটুকু জানান নিশ্চয়ই অমূলক হবে না, শিক্ষণ-শিবির শেষে একই মতামত জ্ঞাপনপত্র আমাদের সমিতি আবারও হাজির করেছিল ওই ৩০০০ ব্যক্তির কাছে। তাতে শতকরা ১০০ ভাগ অংশগ্রহণকারীই ১ থেকে ২১ প্রশ্নের প্রতিটিতেই 'না'-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।

সাধারণের তুলনায় চিন্তায় কিছুটা যুক্তির পক্ষে এগিয়ে থাকা মানুষদের একটা বিশাল অংশই যদি জ্যোতিষশাস্ত্র, ভাগ্য, শরীরে ধাতুর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ভুল ধারণার শিকার হন, তবে সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে ভুল ধারণার বশবর্তীর ব্যাপকতাঅনুমান করতে কোনও কষ্ট হয় না। তবে আমার কথা, স্বাভাবিক মানুষের চিন্তার গতি সর্বদাই যুক্তির পক্ষে, তাই আমরা সংখ্যায় দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে বেড়েই চলেছি। সুযুক্তি, সঠিক যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি বলেই মানুষ কুযুক্তিকেই গ্রহণ করেছে। সঠিক যুক্তি গ্রহণের সুযোগ কম বলেই এমনটা ঘটেছে। আমরা যদি মানুষের সামনে বার-বার সঠিক যুক্তি বেশি করে হাজির করতে থাকি, কুযুক্তির বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ বেরিয়ে আসবেই।

আশার কথা ছেড়ে আবার একটু অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে আশা যাক। আমাদের চালান অনুসন্ধান থেকে দেখেছি বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিজ্ঞানের অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশার অনেক মানুষও অদৃষ্টবাদের পক্ষে কোনও না কোনওভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন। এমনতর বিজ্ঞান-বিরোধী একান্তভাবেই শুধুমাত্র বিশ্বাসনির্ভর অদৃষ্টবাদী চিন্তা ওইসব বিজ্ঞান পেশার মানুষদের কেন প্রভাবিত করল ? ওঁরা তো শিক্ষার সুযোগ লাভে অক্ষম মানুষ নন ? ওঁরা তো অনিশ্চিত পেশার সঙ্গেও যুক্ত নন ? তবে ?

এই তবের একটিই উত্তর—পরিবেশই এইসব বিজ্ঞান পেশার মানুষদের অদৃষ্টবাদী করেছে।

সাধারণভাবে দারিদ্র্যতা, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ার দরুণ অজ্ঞতা এবং অনিশ্চিত জীবনযাত্রার জন্য মূলত দায়ী আমাদের বর্তমান সমাজের প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ আর্থসামাজিক পরিবেশ। অর্থ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে বেড়ে ওঠা উচ্চশিক্ষিত মানুষরা যখন অন্ধ-বিশ্বাস-কুসংস্কারের দাস হয়, তখন এমনতর ঘটনার জন্য অবশ্যই দায়ী ওইসব উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত মানুষদের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, সমাজ-সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব।

মানুষের ওপর পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বা পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা যেহেতু দ্বিতীয় খণ্ডে করা হয়েছে, তাই এইখণ্ডে আবার সেই একই প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিতান্তই প্রয়োজনহীন। তবে তৃতীয় খণ্ডেই যাঁরা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হলেন, তাঁদের বোঝার সুবিধের জন্যে অতি সংক্ষেপে মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা সেরে নিচ্ছি।

মানবজীবনে দোষ-গুণ প্রকাশে পরিবেশের প্রভাব

উন্নততর দেশগুলির মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের ওপব দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন—মানুষেব বংশগত সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পবিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

আমবা যে দু'পাযে ভর দিযে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুব মত জিব দিয়ে গ্রহণ না কবে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ কবি—এ-সবেব কোনটাই জন্মগত নয। এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলো আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিযেছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিযে অবশ্যই জন্মায। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয-বন্ধু, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রতিবেশী, পরিচিত ও আশেপাশেব মানুষরা, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

আপনার আমার পরিবারের কোনও শিশু সভ্যতার আলো না দেখা আন্দামানের আদিবাসী জাড়োয়াদের মধ্যে বেড়ে উঠলে তার আচার-আচরণে, মেধায় জাড়োয়াদেরই গড় প্রতিফলন দেখতে পাব।

আবার একটি জাড়োয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আমাদেব সামাজিক পরিবেশে মানুষ কবলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদের সমাজের আব দশটা ছেলে-মেয়ের গড় বিদ্যে-বুদ্ধি ও মেধার পবিচয দিচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, বিগত বহু বছরের মধ্যে মানুষের শাবীরবৃত্তিব কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হযনি। এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানব শিশুব সঙ্গে বিশ হাজার বছব আগেব ভাষাহীন, কাচামাংসভোজী সমাজের মানব শিশুব মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। সেই আদিম যুগেব শিশুকে এ-যুগের অতি উন্নততব বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজের পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে পারলে ওই আদিম যুগের শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজের গড় মানুষদের মতই বিদ্যে-বুদ্ধির অধিকাবী হতো।

একই সঙ্গে বিজ্ঞান এ-কথাও অবশ্যই স্বীকার কবে, কোনও অনুকূল পরিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠাব সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকান দেশের নিবন্ন, হতদবিদ্র মূর্খ মানুষগুলোও হতে পারত ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাতন্ত্র্যতা নিশ্চযই থাকতো যেমনটি এখনও আছে একই দেশের একই পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের মধ্যে।

কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয যে—বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পবিবেশ

প্রভাবিত। আর তাই মানুষের পরিবর্তে একটি বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদের সামাজিক পরিবেশে মানুষ করলেও এবং আমাদের পরিবারের শিশুর মতই তাকেও লেখাপড়া শেখাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদের সমাজের স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধার অধিকারী করতে পারব না। কারণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জির ভেতর বংশগতির ধারায় বংশানুক্রমিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পরিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্র থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারলাম, এক : মানবগুণ-বিকাশে জিনের প্রভাব বিদ্যমান। দুই : মানুষের জিনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত।

পরিবেশকে আমরা অবশ্যই দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। এক : প্রাকৃতিক পরিবেশ। দুই : সামাজিক পরিবেশ।

সামাজিক পরিবেশকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক : আর্থ-সামাজিক (Socio-economic) এবং দুই : সমাজ-সাংস্কৃতিক (Socio-cultural)।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যতা দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, নদী, সমুদ্র, পাহাড় বা মরুভূমি ইত্যাদির প্রভাব কম-বেশি পড়েই থাকে।

সমুদ্রকূলের মানুষেরা নৌ-চালনা, মাছ-ধরা, মুক্তোর চাষ, সমুদ্র থেকে আহরণ করা নানা জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এইসব সমুদ্র ছেঁকে তুলে আনতে যে শ্রম ও ঝুঁকির মুখোমুখি হয় তাই মানুষগুলোকে সাহসী করে তোলে। পলিতে গড়া জমির কৃষকদের চেয়ে রুখো জমির কৃষকেরা অনেক বেশি পরিশ্রমী। গ্রীষ্মপ্রধান আর্দ্র অঞ্চলের মানুষদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষদের তুলনায় কম। বেঁচে থাকার সংগ্রাম মরু এবং মেরু অঞ্চলের মানুষদের করেছে কঠোর সংগ্রামী। চরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুষদেব বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয়িত হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি ও মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মত সময়টুকু থাকে না।

আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলেব মানুষদের পায়ের তলাতেই গলানো সোনা। আয়াসহীনভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে, ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। ওরা শ্রম কেনে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। ফলে এই অঞ্চলের মানুষগুলো প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগসর্বস্ব হয়ে পড়ে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের অধরাই থেকে যায়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পবিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে। আবার খরা, বন্যা, ভূমিকম্প

ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকব এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েন। অথবা মানসিক কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, আন্ত্রিক ক্ষত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন।

আর্থসামাজিক পরিবেশ

আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নতশীল দেশে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রতিটি পদক্ষেপে যেখানে রয়েছে অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা, শোষণ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অত্যাচার, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী, এটা সমাজবিজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করবেন। এখানে স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে নানা অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে নামতে হয়। মেয়েদের নিজেকে বাঁচাতে, সংসারকে বাঁচাতে ইজ্জত বেচতে হয়। এদেশের বহু মানুষের কাছে বিশুদ্ধ জল পান চরম বিলাসিতা। এ-দেশে এখনও অচ্ছুতবা বর্ণহিন্দুদের কুঁযো ছোঁয়ার দুঃসাহস দেখালে ধড় থেকে মাথা যায় কাটা। হরিজন নারীকে জীবনসঙ্গিনী করার অপরাধে বর্ণহিন্দুব চাকরি যায়, বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওযা হয। রাজনীতিকের জাদুকাঠির ছোঁযা না পেলে ঋণ-মেলায় ঋণ মেলে না, সরকারী চাকরি অধরাই থেকে যায়। চাকরির সুযোগ সীমিত, বেকার অসীম। ফলে কাজ পেতে খুঁটি ধরাই সেরা যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। তবুও এরপরও চাকরি পাওয়া ছেলেটি ও তাদের পরিবারেব সকলেই মনে করে— কাজ পাওয়াটাই বিশাল ভাগ্য, মানতের ফল, অবতারের আশীর্বাদের কেরামতি, গ্রহরত্নেব ভেল্কি।

যে দেশের পঙ্গু অর্থনীতি গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দিতে পাবে না, সে দেশের গ্রামবাসীবা রোগ ও মৃত্যুকে অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিক—এটাই চাইবে রাষ্ট্রক্ষমতা, সরকার। আর তেমনটাই মেনে নিচ্ছে অসহায় গ্রামের মানুষরা। গরীব ঘবেব মানুষদের বিনে মাইনের স্কুলে সন্তান পড়াবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয না। ঘরের ছেলে কাজে না গিয়ে স্কুলে গেলে রোজগার করবে কে? শিশু-শ্রমের ওপরও প্রায় সমস্ত দরিদ্র পরিবারকেই কিছুটা নির্ভর করতে হয়। আবার পাশাপাশি এও সত্য—আব্রু রক্ষা করে স্কুলে যাওযার মত সাধারণ পোশাকটুকুও অনেকের জোটে না। পড়াশুনো ও বাইরের খববা-খবর রাখতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ যেহেতু দরিদ্রদেব ক্ষেত্রে খুবই কম, তাই শুধুমাত্র এই আর্থ-সামাজিক কারণেই দরিদ্র গ্রামবাসী ও শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে মেধা, বুদ্ধি, মননশীলতা খুবই কম। গ্রামের কিশোরীদের চেযে শহরের গরীব কিশোরীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটা ঘর নামক নরকে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরেব সূর্যের প্রতিক্ষা করতে হয। ফলে অনেক সময এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিযাকলাপ দেখে কৈশোবেই যৌন আবেগ দ্বারা চালিত হয। আবার অনেক সময ইচ্ছে না থাকলেও আর্থিক নিরাপত্তা, জীবন ধারণের নিবাপত্তার জন্য পাড়ার মস্তান, কাজে নিয়োগকারী বা আত্মীযদেব লালসাব শিকার হতে হয়। কৈশোরে পা দিযেই অনেককে বেঁচে থাকার জন্যই যোগ দিতে হয নানা অবৈধ কাজে। এইসব পিছিযে পড়া মানুষগুলো এমনতর জীবনযাত্রা ইচ্ছে করে

বেছে নেযনি, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই তাদের এমনতর জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

আর্থসামাজিক পরিবেশ যে সাধারণ মানুষকে কী বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা মুখ খুলতে চাননি। যখন খুলেছেন, তখন মানবজীবনে আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে লঘু করে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রাষ্ট্র ও শোষকশ্রেণী দ্বারা সম্মানীত এইসব মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থেই চান না, অথবা সরকার ও শোষকশ্রেণীকে তুষ্ট করার স্বার্থেই চান না, বঞ্চিত মানুষগুলো তাদের বঞ্চনার কারণ হিসেবে আর্থসামাজিক পরিবেশ, রাষ্ট্র কাঠামোকেই দাযী করুক।

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ

প্রতিটি সমাজ ও তার সংস্কৃতি জন্ম থেকেই শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবেই মানবিক আচার-আচরণ, মানবিক হৃদযবৃত্তি বিকশিত হতে থাকে। শিশুকে হাঁটতে শেখান হয, শিশু হাঁটতে দেখে, তাই হাঁটে। শিশু কি ভাবে হাতকে ব্যবহাব করে খাদ্য গ্রহণ করবে, কি ভাষায কথা বলবে, সবই নির্ভর করে মা-বাবা ও তার আশেপাশের আপনজনদের উপর। শিশু যদি কোন কারণে মানবসমাজে প্রতিপালিত না হযে পশুসমাজে বেড়ে ওঠে, তাহলে দেখা যাবে সে পশুর মতই হামা দিয়ে হাঁটবে। হাতকে ব্যবহার না করে পাত্র থেকে সরাসরি মুখ দিযে খাদ্য গ্রহণ করবে। জলপানের জন্য জিবকে কাজে লাগাবে।

শিশু বযসে বা কৈশোরে মানুষ তার মা-বাবার ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয। মা-বাবার ধর্মীয বিশ্বাস, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠিপ্রীতি, শ্রেণী-চেতনা, প্রাদেশিকতা, যুক্তিবাদী চেতনা, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সাহিত্য-প্রীতি, সংগীত-প্রীতি, অঙ্কন-প্রীতি, অভিনয প্রীতি, দযা, নিষ্ঠুরতা, ঘরকুনো মানসিকতা, সমাজসেবায আগ্রহ, নেশা-প্রীতি, অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ, ভীরুতা, সাহসিকতা, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিযতা, বাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজ সচেতনতা, মিথ্যে বলাব প্রবণতা ইত্যাদি সন্তানকে প্রভাবিত করে।

শিশু বড় হতে থাকে। পাঠাভ্যাস গড়ে উঠলে বিদ্যালযের শিক্ষক, সহপাঠীদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, ভাললাগা না লাগা প্রভাবিত করতে থাকে। বেড়ে ওঠা শিশুটিব ওপর অনবরত প্রভাব ফেলতে থাকে পরিবাবের লোকজন, আত্মীযস্বজন, প্রতিবেশি, বন্ধু, পাঠ্য-বই, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, সিনেমা, যাত্রা, থিযেটার, ক্লাব, ধর্মীয প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। কিশোর বযেসে সে তার ঘনিষ্ঠ মানুষজনের চোখ ও কান দিযে দেখে ও শোনে। তাব পরিচিত গোষ্ঠির মূল্যবোধের সঙ্গে জাতীয স্বার্থের সংঘাত হলে সে নিজের গোষ্ঠিস্বার্থে জাতীয স্বার্থেব বিরোধীতা করতে পারে। ধর্মীয উন্মত্ততা, জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতা, অতীন্দ্রযতার প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরজাতীয কোনও কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে

বিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস, ভূত নামক কোনও কিছুর অদ্ভুত সব কাজকর্মের প্রতি বিশ্বাস, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস ইত্যাদি প্রধানত গড়ে ওঠে আশেপাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে, পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে।

শিশুকাল থেকে আমরণ আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি ; ফলে আমরা সাধারণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে পড়ি।

আমাদের খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, শিক্ষা-চেতনার স্ফুরণ, রাজনৈতিক মতবাদ—কোনও কিছুই শূন্য থেকে আসে না। এর প্রত্যেকটি গড়ে ওঠে সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলেই।

এ-যুগের অনেকেই প্রথাগত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। এদের অনেকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি করেছেন, ডক্টরেট নামক ডিগ্রি পেয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, চিকিৎসক পেশায় সফল হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী নামে প্রচারিত হচ্ছেন, সফল বিভিন্ন শাখার ইঞ্জিনিয়াররা, প্রযুক্তিবিদরাও বিজ্ঞানী বলে পরিচিত হচ্ছেন। এরা অনেকেই বিজ্ঞানের কোনও বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেননি, পারেননি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে—পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পরই কোনও মনতে গ্রহণ বা বর্জন করতে। এঁরা আমাদের সমাজের আপনার আমারই বাড়ির ছেলে। শিশুকালে হাতেখড়ি হয়েছে সরস্বতীকে আরাধণা করে। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের দেখেছে ঈশ্বরজাতীয় কারো কাছে পরম ভক্তিতে আভূমি নত হতে। পড়ার বইয়ে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে নানা পুরাণের গপ্পের মধ্যে কাল্পনিক অলৌকিক কাহিনী। দেখেছে জ্যোতিষ-কোষ্ঠি-হাতের রেখার প্রতি পরিচিত মানুষদের পরম বিশ্বাস। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে ঈশ্বর, আল্লা ও পরম পিতার প্রতি প্রার্থনা। এমনি আরো বহুতর অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে বেড়ে ওঠার সূত্রে বিশ্বাস করেছে বহু অলীকে। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো হওয়ার সুবাদে আপনি আমি ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ছেলের পেশাগত সুবিধার কথা ভেবে তাকে বিজ্ঞান শাখায় পড়তে উৎসাহিত করেছি। সন্তান আমাদের বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করেছে। পড়াশুনায় সফল হয়ে বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে গ্রহণও করেছে ; যেমনভাবে পেশাহিসেবে কেউ গ্রহণ করে আলু-পটলের ব্যবসাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তারা কখনই নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেনি। আর্থ-সামাজিক পরিবেশই এমন সব অনেক বড় বড় বিজ্ঞান পেশার কিন্তু বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী মানুষ বা অমানুষ তৈরি করেছে। 'অমানুষ' কথাটা একটু কড়া হলেও সুচিন্তিতভাবেই লিখতে হলো। যে নিজেকে বিজ্ঞানীর পূজারী বলে জাহির করে এবং একই সঙ্গে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ পরিত্যাগ করে অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, তাকে 'অমানুষ' নিশ্চয়ই বলা চলে। কারণ তার গায়ে 'বিজ্ঞানী' তকমা আঁটা থাকায় তার ব্যক্তি-বিশ্বাস সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা নেয়, মানুষের প্রগতির পক্ষে, বিকাশের পক্ষে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জনগণ স্বভাবতই যা ভাবে তা হলো এতো বড় বিজ্ঞানী কি আর ভুল কথা বলছেন ?

ঠিক এই সময় ভ্রান্ত চিন্তার পরিমণ্ডল থেকে সাধারণ মানুষদের বের করে আনতেই

প্রয়োজন নতুন বলিষ্ঠ যুক্তিযুক্ত চিন্তার পরিমন্ডল সৃষ্টি করা। এই সময়ই প্রয়োজন বিভ্রান্তিকর কুযুক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সুযুক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। মানুষ সাধারণভাবে যুক্তির দিকেই ধাবিত হয়। সুযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হলে কুযুক্তি তারা বর্জন করবেই। দীর্ঘদিনের প্রচলিত বহু ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণাকেই বর্তমান শোষক ও শাসকশ্রেণী বজায় রাখতে সচেতন।

যে ভ্রান্ত চিন্তা প্রতিটি বঞ্চনার জন্য অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, সে ভ্রান্ত চিন্তা মানুষের মধ্যে থাকলে লাভ তো বঞ্চনাকারীদেরই।

তাই তো বঞ্চনাকারী শোষক ও তাদের তল্পিবাহক রাষ্ট্রক্ষমতা মুখে যত লক্ষবারই সাধারণ মানুষদের কুসংস্কার মুক্ত করার আহ্বান জানাক না কেন, কাজে বঞ্চিত মানুষদের কুসংস্কারে আবদ্ধ রাখতেই চাইবে। তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রচারের সাহায্যে সব সময়ই জনসাধারণের মগজ ধোলাই করে ভ্রান্ত চিন্তার পরিমন্ডল গড়ে তোলার চেষ্টা কর চলেছে, চলবেও।

কুসংস্কার-মুক্তির আন্দোলনের চরম সাফল্য কখনই সরকারী সহযোগিতায় আসবে না। আসবে শোষক-শ্রেণীর অর্থে নির্বাচনে জিতে গদিতে বসা, শোষক শেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সরকারের তীব্র প্রতিরোধ ও বিরোধীতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে। আর এরই জন্য চাই যুক্তিবাদী পরিমন্ডলকে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত করা। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা।

পারিপার্শ্বিক মানুষজনের প্রভাবে আমাদের দেশের শিশু যখন যুবক ও পৌঢ়ত্বে পা রাখে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসগুলো একইভাবে অনড় থাকে, যদিও এঁদের কেউ কেউ ব্যবহারিক জীবনে বা পেশাগতভাবে 'বিজ্ঞানী', 'বুদ্ধিজীবী', ইত্যাদি বিশেষণে পরিচিত হতে থাকেন। তাই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও বিজ্ঞান-পেশার মানুষদের মধ্যেও দেখা যায় যুক্তির শিথিলতা অথবা যুক্তিহীনতা। এঁদের মধ্যে একই সঙ্গে অবস্থান করে পড়ার বইয়ের কিছু কিছু জ্ঞান ও আশৈশব গড়ে ওঠা অন্ধবিশ্বাস। এঁদের অনেকেরই আঙুলে, গলায়, বাজুতে, শোভা পায় গ্রহরত্ন, ধাতুর বালা বা আংটি, শিকড় বা তাবিজ কবচ। ধারণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে এঁদের অনেকেই লজ্জায় স্বীকার করতে চান না—ভাগ্য ফেরাতে পরেছেন। জেল্লা বজায় রাখতে সকলেই হাত বাড়ায় অজুহাতের 'ব্রাসো'র দিকে। এঁরা নিজেদের 'প্রেজেন্ট' করেন বিদ্যাসাগরের সুবোধ বালক হিসেবে—'যাহা দেয়, তাহাই পরে'। এ-সব হাবি-জাবি জিনিস পরতে এঁদের নাকি অনুরোধ জানিয়েছিলেন মাতা, মাতামহী, পিতা, পিতমহ, আত্মীয়, বন্ধু, প্রেমিক, পত্নী ইত্যাদিরা। আর স্রেফ ওদের দুঃখ দিতে না চাওযার জন্যই পরা। এঁরা এতই কোমলহৃদয় প্রাণী যে ভয় হয়, কেউ জুতোর মালা পরাতে চাইলে প্রার্থীর হৃদয় রাখতে টপ্ করে না জুতোর মালাই গলায় গলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ আবার এই যুক্তিই দেন—"বলল, তাই পরে ফেললাম। দেখিই না, যদি কাজ হয় ভাল, না হলেও ক্ষতি তো নেই।" এই স্বচ্ছতাহীন দ্বিধাগ্রস্ত মানুষগুলো এটা বোঝে না যে, এতেও ক্ষতি হয়। প্রথমেই অর্থ ক্ষতি তো অবশ্যই। তারপর যে ক্ষতি তা সমাজের ক্ষতি। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই এই দ্বিধাগ্রস্ততা, অস্বচ্ছতা যা অদৃষ্টবাদকে সমর্থনেরই নামান্তর, তা প্রভাবিত করবে তাঁরই পরিবারের শিশুটিকে, আশেপাশের মানুষজনকে।

তিন

জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের বিরোধের কথাটা কম বেশি অনেকেরই জানা। আবার জ্যোতিষীদের লাগাতার প্রচারে অনেকে এ-ও ভাবেন জ্যোতিষ-শাস্ত্র খাঁটি বিজ্ঞান।

হাতের রেখা দেখে, কোষ্ঠি বিচার করে, কপাল দেখে কিম্বা কান দেখে অথবা অলৌকিক কোনও উপায়ে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে থাকেন জ্যোতিষীরা। তাঁদের এমনটা বলতে পারার পেছনে যে দুটি কারণ ক্রিয়াশীল বলে জ্যোতিষীরা দাবি করেন সে দুটি হলো—এক ঃ মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত। জন্ম মুহূর্ত থেকে প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কি ভাবে অতিবাহিত হবে সবই আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। এই ঠিক হয়ে থাকাটা অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘ্য। এই যে আজ এই মুহূর্তে আপনি আমার লেখার এই অংশটাই পড়ছেন, এটা আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে বলেই পড়ছেন, পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। দুই ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র এমনই একটি শাস্ত্র, যে শাস্ত্রের সূত্রাবলির সাহায্যে বিচার করে একজন মানুষের নির্ধারিত ভাগ্যকে জানতে পারা যায়। আর এই জানার ভিত্তিতেই একজন জ্যোতিষী একজন মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই বলতে পারেন।

এ তো গেল জ্যোতিষীদের দাবির কথা। কিন্তু কেউ কোনও কিছু দাবি করলেই যদি মেনে নিতে হয়, তবে তো দারুণ গণ্ডোগোল বেধে যাবে। সত্যবাবু দাবি করলেন বিপ্লববাবুকে হাজার টাকা ধার দিয়েছেন একটি বছর আগে। ফেরৎ দেবার কথা ছিল একটি মাসের মাথায়, অথচ বারো মাসেও ফেরৎ দেবার নামটি নেই। বিপ্লববাবু দাবি করলেন, সত্যবাবু বেজায় অসত্য ভাষণে পটু। এক পয়সাও ধার নেননি কোনও দিনই। অতএব ফেরৎ দেবার প্রশ্নই আসে না। দু'জনের দাবিই সত্যি বলে মানতে হলে তো গোলমালের চূড়ান্ত।

কিছু কিছু জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ সমর্থক এক ধরনের যুক্তির অবতারণা করেন—"জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান নয়, এই কথাটা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারবে?"

কিন্তু এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে অনেক অস্তিত্বহীনের অস্তিত্বই প্রমাণ করা যায়।

ধরুন, আমি হঠাৎ দাবি করে বসলাম, "রাত ঠিক বারোটায় আমার হাত দুটো মাঝে মধ্যে ডানা হয়ে যায়। তবে ঠিক কবে যে হবে, তা বলা যায় না। যতবারই হাত দুটো ডানা হয়েছে, দেখছি ঠিক একটা তিরিশ হলেই ডানা দুটো আবার হাত হয়ে গেছে।"

আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করলে আমি একইভাবে আপনাকে যদি বলি, "আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে আমার হাত দুটো ডানা হয় না?" আপনি আমার দাবির বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই হাজির করতে পারছেন না। ধরুন আপনি আমার দাবি পরীক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচী নিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাত একটা থেকে দেড়টা আমাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। আমি সে সহযোগিতা করতেও লাগলাম। উলুবেড়িয়া থেকে হনুলুলু সর্বত্র আপনাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলাম। আপনি আমার হাত ডানা হতে দেখলেন না। মাঝে-মধ্যে আমার দাবি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতেও পারেন। কিন্তু সেই সংশয় দ্বারা কখনই প্রমাণ হয় না যে, মাঝে-মধ্যে আমার হাত ডানা হয় না। যে কয় বছর আপনি আমাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন, তার মধ্যে আমার হাত ডানা হয়নি বলে প্রমাণ হয় না আমার হাত ডানা হয় না, এবং ভবিষ্যতেও হবে না। যেহেতু আপনি এবং আমি মরণশীল, তাই এক সময় আমাদের মরতেও হবে। ধরুন আমাদের দু'জনের মধ্যে আমিই আগে মরলাম। তাতেও কিন্তু আপনি আমার দাবির বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই হাজির করতে পারবেন না। কারণ তখনও তূণে একটি মোক্ষম যুক্তি থেকেই যাচ্ছে, আরোও দীর্ঘ সময় বাঁচলে নিশ্চয়ই এক সময় হাত ডানা হোত। ডানা যে হোত না—এ আপনি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না, কারণ আমি তো তখন মৃত। আর, আপনি যদি আগে মারা যান তবে তো আমি বলার সুযোগ পেয়েই যাব, "আমার দাবির অসারতা প্রমাণ করতে না পারার ব্যর্থতা নিয়েই আপনি মারা গেছেন।"

কথা হচ্ছে, এই যে আপনি আমার দাবিকে মিথ্যে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলেন, এর দ্বারা কী এই প্রমাণিত হলো যে, আমার দাবি সঠিক? এই একইভাবে অনেক কিছুই প্রমাণ করা যায়—আমার শরীরটা মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায় 'দ্য ইনভিজিবল্ ম্যান'-এর মত। হঠাৎ হঠাৎ কোনও এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আমার দৃষ্টিশক্তি ধ্বংসাত্মক লেজার রশ্মির ভূমিকা নেয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলো হয়ে যাই। তখন মহাশূণ্যে বিচরণ করতে ভালবাসি। আমার হাতের ছোঁয়ায় কখন যে অন্ধ ফিরে পায় দৃষ্টি, মৃত ফিরে পায় প্রাণ, তার হদিশ আমার নিজেরই অজানা। এমন শ'য়ে শ'য়ে দাবি আমি করতে পারি যার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই আমি যদি বুক ঠুকে বলি, "আমার যে এ-সব ক্ষমতা নেই, প্রমাণ করতে পারবেন?" তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আপনি ব্যর্থ হবেন।

এতক্ষণে বোধহয় প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকারাই ধরতে পারবেন এই ধরনের [illegible] প্রমাণের ক্ষেত্রে যুক্তির গলদটা কোথায়। এ ক্ষেত্রে দাবিদারকেই তার দাবির সমর্থনে প্রমাণ হাজির করতে হবে, যদি সে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে লোক ঠকানোর চেষ্টা না করে সত্যিকারেই তার দাবিকে যুক্তিগতভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে চায়। যতক্ষণ দাবিদার তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে না পারছে, ততক্ষণ আমরা সেই দাবি মানতে বাধ্য নই।

এবার জ্যোতিষীদেরই দাবিগুলো প্রমাণ করা—কি কি [illegible]

[illegible]

তারপর দাবি প্রমাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্যোতিষীদের কি করণীয় সে বিষয়ে বহু বছর আগেই পথ-নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

"একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিময়টা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহা স্পষ্টভাষায় বলিতে হইবে। কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তারপর হাজারখানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে ; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে। শিশুদের নাম-ধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চাই, যেন যাহার ইচ্ছা, সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকাল সম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। গণনার নিয়ম পূর্ব হইতে বলা থাকিলে যে-কোন ব্যক্তি গণনা করিয়া কোষ্ঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যতদূর জানি, এই গণনায় পাটীগণিতের অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে ; যতটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয়শ মিলিয়া যায়, মনে করিতে হইবে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে ; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে করিতে হইবে তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে।"

যুক্তিবাদীরা, বিজ্ঞানমনস্করা কোনও কিছুতেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিয়ে অচল অনড় হয়ে বসে নেই। তাঁরা প্রমাণ পাওয়ার ভিত্তিতেই কোনও কিছুকে গ্রহণ করে থাকেন।

সাধারণ মানুষ যত সহজে কোনও একটি ঘটনা বিশ্বাস করে ফেলেন, যুক্তিবাদীরা, বিজ্ঞানমস্করা তত সহজে বিশ্বাস করতে চান না। ঘটনাটিকে গ্রহণ করার আগে নানা ধরনের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান চালান। তারপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়ার পর ঘটানাটিকে বিশ্বাস করেন, সত্য বলে গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ মনে করে শ্রদ্ধেয়জন, বয়স্কমানুষদের কথায় অবিশ্বাস করাটা নিতান্তই অনুচিত ও অসামাজিক কাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মানুষদের মধ্যে, যুক্তিনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে, এই সামাজিক বোধ, সৌজন্যতা বোধ নেই। কারণ তাঁরা জানেন, যাঁরা মিথ্যাভাষণে পটু, অথবা যাঁরা মাঝে-মধ্যে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে ভালবাসেন, যাঁরা পরের কাছে শোনা ঘটনাতে বিশ্বাস স্থাপন করে অপরের কাছে ঘটনাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করেন, তাঁরাও কারো না কারো মা-বাবা, আত্মীয়, পড়শি বা শিক্ষক।

সব কিছুতেই প্রশ্ন তোলা, সংশয় প্রকাশ করা যুক্তিবাদীদের, বিজ্ঞানমনস্কদের বড় গুণ

বা দোষ, যাই বলুন। তবে তাঁদের এই সংশয়যুক্ত মানসিকতা শুধুমাত্র অন্যের প্রতিই নয়; তাঁদের নিজেদের ওপরেও। তাঁরা আপন ইন্দ্রিয়কেও পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন না। কারণ জানেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই বাস্তব সত্য নয়, ইন্দ্রিয়ও প্রতারিত হয়। তাই অনেক সময় বহুভাবে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের পরই কোনও কিছুকে তাঁরা গ্রহণ বা বর্জন করে থাকেন। তাঁরা আপন বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। জানেন, যে বিষয়ের ব্যাখ্যা তাঁর বুদ্ধির অগম্য তার ব্যাখ্যা অন্যের কাজে গম্য হতেই পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে হলে দাবিদার জ্যোতিষীদের প্রথম পদক্ষেপই হওয়া উচিত, বৈজ্ঞানিকদের জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে সংশয় কাটিয়ে তোলা। এই সংশয় ও প্রশ্নের মীমাংসা যেখানে প্রমাণ হাজির করলে অতি সহজেই হয়ে যায়, সেখানে জ্যোতিষীরা প্রমাণ হাজির না করে নানা কূটকচকচালি, তত্ত্বকথা, নীতিকথা শোনাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন, এবং যাঁরা প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু মেনে নিতে নারাজ তাঁদের গাল পাড়েন। এ-সবই জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার দাবিদারদের অতি দুর্বলতারই পরিচয়। বাস্তবে জ্যোতিষশাস্ত্র আরামভোগী, অন্নচিন্তাহীন, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া একদল পণ্ডিত নামক প্রতারকদের করে খাওয়ার শাস্ত্র।

এর পরও কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, "জ্যোতিষ যখন শাস্ত্র, তখন তার কোনও একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। না হলে এই শাস্ত্রটা টিকে আছে কী করে? আর এইসব শাস্ত্র এলোই বা কোথা থেকে?"

এমন প্রশ্ন জ্যোতিষী অ-জ্যোতিষী অনেকেই তোলেন, ১৯৮৭ সালের জুনে 'বর্তিকা' পত্রিকায় মহাশ্বেতা দেবী এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। আজই এই একই প্রশ্ন নিয়ে একটা চিঠি পেয়েছি, পত্রদাতা উত্তর চব্বিশ পরগণার সোদপুর শহরের পূর্বপল্লীর উজ্জ্বলকুমার চক্রবর্তী। এই দুই সময়ের ব্যবধানে বহুর কাছ থেকে এই একই প্রশ্ন এসেছে।

"শাস্ত্র যখন, তার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে"—এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে জানাই চারিটি বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থ নিয়ে যে বিশাল বৈদিক শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাতে সাহিত্য, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি থাকলেও এরই সঙ্গে রয়েছে দেবতার উদ্দেশ্যে নানা স্তোত্র ও প্রার্থনা। স্তোত্র ও প্রার্থনাগুলিতে নিবেদিত হয়েছে যে আকুতি তা হলো—আমাদের পর্যাপ্ত বৃষ্টি দাও, আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলো সমৃদ্ধ কর, গাভীগুলোকে সুদগ্ধবতী কর, ব্যাধিমুক্ত কর, শত্রু বধ কর...বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে এইসব প্রার্থনায় চাওয়া হয়েছে কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষের বিভিন্ন কাম্যবস্তু। সেই সময়ের সমাজে বিজ্ঞানের মুঠোয় সবকিছুই ছিল প্রায় অধরা। তাই মানুষ ঈশ্বর ও অদৃষ্টের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করে বাঁচতে চেয়েছে।

এই বৈদিক শাস্ত্রের 'অথর্ব'বেদে রয়েছে নানা তুকতাক, বশীকরণ, মারণ-উচাটন ইত্যাদি নানা মন্ত্র-তন্ত্র। আছে বৈরনাশ মন্ত্র। আছে এমন অব্যর্থ মন্ত্রের হদিশ যাতে গৃহবন্ধ করা যায়। ফলে ঘরে চুরি হবে না। বিপদ আপদ থাকবে দূরে। গ্রামবন্ধ করার মন্ত্রও আছে অথর্ব বেদে। যাঁরা বেদকে অভ্রান্ত মেনে শাস্ত্র মাত্রেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে প্যান, তাঁরা গৃহবন্ধের মন্ত্র পড়ে ঘরের গারদহীন জানালা খোলা রেখে, দরজা উন্মুক্ত করে রাত-দিনের স্বাভাবিক কাজকর্মকে বজায় রেখে কিছুদিন পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, চোররা মন্ত্রের জোরে

বাস্তবিকই আপনার আসবাবপত্র ও রত্নালঙ্কার স্পর্শহীন রেখেছে কিনা। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন শহরে-গ্রামে এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে সফলতা পেলে আমরা গৃহবন্ধী মন্ত্রের কার্যকারিতা বিষযে সন্দেহমুক্ত হতে পারি। এবং এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা প্রমাণের ভিত্তিতে 'গ্রামবন্ধ', 'শহর বন্ধ' ইত্যাদি মন্ত্রও কার্যকর হবে, এই প্রত্যাশা নিযে আমাদের দেশের গ্রাম, শহর ইত্যাদিকে মন্ত্রে বাঁধতে বাঁধতে বেঁধে ফেলতে পারি গোটা দেশটাকেই। ফলে পুলিশ ও প্রশাসন নামক মাথাভারি বিশাল দপ্তর ট্যাক্সের টাকায় পোষার হাত থেকে আমাদেব দেশের ট্যাক্সদানকারীরা বেঁচে যান।

আমরা আরো একটি জরুরি বিষয়ে এই শাস্ত্রকে কাজে লাগাতে পারি। সেটা হলো যুদ্ধ। প্রতি বছর বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যায না করে, যুদ্ধ লাগলে আমরা মারণ-উচাটন মন্ত্রের সাহায্যে বিরুদ্ধ দেশের রাষ্ট্রনায়ক, সেনানাযকদের পটাপট মেরে ফেলতে পারলে আর পায কে।

এরপর আমরা ডাক্তারি পড়ার কলেজগুলো এবং হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিতে পারি, যদি দেখি শাস্ত্রকে বিজ্ঞান প্রমাণ কবে মন্ত্রে রোগমুক্তি ঘটান যাচ্ছে।

আমাদের দেশে এখনও বহু বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্বাসী পণ্ডিত প্রচারক ও ধর্মীয প্রতিষ্ঠান আছেন। ওইসব পণ্ডিত বৈদ্বিকরা বৈদিক শাস্ত্রকে বিজ্ঞান, বেদকে অভ্রান্ত বলে বাণী ছড়াতে তৎপর হলেও নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে কখনই ওইসব শাস্ত্রের কথাকে প্রযোগ করার মত চূড়ান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয দেননি।

এর পরেও কিছু জ্যোতিষী প্রশ্ন তোলেন, "হ্যাঁ মানছি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে এখনও প্রমাণ কবা যাযনি, কিন্তু ভবিষ্যতে যে যাবে না, সে কথা কী বুক ঠুকে বলতে পারেন ? বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার যে প্রতিনিযত প্রমাণিত সত্য হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, স্বীকৃতি লাভের পূর্ব মুহূর্তে সেগুলো স্বীকৃত সত্য ছিল না। তবে ?"

এই ধরনের যুক্তির সাহায্যেও কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণিত হলো না। কারণ এই একই যুক্তিতে কোনও যোগবলে গবেষক অথবা ভূত-গবেষক কিন্তু দাবি করে বসতেই পাবেন, "আজকে যা গবেষণার পর্যায়ে রযেছে, আগামী দিনে সেটা যে বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে না, কে বলতে পারে ?" আর ইতিমধ্যে এই ধরনের দাবি করা শুরুও হযে গেছে। এটা আর নিছক হাল্কা-হাসির রসিকতার পর্যাযে নেই। জাদুকর পি. সি. সবকার (জুনিযার) দাবি করেছেন, "আজকে যেটাকে ভৌতিক ভাবছি, আগামী দিনে সেটা হযত পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পবিচিত হবে।"

যখন পবিচিত হবে, হবে। তার জন্য প্রমাণ হাজির না করেই এত লম্ফ-ঝম্ফের কি প্রয়োজন ? বৈজ্ঞানিক-মনস্করা যুক্তিবাদীরা খোলা মনের মানুষ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে ঈশ্বর মেনে নেবে ; জাতিস্মরের অস্তিত্ব প্রামাণিত হলে মেনে নেবে পূর্বজন্ম ; অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ প্রমাণিত হলে মেনে নেবে অলৌকিকত্ব ; জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণিত হলে জ্যোতিষশাস্ত্রকেও স্বীকৃতি জানাবে। বর্তমানে এর কোনটিই যেহেতু প্রমাণিত হয়নি, তাই মেনে নিতে আপত্তি আছে।

এখানেই যে "বিশ্বাসে মিলায বস্তু, তর্কে বহু দূর" কথায় শ্রদ্ধাশীলেরা চুপ করে যাবেন, এমনটি প্রত্যাশা করি না। এবপরও তাঁরা তর্ক চালাতে প্রশ্ন করতেই পারেন "বিজ্ঞান ও যুক্তিব সঙ্গে বিশ্বাসের শুধু কী বিবাদই রযেছে ? বিজ্ঞানে কী বিশ্বাসেব কোনও মূল্যই নেই ?"

বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের বিবাদ কোথায় এবং বিশ্বাসের মূল্য যুক্তি ও বিজ্ঞানের কাছে কতখানি, একটু দেখা যাক। আপনি যদি একটা মুদ্রা ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিশ্বাস করেন, মুদ্রাটির হেড বা টেল ওপরের দিকে করে পড়বে, তাহলে আপনার বিশ্বাসের মূল্যমান হবে শতকরা একশ ভাগ। যদি আপনি বিশ্বাস করেন মুদ্রাটির হেড ওপরের দিকে মুখ করে পড়বে, তাহলে আপনার বিশ্বাসের মূল্যমান হবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, টেল পড়বে বিশ্বাস করলেও আপনার বিশ্বাসের মূল্যমান হবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস করে বসে থাকেন, হেড ও টেল এক সঙ্গেই পড়বে, কিম্বা হেড বা টেল কিছুই পড়বে না, তবে আপনার বিশ্বাসের মূল্যমান দাঁড়াবে শূন্য।

'৯০-এর কলিকাতা পুস্তক মেলায় আমাদেব সমিতির টেবিলের সামনে চেয়ারে দাঁড়িযে যখন বহু শ্রোতার বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলাম, তখন এক আর্চবিশপ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনার পিতাই যে আপনার জন্মদাতা, এটা কী আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ? এটা তো পুরোপুরি বিশ্বাস-নির্ভর ব্যাপার। তবে অন্য সময় বিশ্বাসে নির্ভরতায় আপনাদের, যুক্তিবাদীদের আপত্তি কেন ?"

উত্তরে বলেছিলাম, "জীববিজ্ঞানের নিযম অনুসাবে আমার একজন জন্মদাতা নিশ্চযই আছেন। যুক্তির দিক থেকে তিনি আমার পিতা হতে পাবেন, নাও হতে পাবেন—এটা নিশ্চযই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার পিতাই আমার জন্মদাতা কিনা, এই নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালান আমার কাছে একান্তই প্রয়োজনহীন। তবে আবারও বলি, আমার জন্মদাতার অস্তিত্ব ছাড়া যে আমার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবেই অসম্ভব এটা জানি, বিশ্বাস করি। এখানে বিশ্বাসটা এসেছে জ্ঞান ও যুক্তির পথ ধরেই। কিন্তু আপনি যদি এখন বলে বসেন, অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি শূন্যে বিচরণ করতে পারেন বা ইচ্ছেমত সৃষ্টি করতে পারেন যা খুশি তাই ; এবং তাতে যদি আমি বিশ্বাস করে বসি, তবে তা হবে জ্ঞান ও যুক্তিবিরোধী অন্ধবিশ্বাস ; এবং সে ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাসের মূল্যমান হবে শূন্য।

জ্যোতিষ, যুক্তি ও বিজ্ঞান নিযে আলোচনা করতে করতে কিছু বিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ে গেল। এঁরা সরাসরি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। ইস্তাহারটি প্রকাশিত হযেছিল ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বরে 'দি হিউম্যানিষ্ট' পত্রিকায, সাক্ষরকারী ১৮৫জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে ১৮জন নোবেল বিজয়ী। ইস্তাহারটিতে বলা হযেছিল—

Scientists in a variety of fields have become concerned about the increased acceptance of astrology in many parts of the world We, the undersigned—astronomers, astrophysicists and scientists in other fields—wish to caution the public against the unquestioning acceptance of the predictions and advice given privately and publicly by astrologers Those who wish to believe in astrology should realize that there is not scientific foundation for its tenets

In ancient time people believed in the predictions and advice of astrologers because astrology was part and parcel of their magical world view They looked upon celestial objects as abodes or omens of the Gods and, thus, intimately

connected with events here on earth. they had no concept of the vast distances form the earth to the planets and stars. Now that these distances can and have been calculated, we can see how infinitesimally small are the gravitational and other effects produced by the distant planets and the far more distant stars. It is simply a mistake to imagine that the forces exerted by stars and planets at the moment of birth can in any way shape our futures. Neither is it ture that the positions of distant heavenly bodies make certain days or periods more favourable to particular kinds of action, or that the sign under which one was born determines one's compatibility or incompatibility with other people.

Why do we believe in astrology ? In these uncertain times many long for the comfort of having guidance in making decisions They would like to believe a destiny predetermined by astral forces beyond their control However, we must all face the world, and we must realize that our futures lie in ourselves, and not in the stars.

One would imagine, in this day of widespread enlightenment and education, that it would be unnecessary to debunk beliefs based on magic and superstition Yet, acceptance of astrology prevades modern society. We are especially distrubed by the continued uncritical dissemination of astrological charts, forecasts, and horoscopes by the media and by otherwise reputable newspapers, magazines, and book publishers. This can only contribute to the growth of irrationalism and obscurantism We believe that the time has come to challenge directly, and forcefully, the pretentious claims of astrological charlatans.

It should be apparent that those individuals who continue to have faith in astrology do so in spite of the fact that there is no verified scientific basis for their beliefs, and indeed that there is strong evidence to the contrary

এখানে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের এই সম্মিলীতে ঘোষণাটির উল্লেখ করলাম এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে। এর বাড়তি কোনও গুরুত্ব আরোপ করছি না, যেহেতু এই ঘোষণা-পত্রে "জ্যোতিষশাস্ত্র কেন বিজ্ঞান নয়" এই প্রসঙ্গ নিযে কোনও আলোচনা ছিল না, ছিল না কোনও যুক্তির অবতারণা।

অনেক যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীরা এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে এমনভাবে উল্লেখ করেন যেন, ১৮৬জন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরোধীতা করাটাই জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রান্তির অকাট্য প্রমাণ। এই সময আবেগতাড়িত হযে অনেক যুক্তিবাদীও ভুলে যান, জ্যোতিষীদের পক্ষে বা বিপক্ষে কতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বিশিষ্ট ব্যক্তি মত প্রকাশ করলেন এমন সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে কোনও মতকে মেনে নেওযা যুক্তিগতভাবে একন্তই মূল্যহীন। জ্যোতিষীরা যদি ১৮৬জনের বেশি বিজ্ঞানী জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে হাজির করেন, তবে কী

জ্যোতিষশাস্ত্রটা রাতারাতি বিজ্ঞান হয়ে যাবে ? এক সময় পৃথিবীর সংখ্যা-গরিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন পৃথিবী স্থির, সূর্যই পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিকে গ্রহণীয় মনে করলে আজও আমাদের ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকেই মেনে নিতে হোত। ইতিহাস বলে, বহু ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট সংখ্যাগুরুদের মতও আবর্জনার মতই পরিত্যক্ত হয়েছে যুক্তির কাছে, বিজ্ঞানের কাছে।

বিবেকানন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে ছিলেন কী বিপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে কী বলেছেন, এগুলো "জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান, কী বিজ্ঞান নয়"—প্রমাণ করার পক্ষে কখনই অকাট্য যুক্তি নয়। এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা শুধু বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের জ্যোতিষ বিষয়ে মতামত জানতে পারি মাত্র। ওই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কী বিশ্বাস করেন, সেটা যুক্তির কাছে মূল্যবান নয়; মূল্যবান—তাঁদের বিশ্বাসের পেছনে ক্রিয়াশীল যুক্তিগুলি।

আবারও বলি, বহু বিজ্ঞান-আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদ-আন্দোলনকর্মী ও বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ বিষয়ক পত্র-পত্রিকা যেভাবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রান্তির পক্ষে জোরাল যুক্তি হিসেবে হাজির করতে চাইছেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে পাল্টা যুক্তি হেনে সেই জোরাল যুক্তিকে ভাসিয়ে দেওয়া অতি সরল কাজ। আর জ্যোতিষীদের পক্ষ থেকে সে কাজ শুরুও হয়েছে।

জনৈক স্ব-ঘোষিত ডক্টরেট উপাধিধারী জ্যোতিষসম্রাট তাঁর লেখা একটি জ্যোতিষ সংক্রান্ত নধর গ্রন্থে ১৮৬জন বিজ্ঞানীর জ্যোতিষ-বিরোধী মতামতকে ভাসিয়ে দিতে পৃথিবী বিখ্যাত নমস্যঃ বিজ্ঞানী পিথাগোরাস, টলেমী, বরাহমিহির, ট্রাইকোব্রাহা, গ্যালিলিও, কেপলার, ভাস্কর, শ্রীপতি থেকে শুরু করে এ যুগের বহু বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছেন।

এক জনপ্রিয় জ্যোতিষী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন মাঝে-মধ্যেই। ওই বিজ্ঞাপনে এ-যুগের অনেক রথী-মহারথী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানী জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

এক সময়কার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন' পত্রিকার ২৪-৩০ নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যায় জনৈক খ্যাতিনাম জ্যোতিষী তথ্য, প্রমাণ সহ দেখাতে চেয়েছেন—স্বামী বিবেকানন্দ জ্যোতিষবিরোধী কোনও একটি উক্তি করলেও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর ব্যক্তিজীবনে।

জনপ্রিয় মাসিক শিশু-সাহিত্য পত্রিকা 'শুকতারা'য় ১৩৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'অলৌকিক' শিরোনামের একটি লেখায় লেখক নটরাজন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ যখন বিবেকানন্দ তখনও তিনি অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

জ্যোতিষীদের পক্ষ থেকে এইসব সাক্ষী ও তথ্য হাজির করার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মতামতকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া, সংখ্যাতত্ত্বকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া বিজ্ঞান-আন্দোলনকর্মী ও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে পড়বেন। কিন্তু যুক্তিবাদীদের এতে সামান্যতম অস্বস্তির কারণ দেখি না। কারণ জ্যোতিষীদের ও শুকতারার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি এ-কথাই বলে—জ্যোতিষীদের কথা থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয়, কিছু কিছু বিজ্ঞান-পেশা, সাহিত্য-পেশা ও অন্যান্য পেশার বিশিষ্ট মানুষরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু তাতে

জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান— এ-কথা প্রমাণিত হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতিষ বিশ্বাস, জ্যোতিষ অবিশ্বাস বা স্ব-বিরোধীতার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তি-বিশ্বাসের পরিচয়টুকুই আমরা পেতে পারি মাত্র। এর বাড়তি কিছু নয়। কারণ বিবেকানন্দ বা অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বর আপন বিশ্বাসের দ্বারা কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না।

অতএব আসুন ব্যক্তি-বিশ্বাসে গুরুত্ব আরোপ না করে যুক্তির নিরিখে বিচারে বসি। জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে বসি। দেখি জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেন, সেগুলো কতটা গ্রহণযোগ্য অথবা বর্জনীয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে হাজির করা যুক্তির বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি আছে কিনা, তাও দেখা যাক। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিপক্ষে যুক্তির শানিত আক্রমণ চালাতে যুক্তিবাদীদের পক্ষে কোন্ যুক্তিগুলো অপ্রতিরোধ্য, অব্যর্থ, সেগুলো নিয়েও আলোচনায় আসা যাবে। এসব নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের যেটা একান্তই প্রয়োজন, সেটা হলো, যে শাস্ত্রটিকে নিয়ে আলোচনা, সেই শাস্ত্র বিষয়ে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারনা নেওয়া।

চার

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের পার্থক্য

আমার এক বন্ধু অংকের অধ্যাপক। একদিন আমাকে বললেন, "তোমরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে কেন যে মানতে চাও না, বুঝি না। জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও কি তোমরা অস্বীকার করতে চাও নাকি?"

কথা হচ্ছিল বন্ধুর বাড়িতে বসেই। বললাম, "জ্যোতির্বিজ্ঞান নিশ্চয়ই মানি। না মানার মত যুক্তিহীন কিছু তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যে দেখি না। গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান ও তাদের পরিক্রমা পদ্ধতি, মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এই সব জ্যোতির্বিজ্ঞানের কর্ম-পদ্ধতির মধ্য পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞান হঠাৎ করে বা কারো ইচ্ছে অথবা দয়ায় কিম্বা প্রচারের দৌলতে বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। নিরন্তর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং সেই নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই মহাকাশ গবেষকরা তাঁদের মহাকাশ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বকে হাজির করেছেন এবং সেগুলোর সত্যতা প্রমাণও করেছেন। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে মানি আমরা।"

"জ্যোতিষশাস্ত্র তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা একটা শাস্ত্র, একটা পুরোপুরি অংকের ব্যাপার। তাহলে এটা বিজ্ঞান বলে মানবে না কেন?" বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের ভাগ্যের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব। এই শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আছে, অংকও আছে। কিন্তু অংক এবং গ্রহ-নক্ষত্রের কথা থাকলেই তাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিলে কোনও ভূত গবেষক জাদুকর হয়তো একটা গোটা ভূত-শাস্ত্রই লিখে ফেলবেন। সেই শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রসঙ্গ ও অংক-টংক মিশিয়ে দিতে পারলে নিশ্চয়ই তোমার যুক্তিতে সেই শাস্ত্রও বিজ্ঞান হয়ে উঠবে। আমরা মানুষের মৃত্যু মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে ভূতের ভবিষ্যৎও বলে দিতে পারব। ভূত মোটা হবে কী কালো, কবে কার ওপর ভর করবে, কবে ঝাঁটাপেটা খাবে, কবে বিয়ে হবে, বউটি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে কালো হবে, কী ফর্সা; মোটা হবে, কী রোগা; বেঁটে হবে, কী লম্বা— সবই আমরা বের করে ফেলব। গায়ক ভূত হিসেবে কে সফল হবে, কোন্ কবি মৃত্যুর পর ভূতরাজ্যে কবি হিসাবে পাত্তাই পাবে না; সবই ওই শাস্ত্রের সাহায্যে বলে দেওয়া যাবে।"

বন্ধুর শিক্ষিকা স্ত্রীও একই সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনে আমার এ-জাতীয় কথায় বন্ধুটির সম্মান বোধহয় সামান্য ঘা খেয়েছিল। তাইতেই যথেষ্ট উত্তাপ ছড়িয়ে হঠাৎই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বন্ধুটি, "দেখ, সিরিয়াসলি তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, চ্যাংড়ামি নয়।"

কেউ রেগে গেলে তাকে আরো রাগিয়ে দেবার একটা প্রবণতা মাঝে-মধ্যে আমাকে পেয়ে বসে। আর ওই বিদ্‌ঘুটে প্রবণতাটাই আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। তবু অনেক করে সংযত করতে হলো নিজেকে, বন্ধু-পত্নীর উপস্থিতির কথা মাথায় রেখে। তাই আলোচনায় জের টানতে শুধু বললাম, জ্যোতিষশাস্ত্র এমন কোনও তত্ত্ব বা তথ্য হাজির করে প্রমাণ করতে পারেনি মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত এবং ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের এই কথাগুলোকে মেনে নিতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।"

অধ্যাপক বন্ধুটির মত এমন প্রশ্ন অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান মানুষের কাছ থেকেই কখনও বা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে, কখনও বা মনের গভীরে বিশ্বাস হয়েই বেঁচে থাকে। আসলে এঁরা অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলেন। গুলিয়ে ফেলেন astronomy-র সঙ্গে astrology-কে। বাংলা ও ইংরেজি দুটো কথায় এতই মিল যে দুটোকে বড় বেশি সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। দুটোতেই গ্রহ-নক্ষত্র আছে, আছে অংক-টংকের ব্যাপার, সুতরাং এইসব কিছু মিলিয়ে মানুষ আরো বেশি করে বিভ্রান্ত হন; ভাবতে শুরু করেন জ্যোতির্বিজ্ঞন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিষয়ক বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষের জীবনে ওই সব গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয় করে অংক-টংক কষে। কিন্তু যেমনভাবে ভাবা হয়, বিষয়টা আসলে আদৌ তা নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কী, সে নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করেছি। তবু আবারও ওই প্রসঙ্গতে সামান্য সময়ের জন্য ফিরে যেতে চাই। কারণ, "পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল প্রীতিকর হয় না; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক ফল পাওয়া যায় না।"

জ্যোতির্বিজ্ঞান একটা বিজ্ঞান; কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির (observatory) থেকে, অন্যান্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান নির্ণয় করে এবং গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রগুলির গণিত অবস্থান বার করে মেলান হয়। দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গণিত-অবস্থান মিলিয়ে তৈরি হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র। কখনও দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গণিত অবস্থানে পার্থক্য দেখা গেলে সে বিষয়ে আবার গবেষণা করা হয় এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গণিত গণনার সূত্রগুলির সংস্কার করা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র বলে—একজন মানুষের জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ওপর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ধারিত হয়ে যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু তাদের এ-জাতীয় বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণই আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারেনি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে

বুদ্ধির উন্মেষের আগে মানুষ, গুহা-মানুষ দৃষ্টির শেষ প্রান্তে নীল আকাশের দিকে অবাক হয়ে দেখেছে। দেখেছে আকাশের সূর্যের উদয় ও অস্ত, অনুভব করেছে মধ্য গগনে

অবস্থানরত সূর্যের প্রখরতা, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ও উদয়-অস্ত, তারা ভরা রাত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ। ধূমকেতু, উল্কাপাত, অবাক অসহায়ভাবে তারা শুধু দেখেইছে। কেন এমনটা ঘটছে—ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। খুঁজে পাওয়ার মত মানসিক উত্তরণ তখনও মানবজীবনে আসেনি। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন, বর্ষা-গ্রীষ্ম-শীত, ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি-বন্যা, খরা, জলকষ্ট, তুষারপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি দেখে অসহায় অবুঝ মানুষগুলো এক সময় ভাবতে শুরু করলো এসবের পিছনে রয়েছে একটা শক্তি। এসব শক্তিকে তারা ভয় করতে শুরু করলো। এদের তুষ্ট করতে চাইল। নিবেদন করলো শ্রদ্ধা। এক সময় দেবত্বের আসনে বসাল পাহাড়-পর্বত, নদী-জল, আগুন, ঝড়, বজ্র, সমুদ্র, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রদের। প্রাচীন যুগের মানুষেরা ভাবতে শুরু করলো এইসব দেবতাদের তুষ্ট করতে পারলে খড়া, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, তুষারপাত, ভূকম্প, প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তারা অব্যাহতি পাবে।

এক সময় মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হলো। কৃষিকাজ, পশুপালন, নৌ-চালনা শিখলো। মানুষ মনে করতে শুরু করলো, ওইসব প্রকৃতি-দেবতাকে তুষ্ট করলে ফলন ভাল হবে, পশু-মড়ক হবে না, ধীরে ধীরে এর থেকেই সৃষ্টি হলো দেবতাদের তুষ্ট করতে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করল বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শুয়োর, আরও নানা পশু। এইসব সম্পদ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আনল, সেই সঙ্গে দেবতা হিসেবে পুজোও পেতে লাগল।

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের গোষ্ঠীর শক্তিমান ও বুদ্ধিমান মানুষটিকে বরণ করল নেতা হিসেবে। শক্তিমান হলো শাসক ; বুদ্ধিমান হলো ধর্মীয় নেতা। প্রধানত এইসব বুদ্ধিজীবী, কল্পনাবিলাসী, শ্রমবিমুখ ধর্মীয় নেতারা কল্পনার দেবতাদের নিয়ে কল্পনার তুলিতে আঁকল নানা অদ্ভুত সব কাহিনী। ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের দূত, এই প্রচারে প্রভাবিত সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের এইসব দেব-কাহিনীগুলোকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরর মধ্যে তৈরি হলো বিচিত্র সব দেব-কাহিনী। আজও সেইসব দেব-বিশ্বাসের কাহিনীর অনেকগুলোই বেঁচে রয়েছে আধুনিক যুগের মানুষদের মধ্যেও।

এক সময় মানবসভ্যতার সূত্রপাত হলো মিশর, চিন, ভারত, ব্যাবিলন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মানুষ শিখল গণনা, মাপ-জোক। মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল প্রকৃতির কিছু সুশৃঙ্খল দিক। সূর্যের পূর্ব দিকে ওঠা, পশ্চিমে অস্ত যাওয়া, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি, সবেই মানুষ লক্ষ্য করল নিয়মানুবর্তিতা। চাঁদের গতিবিধির সঙ্গে জোয়ার-ভাটাকেও মেলাতে পারল। মানুষ স্থল ছেড়ে জলকে জয় করতে চাইল। দরিয়ায় নৌ-যান ভাসাতে শিখল। দিক নির্ণয়ের জন্য অনুভব করল নক্ষত্র চেনার প্রয়োজনীয়তা। বুঝতে শিখল গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে চিনতে শিখলো, এ-সব গ্রহ-নক্ষত্ররাও স্থান পেল বিভিন্ন দেশের পুরাণে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। বেদ চার খণ্ডে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। ঋকবেদ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের হাজার থেকে দেড়-হাজার বছর আগে, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অধিকাংশ পণ্ডিতই এই রায় দিয়েছেন। ঋক্ বেদে আছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বহু স্তোত্র। সূর্যকে লক্ষ্য করে রচিত স্তোত্র পাঠে আমরা জানতে পারি,

রচয়িতাদের অজানা ছিল না সূর্যই ঋতুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্যের তেজে চন্দ্র আলোকিত। মিশরে আবিস্কৃত হলো সৌর ক্যালেণ্ডার। সুমেরীয়রা সূর্যের পরিক্রমাকে সামগ্রিকভাবে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করল। দিনকে ২৪ ঘন্টায়, ঘন্টা ও মিনিটকে ৬০ ভাগে ভাগ করল। শুরু হলো গ্রহ-নক্ষত্র নিযে চর্চা।

সেকালের মানুষদের জ্যোতিষচর্চা ছিল পুরোপুরি চোখের উপর নির্ভরশীল, কারণ দূরবীন তখনও আবিস্কৃত হযনি। তাদের চিন্তায বিশ্বজগৎ কেমন ছিল, একটু ফিরে দেখা যাক।

প্রাচীন ভারতীযদের কল্পনায় পৃথিবী দাঁড়িযে ছিল বাসুকী সাপের মাথায়। বাসুকী কখনও নাড়াচাড়া করলে পরিণতিতে হয় ভূমিকম্প। আবার এক সময আর একটা কল্পনাও তৈরি হয়—আটটা হাতি তাদের দাঁতের উপর ধরে রেখেছে পৃথিবীকে। পৃথিবীর কেন্দ্রে রযেছে সুমেরু পর্বত। সূর্যদেবতা সাত ঘোড়ার রথে চড়ে পরিক্রমায় বের হন।

চন্দ্র-সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হিসেবেও হাজির হলো এই বিচিত্র কাহিনী। চন্দ্র বিযে করেছিলেন প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি সুন্দরী কন্যাকে। প্রেমের ব্যাপারে চন্দ্র মোটেই সাম্যবাদী ছিলেন না। একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের মতই ছিলেন একটু এক পেশে। রোহিণীর দিকে একটু বেশি ঝুল খাওযা। ফলে স্বভাবতই বাকি ছাব্বিশজনের প্রতি কিঞ্চিত অবহেলা দেখালেন চাঁদ। সে খবর শুনে দক্ষ গেলেন ক্ষেপে। চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, "তোমার ক্ষয়রোগে হবে।" তখনকার দিনে ক্ষযরোগে ভোগার অর্থই ছিল মৃত্যু। দক্ষের কাছে মেয়েরা পড়লেন কেঁদে, "বাবা ওকে না বাঁচালে আমরা যে বিধবা হই।" দক্ষ বুঝলেন, অভিশাপটা বড়ই জোরাল হযে গেছে। বললেন, "বেশ, চন্দ্রকে একটা বর দিচ্ছি। ও ক্ষযে ক্ষযে যখন শেষ হবে। তখনই শুরু হবে ওর বৃদ্ধি, একটু একটু করে আবার পুরো শরীরটাই ফিরে পাবে।"

গ্রহণের কারণ হিসেবেও এলো কাহিনী। সমুদ্র মন্থন করে সুধা উঠেছে। বিষ্ণু রমণীয রমণী সেজে সুধা ভাগ করার দাযিত্ব নিযে দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করছেন। তখন দৈত্য রাহু দেবতার ছদ্মবেশে অমৃত গ্রহণ করে। সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে চিনতে পেরে বিষ্ণুকে জানান। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু সুধা পান করে রাহু তখন অমর। তারপর থেকেই প্রতিশোধ নিতে রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গিলে খায় সুযোগ পেলেই। কিন্তু গিললেও কাটা গলা দিযে সূর্য, চন্দ্র আবার বেরিযে আসেন।

শুক্রকে নিযেও গড়ে উঠল এক কাহিনী। শুক্রের পিতা মহর্ষি ভৃগু। শুক্র দৈত্যগুরু। শুক্র জানতেন সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্রে নিহত দৈত্যদের আবার বাঁচিযে তুলতেন শুক্রাচার্য। মহাদেব এই কথা শুনে শুক্রকে খেযে ফেলেন। উদ্ধার পেতে পেটের ভিতরই শুক্র শিবের স্তব শুরু করলেন। স্তবে তুষ্ট শিব নিজ লঙ্গপথে শুক্রকে বের করলেন। শুক্রের সঙ্গে অপ্সরা বিশ্বাচীর দীর্ঘ বিহার নিযেও রয়েছে আর এক কাহিনী। সব মিলিয়ে শুক্র হয়ে উঠলেন প্রণয় ও যৌনতার প্রতীক। দৈত্যরাজ বলি ছিলেন দানবীর। মহাপরাক্রমী বলিকে রাজ্যচ্যুত করতে বিষ্ণু এক ফন্দি আঁটলেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বলির কাছে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য, দান হিসেবে রাজ্যটাকেই চেয়ে বসা। ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে চিনতে পারলেন শুক্রাচার্য, বুঝতে পারলেন তাঁর আগমন উদ্দেশ্য। বলিকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বলি-গুরু শুক্রাচার্য এগিযে এলেন। যে কমণ্ডুলেরর জলে হাত ধুয়ে দানকার্য সম্পন্ন হবে, সেই কমণ্ডুলের মুখে একটি পোকার

রূপ ধারণ করে জল নির্গমনের পথ বন্ধ করে বসে রইলেন শুক্র। বিষ্ণু শুক্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে একটি শলাকা দিয়ে কমণ্ডুলের মুখ পরিষ্কারের অজুহাতে শুক্রের একটি চোখ দিলেন কানা করে।

বৃহস্পতি দেবগুরু। তাঁর স্ত্রী তারা। চন্দ্র একবার তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে চন্দ্র তারাকে ফিরিয়ে দেন। চন্দ্রের ঔরষে তারার গর্ভে বুধের জন্ম। এমনটা কল্পনার কারণ সম্ভবত, বৃহস্পতির কাছের একটি নক্ষত্রকে তারা কল্পনা করা হয়েছিল। কোনও এক সময় চন্দ্রে ঢাকা পড়েছিল তারা। চন্দ্র সরে যেতে চোখে পড়ে বুধ। তারপরই তারাকে আবার দেখা যায় বৃহস্পতির কাছে।

শনিকে নিয়েও গড়ে উঠেছে কাহিনী। শনি তেজে ভাস্কর, তপস্বী। ওঁর স্ত্রী ঋতুস্নান করে এসে মৈথুন কামনা করেন। ধ্যানস্থ শনি স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকান না। ক্রুদ্ধ স্ত্রী শনিকে শাপ দেন, "তুমি যার দিকে তাকাবে তার শুধু অনিষ্টই হবে।" শনির দৃষ্টিতে গণেশ তাঁর দেবমাথা হারিয়ে ছিলেন। ক্রুদ্ধ গণেশ-মাতা দুর্গার অভিশাপে শনি হয়ে পড়েন খোঁড়া। শনির দৃষ্টিতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কষ্ট ও মৃত শোল মাছ জ্যান্ত হওয়ার গল্প অনেকেরই জানা।

এসবই গেল হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের গল্প। একটু অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাই। প্রাচীন মিশরীযদের কল্পনায পৃথিবীর আকার একটা চৌকো বাক্সের মত। তলায মাটি। ওপবে গোল আকাশের ঢাকনা। সূর্য দেবতা - চন্দ্র দেবতা রোজ পান্‌সি বেয়ে এক দরজা দিযে আসেন, আর এক দরজা দিযে বেরিযে যান। প্রতিটি নক্ষত্র হচ্ছে এক একটি দেবতার হাতে ধরা বাতি। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এক শূকরী একটু একটু করে খায় চন্দ্রকে। কখনও সখনও আস্তই গিলে ফেলে চন্দ্রকে, আর তাইতেই হয় চন্দ্রগ্রহণ। একটা সাপ এসে মাঝে-মধ্যে সূর্যকে যখন গিলে খায, তখনই হয় সূর্য গ্রহণ।

ব্যাবিলনীযদের কল্পনায পৃথিবী একটা ফাঁপা পর্বতের মত। ফাঁপা পর্বতটা ভেসে রয়েছে জলের ওপর। পৃথিবীর নিচের জল ফোযারার মত উঠে এসে সৃষ্টি করে ঝরণার, নদীর। পৃথিবীর ওপরের ওই আকাশটা আসলে একটি গোলক আকাবের কঠিন ঢাকনায ঢাকা জল-রাশি। তাইতেই আকাশ সমুদ্রের মতই নীল। পৃথিবীর ওপরের ওই জল মাঝে-মাঝে কঠিন গোলকের ভেতব দিযে ঝরে পড়ে। তখন এই জল পড়াকেই আমরা বলি বৃষ্টি। ওপরের গোলকের রয়েছে দুটি দরজা ; একটা পূবে, একটা পশ্চিমে। সূর্য ও চন্দ্র প্রতিদিনই পূবের দরজা দিযে প্রবেশ করে আকাশে। আর পরিক্রমা শেষে বিদায় নেয় পশ্চিমের দরজা দিযে।

গ্রীকদের কল্পনায় পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে গ্রীস। পৃথিবী ঘিরে রয়েছে জল। দেবতা জুপিটারের আদেশে সূর্যকে অ্যাপেলো রোজ রথে চড়িয়ে আকাশ ঘুরিযে নিযে আসে, সারদিন ঘোরার পর ক্লান্তি দূর করতে সূর্য স্নানে নামেন সমুদ্রে।

চীনদেশের মানুষ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের পিছনেও ড্রাগনকে আবিষ্কার করেছে। ড্রাগন যখন সূর্য ও চন্দ্রকে খায়, তখনই হয গ্রহণ। গ্রহণেব সময চীনারা দারুণ রকম হৈ-হট্টগোল জুড়ে দেয। তাদেব ধারণায, এত মানুষী চিৎকারে ভয পেযে ড্রাগনটা চন্দ্র বা সূর্যকে ছেড়ে দিযে পালিযে যায।

প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা ঢুকে পড়লেও প্রাচীন যুগের মানুষরা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিযে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তারা গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য বুঝতে পেরেছিল। তারামন্ডল দেখে আগত ঋতু নির্ণয় করতে শিখেছিল। সূর্যের আহ্নিকগতি ধরে রাশিচক্রের আবিষ্কার করেছিল।

তখন অবশ্য পৃথিবীকেই বিশ্বেব কেন্দ্র হিসেবে কল্পনা করা হতো। তারা ভাবত সূর্য, চন্দ্র এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র একদিনেব মধ্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ব্যাবিলনীয়ারাই সাতদিনে সপ্তাহের প্রচলন করে। আকাশের সাতটি গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহের নামে সাতটি নাম রাখা হয়। তাদের মতে, পৃথিবীর সবচেযে কাছের থেকে দূরের গ্রহগুলো হলো—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি। ব্যাবিলনীযদের এই আবিস্কারের বহু পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই সাতটিকেই গ্রহ হিসেবে ধরে নিযে চালিযে গিযেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাজির করেছিল নানা জটিল তত্ত্ব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব ধ্যান-ধারনার সূত্র ধরেই ধীবে ধীরে আধুনিক সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব তৈবি হয।

সেই সময় যাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, তাঁদের অনেকে গ্রহ (প্রাচীন ধারনা অনুসাবে) অবস্থানের সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনাবলীর যোগসূত্র খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। কোনও রাজার রাজ্য জয, যুদ্ধে পরাজয়, রাজপুত্র-রাজকন্যার জন্ম, রাজার বিযে, সিংহাসন লাভ, রাজপুত্র-রাজকন্যাদের বিয়ে, রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠদের অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু, পন্ডিতদের রাজকৃপা লাভ, বন্যা, খরা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা ঘটার সময় গ্রহগুলোর অবস্থায় নির্ণয় করলেন। তাঁরা অনুমান করলেন, ওইসব বিশেষ ঘটনাগুলোর সঙ্গে সেই সময়কার গ্রহ অবস্থানগুলোর একটা সম্পর্ক রযেছে। তাঁদের এই অনুমান বা বিশ্বাসের ওপরই গড়ে উঠতে লাগল জ্যোতিষশাস্ত্র।

জ্যোতিষীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম যে রাজকুল এগিযে এলেন, তাঁরা ব্যাবলনীয। রাজা ও রাজপরিবারের বিষযে আগাম খবর দিতে রাখা হলো জ্যোতিষী। তা সত্বেও ব্যাপক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা নিয়ে গবেষণা শুরু হয় গ্রীসেই প্রথম। এই সময অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কৌতুহল বশে গবেষণা করে দেখতে চেযেছিলেন, বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে গ্রহ অবস্থানের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। তাঁদের অনেকেই গবেষণার স্বার্থে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সময গ্রহ অবস্থানগুলো লিখে গেছেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এই ধরনের কোনও গ্রহ অবস্থানে একই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে কিনা।

আলেকজান্দ্রিয়ায় গড়ে উঠল বিখ্যাত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থগারে বেতনভূক পন্ডিতদের রাখা হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য। এই সময় গ্রীসে আমরা দেখতে পাই থালেস-কে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৪-৫২৭)। তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আকাশ পর্যবেক্ষণেব প্রেমে তিনি ছিলেন মাতোযারা। তাঁর ধারণায পৃথিবীর আকার একটা চাকার মত। পৃথিবী ভেসে রযেছে জলের ওপর। তবে তাঁর মুখেই শোনা যায—বিশ্বজগতের কান্ডকারখানার মধ্যে রযেছে প্রকৃতির নিয়ম ও শৃঙ্খলা। এই নিযম-শৃঙ্খলা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বরকে টেনে আনার কোনও প্রযোজন নেই, প্রয়োজন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির।

গ্রীসের পিথাগোরাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭) ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছিলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলোর আকৃতি গোলকের মত।

ফিলোলাউস ছিলেন পিথাগোরাসের শিষ্য। তিনই প্রথম বললেন, পৃথিবী শুধু গোলক নয়, এর একটা গতি আছে। তিনি অবশ্য ধরতে পারেননি, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্লেটো এলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮)। প্লেটোর ধারণায় পৃথিবী একটি নিটোল গোলক। পৃথিবীর গতিপথও নিখুঁত বৃত্তাকার। বিশ্বসৃষ্টি ত্রুটিহীন। কারণ, স্রষ্টা স্বয়ং সর্বশক্তিমান।

প্লেটোর তত্ত্বকেই আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন অ্যারিস্টটল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)। অ্যারিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে নয়টি এককেন্দ্রীয় স্বচ্ছ গোলক। এই নয় গোলক হলো চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং শনির বাইরে আরও দুটি স্থির গোলক আছে, যেগুলো নক্ষত্র। এর বাইরের একটি গোলকে বসে আছেন বিশ্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বর।

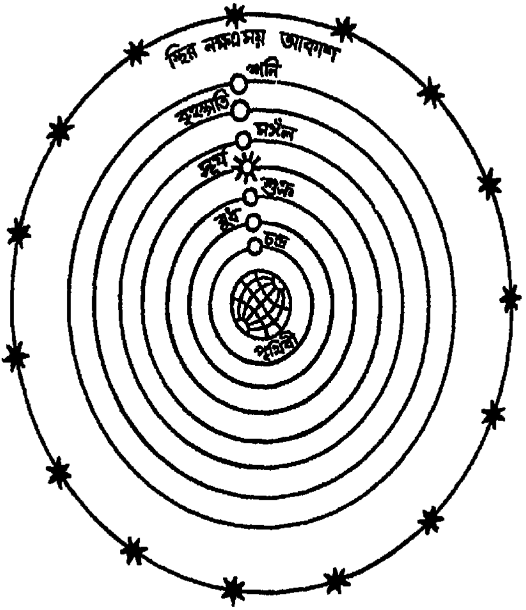
এলেন অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০-২৩০)। তিনি ছিলেন প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তাঁকে বলা হয় গ্রীকযুগের কোপারনিকাস। তিনি সূর্যঘড়ি ও কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন। তাঁর লেখা একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, গ্রন্থটির নাম "On the size and distance of the Sun and Moon" বাংলায় বলা চলে "সূর্য ও চন্দ্রের আকার ও দূরত্ব বিষয়ে"। তিনি দেখালেন সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়।

অ্যারিস্টার্কাস আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থটির সন্ধান আমরা না পেলেও গ্রন্থটির উল্লেখ পাই আর্কিমিডিসের লেখায়। আর্কিমিডিস জানিয়েছিলেন গ্রন্থটিতে অ্যারিস্টার্কাস জানিয়েছিলেন সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরে চলেছে। সতের শতক পরে এই সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কোপারনিকাস।

আরিস্টার্কাস ও কোপারনিকাসের মাঝের সতেরো শো বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল ভূকেন্দ্রীক বিশ্বতত্ত্ব। কারণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতই সর্বগ্রাসী ছিল যে তাঁদের সূত্র ছাড়া মহাকাশ গবেষণার কথা তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল অকল্পনীয়।

খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে এলেন ক্লডিয়াস টলেমি। ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যায় ও জ্যোতিবিদ্যায় তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। জ্যোতির্বিদ্যার উপর তিনি একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, নাম— Almegest "অ্যালমাজেস্ট"। টলেমির সময় থেকে কোপারনিকাসের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ বারো শো বছর জ্যোতির্বিদদের কাছে গ্রন্থটি ছিল গীতা, কোরান, বাইবেল, বেডবুক। তের খণ্ডের এই গ্রন্থটির প্রথম তিনটি খণ্ড লেখা হয়েছিল সূর্য-চন্দ্রের গতি, বছরের পরিমাপ নিয়ে। চতুর্থ খণ্ডের মূল অলোচ্য চন্দ্রের গতি ও গ্রহণ। পঞ্চম খণ্ডের আলোচ্য সূর্য-চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাত। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে ছিল নক্ষত্র পরিচয়। টলেমি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নাম 'Tetrabiblos'। এটি ছিল বলতে গেলে জ্যোতিষশাস্ত্রের বেদ। টলেমির ধারণায় বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী। আর, গ্রহগুলো

বৃত্তাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। গ্রহগুলোর চক্রগতি হচ্ছে একই সঙ্গে। টলেমির ভ্রান্ত ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব এবং গ্রহদের ভ্রান্ত চক্রগতির কথা বর্তমান পৃথিবীর জ্যোতিষর্বিজ্ঞানীদের কাছে পরিত্যক্ত হলেও বহু জ্যোতিষীদের কাছে টলেমির ভ্রান্ত চিন্তার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জ্যোতিষচিন্তা আজও ব্রাত্য হয়নি।



টলেমির পরিকল্পনায় ভূকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ

এই সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা একই সঙ্গে চলছিল। দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট কোনও বিভাজন ছিল না। মহাকাশচর্চায় বহু ভ্রান্তির জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান সে সময় বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি।

এই সময় ভারতবর্ষ পেল আর্যভটকে (আনুমানিক খ্রীস্টাব্দ ৫০০)। আর্যভটই প্রথম ভারতীয় জ্যোতির্বিদ যিনি পৃথিবীর আহ্নিকগতির কথা উল্লেখ করেন।

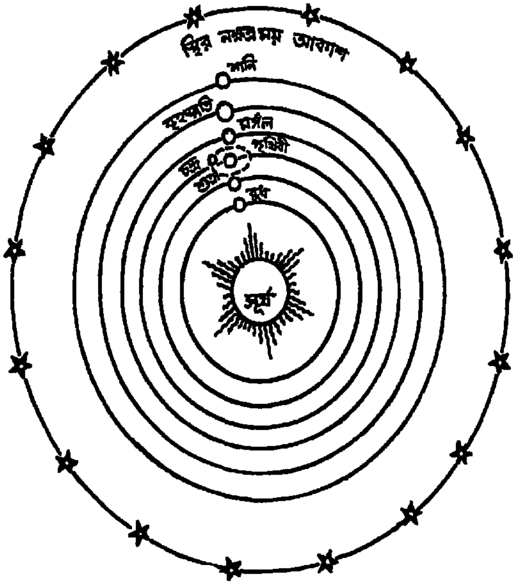
আলোকজাভারের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ধারাটি আরব হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ষষ্ঠ শতকের গুপ্তযুগ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চার সুবর্ণযুগ। টলেমি জ্যোতিষশাস্ত্রকে তাঁর পর্যবেক্ষণের যতটুকু দিতে পেরেছিলেন, সেটাই কিন্তু আজকের আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল।

গ্রীসের জ্যোতির্বিজ্ঞানও জ্যোতিষর্চচা সমকালীন ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল দিগবিজয়ী সেনা, নাবিক, পর্যটক ও বণিকদের মাধ্যমে।

গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষচর্চা শুরু হয়েছিল আরব দেশগুলোতে। আরবরা তাদের জ্যোতিষচর্চায় নিজস্ব গণিতশাস্ত্রকে প্রয়োগ করেছিল।

প্রাচীন ভারতের আর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদের পরিচয় আমরা পেলাম দ্বাদশ শতকের শুরুতে। ইনি ভাস্করাচার্য। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য প্রথম জানালেন পৃথিবীর ব্যাস। ওই শতকেই বঙ্গদেশে সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রও রাজশক্তিব পৃষ্ঠপোষকতা পেযেছিল। সেই সময রচিত গ্রন্থেব একটা বিরাট অংশই দখল কবেছিল জ্যোতিষশাস্ত্র।

শত-সহস্র বছর ধরে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা কাজ করছিল। আমাদের প্রিয বাসভূমি পৃথিবীই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। এতদিনকার জ্যোতির্বিদা ও জ্যোতিষীদের ধারণাকে খান খান কবে ভেঙে দেওযার কাজে হাত দিলেন কোপারনিকাস (খ্রীস্টাব্দ ১৪৭৩ - ১৫৪৩)। জন্ম পোল্যাণ্ডে। তিনি একটি বই লেখেন "On the revolution of the heavenly spheres' বাংলায় বলা যায "স্বর্গীয় গোলকদেব আবর্তন বিষযে"। কোপারনিকাস জানালেন সূর্য স্থির। পৃথিবী লাট্টুব মতো পাক খেতে খেতে সূর্যের চাবদিকে প্রতিনিয়ত ঘুরে চলেছে। অন্যান্য গ্রহরাও সূর্যেব চারদিকে ঘুরছে।

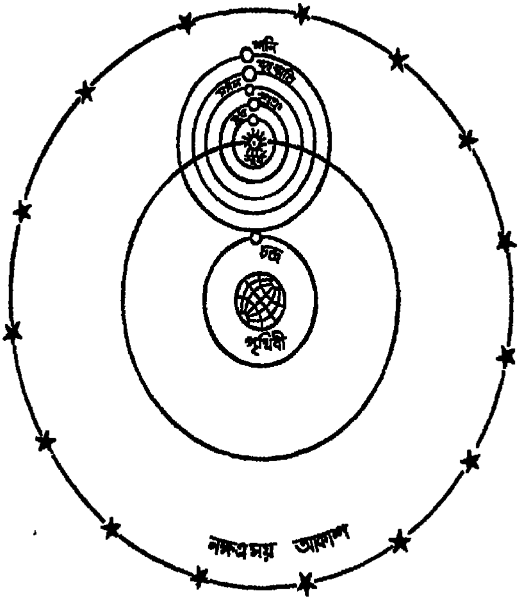


কোপাবনিকাসেব পরিকল্পনাব সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব

কোপারনিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন গিযোভানো ব্রুনো (খ্রীস্টাব্দ ১৫৪৮ ১৬০০)। জন্ম ইতালিতে। তিনি ইউবোপের বিভিন্ন স্থানে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রচার করতে

শুরু করলেন। রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো এমন ধর্মবিরোধী কথা প্রচার করার অপরাধে ব্রুনোকে বন্দী করল। আটকে রাখা হলো একটা ঘরে। ঘরের ছাদ মুড়ে দেওয়া হলো সীসে দিয়ে। গ্রীষ্মে ঘর হতো আগুন, শীতে বরফ। দীর্ঘ আট বছর আটকে রেখে বিচারের নামে চলল প্রহসন। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি ব্রুনোকে প্রকাশ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো।

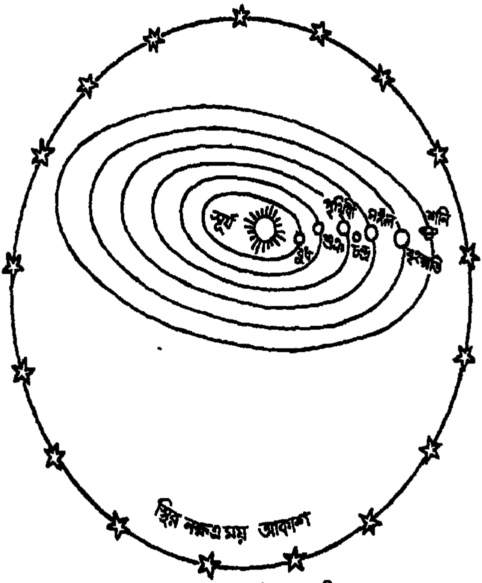
এলেন জোহান কেপলার (খ্রীস্টাব্দ ১৫৭১ - ১৬৩০)। জন্ম জার্মানে। গরীব ঘরের ছেলে। চার-বছর বয়েসে অসুখে ভুগে হারিয়েছিলেন বাঁ'হাত। দৃষ্টিশক্তিও ছিল ক্ষীণ। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের সঙ্গে কেপলারের পরিচয়। ব্রাহে কেপলারের বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস



টাইকো ব্রাহে বিশ্বজগতের যে চিত্রটি কল্পনা করেছিলেন

করতেন না। ব্রাহের আকাশ সম্পর্কে তত্ত্ব সংগ্রহ ছিল অসামান্য ও বিপুল। কেপলার ব্রাহের সংগৃহীত তত্ত্বগুলোকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। গ্রহরা আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরছে ধরে নিয়ে অঙ্ক কষতে গিয়ে দেখলেন ব্রাহের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার অঙ্ক মিলছে না। কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে অঙ্ক কষতে শুরু করলেন। তাতেও মিলল না। এমনি করে কেটে গেল আটটা বছর। কেপলার এক সময় গ্রহদের কক্ষপথকে বৃত্ত না ধরে উপবৃত্ত কল্পনা করে অঙ্ক কষতে বসলেন। কেপলারের দীর্ঘ সাধনা সার্থক হলো, অঙ্ক মিলল। কেপলার গ্রহদের গতি গাণিতিক সূত্রে প্রমাণ করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন পৃথিবীসহ সব গ্রহগুলো উপবৃত্তাকারে ঘুরছে। ফলে গ্রহগুলো বিভিন্ন সময়ে সূর্যের থেকে বিভিন্ন দূরত্বে থাকে। গ্রহগুলো যতই সূর্যের

কাছাকাছি হয়, ততই তাদের গতিবেগ বাড়ে। কেপলারের এই মতামত সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে পরিবর্তীকালে সর্বজনগ্রাহ্য করায় প্রবল ভূমিকা নিয়েছিল।



কেপলারের পরিকল্পনায় সৌরজগতের চিত্র

অ্যারিস্টর্কাসের গ্রন্থ, কোপারনিকাসের গ্রন্থ, ব্রুনোর প্রচেষ্টা ও কেপলারের গাণিতিক সূত্র, দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায়ও অতি সামান্য সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। তখন শুধুমাত্র দৃষ্টির উপর নির্ভর করে গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করতে হতো। আর এই কাজটা ছিল অতি মাত্রায় কষ্টসাধ্য।

এলেন গ্যালিলিও (খ্রীস্টাব্দ ১৫৬৪ - ১৬৪২)। যাঁকে বলতে পারি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্মদাতা। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনের সাহায্যে প্রথম আকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন ১৬০৯ সালে। দূরবীন গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে এলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বড় বেশি কাছে। গ্যালিলিও দেখলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ, শুক্রের চন্দ্রকলার মতই হ্রাস-বৃদ্ধি। কিন্তু গ্যালিলিওর এইসব কথাবার্তা ও সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো ক্ষেপে উঠলো, একি ধর্ম বিরোধী কথা। গ্যালিলিওর বিচার শুরু হলো ১৬৩৩এর ২০জুন।

বিচারে গ্যালিলিও অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি হিসেবে বন্দীজীবনে শুরু হলো অকথ্য নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ও মৃত্যুদণ্ড এড়াতে গ্যালিলিও লিখিতভাবে জানালেন, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ। তিনি তাঁর তত্ত্ব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছেন। প্রাণদণ্ডের হাত থেকে বাঁচলেও বন্দীজীবন থেকে তিনি মুক্তি পাননি। ১৬৪২ সালে গ্যালিলিও শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।



১৬৪২ সালেই জন্মালেন আইজ্যাক নিউটন। আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষ ও তার নিয়মকানুন। ফলে গ্রহদের নির্ভুল গতিবিধি নির্ণয় করা গেল।

নিউটনের আগে সংখ্যাগুরু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জ্যোতিষ চর্চায় গণিত থাকলেও বিজ্ঞান ছিল না; ছিল অসম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy) ও জ্যোতিষশাস্ত্র বা ফলিত জ্যোতিষ (astrology) এর মধ্যে ছিল না সুস্পষ্ট কোনও পার্থক্য।

জ্যোর্তিবিদ্যা বাস্তবিকই জ্যোতির্বিজ্ঞান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে অবিরত গতিতে রচিত হয়েই চললো পার্থক্যের ব্যাপকতা। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠা পেল জ্যোতির্বিদ্যা, অ-বিজ্ঞান হিসেবে পরিত্যক্ত হলো জ্যোতিষশাস্ত্র বা ফলিত জ্যোতিষ।

মহাকাশযুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার সামান্যতম কৃতিত্বেও অংশীদার নয় ফলিত জ্যোতিষ। ফলিত জ্যোতিষ জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছ থেকে জেনেছে বিভিন্ন গ্রহ-পরিচয়, অবস্থিতি, গতি-প্রকৃতি। কিন্তু মানুষের জন্মকালে এইসব গ্রহ অবস্থানের উপর জাতকের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়—এই বক্তব্যের পিছনে প্রমাণ কোথায়? জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফসল আধুনিক এফিমেরিসের সাহায্যে গ্রহগুলির সঠিক অবস্থান জেনে নিয়ে ফলিত জ্যোতিষ মানুষের ভাগ্য গণনা করলেই ভাগ্য গণনা অভ্রান্ত হবে না, এবং এফিমেরিসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—এই অজুহাতে ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান হয়ে যাবে না। শুধু এটুকুই বলা যাবে—ভাগ্য গণনার জন্য যে গ্রহ অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, সেগুলো নির্ভুল। কিন্তু নির্ভুল গ্রহ অবস্থান জানতে পারলে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বলা যাবে—এমনটা বিশ্বাস করার মত কোনও প্রমাণই জ্যোতিষীরা আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারেননি। জ্যোতিষীরা এমন একটা অদ্ভুত যুক্তির কথা প্রায়ই হাজির করেন—"জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠে জ্যোতিষশাস্ত্র অবিজ্ঞান হবে কী করে?"

এই ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত কি না, একটু দেখা যাক। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে শোভনচন্দ্র ঋণ নিয়ে একটি চিনে রেস্তোরা খুলে বসলেন দমদমের নাগের বাজারে। এয়ারকুলার মেশিন বসিয়ে চিনে কায়দায় হোটেল সাজিয়ে বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে ফেললেন। এবং আঠার মাসে আঠারজন খদ্দের পেয়ে রেস্তোরায় লালবাতি জ্বালতে বাধ্য হলেন। তারপরও শোভনচন্দ্র অশোভনভাবে কারবার বন্ধ করতে রাজী হলেন না। ধার পাওয়ার আশায় হাজির হলেন তাঁর স্কুল- জীবনের বন্ধু জ্যোতিষসম্রাট শ্রীগৌতম গুলানির কাছে। এক সঙ্গে ক্লাশ টেনে তিনটি বছর পড়াশুনা করেছিলেন শোভনচন্দ্র ও শ্রীগৌতম গুলানি। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, শ্রী গৌতম বেজায় গরীব থেকে বেজায় ধনী হয়েছেন জ্যোতিষশাস্ত্রের কল্যাণে। কিন্তু এখনও শোভনচন্দ্র ও শ্রীগৌতমের বন্ধুত্বে একটুও চিড় ধরেনি। শোভনচন্দ্র শ্রীগৌতমের কাছে লাখ তিনেক টাকা ধার চাইলেন রেস্তোরার শ্রীবৃদ্ধি করতে। শোভনচন্দ্রের ব্যবসার হালত জানতে, ধার শোধ করতে পারবেন কি না বুঝতে শ্রীগৌতম জানতে চাইলেন ব্যবসা কেমন চলছে? খদ্দের কেমন হচ্ছে? লাভ আসছে তো? শোভনচন্দ্র জানালেন, "ব্যবসা দারুণ চলছে। খদ্দের সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। লাভ হচ্ছে ফ্যানটাসটিক।"

"চিলে কান নিয়ে গেল" বললেই শ্রীগৌতম চিলের পেছনে ছোটার বান্দা নন। অতএব শোভনচন্দ্রের ব্যবসার খবরাখবর নিতে সেই সব লোক লাগালেন, যারা খদ্দেরদের খবরাখবর এনে দিয়ে তাঁর জ্যোতিষ-ব্যবসার রমরমা তৈরি করেছে। ইনফরমাররা জানাল রেস্তোরায় আঠার মাসে আঠারটি খদ্দের আসার খবর। শোভনচন্দ্র ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে চাইছিলেন বুঝতে পেরে শ্রীগৌতম যখন ক্ষেপে আগুন, ঠিক সেই সময় শোভনচন্দ্রের আগমন ঘটল। শোভনচন্দ্রকে দেখে শ্রীগৌতম গাল পাড়তে লাগলেন, "ইঁদুর, ছুঁচো, গিরগিটি, কুমীর" ইত্যাদি

ইত্যাদি বলে। শোভনচন্দ্র এমনতর গাল-পাড়ার কারণ জানতে চাইলে শ্রীগৌতম বললেন, "তুমি তোমার ব্যবসা সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যে তথ্য দিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলে।" বন্ধুর এমন কথায় শোভনচন্দ্র লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলেন। বললেন, "আরে ছিঃ, ছিঃ। আমি বলব মিথ্যে? তাও তোমাকে? আরে ভাই, আমি ধার নিয়েছি ভারতের সব সেরা ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। স্টেট ব্যাঙ্কের ব্যবসা দারুণ চলছে; খদ্দেরও আসছে প্রচুর। সত্যি বলছি ভাই, স্টেট ব্যাঙ্ক লাস্ট ইয়ারে ফ্যানটাসটিক লাভ করেছে।"

শোভনলালের এমন উদ্ভট কথা শুনে শ্রীগৌতমের রাগটা গেল চড়ে। গলা চড়িয়ে বললেন, "স্টেট ব্যাঙ্কের ভাল ব্যবসা, অনেক খদ্দের, অনেক লাভ, তো তোমার কী? তুমি তো বাপু তোমার কারবারে লালবাতি জ্বেলেছ। তোমার মত এমন মিথ্যেবাদী বন্ধুকে ধার দেব কোন্ ভরসায়?"

শোভনচন্দ্র বন্ধুর এমন কথায় আবার একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাফল্য যদি জ্যোতিষশাস্ত্রের সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে, তবে স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে স্টেট ব্যাঙ্কের সাফল্য কেন আমার ব্যবসার সাফল্য হবে না?"

শ্রীগৌতম শোভনচন্দ্রের যুক্তিকে মেনে নিলে গচ্ছা যায় কয়েক লক্ষ টাকা। আর না মানলে জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে নিজের দাবিই নস্যাৎ হয়ে যায়। এমত অবস্থায় শ্রীগৌতম কী করবেন, সেটা শ্রীগৌতমের সমস্যা। আসুন, আমরা বরং এখন একটু অন্য সমস্যায় মাথা ঘামাই। 'এফিমেরিস' কথাটা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তখন না করায় অনেকের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট না হতেই পারে ভেবে, একটু আলোচনায় যাচ্ছি।

পৃথিবীতে যত মানমন্দির (observatory) আছে সেইসব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অংক কষে এদের যে অবস্থান ও গতিপথ পাওয়া গেছে তা দূরবীনে দেখা অবস্থান ও গতিপথের সঙ্গে মিলছে কি না দেখা হয়। কোনও পার্থক্য দেখা গেলে সে বিষয়ে গবেষণা চালান হয়। প্রয়োজনে সূত্রাবলীর সংস্কার করা হয়। সমস্ত মানমন্দিরের কাজে সমন্বয়সাধনের জন্য গঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন। কোনও মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণের পর কোনও রকমের সন্দেহ দেখা দিলে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ইউনিয়নকে জানায়। ইউনিয়ন অন্যান্য মানমন্দিরকে বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত করে। চলে গবেষণা। তারপর ইউনিয়নের নেতৃত্বেই সূত্রাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়। পৃথিবীর আটটি দেশের এফিমেরিস সেন্টার থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কে তথ্য এবং মহাকাশ বিষয়ক আরও নানা তথ্যসম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়। এই বইকেই বলে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এফিমেরিস, সংক্ষেপে এফিমেরিস।

পাঁচ

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি

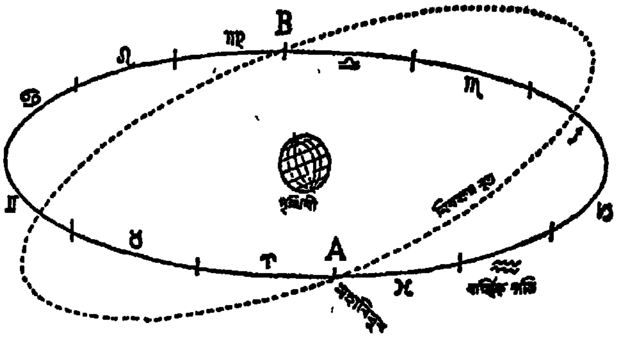
জ্যোতিষে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনান, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণী মিলে যাওযার গাযে কাঁটা দেওয়া গল্প। বাস্তবিকই তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতাতেই যেমন কল্পনার রঙ মেশান থাকে, আবার কিছু কিছু অভিজ্ঞতায থাকে বাস্তবের ছোঁযা। কেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেলে, মেলার সঙ্গে বাস্তবিকই জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্পর্ক আছে কিনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই কীভাবে মেলান যায এবং জ্যোতিষীদের এই মিলিযে দেবার পেছনে ফাঁক আর ফাঁকিই বা কোথায়, সেই প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে পর্যাযক্রমে নিশ্চযই আসব। আসব জ্যোতিষীরা এই শাস্ত্রের পক্ষে কি কি যুক্তির অবতারণা করেন ; যুক্তিগুলো কতখানি গ্রহণযোগ্য ; জ্যোতিষশাস্ত্রের বুজরুকির বিরুদ্ধে যুক্তিগুলো কী কী, এইসব প্রসঙ্গ নিযেও আলোচনায আসব আমরা। কিন্তু যে শাস্ত্রটিকে নিযে এই বিতর্ক, সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা রাখা সবার আগে একান্তই প্রযোজন। এই প্রযোজনীয বিষয নিযে আলোচনাটা গোড়াতেই সেরে নিই আসুন।

জ্যোতিষীরা জাতকের জন্ম সময় জানার পর সেই সমযে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কোথায অবস্থান করছিল বের করেন। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানার জন্য তাঁরা বিভিন্ন পত্রিকা বা এফিমেরিসের সাহায্য নিযে থাকেন। তারপর এই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের একটি চিত্র বা ছক তৈরি করা হয। এই জন্মছক বা রাশিচক্রের ওপর নির্ভর করে জ্যোতিষীরা জাতকের ভবিষ্যৎ গণনা করে থাকেন। এ-ছাড়া আরও এক শ্রেণীর জ্যোতিষী আছেন যাঁরা জাতকের হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেন। এই দুই ধরনের ভাগ্য গণনা-পদ্ধতি বেশি জনপ্রিয। এর বাইরে কেউ কেউ আবার কপাল দেখে, কান দেখে, এমন কি পাযের রেখা দেখেও ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। তবে এই শ্রেণীর ভবিষ্যৎ-বক্তারা সংখ্যায অতি নগণ্য। আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের জনপ্রিয দুই পদ্ধতি, রাশিচক্র ও হস্তরেখা নিযে আলোচনা করব। প্রথমে আসা যাক রাশিচক্রে।

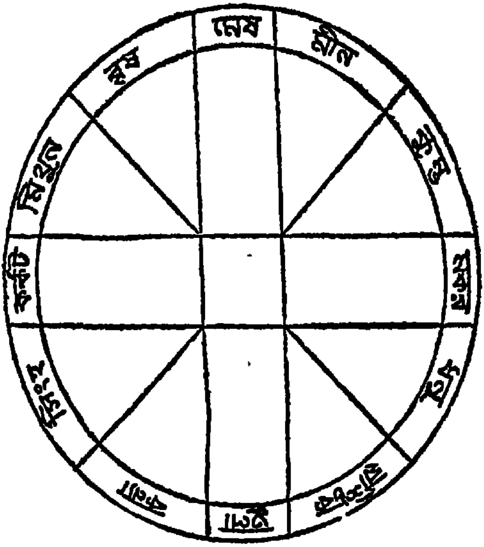
প্রতিটি জন্ম-পত্রিকার, ঠিকুজীর বা কোষ্ঠীর শীর্ষে আঁকা থাকে একটি ছক বা রাশিচক্র। রাশিচক্রে রযেছে বারোটি ঘর। কাল্পনিক রেখায ভাগ করা বারোটি ঘর প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আকাশপটের ক্রান্তিবৃত্তের মানচিত্র। বিষুবরেখার উত্তরে কল্পনা করা হযেছে মেষ, বৃষ, মিথুন,

কর্কট, সিংহ ও কন্যারাশি। বিষুবরেখার দক্ষিণে কল্পনা করা হয়েছে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনরাশি।

রাশিচক্রের ৩৬০° ডিগ্রিকে মোট ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি রাশিতে থাকছে ৩০° ডিগ্রি। নীচের ছবি দেখলে বোঝা যাবে :



ভারতীয় মতে রাশিচক্র



রাশিচক্র

কাল্পনিক বারো ভাগের যে যে ভাগে যে যে নক্ষত্রগুলোকে দেখা গেল সেই নক্ষত্রগুলোকে কাল্পনিক রেখা জুড়ে দিতে জ্যোতিষীরা কল্পনায় দেখতে পেলেন এক একটি চিত্র। এই চিত্রগুলোর সঙ্গে যে যে প্রাণী বা বস্তুর মিল খুঁজে পেলেন, সেই নামেই সেই ভাগের ঘরটির রাশির নামকরণ করলেন।

ভারতীয় মতে রাশির আকৃতি

১।	মেষ	মেষাকৃতি।
২।	বৃষ	বৃষাকৃতি।
৩।	মিথুন	একাসনস্থিত স্ত্রী ও পুরুষ।
৪।	কর্কট	কর্কটাকৃতি।
৫।	সিংহ	সিংহাকৃতি।
৬।	কন্যা	নৌকাতে চড়া, অগ্নি ও শস্যধারিণী কুমারী।
৭।	তুলা	দাঁড়িপাল্লার আকৃতি।
৮।	বৃশ্চিক	কাঁকড়াবিছার আকৃতি।
৯।	ধনু	উর্ধ্বভাগ ধনুকধারী পুরুষ ও নিম্নভাগ অশ্বাকৃতি।
১০।	মকর	মকরাকৃতি।
১১।	কুম্ভ	কাঁধে ঘট নিয়ে পুরুষ।
১২।	মীন	পরস্পর বিপরীত পুচ্ছ স্পর্শ করা দুটো মাছ।

জ্যোতিষীরা তাঁদের কল্পনাকে আরো প্রসারিত করে বিভিন্ন রাশির জাতকের মধ্যে রাশির কল্পনিক আকৃতির দোষ-গুণ আরোপ করে বসলেন।

নক্ষত্র

জ্যোতিষীদের ধারণায় রাশির বারো ভাগে রয়েছে ২৭টি প্রধান নক্ষত্র। এই নক্ষত্রগুলোও পৃথিবী এবং জীবজগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই ২৭টি নক্ষত্র হলো (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্বফাল্গুনী, (১২) উত্তরফাল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

এই ২৭টি নক্ষত্র কিন্তু ২৭টি নক্ষত্র মাত্র নয়। এক বা একাধিক নক্ষত্র নিয়ে এই ২৭টি নক্ষত্রের নামকরণ হয়েছে। যেমন—

১।	অশ্বিনী	—	তিনটি নক্ষত্র।
২।	ভরণী	—	তিনটি নক্ষত্র।
৩।	কৃত্তিকা	—	ছয়টি নক্ষত্র।

৪।	রোহিণী	—	পাঁচটি নক্ষত্র।
৫।	মৃগশিরা	—	তিনটি নক্ষত্র।
৬।	আর্দ্রা	—	একটি নক্ষত্র।
৭।	পুনর্বসু	—	দুটি নক্ষত্র।
৮।	পুষ্যা	—	তিনটি নক্ষত্র।
৯।	অশ্লেষা	—	ছয়টি নক্ষত্র।
১০।	মঘা	—	পাঁচটি নক্ষত্র
১১।	পূর্বফাল্গুনী	—	দুটি নক্ষত্র
১২।	উত্তরফাল্গুনী	—	দুটি নক্ষত্র
১৩।	হস্তা	—	পাঁচটি নক্ষত্র
১৪।	চিত্রা	—	একটি নক্ষত্র
১৫।	স্বাতী	—	একটি নক্ষত্র
১৬।	বিশাখা	—	চারটি নক্ষত্র
১৭।	অনুরাধা	—	ছয়টি নক্ষত্র
১৮।	জ্যেষ্ঠা	—	আটটি নক্ষত্র
১৯।	মূলা	—	বারটি নক্ষত্র
২০।	পূর্বাষাঢ়া	—	চারটি নক্ষত্র
২১।	উত্তরষাঢ়া	—	দুটি নক্ষত্র
২২।	শ্রবণা	—	তিনটি নক্ষত্র
২৩।	ধনিষ্ঠা	—	পাঁচটি নক্ষত্র
২৪।	শতভিষা	—	শত নক্ষত্র
২৫।	পূর্বভাদ্রপদ	—	দুটি নক্ষত্র
২৬।	উত্তবভাদ্রপদ	—	দুটি নক্ষত্র
২৭।	বেরতী	—	বত্রিশটি নক্ষত্র

নক্ষত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার

জ্যোতিষীদের বিচারে মোটামুটিভাবে নক্ষত্রদের প্রভাব জাতকের চরিত্রের উপব যে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে তার একটি তালিকা দিলাম।

অশ্বিনী—সুন্দর তনু, সৌন্দর্যের পূজারী, সর্বজনপ্রিয়, চতুর, শিক্ষিত, ধনশালী, অবিচলিত, পেশায় চিকিৎসক, অধ্যাপক বা ইঞ্জিনিয়ার।

ভরণী—দৃঢ়, সত্যবাদী, স্বাস্থ্যবান, স্ফূর্তিময় জীবন, শিক্ষিত ও সম্পদশালী।

কৃত্তিকা—পেটুক, কামুক, বলবান, নীতিবাগীশ, প্রসিদ্ধ, রাজপ্রিয় ও উচ্চ ক্ষমতালোভী। প্রথম জীবনে কষ্ট করতে হয়।

রোহিণী—সত্যবাদী, সুতার্কিক, দৃঢ়চিত্ত, দাতা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন।

মৃগশিরা—সংযমী চরিত্র, সুবক্তা, ধনী, সরল জীবনযাত্রায় ভক্ত, স্নানপ্রিয়।

আর্দ্রা—অলস, স্বার্থপর, গর্বিত, অকৃতজ্ঞ, মন্দস্বভাব ও হঠাৎ ক্রোধী।

পুনর্বসু—সুন্দর স্বভাব, চতুব, অকর্মণ্য, পানরত, হিংস্র ও স্পষ্টবক্তা।

পুষ্যা—আইনজ্ঞ, কর্তব্যপরায়ণ, সু-চরিত্র, শিক্ষিত, সর্বজনপ্রিয়, দৃঢ়, সংকল্পে অটল, বিদ্বান ও সাহিত্যিক হন।

অশ্লেষা—বলবান, প্রফুল্ল, বিজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, খর-চিহ্বা।

মঘা—ধনী, ঈশ্বরভক্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, চঞ্চল, কুসুম ও সুগন্ধপ্রিয় ও বহু দাস-দাসীর অধিকারী।

পূর্বফাল্গুনী—দযালু, মধুরভাষী, দূরদ্রষ্টা, উচ্চপদধারী, দুর্বল, পেশায বণিক বা ব্যবসায়ী।

উত্তরফাল্গুনী—চিন্তাশীল, সত্যবাদী, রগচটা, দৃঢ়চিত্ত ও অতি পেটুক।

হস্তা—শিক্ষিত, সংকল্পে দৃঢ়, সৌন্দর্যের পূজারী, কৃতজ্ঞ, মধ্যবযস থেকে ধনবান, লজ্জাশূন্য, নির্দয় ও প্রচ্ছন্ন শক্তিশালী।

চিত্রা—সু-নেত্র, মানানসই তনু, সু-চরিত্র, ভূষণভক্ত, স্থূল, ভাঁড়, বিষণ্ণ, ধীরস্থির, অভিনেতা, দযালু ও শ্রীযুক্ত।

স্বাতী—মনোরমস্বভাব, দযালু, ধার্মিক, বিজ্ঞ, পিতৃ-মাতৃভক্ত, সু-কণ্ঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাষ্ট্রনেতা।

বিশাখা—হিংসুক, কৃপণ, সংযতবাক্, কৌতুহলী, ক্রোধী, ধার্মিক।

অনুরাধা—ধনবান, সজ্জন কর্তৃক প্রশংসিত, কর্তব্যপরায়ণ, সু-কেশ, রক্তিম নেত্র, তাম্বুলপ্রিয, উগ্র যৌনক্ষুধা, ভ্রমণপটু।

জ্যেষ্ঠা—বিদ্রোহী, ক্রোধী, কর্কশভাষী, দবিদ্র, মিথ্যাবাদী, কৃপাশীল, স্বল্পবন্ধু, মুগ্ধকর বাক্যবিদ্ ও প্রফুল্ল।

মূলা—গর্বিত, ধনী, দৃঢ়মনা, সহজ প্রেমিক, রগচটা, স্বজনহীন ও নীতিপরায়ণ।

পূর্বাষাঢ়া—দীর্ঘদেহী, গর্বিত, প্রেমময়ী ভার্যার পতি, দূরদ্রষ্টা, মাতৃভক্ত, সত্যবাদী, ভ্রমণবিলাসী, রমণীপ্রিয, ধনবান।

উত্তরাষাঢ়া—তেজস্বী, দীর্ঘনাসিকা, কৃতজ্ঞ, সমাজপ্রিয, সরল, ধার্মিক, পিতৃমাতৃভক্ত, ভোজনবিলাসী, আত্মীযবৎসল।

শ্রবণা—পণ্ডিত, খ্যাতিমান, সময়োপযোগী, রতিপটু, নারী-আসক্ত, সুগন্ধ-প্রীতি, সৌন্দর্য-পূজারী, ভদ্র ও নম্র।

ধনিষ্ঠা—নির্জীব, স্বাধীনচেতা, মহৎ, বিপ্লবী, উচ্চমতাবলম্বী, গুরুজনপ্রিয় ও সঙ্গীতাসক্ত।

শতভিষা—আইনবিদ্, নিজ সংকল্পে অটল, সত্যবাদী, কর্কশভাষী, শিক্ষিত, উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান, আস্থাবান ও আমলাপূজক, অতি সাহসী, নিষ্ঠুর, চতুর, শত্রুর প্রতি নিদারুণ।

পূর্বভাদ্রপদ—বিষণ্ণ, নারীর বশীভূত, রমণীসম্পদ প্রত্যাশী, সুচারুবাক্, শিক্ষিত, নাস্তিক, হিংস্র ও পরশ্রীকাতর।

উত্তরভাদ্রপদ—দযালু, বাক্পটু, চতুর, তার্কিক, নীতিহীন।

রেবতী—সুন্দরদেহী, বীর, অন্যেব সম্পদ-লাভ, নারীব প্রতি আসক্তি, সহজে বশীভূত, সুন্দব বচন,- অনিন্দ্যনীয়।

পাশ্চাত্য মতে রবির সঙ্গে রাশি বিচার

পাশ্চাত্য মতে জাতকের জন্ম সময়ে রবি যে রাশিতে অবস্থান করে সেটাই জাতকের বাশি। বছরের বিভিন্ন সময়ে রবির ১২টি রাশিতে অবস্থান এইভাবে সূচীত হয়—

	রাশির নাম	রবির অবস্থান কাল
১।	মেষে রবি থাকে	২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল
২।	বৃষে রবি থাকে	২১ এপ্রিল থেকে ২০ মে
৩।	মিথুনে রবি থাকে	২১ মে থেকে ২০ জুন
৪।	কর্কটে রবি থাকে	২১ জুন থেকে ২০ জুলাই
৫।	সিংহে রবি থাকে	২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট
৬।	কন্যায় রবি থাকে	২২ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর
৭।	তুলায় রবি থাকে	২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ আক্টোবর
৮।	বৃশ্চিকে রবি থাকে	২৩ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর
৯।	ধনুতে রবি থাকে	২৩ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর
১০।	মকরে রবি থাকে	২১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারী
১১।	কুম্ভে রবি থাকে	২০ জানুয়ারী থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী
১২।	মীনে রবি থাকে	১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ মার্চ

রাশি নির্ণয়ের ভারতীয় পদ্ধতি

ভারতীয় জ্যোতিষীদের মতে রাশি ও চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। কোনও জাতকের জন্মরাশি নির্ণীত হয় জন্মকালীন চন্দ্রের অবস্থানের উপর। জাতকের জন্মকালীন চন্দ্র যে নক্ষত্রযুক্ত ছিল, জাতকের জন্ম-নক্ষত্রও সেই নক্ষত্রই হবে।

জাতকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত যে গ্রহগুলি

জাতকের ভাগ্য নিযন্ত্রণের ক্ষেত্রে নক্ষত্রের চেয়ে গ্রহগুলির ভূমিকা প্রবল বলে জ্যোতিষীরা কল্পনা করেন। জন্মকালীন গ্রহ-অবস্থানের উপর জাতকের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় বলে জ্যোতিষীরা কল্পনা করেন।

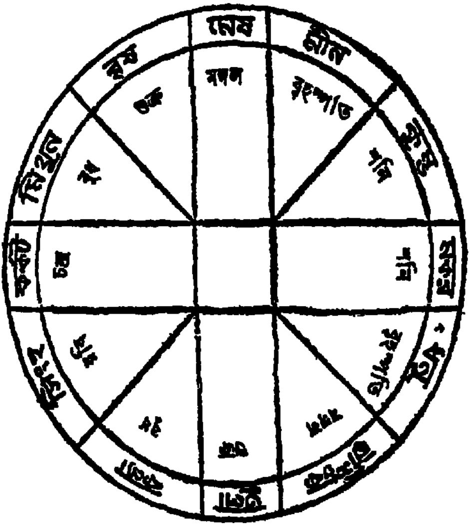
জ্যোতিষীদের মতে ৯টি গ্রহ আমাদের ভাগ্যকে নির্ধারিত ও নিযন্ত্রিত করে। গ্রহগুলো হলো (১) বুধ, (২) শুক্র, (৩) মঙ্গল, (৪) বৃহস্পতি, (৫) শনি, (৬) রবি, (৭) চন্দ্র, (৮) রাহু, (৯) কেতু।

গ্রহ-অবস্থান ও জ্যোতিষ-বিচার, স্বক্ষেত্র, ত্রিকোণ, তুঙ্গস্থান, নীচস্থ

স্বক্ষেত্র

জ্যোতিষীদের কল্পনায় জাতকের জন্মকালে গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকলে গ্রহটি জাতকের ভাগ্যের ক্ষেত্রে ভাল বলে বিবেচিত হয়। গ্রহ মূল-ত্রিকোণে থাকলে অধিকতর ভাল ফল দেয় এবং তুঙ্গস্থানে সবচেয়ে ভাল ফল দিয়ে থাকে। গ্রহ নীচস্থ থাকলে খারাপ ফল দেয়।

জ্যোতিষীরা স্বক্ষেত্র বা নিজেদের ক্ষেত্র অথবা গৃহ বা ঘর কল্পনা করেছেন বিভিন্ন গ্রহের। কোন্ গ্রহের স্বক্ষেত্র কোন্‌টি নীচের ছবিটি দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

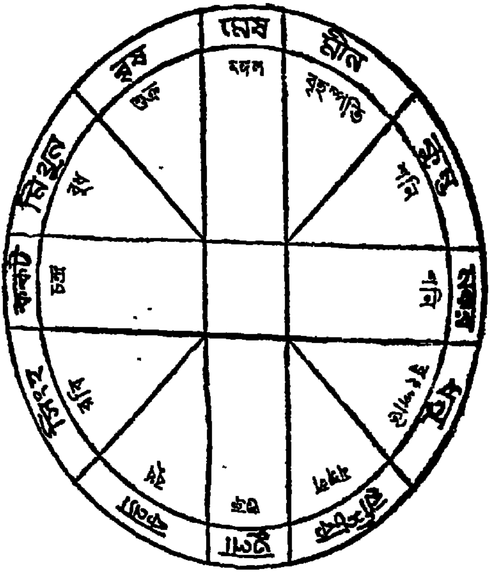


এখানে আমরা দেখছি যে, প্রতিটি গ্রহের দুটো করে ঘর স্বক্ষেত্র। শুধু চন্দ্র ও রবির স্বক্ষেত্র একটি করে ঘর।

জ্যোতিষীরা কল্পনা করেন গ্রহগুলো তাদের স্বক্ষেত্রের অধিপতি। অর্থাৎ
মেষ ও বৃশ্চিকরাশির অধিপতি মঙ্গল।
বৃষ ও তুলারাশিব অধিপতি শুক্র।
মিথুন ও কন্যারাশির অধিপতি বুধ।
কর্কটরাশির অধিপতি হল চন্দ্র।
সিংহরাশির অধিপতি হল রবি।
ধনু ও মীনরাশির অধিপতি হল বৃহস্পতি।

মকর ও কুম্ভরাশির অধিপতি হল শনি।

নীচের ছবি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে।



ত্রিকোণ

জ্যোতিষশাস্ত্রে ত্রিকোণ বলতে বোঝায় লগ্ন, নবম ও পঞ্চম এই তিনটি ভাবকে। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম রাশির নাম-কেন্দ্র।

আবার গ্রহরা কিছু ঘরে থাকতে খুবই ভালবাসে এবং জাতককে ভাল ফল দেয বলে জ্যোতিষীরা কল্পনা করেন। গ্রহদের ভালবাসার অবস্থানকে বলা হয মূল-ত্রিকোণ।

তুঙ্গ-স্থান

তুঙ্গ-স্থানে গ্রহগুলো সাধারণভাবে শুভফলদানকারী বলে জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন।

মঙ্গলগ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল মকররাশিব ২৮° ডিগ্রির মধ্যে।

শুক্র গ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল মীনরাশির ২৭° ডিগ্রির মধ্যে।

বুধ গ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল কন্যারাশির ১৫° ডিগ্রির মধ্যে।

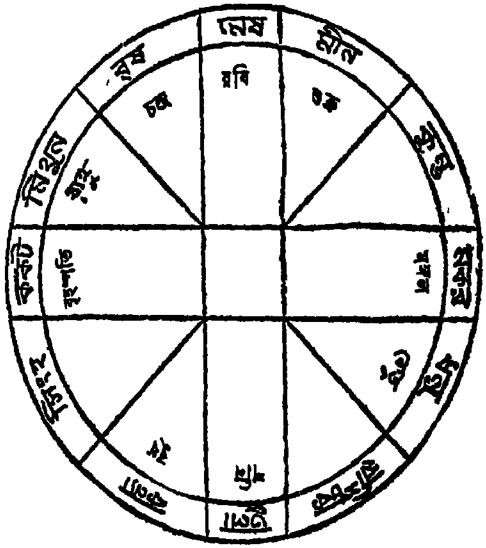
বৃহস্পতি গ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল কর্কটরাশির ৫° ডিগ্রির মধ্যে।

চন্দ্রগ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল বৃষরাশির ৩০° ডিগ্রির মধ্যে।

রবি গ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল মেষরাশির ১০° ডিগ্রির মধ্যে।

শনি গ্রহের তুঙ্গ-স্থান হল তুলারাশির ২০° ডিগ্রির মধ্যে।

নীচের ছবি দেখুন :—



গ্রহদেব তুঙ্গ-স্থানের চিত্র

নীচস্থ স্থান

গ্রহরা বিশেষ বিশেষ রাশিতে খুবই দূর্বল বলে কল্পনা করা হয়েছে। দূর্বলতা হেতু ফলও খারাপ দিয়ে থাকে। যে গ্রহ যে বাশিতে দূর্বল বা খারাপ ফল দিযে থাকে, তাকে বলা হয় গ্রহটির নীচস্থ ঘর। ছবিতে গ্রহগুলোর নীচস্থ ঘবের পরিচয দিলাম।

মঙ্গল গ্রহের নীচ-স্থান হল কর্কটরাশির ২৮° ডিগ্রির মধ্যে।

শুক্র গ্রহের নীচ-স্থান হল কন্যারাশির ২৭° ডিগ্রির মধ্যে।

বুধ গ্রহের নীচ-স্থান হল মীনরাশির ১৫° ডিগ্রির মধ্যে।

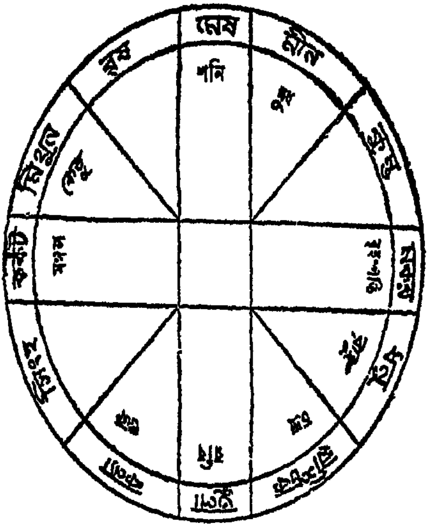
বৃহস্পতি গ্রহের নীচ-স্থান হল মকররাশির ৫° ডিগ্রির মধ্যে।

চন্দ্র গ্রহের নীচ-স্থান হল বৃশ্চিকরাশির ৩° ডিগ্রির মধ্যে।

ববি গ্রহেব নীচ স্থান হল তুলারাশি ১০° ডিগ্রির মধ্যে।

শনি গ্রহের নীচ-স্থান হল মেষবাশিব ২০° ডিগ্রির মধ্যে।

নীচের চিত্র দেখলে বোঝা যাবে :–



গ্রহদের নীচস্থ স্থানের চিত্র।

জ্যোতিষ মতে শুভগ্রহই হোক, আর অশুভগ্রহ বা পাপগ্রহই হোক, গ্রহ উচ্চস্থ হলে ফলের শুভতা ও নীচস্থ হলে অশুভের আধিক্য ঘটে থাকে। বিষয়টি আরও একটু বিস্তৃত করছি। শুভগ্রহ উচ্চস্থ হলে সম্পূর্ণ শুভফল দেয়, মূলত্রিকোণে থাকলে তিন-চতুর্থাংশ শুভফল দেয়, স্বক্ষেত্রে থাকলে শুভফল দেয় অর্ধেক এবং মিত্রক্ষেত্রে থাকলে শুভ ফল দেয় একচতুর্থাংশ, নীচস্থ হলে কিছুমাত্র শুভফল দেয না। আবার অশুভ গ্রহ উচ্চস্থ হলে সম্পূর্ণ অসুভফল দেয়। মূলত্রিকোণে অশুভফল দেয় তিনচতুর্থাংশ, স্বক্ষেত্রে অর্ধেক ও মিত্রক্ষেত্রে একচতুর্থাংশ ও নীচস্থ হলে কিছুমাত্র অশুভফল দেয় না।

রাহুর স্বক্ষেত্র হিসেবে জ্যোতিষীরা কন্যা রাশিকে কল্পনা করেছেন। মূলত্রিকোণ কুম্ভ, তুঙ্গস্থান মিথুন, নীচস্থ স্থান ধনু।

কেতুর ক্ষেত্রে এর বিপরীত। অর্থাৎ কেতুর স্বক্ষেত্র মীন, মূলত্রিকোণ সিংহ, তুঙ্গস্থান ধনু, নীচস্থ স্থান মিথুন।

গ্রহের মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষ গ্রহ

জ্যোতিষীদের ধারণায সব গ্রহের সঙ্গে সব গ্রহের সম্পর্ক সমান হয। কারণ এক একটি গ্রহের সঙ্গে এক একটি গ্রহেব সম্পর্ক ভিন্নতব। একটি গ্রহের কে বন্ধু, কে শত্রু, কে নিরপেক্ষ

এ বিষযেও জ্যোতিষীরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। অবশ্য তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ না ধরে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসকেই পাথেয় করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গ্রহদের মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষদের একটা তালিকা হাজির করছি।

গ্রহের বন্ধু

রবির বন্ধু—চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি।
চন্দ্রের বন্ধু—রবি, বুধ।
মঙ্গলের বন্ধু—রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি।
বুধেব বন্ধু—রবি ও শুক্র।
বৃহস্পতির বন্ধু—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল।
শুক্রের বন্ধু—বুধ ও শনি।
শনির বন্ধু—বুধ ও শুক্র।
রাহুর বন্ধু—শুক্র ও শনি।
কেতুর বন্ধু—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল।

গ্রহের শত্রু

রবিব শত্রু—শুক্র, শনি।
চন্দ্রের শত্রু—চন্দ্রের কোনও শত্রু নেই।
মঙ্গলের শত্রু—বুধ।
বুধের শত্রু—চন্দ্র।
বৃহস্পতির শত্রু—বুধ, শুক্র।
শুক্রেব শত্রু—রবি ও চন্দ্র।
শনিব শত্রু—রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল।
রাহুর শত্রু—রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল।
কেতুর শত্রু—শুক্র ও শনি।

কোন্ গ্রহ কার পক্ষে নিরপেক্ষ

ববিব নিবপেক্ষ গ্রহ—বুধ।
চন্দ্রেব নিরপেক্ষ গ্রহ—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি।
মঙ্গলেব নিবপেক্ষ গ্রহ—শুক্র ও শনি।
বুধেব নিবপেক্ষ গ্রহ—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।
বৃহস্পতিব নিবপেক্ষ গ্রহ—শনি।
শুক্রেব নিবপেক্ষ গ্রহ—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

শনির নিরপেক্ষ গ্রহ—বৃহস্পতি।

রাহুর নিরপেক্ষ গ্রহ—বুধ ও বৃহস্পতি।

কেতুর নিরপেক্ষ গ্রহ—বুধ ও বৃহস্পতি।

গ্রহদের এই মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষদের জ্যোতিষীরা বলেন প্রাকৃতিক-মিত্র, প্রাকৃতিক-শত্রু ও প্রাকৃতিক-নিরপেক্ষ। এ ছাড়াও জ্যোতিষীরা আর একটি গণনার সাহায্যে তৎকালীন মিত্র-শত্রু নির্ণয় করেন। কোনও গ্রহ থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ ঘরে যে গ্রহগুলো অবস্থান করে সেগুলিকে প্রথমোক্ত গ্রহটির তৎকালীন মিত্র হিসেবে ধরা হয়। বাকি ছটি ঘরে অবস্থিত গ্রহগুলোকে প্রথমোক্ত গ্রহটির তৎকালীন শত্রু বলে ধরা হয়ে থাকে।

গ্রহ-ফল বিচারে কী কী দেখতে হয়

জ্যোতিষীদের বিচারে গ্রহরা নানাভাবে ফল দিয়ে থাকে। ফলাফল ঠিক মত বিচার করতে জ্যোতিষীরা যে-সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওযার কথা সাধারণভাবে বলে থাকেন, সেগুলো হলো—(১) গ্রহগণের প্রাকৃতিক শুভাশুভত্ব, (২) গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি, (৩) গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি, (৪) গ্রহগণের পরস্পরের মিত্রতা, শত্রুতা ও নিরপেক্ষতা, (৫) গ্রহগণের স্বক্ষেত্রে অবস্থানবশতঃ ফলের তারতম্য, (৬) গ্রহগণেব কারকতা, (৭) গ্রহগণের পরস্পর যোগ ও সম্বন্ধ প্রভৃতি, (৮) গ্রহগণের দশা, এবং গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু বিশেষ বিধি।

গ্রহগণের স্থিতি ও দৃষ্টি

জ্যোতিষীরা গ্রহদের দৃষ্টি কল্পনা করেছেন। গ্রহ যে রাশিতে থাকে সেই রাশি থেকে তৃতীয় ও দশম ঘরে এক-চতুর্থাংশ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। পঞ্চম ও নবম ঘরে দৃষ্টি দেয় অর্ধেক, চতুর্থ ও অষ্টমে তিন-চতুর্থাংশ এবং সপ্তমে পূর্ণ দৃষ্টি দেয়।

এরপরও আছে। বৃহস্পতি নবম ও পঞ্চমে পূর্ণদৃষ্টি দেয। মঙ্গল পূর্ণ দৃষ্টি দেয চতুর্থ ঘবে ও অষ্টম ঘরে, শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকে তৃতীয় ও দশম ঘবে। অবশ্য বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনি সপ্তমেও পূর্ণদৃষ্টি দেয়।

রাহুব পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে পূর্ণদৃষ্টি ; তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমে অর্ধদৃষ্টি ; দ্বিতীয় ও দশম ঘরে তিন-চতুর্থাংশ দৃষ্টি থাকে।

ফলাফল বিচারে, মোটামুটি পূর্ণদৃষ্টিই জ্যোতিষীরা গ্রহণ করে থাকেন।

কোন্ ভাব থেকে কী বিচার করা হয়

জ্যোতিষীদের ধারণায লগ্নকে প্রথম ঘর ধরে বারোটি ঘবের এক একটি ঘবে জাতকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচার সম্ভব।

লগ্নের ঘরকে প্রথম ঘর ধরা হয়। এই ঘর থেকে জ্যোতিষীরা তনুভাবের বিচার করেন। তনুভাব থেকে তাঁরা জাতকের শরীরের গঠন, বর্ণ, গুণ, যশ, সবলতা, দুর্বলতা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিচার করেন।

দ্বিতীয় বা ধনভাব থেকে মুখ, বাক্য, চোখ, আত্মীয়, মাসী, মামা, বন্ধু ইত্যাদি বিষয় বিচার করেন।

তৃতীয় বা সহজভাব থেকে ভাই, সাহস, পরাক্রম, সহনশীলতা, প্রতিপালিত লোক ও কর্মচারীদের বিষয়ে বিচার করা হয়।

চতুর্থ বা সুখভাব থেকে বিচার করা হয সুখ, মন, বন্ধু, যান-বাহন, ভূসম্পত্তি, পিতৃ-সম্পত্তি, মা, বিদ্যা, ইত্যাদি বিষযে।

পঞ্চমভাব থেকে দেবভক্তি, রাজভক্তি, পিতা, পুত্র, বুদ্ধি, রাজনৈতিক বুদ্ধি ইত্যাদি বিচার করা হয।

ষষ্ঠ বা শত্রুভাব থেকে শত্রু, ক্লেশ, আঘাত, ক্ষত, মামা, মাসী ইত্যাদি বিষয়ে বিচার করা হয।

সপ্তম বা জায়াভাব থেকে প্রেম, বিবাহ, স্ত্রী, স্বামী, বড়-ভাইয়ের ছেলে, ব্যবসা-বানিজ্য, মুত্রাশয়, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষযে বিচার করা হয়।

অষ্টম বা নিধনভাব থেকে বড় বোনের ছেলে, খাদ্য-সুখ, মৃত্যু, মরণের কারণ, মৃত্যুস্থান, জয় ও পরাজয বিষযে বিচার করা হয।

নবম বা ধর্মভাব থেকে ভাগ্য, ধর্মানুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, আধ্যাত্মিক উন্নতি, গুরুর অনুগ্রহ ইত্যাদি বিচার করা হয়। অনেকে নবম স্থান থেকে পিতৃবিষযক বিচার করে থাকেন।

দশম বা কর্মভাব থেকে কর্মক্ষেত্র, যশ, উচ্চপদ, সম্মান, সন্ন্যাস, শাস্ত্রোক্ত কর্ম, পিতা ইত্যাদি বিষযে বিচার করা হয।

একাদশ বা আয়ভাব থেকে আয, লাভ, মিত্র, কন্যা, বড় ভাই, ছোট-ভাইযের ছেলের বিষযে বিচার করা হয়।

দ্বাদশ বা ব্যয়ভাব থেকে ব্যয়, দূর ভ্রমণ, রাজদন্ড, ছোটবোনেব ছেলে ইত্যাদি বিষযে বিচার করা হয।

দশা বিচার

জ্যোতিষীদের কাছে জাতকের দশা বিচারের গুরুত্ব খুবই বেশি। জ্যোতিষীরা মনে কবেন কোনও গ্রহের দশায় সেই গ্রহ জাতকের জীবনে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার কবে।

বাংলাদেশে অষ্টোত্তরী মতে জাতকের দশা-অন্তর্দশা বিচার প্রচলিত ছিল। এখনও বহু জ্যোতিষীই অষ্টোত্তরী মতে জাতকের দশা-অন্তর্দশা বিচার কবে ভাগ্য গণনা করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে বিংশোত্তরী বিচারই প্রচলিত।

অষ্টোত্তরী মতে বিভিন্ন গ্রহের দশা ভোগকাল

রবির দশা ভোগকাল ৬ বছর।

চন্দ্রের দশা ভোগকাল ১৫ বছর।

মঙ্গলের দশা ভোগকাল ৮ বছব।

বুধের দশা ভোগকাল ১৭ বছব।

শনির দশা ভোগকাল ১০ বছর।

বৃহস্পতির দশা ভোগকাল ১৯ বছর।

রাহুর দশা ভোগকাল ১২ বছব।

শুক্রের দশা ভোগকাল ২১ বছব।

জাতক কিসের দশা দিয়ে জীবন শুবু করবে, তা নির্ভব কবে কোন্ নক্ষত্রের জাতক, তার উপর।

১। কৃত্তিকা, বোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুবু হবে রবিব দশা মধ্যে।

২। আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুরু হবে চন্দ্রের দশা।

৩। মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের জাতকেব প্রথম শুবু হবে মঙ্গলের দশা।

৪। হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা নক্ষত্রেব জাতকের প্রথম শুরু হবে বুধের দশা।

৫। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুরু হবে বুধের দশা।

৬। পূর্বাষাঢ়া, উত্তবাষাঢ়া, শ্রবণা নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুরু হবে বৃহস্পতির দশা।

৭। ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুবু হবে রাহুব দশা।

৮। উত্তবভাদ্রপাদ, বেবতী, অশ্বিনী, ভরণী নক্ষত্রের জাতকের প্রথম শুরু হবে শুক্রের দশা।

বিংশোত্তরী মতে বিভিন্ন দশার ভোগকাল

জ্যোতিষীরা জন্ম নক্ষত্রের সংখ্যার সঙ্গে ১৬ যোগ করে ৯ দিয়ে ভাগ কবলে যে অংক অবশিষ্ট থাকে, সেই অংকই জন্মকালে কোন গ্রহের দশা শুরু হবে তা সূচিত করে।

১ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে ববিব দশা।

২ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে চন্দ্রের দশা।

৩ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে মঙ্গলের দশা।

৪ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে বাহুর দশা।

৫ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুরু হবে বৃহস্পতির দশা।

৬ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুরু হবে শনির দশা।

৭ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুরু হবে বুধের দশা।

৮ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে কেতুর দশা।

৯ অথবা ০ অবশিষ্ট থাকলে প্রথমে শুবু হবে শুক্রের দশা।

রবির দশা ভোগকাল ৬ বছর।
চন্দ্রের দশা ভোগকাল ১০ বছর।
মঙ্গলের দশা ভোগকাল ৭ বছর।
রাহুর দশা ভোগকাল ১৮ বছর।
বৃহস্পতির দশা ভোগকাল ১৬ বছর।
শনির দশা ভোগকাল ১৯ বছর।
বুধের দশা ভোগকাল ১৭ বছব।
কেতুর দশা ভোগকাল ৭ বছর।
শুক্রের দশা ভোগকাল ২০ বছর।

এইসব দশার পরেও অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তবী মতে ওই দশাকালীন বিভিন্ন গ্রহের অন্তর্দশা চলতে থাকে। এই দশা ও অন্তর্দশা জাতক-জীবনের ভাগ্যকে পূর্ব-নির্ধারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বলে জ্যোতিষীদেব বিশ্বাস।

গোচর ফল

জ্যোতিষীবা তাঁদের তৈরি নিয়মে দশা-অন্তর্দশা প্রভৃতিব সাহায্যে বিচার কবতে গিয়ে দেখলেন একাধিক সময় একই ধরনের ফল লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আবাব কখনও বা আরও নানা ধরনের সমস্যা ভাগ্য বিচাবের ক্ষেত্রে হাজির হচ্ছে। জন্মকালীন বিভিন্ন ঘরের গ্রহ অবস্থান দেখেও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব হবে পড়ছে। অন্যান্য নানা নিযম-কানুনের সাহায্য নিযেও জাতকের ভাগ্য বিচার সফলতা পাচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতেই আরও নানা ধরনের বিচার পদ্ধতির জটিলতা হাজির কবেছেন জ্যোতিষীরা। এইভাবেই এসেছে গোচর ফল।

গ্রহগুলো ঘুরছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ এক রাশি থেকে অন্য রাশি পরিক্রমা কবে চলেছে। ফলে প্রতিটি গ্রহ কিছু সমযের জন্য এক একটি রাশিতে বা ঘরে অবস্থান করছে। গ্রহগুলো যে সময়ে যে ঘরগুলোতে দৃশ্যমান, সে ঘরগুলো সেই সেই গ্রহের 'গোচরে' আছে বলে ধরে নিযে গোচর ফল বিচাব করা হয। মোটামুটিভাবে এক বাশিতে গ্রহগুলো এইভাবে থাকে—

রবি এক রাশিতে থাকে ১ মাস।
চন্দ্র এক রাশিতে থাকে ২$^{১}/_{৪}$ মাস।
মঙ্গল এক বাশিতে থাকে ৪৫ দিন।
বুধ এক রাশিতে থাকে ১৮ দিন।
বৃহস্পতি এক রাশিতে থাকে ১ বছর।
শুক্র এক বাশিতে থাকে ২৮ দিন।
শনি এক রাশিতে থাকে ২$^{১}/_{২}$ বছর।
রাহু এক রাশিতে থাকে ১$^{১}/_{২}$ বছর।

গোচরে চন্দ্র জন্মরাশি থেকে কেবলমাত্র প্রথম, তৃতীয, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম ও একাদশ ঘরে থাকলে শুভফল দেয। এছাড়াও আরও নিযম আছে। শুক্লপক্ষে চন্দ্র দ্বিতীয, পঞ্চম ও নবমে থাকলেও শুভ ফল দেয।

গোচরে মঙ্গল জন্মরাশি থেকে কেবলমাত্র তৃতীয, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানে শুভ ফল দেয।

গোচরে বুধ জন্মরাশি থেকে দ্বিতীয, চতুর্থ, অষ্টম, দশম ও একাদশ রাশিতে থাকাকালীন শুভ ফল দেয়।

গোচরে বৃহস্পতি শুভ ফল দেয় জন্মরাশি থেকে দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশে।

গোচবে শুক্র প্রথম, দ্বিতীয, তৃতীয, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ স্থানে শুভ ফল দেয।

তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ ঘরের শনি রাহু ও কেতু শুভ ফল দেয়।

কোনও কোনও মতে গোচরে জন্মবাশি থেকে দশমস্থ শনি, রাহু ও কেতু শুভ ফল দান কবে।

এরপর জ্যোতিষীরা জাতকদের ভবিষ্যৎ বিচার করতে অসুবিধার মুখোমুখি হযে গ্রহদের গোচর ফলের সঙ্গে নক্ষত্রদের যুক্ত করলেন। জানালেন, গোচরে গ্রহ শুভ নক্ষত্রে এলে শুভফল দেবে, অশুভ নক্ষত্রে অশুভ ফল।

গোচরে জন্মরাশি থেকে বিচার করা হয। জন্মকালীন যে রাশিতে চন্দ্র ছিল, সে রাশিই জাতকের জন্মরাশি।

গ্রহ কোন্ ঘরে কেমন ফল দেয়

জ্যোতিষীদের বিচারে প্রতিটি গ্রহ লগ্ন থেকে গণনা করে কোন্ ঘরে আছে, তার উপরও কিছু বিশ্বাস রয়ে গেছে। বিভিন্ন জ্যোতিষীদের বিশ্বাসও বিভিন্ন ধরনের।

খুব সংক্ষেপে মোটামুটিভাবে কোন্ গ্রহ কোন্ ঘরে থাকলে কী ধরনের ফল জাতক পাবে সে বিষয়ে আলোকপাত করছি।

রবি

রবি লগ্নে থাকলে জাতকের মাথার চুল থাকবে স্বল্প অথবা টাক। জাতক হবে অলস, ক্রোধী, নেত্ররোগী, দীর্ঘদেহী, কর্কশ শরীর ও ক্ষমাশীল।

রবি দ্বিতীয়ে বা ধনস্থানে থাকলে জাতক ধন-পুত্র বিষযে অসুখী, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অমিল, বুদ্ধিহীনতা, পর-গৃহে বাস।

রবি তৃতীযে থাকলে জাতক হয প্রিযভাষী, ধনী, তেজস্বী, স্বল্প ভাই-বিশিষ্ট।

রবি চতুর্থে থাকলে জাতক সুখহীন, ধনহীন হয। জাতকের এক জায়গায় স্থির বাস হয না।

রবি পঞ্চমে থাকলে সুখহীন, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, সৎ ও দেবভক্ত হয়।

রবি ষষ্ঠে থাকলে সদাসুখী, শত্রুহন্তা, মহাতেজা, সত্বগুণের অধিকারী, মনোহব মানের অধিকারী ও রাজশক্তির নিকটজন হয়।

রবি সপ্তমে থাকলে হতশ্রী, ভীত, খারাপস্বভাব, রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির ক্রোধে ক্লিষ্ট হয়।

রবি অষ্টমে থাকলে নেত্ররোগী, বহু শত্রুবিশিষ্ট, প্রয়োজনের সময় বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, ক্রোধী, অল্পবিত্ত ও কৃশদেহী হয়।

রবি নবমে থাকলে ধার্মিক, সুকর্মী, পুত্র ও মিত্র বিষয়ে সুখী হয়, তবে মা'য়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা থাকে।

রবি দশমে থাকলে ধনী, সুবুদ্ধি, রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ বিশিষ্ট ও পুত্রবান হন।

রবি একাদশে থাকলে জাতক বিত্তবান, রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সঙ্গীতপ্রিয় হয়।

রবি দ্বাদশে থাকলে চোখের অসুখ, বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য সূচিত করে।

চন্দ্র

চন্দ্র বৃষ, কর্কট ও মেষলগ্নগত হলে জাতক ধনবান, রূপবান, গুণী, ভোগী ও দয়ালু হয়। চন্দ্র অন্য লগ্নে থাকলে জাতক চঞ্চলচিত্তের অধিকারী, নীচতা, মূক ও বধিরতা সৃষ্টি করে।

পূর্ণচন্দ্র দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক ধনী, সুখী ও পুত্রবান হয়। ক্ষীণ চন্দ্র থাকলে গরীব ও বুদ্ধিহীন হয়।

চন্দ্র তৃতীয়ে থাকলে জাতক গর্বিত, হিংস্র, কৃপণ, অল্পবুদ্ধি, সাহসী ও বন্ধুবৎসল হয়।

চন্দ্র চতুর্থে থাকলে ধনী, বাহনের অধিকারী, শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে ভক্তি দান করে।

চন্দ্র পঞ্চমে থাকলে জাতক সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, ধনী, প্রসন্নচিত্ত, পুত্রবান ও সংগ্রহশীল হয়।

চন্দ্র ষষ্ঠে থাকলে মানব ক্রুদ্ধ, অলস, নির্দয় ও শত্রুবিশিষ্ট হয়।

চন্দ্র সপ্তমে থাকলে জাতক ক্ষীণদেহী, ধনহীন, বিনয়হীন, কামাতুর ও অভিমানী হয়।

চন্দ্র অষ্টমে থাকলে জাতক উদ্বিগ্নতা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি নানা অসুখে ভোগে। জাতক চোব, শত্রু ও রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হয়।

চন্দ্র নবমে থাকলে জাতক স্ত্রী-পুত্রবান, ধনী, তীর্থ ও শাস্ত্রপ্রিয় হয়।

চন্দ্র দশমে থাকলে রাষ্ট্রশক্তি থেকে সম্মান লাভ, অর্থলাভ, যশলাভ হয়। জাতক স্থিরচিত্তেব, সৌম্য ও ধনী হয়।

চন্দ্র একাদশে থাকলে সদ্‌গুণ দান করে। জাতক নানা সম্মান, কীর্তি ও নানা বাহনেব অধিকাবী হয়।

চন্দ্র দ্বাদশে থাকলে নেত্রপীডা, ক্রোধ ও শত্রুবৃদ্ধি ঘটে।

মঙ্গল

মঙ্গল লগ্নে থাকলে জাতক সাহসী ও উগ্রস্বভাবের হয়। জাতকের মতিভ্রমের সম্ভাবনা ও আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

মঙ্গল দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক ধনহীন, নির্দয় ও বিবাদপ্রিয় হয়।

মঙ্গল তৃতীয়ে থাকলে জাতক উদার হয়, রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ পায়, বিক্রম প্রকাশ করে ও ভাইয়ের বিষয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে।

মঙ্গল চতুর্থে থাকলে বন্ধু থেকে কষ্ট, শারীরিক রোগ ও দুর্বলতা দান করে।

মঙ্গল পঞ্চমে থাকলে জাতক চঞ্চলমতি হয়। পুত্র ও মিত্র থেকে সুখহানি ঘটে। বাত ও শ্লেষ্মায় ভোগে।

মঙ্গলে ষষ্ঠে থাকলে জাতক সৎসঙ্গ লাভ করে, শত্রুনাশ করে, ক্রোধযুক্ত ও কামাতুর হয়।

মঙ্গল সপ্তমে থাকলে স্ত্রী বিষয়ে খুবই অসুখী হয়, অনর্থক নিষ্ফল চিন্তা করে।

মঙ্গল অষ্টমে থাকলে চোখের অসুখ, রক্তচাপ বা রক্তপীড়ায় ভোগে, খারাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়, ভাগ্যহীন হয়।

মঙ্গল নবমে থাকলে ঈর্ষাপরায়ণ ও ধনহীন হয়।

মঙ্গল দশমে থাকলে জাতক রাজতুল্য, সাহসী ও পরোপকারী হয়।

মঙ্গল একাদশে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ লাভ করে।

মঙ্গল দ্বাদশে থাকলে মিত্রদের সঙ্গে বিবাদ হয়, চোখের রোগ, ক্রোধ ও ধনব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। জাতকের কারাগার ভোগ হয়।

বুধ

বুধ লগ্নে থাকলে জাতক বিদ্বান, সদাচারী, উদার, বিনীত, কলাজ্ঞ, ধীর ও শান্ত স্বভাবের ও শিশুর মত সরল হয়।

বুধ দ্বিতীয়ে বা ধনস্থ হলে জাতক সুকান্তি, উন্নতিশীল, সুশীল ও গুরুভক্ত হয়।

বুধ তৃতীয়ে থাকলে সাহসী, হৃত-সুখ, শৈশবে রোগ-ভোগ হয়।

বুধ চতুর্থ স্থানে থাকলে জাতক বিদ্যান, ধনবান, সাহিত্য-শিল্প-সংগীত বিষয়ে আগ্রহী হয়।

বুধ পঞ্চমে থাকলে জাতক সদা আনন্দময়, বন্ধুবৎসল, সুশীল, বুদ্ধিমান ও পুত্র বিষয়ে সুখী হয়।

বুধ ষষ্ঠ স্থানে থাকলে জাতক অলস, নিষ্ঠুর, কলহপ্রিয় ও শত্রু দ্বারা পীড়িত হয়।

বুধ সপ্তমে থাকলে মানব সুশীল, ধনবান, সত্যভাষী, স্ত্রী ও পুত্র সুখে সুখী হয় ও পরস্ত্রীগামী হয়।

বুধ অষ্টমে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহে ধনী ও পরের ধন গ্রাসকারী হয়।

বুধ নবমস্থ হলে জাতক বিদ্বান, ধনবান, দাতা, উপকারী, সৎ, কর্মপটু ও সুপুত্রবিশিষ্ট হয়।

বুধ দশম ঘরে থাকলে জাতক জ্ঞানবান, ধনী, সদা আনন্দময, ও কর্মবীর হয়।

বুধ একাদশ ঘরে থাকলে জাতক বিনীত, বিভিন্নভাবে বিপুল আয়, ভোগী, আনন্দচিত্ত, সুশীল ও বলবান হয়।

বুধ দ্বাদশ ঘরে অবস্থান কবলে জাতক বিদ্যাহীন, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা ত্যক্ত, স্বকার্যে নিপুণ, অত্যন্ত ধূর্ত ও মলিন প্রকৃতির হয়।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি লগ্নে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তি-প্রিয়, উদার, প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ চরিত্রের, চারুদেহী ও গম্ভীব স্বভাবের হয়।

বৃহস্পতি দ্বিতীয় ঘরে থাকলে জাতক রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, যশস্বী, ত্যাগী, ধনবান ও অজাতশত্রু হয়।

বৃহস্পতি তৃতীয ঘরে থাকলে জতক সৌজন্যহীন, কৃতঘ্ন, কৃপণ, স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারা অসুখী হয।

বৃহস্পতি চতুর্থে থাকলে জাতক বহুমান্য, ধনবান, বাহনযুক্ত, রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহে সম্পদশালী হয।

বৃহস্পতি পঞ্চমে থাকলে ধনবান, গাড়ি-বাড়ির অধিকারী, মন্ত্রণা-কুশল ও সু-পুত্রের পিতা হয়।

বৃহস্পতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক সংগীতপ্রিয়, কীর্তিপ্রিয ও শত্রু-বিনাশকারী হয।

বৃহস্পতি সপ্তমে থাকলে জাতক বিনযী, সাহিত্যিক, বিদ্বান, মন্ত্রণাকুশল ও কামিনী-কাঞ্চন বিষযে অত্যন্ত সুখী হয।

বৃহস্পতি অষ্টমে থাকলে জাতক দরিদ্র, অলস, ক্ষীণদেহী ও বিবেচনাহিন হয।

বৃহস্পতি নবমে থাকলে জাতক রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, বিভিন্ন বিষযে জ্ঞান, কর্মপটু ও দেব-দ্বিজে ভক্ত হয।

বৃহস্পতি দশমে থাকলে জাতক রাজনৈতিক নেতা, ধনী, গাড়ি-বাডির অধিকারী, বিবিধ যশেব অধিকারী ও স্ত্রী-পুত্র বিষযে সুখী হয।

বৃহস্পতি একাদশে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ, ক্ষমতা, অর্থ ও গাড়ি-বাড়ির মালিক হয।

বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকলে জাতক অলস, নির্বোধ, কোপন-স্বভাব ও নির্লজ্জ হয়।

শুক্র

শুক্র লগ্নে থাকলে জাতক নানা বিদ্যায় পারদর্শী, মিষ্টভাষী, সুদর্শন, কামুক, রাষ্ট্রশক্তি থেকে সম্মান পায।

শুক্র দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক গাড়ি বাড়ি, অর্থ প্রাচুর্য বিদ্যা লাভ করে।

শুক্র তৃতীয় ঘরে থাকলে জাতক কৃশদেহী, কৃপণ, গরীব, কামুক ও দুষ্ট প্রকৃতির হয়।

শুক্র চতুর্থ ঘবে থাকলে ধনবান, সুখী, সদানন্দ ও দেবভক্ত হয়।

শুক্র পঞ্চম ঘবে থাকলে জাতক কাব্য ও কলা বিষযে জ্ঞানী, ধনী, সম্পদশালী ও সুপুত্রের অধিকারী হয়।

শুক্র ষষ্ঠ ঘরে থাকলে জাতক কামহীন, রমণীদের কাছে অপ্রিয় ও শত্রুভযযুক্ত হয়।

শুক্র সপ্তম ঘরে থাকলে জাতক বিভিন্ন কলায় কুশলী, সন্তরণপটু, রতিপণ্ডিত, রমণীরমন ও বিভিন্ন নারীতে আসক্ত হয।

শুক্র অষ্টমে থাকলে জাতক প্রসন্ন-মূর্তি, রাষ্ট্রশক্তিব প্রিয়জন, স্ত্রী-পুত্র বিষযে উদ্বিগ্ন, শঠ ও নির্ভয মানসিকতাসম্পন্ন হয।

শুক্র নবম স্থানে থাকলে জাতক অতিথিসেবক, গুবু-দেব-দ্বিজ-পূজক, তীর্থ-প্রিয, আনন্দময, ক্রোধশূন্য ও ধনী হয।

শুক্র দশম স্থানে থাকলে সৌভাগ্যবান, মানী, ধনবান, স্ত্রী-পুত্র বিষযে সুখী হয।

শুক্র একাদশ ঘরে থাকলে জাতক অভিনয, নৃত্য-গীত ইত্যাদি বিষযে আগ্রহী হয, ধর্মপরাযণ হয।

শুক্র দ্বাদশে থাকলে জাতক সর্বদা কামচিন্তায় কাতর থাকে, নির্দয় ও মিথ্যাচারী হয়।

শনি

শনি তুলা, কুম্ভ ও মকর লগ্নগত হলে জাতক রাষ্ট্রনাযক হয। অন্যান্য লগ্নে শনি থাকলে শনি জাতকের দাবিদ্র্য ও অমঙ্গলেব কারণ হয।

শনি দ্বিতীয় ঘরে থাকলে জাতক অসৎ উপাযে ধনী, মানসিকভাবে অসুখী, বিলাসী ও বান্ধবত্যক্ত হয।

শনি তৃতীযে থাকলে জাতক মাঝারি আকারের রাজনৈতিক নেতা, বহু পালক ও বিক্রমশীল হয।

শনি চতুর্থে থাকলে জাতক পীড়িত, অলস, কলহপ্রিয হয।

শনি পঞ্চমে থাকলে জাতক সদাপীড়িত, ধনহীন, পুরুষত্বহীন ও পুত্র বিষযে অসুখী হয।

শনি ষষ্ঠে থাকলে জাতক স্বাস্থ্যবান, শত্রুজযী, গুণগ্রাহী হয। শনি ষষ্ঠে মেষ রাশিতে থাকলে নীচ জাতির কোনও ব্যক্তি থেকে ভযের সম্ভাবনা থাকে। শনি ষষ্ঠে তুলা বাশিতে অবস্থান কবলে জাতক পূর্ণকাম হয।

শনি সপ্তমে থাকলে জাতক স্ত্রী বিষযে অসুখী, গৃহ-ধনাদি বিষযে অসুখী ও অসুখে ভুগে দুর্বল শবীরের হয।

শনি অষ্টমে থাকলে জাতক নির্ভয, অলস, অসন্তুষ্ট ও রোগক্লিষ্ট হয।

শনি নবমে থাকলে জাতক বিকলদেহ, মন্দমতি ও ধার্মিক হয।

শনি দশমে থাকলে জাতক শাসকের প্রিয, অভিজ্ঞ, সুচতুর, সংগ্রামী ও বিনযী হয।

শনি একাদশে থাকলে জাতক ধনবান ও স্থিরচিত্তের অধিকাবী হয।

শনি দ্বাদশ ঘরে থাকলে জাতক নির্দয়, অতিমব্যয়ী, অলস, নির্ধন, নির্লজ্জ, অসৎ বন্ধুবিশিষ্ট ও প্রবাসপ্রিয় হয়।

রাহু

রাহু লগ্নে থাকলে জাতক দুষ্টবুদ্ধি, দুষ্ট-স্বভাব, স্বজন-প্রতারক, কামুক, রুগ্নদেহী ও শিরোরোগী হয়।

রাহু ধনস্থ হলে অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘরে থাকলে বাকপটু, ভ্রমণশীল ও দরিদ্র হয়।

রাহু তৃতীয় ঘরে থাকলে যশ, বিলাস ও বিক্রম দান করে। একই সঙ্গে জাতকের ভ্রাতৃনাশ ও দারিদ্র্যভাবও দেখা যায়।

রাহু চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতকের সুখনাশ, আত্মীয়-হানি, সদা ভ্রমণ ও পুত্র-মিত্র বিষয়ে অসুখী করে।

রাহু পঞ্চমে থাকলে মিত্র-স্বল্পতা দেখা যায়।

রাহু ষষ্ঠ স্থানে থাকলে জাতক মহাবলী, শত্রুজয়ী হয়।

রাহু সপ্তমে থাকলে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ, স্ত্রী-নাশ সূচিত হয়। জাতকের স্ত্রী ক্রোধী, কলহপ্রিয়া ও রোগযুক্তা হয়।

রাহু অষ্টমে থাকলে জাতক চোর হয়। জাতক গুহ্যদ্বারের পীড়া, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ও মূত্ররোগ ভোগ করে।

রাহু নবম ঘরে থাকলে জাতক দরিদ্র, বন্ধুহীন ও অসুখী হয়।

রাহু দশম ঘরে থাকলে জাতক পিতার বিষয়ে অসুখী, ভাগ্যহীন, যানবাহন দ্বারা পীড়িত ও বাত-রোগে আক্রান্ত হয়।

রাহু একাদশে থাকলে জাতক রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করে, ধনী, সুখী ও বিজয়ী হয়।

রাহু দ্বাদশে থাকলে জাতক নেত্ররোগী, পায়ে আঘাত, প্রতারক, অসৎ-সঙ্গপ্রিয়তা, দম্ভ, স্ত্রী বিষয়ে অসুখী ও প্রবাসী হয়।

কেতু

কেতু লগ্নে থাকলে জাতক ভীরু, রোগযুক্ত, উদ্বিগ্নচিত্ত ও অস্থির প্রকৃতির হয়।

কেতু দ্বিতীয় ঘরে থাকলে জাতক ধনী, সুখী, তেজস্বী, শত্রুজয়ী হয়। তবে জাতক কলহে জড়িয়ে পড়ে, বন্ধু বিয়োগ ঘটে এবং জাতক কোনও রোগে পীড়িত হয়।

কেতু তৃতীয় স্থানে থাকলে মাতৃ-সুখ ও বন্ধু-সুখ থেকে বঞ্চিত হয় ; তবে কেতু লগ্ন থেকে চতুর্থ ঘরে ধনু রাশিতে থাকলে ফল শুভ হয়।

পঞ্চমে কেতু থাকলে জাতক পেটের অসুখে ভোগে, ভাইয়ের বিষয়ে অসুখী হয়।

ষষ্ঠে কেতু থাকলে ধনলাভ, সুখ, নীরোগ জীবন লাভ করেন জাতক। তবে মাতুল পক্ষ থেকে অপমানিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

সপ্তমে কেতু থাকলে জাতক বেড়াতে ভালবাসে, তবে অর্থনাশ, বিত্তনাশ ও জল থেকে

ভযের কারণ থাকে। কেতু সপ্তম ঘরে বৃশ্চিক রাশিতে থাকলে কলহ, ব্যয়ের সম্ভাবনা থাকে।

কেতু অষ্টমে থাকলে গুহ্যদেশে পীড়া, বাহনভয় ও অর্থনাশ হয। কিন্তু কেতু অষ্টম ঘবে বৃশ্চিক, কন্যা, মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশিগত হলে জাতকের অর্থভাগ্য শুভ হয।

কেতু নবমে থাকলে জাতক নানা ধবনের অসুখের শিকার হয। ভাইও অসুখে ভোগে। দান করলেও সমাজে সম্মান পান না ; বরং উপহাসের পাত্র হন।

কেতু দশমে থাকলে দুর্ভাগ্য, ক্লেশ ও বাহনভয দেখা দেয। পিতা অসুখী হন। দশমস্থ কেতু বৃষ, মেষ, বৃশ্চিক ও কন্যায থাকলে শত্রুনাশ হয।

কেতু একাদশে থাকলে জাতক বিদ্বান, সুমিষ্টভাষী, তেজস্বী হয। তবে পুত্র বিষয়ে অসুখী ও গুহ্যদেশের পীড়ায পীড়িত হয।

কেতু দ্বাদশে থাকলে জাতক রাজতুল্য, শত্রুনাশকারী হয। পায়ের, চোখের, পেটের ও গুহ্যদেশের অসুখে ভোগে।

প্রতিটি ঘরের অধিপতিরা কোন্ ঘরে থাকলে কেমন ফল দেয়

আগেই আমরা প্রতিটি গ্রহের স্বক্ষেত্র অর্থাৎ কোন্ গ্রহ কোন্ ঘরের মালিক বা অধিপতি, সে বিষয়ে আলোচনা কবেছি। লগ্ন থেকে দ্বাদশ স্থান পর্যন্ত বাবোটি ঘরের অধিপতিবা কোথায অবস্থান করছে তাব উপরও জাতকের ভাগ্য নির্ধাবিত হয বলে জ্যোতিষীবা বিশ্বাস কবেন। প্রতিটি ঘরেব অধিপতিরা কোন্ ঘরে থাকলে কেমন ফল দেয—এ বিষয়ে জ্যোতিষীরা কী বলেন খুব সংক্ষেপে সেটুকু নিয়ে আলোচনা করছি।

লগ্নপতি

জাতকেব সঠিক জন্ম সময অনেক সময়েই বিভিন্ন কারণে রাখা সম্ভব হয না। ফলে জন্মলগ্ন নির্ধারণে ভুল হতে পাবে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যেও জ্যোতিষীরা পথ বেব করে ফেলেছেন। কিছু নিয়ম-কানুন তৈরি কবেছেন যেগুলোর সাহায্যে নাকি সঠিক লগ্ন নির্ণয করা সম্ভব।

চন্দ্র লগ্নেব মত অত তাড়াতাড়ি তো এক ঘর থেকে আব এক ঘরে দৌড়োয না। তাই জন্মের সময চন্দ্রের অবস্থান দেখে রাশি নির্ণয কবেও ভাগ্যেব বিচার করা হয। জন্মের সময চন্দ্র যে বাশিতে থাকে সেটাই জাতকের বাশি হিসেবে ধরে নেওযা যায।

জ্যোতিষ মতে জাতকেব লগ্নই মস্তক। তাই লগ্নে পাপগ্রহ অর্থাৎ রাহু, ববি, মঙ্গল বা শনি থাকলে মাথায আঘাত পাওযাব সম্ভাবনা থাকে। জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি লগ্নেব উপব নির্ভবশীল বলে জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন।

লগ্নের অধিপতি অর্থাৎ লগ্নপতি লগ্নে থাকলে জাতক সবল, নীরোগ ও কীর্তিমান হয।

লগ্নপতি ধনস্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয ঘবে থাকলে জাতক দীর্ঘজীবি, ধনবান ও কর্মক্ষেত্রে উন্নতি কবে।

লগ্নপতি তৃতীয়ে বা ভ্রাতৃস্থানে থাকলে ভাইয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকে, বন্ধুভাগ্য ভাল হয়। জাতক ধার্মিক, দাতা ও বিক্রমী হয়।

লগ্নপতি চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতক দীর্ঘজীবি, পিতৃভক্ত, রাজভক্ত, ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। জাতক পিতার সম্পত্তি লাভ করে।

লগ্নপতি পঞ্চম ঘরে থাকলে জাতক সুপুত্রের পিতা হয়। জাতক দীর্ঘজীবী, ক্ষমতাবান, বিনীত, ত্যাগী ও বিখ্যাত হয়।

লগ্নপতি ষষ্ঠ ঘরে থাকলে জাতক নীরোগ, সবল, ধনী, কৃপণ ও শত্রুহন্তা হয়।

লগ্নপতি সপ্তম ঘরে থাকলে জাতক সুন্দরী স্ত্রী লাভ করে, সচ্চরিত্র, তেজস্বী এবং স্ত্রৈণ হয়। জাতিকার ক্ষেত্রে সুদর্শন পতি লাভ ও স্বামীর নেওটা হওয়ার সম্ভবণা প্রবলভাবে দেখা যায়।

লগ্নপতি অষ্টম ঘরে থাকলে জাতক ধনী, কৃপণ ও দীর্ঘায়ু হয়।

লগ্নপতি নবম ঘরে থাকলে জাতক ধার্মিক, যশস্বী ও তেজস্বী হয়।

লগ্নপতি দশমগত হলে জাতক পন্ডিত, বিখ্যাত গুরু, রাষ্ট্রশক্তির কৃপাধন্য হয়।

লগ্নপতি একাদশ স্থানে থাকলে জাতক অর্থবান, বন্ধুবিশিষ্ট ও পুত্রবান হয়।

লগ্নপতি দ্বাদশ বা ব্যয়স্থানে থাকলে জাতক কটুভাষী, ব্যয়ের আধিক্য থাকলেও অর্থকষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়পতি

দ্বিতীয়পতি বা ধনাধিপতি লগ্নে থাকলে জাতক উদ্যোগী, ধনী, কৃপণ, নির্দয় ও আত্মীয়-কুটুম্ব বিরোধী হয়।

দ্বিতীয়পতি দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ ধনস্থানে থাকলে জাতক ধনী, অর্থলোভী ও গর্বিত হয়।

দ্বিতীয়পতি তৃতীয় ঘরে থাকলে জাতক উদ্যোগী, বিক্রমী, ধনী. গর্বিত, চঞ্চলচিত্ত ও কলহপ্রিয় হয়।

দ্বিতীয়পতি চতুর্থস্থানে থাকলে জাতক পিতার সম্পত্তি লাভ করে, সত্যবাদী, দীর্ঘায়ু ও দয়ালু হয়।

দ্বিতীয়পতি ক্রুর গ্রহ হয়ে চতুর্থ ঘরে থাকলে দ্বিতীয়পতির দশা-অন্তর্দশায় মায়ের কঠিন অসুখ হয়।

দ্বিতীয়পতি পঞ্চমে থাকলে জাতক কৃপণ, দুঃখী, সুপুত্রের পিতা হয় ও নিজগুণে খ্যাতি লাভ করে।

দ্বিতীয়পতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক ধনসংগ্রহে আগ্রহী হয়।

দ্বিতীয়পতি সপ্তম ঘরে থাকলে জাতক বিলাসী, আনন্দময়ী, রোজগেরে স্ত্রী লাভ করে।

দ্বিতীয়পতি অষ্টম ঘরে থাকলে জাতক কোনও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, পরোপকারী হয় তবে স্ত্রীর বিষয়ে অসুখী হয়।

দ্বিতীয়পতি নবমে থাকলে জাতক গুরুর প্রিয় হয় ও দাতা হয়। তবে দ্বিতীয়পতি পাপগ্রহ হলে জাতক ভিক্ষুকজীবন লাভ করে।

দ্বিতীয় পতি দশমে বা কর্মঘরে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তিমান্য, রাষ্ট্রশক্তির কৃপায় ধনী, মানী, পণ্ডিত, মা ও বাবার পালক ও একাধিক স্ত্রী বা স্ত্রীছাড়া বহু নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়পতি একাদশে থাকলে জাতক উদ্যমী ও আশ্রিত-পালক হয়।

দ্বিতীয়পতি দ্বাদশ বা ব্যয়স্থানে থাকলে জাতক ধনী, সাহসী, ও দুঃখী হয়। দ্বিতীয়পতি পাপ গ্রহ হলে জাতক ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে।

তৃতীয়পতি

তৃতীয় ভাব থেকে ভ্রাতা, পরাক্রম, ইত্যাদি বিচার করা হয়।

তৃতীয়পতি লগ্নগত হলে জাতক লম্পট, বড় বড় কথা বলার স্বভাবযুক্ত, অসৎ বন্ধুযুক্ত ও সেবাপরায়ণ হয়।

তৃতীয়পতি দ্বিতীয় ঘরে থাকলে জাতক নির্ধনী, অল্পায়ু ও বন্ধুবিরোধী হয়।

তৃতীয়পতি তৃতীয় ঘরে থাকলে গুরুভক্তি, দেবভক্তি বা রাজভক্তির অধিকারী হয়।

তৃতীয়পতি চতুর্থে থাকলে জাতক পিতা ও সহদরদের সুখী করলেও মায়ের সঙ্গে ঝগড়া লেগে থাকে।

তৃতীয়পতি পঞ্চমে থাকলে জাতক পরোপকারী, দীর্ঘায়ু ও সুবন্ধুভাগ্যের অধিকারী হয়।

তৃতীয়পতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক ধনী, নেত্ররোগী ও বন্ধু-বিরোধী হয়।

তৃতীয়পতি সপ্তম ঘরে থাকলে স্ত্রী সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী হয়। তৃতীয়পতি পাপ গ্রহ হলে স্ত্রীর সঙ্গে দেবরের অবৈধ সম্পর্ক থাকে।

তৃতীয়পতি অষ্টমে থাকলে জাতকের সহোদরের মৃত্যু ঘটে।

তৃতীয়পতি নবমে থাকলে জাতক বন্ধু-পরিত্যক্ত হয়। তবে তৃতীয়পতি শুভগ্রহ হলে জাতক ভালো বন্ধু লাভ করে।

তৃতীয়পতি দশমে থাকলে জাতক মাতৃভক্ত, বন্ধুপ্রিয় ও রাষ্ট্রনায়কের পূজ্য হয়।

তৃতীয়পতি একদশে থাকলে জাতক সুমিত্র, ভোগী ও রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা লাভবান হয়।

তৃতীয়পতি দ্বাদশে থাকলে জাতক মিত্র-বিরোধী ও দূরদেশবাসী হয়।

চতুর্থপতি

চতুর্থস্থান থেকে বিদ্যা, জননী, পিতৃবিত্ত ও সুখ বিচার করা হয়।

চতুর্থপতি লগ্নে থাকলে পিতা ও পুত্র পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর থাকে। পুত্র পিতার নামে বিখ্যাত হয়।

চতুর্থপতি দ্বিতীয় ঘরে থাকলে পিতার সঙ্গে বিরোধ হয়। চতুর্থপতি শুভগ্রহ হলে অবশ্য

জাতক পিতার পালক ও খ্যাতিমান হয়।

চতুর্থপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক পিতা-মাতার শত্রু এমন কি পিতা-মাতার হত্যাকারীও হয়।

চতুর্থপতি চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতক ধনী, মানী, ধার্মিক ও সুখী হয়।

চতুর্থপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক ভূ-সম্পত্তির মালিক, জনপ্রিয়, বিষ্ণুভক্ত হয়। জাতকের পিতা ধনী ও পুত্র দীর্ঘায়ু হয়।

চতুর্থপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতকের একাধিক মা থাকে। জাতক পিতার অর্থনাশকারী, পিতার শত্রু, পিতার দোষ নিজ চরিত্রে গ্রহণকারী ও চোর হয়।

চতুর্থপতি সপ্তম ঘরে থাকলে জাতক বিদ্বান, পিতৃধনত্যাগী ও সভায় জড়বৎ হয়।

চতুর্থপতি অষ্টমে থাকলে জাতক রুগ্ন, দরিদ্র, দুষ্কর্মা ও মৃত্যুপ্রিয় হয়।

চতুর্থপতি নবমে থাকলে জাতক বিদ্বান ও পিতার প্রতি অনাসক্ত হয়।

চতুর্থপতি দশমে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক মান্য, সুখী, আনন্দচিত্ত ও রসায়নবিদ্ হয়।

চতুর্থপতি একাদশে থাকলে জাতক উদার, গুণবান, দাতা ও নিত্যরোগী হয়।

চতুর্থপতি দ্বাদশে অবস্থান করলে জাতক অসুখী ও পিতৃসুখহীন হয়। চতুর্থপতি পাপগ্রহ হলে জাতক জারজ ও ক্লীব হয়।

পঞ্চমপতি

পঞ্চমভাব থেকে পুত্র, বুদ্ধি, দেবভক্তি, রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ ও জাতকের গুপ্ত-মন্ত্রণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চমপতি লগ্নে থাকলে জাতক বুদ্ধিমান, কৃপণ, স্বার্থপর ও শাস্ত্রজ্ঞ হয়।

পঞ্চমপতি দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক ধনবান, উচ্চপদস্থ, খ্যাতিমান, ক্রোধী ও দুঃখিত-চিত্ত হয়।

পঞ্চমপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক মিষ্টভাষী ও যশস্বী হয়।

পঞ্চমপতি চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতক মাতৃভক্ত, পিতৃকর্মে রত হয়।

পঞ্চমপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক বুদ্ধিমান, বচনকুশল, ও খ্যাতিমান হয়।

পঞ্চমপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক শত্রুযুক্ত, রুগ্ন, ধনহীন, মানহীন ও পুত্রযুক্ত হয়।

পঞ্চমপতি সপ্তমে থাকলে জাতক সুশীলা, পুত্রবতী স্ত্রী লাভ করে।

পঞ্চমপতি অষ্টমে থাকলে জাতকের স্ত্রী অসুস্থা, পুত্র ও ভ্রাতা বিকলাঙ্গ হয়, অথবা জাতক সন্তানহীন হয়।

পঞ্চমপতি নবমে থাকলে জাতক কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, রসিক, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়।

পঞ্চমপতি দশমে থাকলে জাতক বিখ্যাত, মাতৃসুখযুক্ত ও পুত্র রাষ্ট্রনেতা হয়।

পঞ্চমপতি একাদশে থাকলে জাতক্ লেখক, জনপ্রিয় ও পুত্র রাষ্ট্রনেতা হয়।

পঞ্চমপতি দ্বাদশে থাকলে এবং পঞ্চমপতি শুভ গ্রহ হলে জাতক সুপুত্রের অধিকারী হয় এবং জাতকের বিদেশযাত্রা সূচিত হয়। পঞ্চমপতি অশুভ হলে জাতক পুত্রহীন হয়।

ষষ্ঠপতি

ষষ্ঠভাব থেকে শত্রু, রোগ, চিন্তা, মাতুল, ক্রুরতা ইত্যাদি বিচার করা হয়।

ষষ্ঠপতি লগ্নে থাকলে জাতক সবল, নিরোগী, উদ্যমী, রিপুজয়ী, বাচাল ও আত্মীয়দের কষ্টদানকারী হয়।

ষষ্ঠপতি দ্বিতীয়ে বা ধনস্থানে থাকলে জাতক দুষ্ট, চতুর, সঞ্চয়ী উচ্চপদস্থ, খ্যাতিমান, রোগযুক্ত ও পুত্রদ্বারা অপহৃতধন হয়।

ষষ্ঠপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক ক্রোধী, বিত্তবান, ভ্রাতৃ-বিরোধী হয়।

ষষ্ঠপতি চতুর্থে থাকলে পিতা রুগ্ন হন, পিতা পুত্রে বৈরিতা থাকে, পিতার বিত্তহানি ঘটে।

ষষ্ঠপতি পঞ্চমে থাকলে পুত্রহানি, পিতা-পুত্রে শত্রুতা ও রাষ্ট্রশক্তির নিগ্রহ জোটে।

ষষ্ঠপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক নিরোগী, সুখী ও কৃপণ হয়।

ষষ্ঠপতি পাপগ্রহ্ হয়ে সপ্তমে থাকলে স্ত্রী উগ্র ও প্রচণ্ড স্বভাবের হয়। ষষ্ঠপতি শুভগ্রহ হয়ে সপ্তমে থাকলে স্ত্রী বন্ধ্যা ও গর্ভপাত রোগযুক্ত হয়। ।

ষষ্ঠপতি হয়ে অষ্টমে শনি থাকলে রোগ, অষ্টমে মঙ্গল থাকলে সর্পদংশনের ভয়, বুধ বিষ থেকে ভয়, চন্দ্র হঠাৎ মৃত্যু, রবি বনচর পশু থেকে ভয়, বৃহস্পতি দুষ্টবুদ্ধি, এবং ষষ্ঠপতি হয়ে অষ্টমে শুক্র থাকলে নেত্রপীড়া হয়।

ষষ্ঠপতি হয়ে কোনও পাপগ্রহ্ নবমে থাকলে জাতক খোঁড়া, পণ্ডিত-বিরুদ্ধবাদী ও গুরু-অবজ্ঞাকারী হয়।

ষষ্ঠপতি হয়ে কোনও পাপগ্রহ্ দশমে থাকলে মায়ের সঙ্গে শত্রুতা হয়। শুভগ্রহ্ থাকলে ধর্মে মতি, পুত্রপালনে মতি দেখা যায়।

কোনও পাপগ্রহ্ ষষ্ঠপতি হয়ে একাদশে থাকলে শত্রু থেকে মৃত্যু, রিপু ও চোর থেকে ক্ষতি হয়।

ষষ্ঠপতি দ্বাদশে থাকলে গৃহপালিত পশু ও ধননাশ ও জাতক ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

সপ্তমপতি

সপ্তম ঘর থেকে স্ত্রী বা স্বামী, ব্যবসা ও ভ্রমণ বিচার করা হয়। ধনভাব অর্থাৎ লগ্ন থেকে দ্বিতীয় ঘর, সপ্তম ঘর ও শুক্র থেকে জ্যোতিষীরা স্ত্রী বা স্বামী বিষয়ে বিচার করে থাকেন।

সপ্তমপতি রাহু বা কেতুর সঙ্গে যুক্ত হলে জাতক ব্যভিচারী হয়।

সপ্তমপতি ও ধনাধিপতি বা দ্বিতীয় ঘরের অধিপতির সম্বন্ধবিশিষ্ট দশা বা অন্তর্দশায় জাতকের বিয়ে হয়। শুক্র, চন্দ্র ও লগ্ন থেকে সপ্তমস্থানের অধিপতির দশা-অন্তর্দশায়ও জাতকের বিয়ের সম্ভাবনা থাকে।

সপ্তমপতি বলবান হয়ে কেন্দ্র কোণে থাকলে বাল্যে বিয়ে হয়।

সপ্তমপতি বা পঞ্চমপতি ষষ্ঠপতির সঙ্গে যুক্ত বা দৃষ্ট হলে স্ত্রী উপপতির সাহায্যে সন্তান

উৎপাদন করে। জাতিকা হলে স্বামী বহুস্ত্রী বিশিষ্ট হয়।

এই ধবনের আরও অনেক বিশ্বাসই জড়িয়ে আছে সপ্তম স্থান ঘিরে। এবার আমরা বরং সপ্তমপতি কোন্ ঘরে থাকলে জ্যোতিষ-বিচার কী বলে দেখা যাক।

সপ্তমপতি লগ্নে থাকলে জাতক রূপবান, ভোগী ও স্ত্রীর দ্বারা অবহেলিত হয।

সপ্তমপতি দ্বিতীয় ঘরে থাকলে জাতকের স্ত্রী দুষ্ট প্রকৃতির হয, জাতক সুখহীন ও নির্জনপ্রিয হয়।

সপ্তমপতি তৃতীয ঘরে থাকেল স্ত্রী সুন্দরী ও দেবরের সঙ্গে প্রণযাবদ্ধ হয। সপ্তমপতি পাপগ্রহ হলে স্ত্রী দেবরের সঙ্গে ঘর বাঁধে। জাতক অসুখী, বন্ধুবৎসল ও আত্মনির্ভরশীল হয।

সপ্তমপতি চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতক চঞ্চলচিত্ত, স্নেহপ্রবণ হন।

সপ্তমপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক সৌভাগ্যযুক্ত, সাহসী ও দুষ্ট স্বভাবের হয।

সপ্তমপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতকের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি থাকে না, এমন কী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক শত্রুতায় দাঁড়ায়।

সপ্তমপতি সপ্তমে থাকলে জাতক সুখী, দীর্ঘাযু, তেজস্বী, নির্মল-স্বভাবযুক্ত হয।

সপ্তমপতি অষ্টমে থাকলে জাতক চিরকুমার ও বেশ্যাসক্ত হয।

সপ্তমপতি নবমে থাকলে জাতক স্বয়ং তেজস্বী, ভদ্র, মার্জিত রুচির হন। স্ত্রীও তেজস্বিনী ও রুচিশীলা হন।

সপ্তমপতি দশমে থাকলে জাতক লম্পট, কর্কশভাষী ও ক্রুর-প্রকৃতির হয।

সপ্তমপতি একাদশে থাকলে জাতকের স্ত্রী রূপবতী ও সুশীলা হয।

সপ্তমপতি দ্বাদশ ঘরে থাকলে জাতকের স্ত্রী চঞ্চলা, পর-পুরুষে আগ্রহী হয কিংবা স্ত্রী অন্যেব সঙ্গে ঘর ছাড়ে।

অষ্টমপতি

অষ্টমস্থান থেকে জাতকের মৃত্যু বিচার করা হয। এ-ছাড়াও মৃত্যু বিষযক আরও অনেক কিছুরই বিচার করা হয অষ্টমস্থান থেকে।

অষ্টমপতি লগ্নে থাকলে জাতক রোগী, চোর, খারাপ আলোচনায আগ্রহী হয।

অষ্টমপতি পাপগ্রহ হযে দ্বিতীয ঘরে থাকলে স্বল্পাযু, বাজতুল্য, শত্রুবান্ হয।

অষ্টমপতি শুক্রগ্রহ হয়ে দ্বিতীযে থাকলে ফল শুভ হয, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে কষ্ট পায।

অষ্টমপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক বিকলাংঙ্গ, চঞ্চল, দুর্বাক, সহোদরহীন ও বন্ধুবিরোধী হয।

অষ্টমপতি চতুর্থে থাকলে জাতকের পিতা রুগ্ন হয, পিতার সঙ্গে শত্রুতা হয, জাতক পিতাব ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে।

অষ্টমপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক অপুত্রক হয, পুত্র হলেও বাঁচে না। অষ্টমপতি শুভগ্রহ হযে শুভগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হযে পঞ্চমে থাকলে জাতক সুপুত্র লাভ কবে।

অষ্টমপতি যদি রবি হয় ও ষষ্ঠে থাকে তবে জাতক রাজশক্তি-বিরোধী হয়। অষ্টমপতি যদি চন্দ্র হয় ও ষষ্ঠে থাকে তবে জাতক রোগী হয়। অষ্টমপতি যদি মঙ্গল হয়ে ষষ্ঠে থাকে, জাতক ঈর্ষাপারায়ণ হয়। বুধ হলে সর্পভয়। বৃহস্পতি হলে কৃশদেহী। শুক্র হলে নেত্ররোগী এবং অষ্টমপতি যদি শনি হয়ে ষষ্ঠে থাকে, জাতক মুখের রোগ ভোগ করে।

অষ্টমপতি সপ্তমে থাকলে জাতক দুষ্ট, গুহ্যরোগযুক্ত হয়। অষ্টমপতি পাপগ্রহ হয়ে সপ্তমে থাকলে জাতক স্ত্রী-বিদ্বেষী ও স্ত্রী-দোষে জাতকের মৃত্যু হয়।

অষ্টমপতি অষ্টম ঘরে থাকলে জাতক ব্যবসায়ী ও সুস্থদেহী হয়।

অষ্টমপতি নবমগত হলে জাতক নিঃসঙ্গ, ঘাতক, পাপী, স্নেহশূন্য এবং পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়।

অষ্টমপতি দশমে থাকলে জাতক সরকারী কর্মচারী, অলস ও বাল্যে মাতৃহীন হয়।

অষ্টমপতি একাদশে থাকলে জাতক অল্পায়ু, বাল্যে দুঃখী ও শেষ বয়সে সুখী হয়।

অষ্টমপতি দ্বাদশে থাকলে জাতক তস্কর, শঠ, বিকৃতদেহ ও স্বেচ্ছাচারী হয়।

নবমপতি

নবমভাব ও বৃহস্পতি থেকে জাতকের ভাগ্য, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্মানুষ্ঠান, উরু ও বাঁ-পায়ের বিচার করা হয়। নবমস্থানকে বলা হয় ভাগ্যস্থান।

লগ্ন থেকে নবম ও চন্দ্র অর্থাৎ জন্মরাশি থেকে নবম—এই দুটির মধ্যে যেটি বেশি বলবান্ সেটা থেকেই ভাগ্য বিচার করা হয়।

নবমপতি লগ্নে থাকলে জাতক বুদ্ধিমান, দেব ও গুরুভক্ত, কৃপণ, স্বল্প ভূসম্পত্তিসম্পন্ন ও সরকারী কর্মচারী হয়।

নবমপতি ধনস্থানে থাকলে জাতক ধনী, বিখ্যাত, বিদ্বান ও যশবান হয়।

নবমপতি তৃতীয় ঘরে থাকলে জাতক বন্ধু-বৎসল হয় ও তার একাধিক স্ত্রী থাকে।

নবমপতি চতুর্থ ঘরে থাকলে জাতক পিতৃভক্ত, বিখ্যাত, ভূসম্পত্তির অধিকারী ও বন্ধুদের উপকারী হয়।

নবমপতি পঞ্চম ঘরে থাকলে জাতক রূপবান, পুত্রবান ও দেবভক্ত হয়।

নবমপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক অধর্মপরায়ণ, নিদ্রালু এবং অশক্ত-দেহী হয়।

নবমপতি সপ্তমে থাকলে জাতক সুরূপা, সুশীলা, শ্রীমতি স্ত্রী লাভ করে।

নবমপতি অষ্টমে থাকলে জাতক অধার্মিক, দুষ্ট, হিংস্র ও বন্ধুশূণ্য হয়।

নবমপতি নবমে থাকলে জাতক স্বদেশে ভাগ্যবান, বন্ধু-প্রিয়, দাতা ও দেব-গুরু-ভক্ত হয়।

নবমপতি দশমে থাকলে জাতক বিশাল ধনী ও ধর্ম দ্বারা বিখ্যাত হয়। মাতার কখনও কোনও বিঘ্ন হয় না।

নবমপতি একাদশে থাকলে জাতক ধর্মিক, স্নেহপরায়ণ, ধনী, বিখ্যাত ও দীর্ঘায়ু হয়।

নবমপতি দ্বাদশে থাকলে জাতক বিদেশে মানী, রূপবান ও বিদ্বান হয়। নবমপতি পাপগ্রহ হয়ে দ্বাদশে থাকলে ধূর্ত ও মন্দবুদ্ধি হয়।

দশমপতি

দশমস্থান থেকে জাতকের ব্যক্তিত্ব, সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব ইত্যাদি বিচার করা হয়।

লগ্ন ও চন্দ্রের মধ্যে যে বলবান, সেই বলবান স্থান থেকে দশমভাব বিচার করে জাতকের কর্ম ও বৃত্তিবিচারও করা হয়ে থাকে। দশমস্থান অর্থাৎ কর্মস্থানে গ্রহ থাকলে শুভ ফল দিয়ে থাকে। গর্গমতে দশমস্থানে কোনও গ্রহ বা গ্রহের দৃষ্টি না থাকলে জাতক দরিদ্র হয়।

দশমপতি লগ্নে থাকলে জাতক পিতৃভক্ত, মায়ের বিরোধী, দুঃখী ও শৈশবে পিতৃহীন হয়।

দশমপতি দ্বিতীয়স্থানে থাকলে জাতক মায়ের দ্বারা পালিত, মায়ের অনিষ্টকারী, অল্প ভূসম্পত্তিসম্পন্ন ও অল্পকর্মা হয়।

দশমপতি তৃতীয়স্থানে থাকলে মা ও আত্মীয়দের বিরোধী হয় এবং জাতক মামারবাড়িতে পালিত হয়।

দশমপতি চতুর্থে থাকলে জাতক মা-বাবাকে সুখী করে, সকলকেই আনন্দ দেয় ও রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ লাভ করে।

দশমপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ লাভ করে এবং সংগীত-প্রিয় হয়।

দশমপতি ষষ্ঠে থাকলে জাতক নিজগুণে বিখ্যাত হয়, পিতৃ-সম্পত্তি লাভ করে এবং রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহ পেয়ে থাকে। ষষ্ঠে পাপগ্রহ থাকলে অশুভ ফল পায়।

দশমপতি সপ্তমে থাকলে জাতকের স্ত্রী সুরূপা, পুত্রবতী এবং জাতক মাতৃপালক হয়।

দশমপতি অষ্টমে থাকলে জাতক মিথ্যাবাদী, চোর, ধূর্ত ও মাকে কষ্ট দেয়। অবশ্য অষ্টমে শুভগ্রহ থাকলে অশুভ এই ফল লাভ করতে হয় না।

দশমপতি নবমে থাকলে জাতক সচ্চরিত্র, সদবন্ধুবিশিষ্ট হয়। জাতকের মা হন পুণ্যবতী।

দশমপতি দশমে থাকলে জাতক বাক্‌চতুর হয় ও মা'কে সুখী করে।

দশমপতি একাদশে থাকলে জাতক সম্মান ও ধনলাভ করে, দীর্ঘায়ু হয় ও মাকে সুখী করে।

দশমপতি দ্বাদশে থাকলে জাতক শক্তিমান, রাজকর্মে রত, সৎকাজে উৎসাহী হয়। দশমে ক্রূরগ্রহ থাকলে জাতক বিদেশগামী হয়।

একাদশপতি

একাদশ স্থানকে আয়স্থান বলা হয়। লগ্ন থেকে একাদশ স্থানে কোনও গ্রহের দৃষ্টি থাকলেই কিছু শুভ হয়ে থাকে। রবিযুক্ত অথবা রবিদৃষ্ট আয়ভাব রবির স্বক্ষেত্র হলে জাতক রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ মন্ত্রী, চোর, চতুষ্পদ জন্তু ও কলহ থেকে ধন লাভ করে। একাদশস্থান চন্দ্রের ক্ষেত্র হলে এবং তাতে চন্দ্রের দৃষ্টি যোগ থাকলে জাতকের জলাশয়, অশ্ব ও স্ত্রী বৃদ্ধি হয়। কিন্তু চন্দ্র দুর্বল হলে ফল বিপরীত হয়। মঙ্গল একাদশে দৃষ্টি দিলে এবং একাদশ স্থানটি মঙ্গলের স্বক্ষেত্র হলে জাতক সাহস ও কৌশলের দ্বারা প্রচুর আয় করে থাকে। একাদশে বুধ থাকলে

জাতক কাব্য, শিল্প, বানিজ্য, ইত্যাদির দ্বারা আর করবে। একাদশে বৃহস্পতি থাকলে জাতক রাষ্ট্রশক্তির অনুগ্রহে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তির মালিক হয়।

এবার দেখা যাক একাদশ স্থানের অধিপতি কোন্ কোন্ স্থানে কি ধরনের ফল দেয় বলে জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন।

একাদশপতি লগ্নে থাকলে জাতক স্বল্পায়ু, বীর, দাতা, ধনপ্রিয় ও সৌভাগ্যশালী হয়।

একাদশপতি দ্বিতীয় বা ধনস্থানে থাকলে জাতক যা আয় করে তাই ব্যয় হয়ে যায়। জাতক দুঃখ ও রোগভোগ করে এবং স্বল্পায়ু হয়।

একাদশপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক বন্ধুবৎসল ও সৎ হয়।

একাদশপতি চতুর্থে থাকলে জাতক দীর্ঘায়ু, পিতৃভক্ত, ধার্মিক হয়।

একাদশপতি পঞ্চমে থাকলে জাতকের পুত্র স্বল্পায়ু হয়।

একাদশপতি ষষ্ঠাগত হলে জাতক শত্রুবিশিষ্ট হয়, দীর্ঘ রোগভোগ করে, অশ্ব সংগ্রহকারী হয়। একাদশপতি ক্রুরগ্রহ হয়ে ষষ্ঠে থাকলে জাতক বিদেশে চোর-ছিনতাইকারীদের হাতে প্রাণ দেয়।

একাদশপতি সপ্তমে থাকলে জাতক তেজস্বী, দীর্ঘায়ু, সুশীল এবং এক স্ত্রীর স্বামী হয়ে থাকে।

একাদশপতি অষ্টমে ক্রুরগ্রহ থাকলে জাতক জীবন্মৃত, স্বল্পায়ু, ও দীর্ঘ রোগভোগ করে। শুভগ্রহ থাকলে জাতক দুঃখী জীবন কাটায়।

একাদশপতি নবমে থাকলে জাতক বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত, ধর্মে খ্যাতিলাভ করে।

একদশপতি দশমে থাকলে জাতক মাতৃভক্ত, পিতৃদ্বেষী, ধনবান ও দীর্ঘজীবী হয়।

একদশপতি একাদশে থাকলে জাতক রূপবান, সুশীল, জনপ্রিয়, দীর্ঘায়ু এবং পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়।

একদশপতি দ্বাদশে থাকলে জাতক মানী, দাতা, দুঃখী, অস্থিরমতি ও তেজী হয়।

দ্বাদশপতি

দ্বাদশপতি থেকে ব্যয়, অর্থহানি, আইনের-দণ্ড ইত্যাদি বিচার করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে দ্বাদশে রবি, মঙ্গল অথবা শনি থাকলে জাতক অতিরিক্ত ব্যয়শীল হয়। বৃহস্পতি, শুক্র ও পূর্ণচন্দ্র ব্যয়স্থানে অর্থাৎ একাদশে থাকলে জাতক সঞ্চয়শীল হয়। ব্যয়স্থানে শুক্র থাকলে জাতক নীচ মনের মানুষ হয়। অলস, ভোগী ও রমনপ্রিয় হয়। ব্যয়স্থানে শুভগ্রহ থাকলে জাতক সদ্ব্যয়ী ও কীর্তিমান হয়। ব্যয়স্থানে অশুভগ্রহ থাকলে জাতক অসৎ কাজে ব্যয় করে এবং কুকীর্তির অধিকারী হয়। দ্বাদশে রবি বা মঙ্গল থাকলে জাতক চোখের পীড়ায় ভোগে।

দ্বাদশপতি লগ্নে থাকলে জাতক রূপবান, মিষ্টভাষী, বিদেশগামী, চিরকুমার, চিরকুমারী অথবা ক্লীব হয়।

দ্বাদশপতি দ্বিতীয়ে থাকলে জাতক কটুভাষী ও কৃপণ হয়। দ্বাদশপতি দ্বিতীয়ে ক্রুরগ্রহ হলে অল্পায়ু হয়। রাষ্ট্রশক্তি, চোর ও আগুন থেকে জাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বাদশপতি তৃতীয়ে থাকলে জাতক ধনবান, কৃপণ, অল্প সহোদর-যুক্ত এবং বন্ধুহীন হয়।

দ্বাদশপতি চতুর্থে থাকলে জাতক কৃপণ, দুঃখী ও অসুখ নিয়ে ভীত হয়। পুত্র জাতকের মৃত্যুব কারণ হয়।

দ্বাদশপতি পঞ্চমে থাকলে জাতক পিতৃভক্ত ও পুত্রবিশিষ্ট হয়। ক্রূরগ্রহ দ্বাদশপতি হয়ে পঞ্চমে থাকলে জাতক পুত্রহীন হয়।

দ্বাদশপতি ষষ্ঠে থাকলে ক্রূরগ্রহে হলে জাতক কৃপণ ও অল্পায়ু হয় এবং জনগণের দ্বারা নিন্দিত হয়। দ্বাদশপতি যদি শুক্র হয় এবং ষষ্ঠে থাকে জাতক অন্ধ হয়।

দ্বাদশপতি সপ্তমে থাকলে দুশ্চরিত্র লম্পট, বাচাল ও নিন্দিত চরিত্রের হয়। জাতকের হাতে দেহজীবিব মৃত্যু হয়। দ্বাদশপতি ক্রূরগ্রহ হয়ে সপ্তমে থাকলে জাতক স্ত্রীর মৃত্যুর কাবণ হয়।

দ্বাদশপতি অষ্টমে শুভগ্রহ থাকলে জাতক ধনী এবং অশুভগ্রহ থাকলে চরম ভাগ্যহীন হয়।

দ্বাদশপতি নবমে থাকলে জাতক বার বার বৃত্তি পরিবর্তন করে।

দ্বাদশপতি দশমে থাকলে জাতক ধনী, পুত্রবান হয়।

দ্বাদশপতি একাদশে থাকলে জাতক খ্যাতিমান, সুদর্শন, সত্যাশ্রয়ী, দাতা, দীর্ঘজীবী ও কর্মজীবনে উচ্চপদস্থ হয়।

দ্বাদশপতি দ্বাদশে থাকলে জাতক ঐশ্বর্যশালী, কৃপণ ও দীর্ঘজীবী হয়।

রাশি অনুসারে যোটক-বিচার

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে পুরুষদের মেষ থেকে মীন পর্যন্ত বারোটি রাশির ক্ষেত্রে নারীদের কোন্ বাশিব মিলন কেমন হবে ছক করে এ-বিষয়ে আলোকপাত করলাম—

নারীর রাশি

পুরুষের বাশি	রাজযোটক	উত্তব মিলন	মধ্যম মিলন	অশুভ	মাঝারি
মেষ	মেষ, মিথুন, কর্কট, মকর, কুম্ভ	ধনু, মীন	বিছা, বৃষ	সিংহ	কর্কট, তুলা
বৃষ	বৃষ, কর্কট, সিংহ, বিছা, কুম্ভ	মীন, মকর	মেষ	তুলা, মকর	কর্কট, ধনু
মিথুন	মিথুন, সিংহ, কুম্ভ, মীন, মেষ	কুম্ভ, বৃষ	মকর	কর্কট, তুলা	বিছা, ধনু
কর্কট	কর্কট, কন্যা, তুলা, মকর, মেষ	বৃষ, মীন	মীন, মিথুন	ধনু, সিংহ	বিছা, কুম্ভ
সিংহ	সিংহ, তুলা, বিছা, বৃষ, মিথুন	মেষ, কর্কট, মীন	মীন	কর্কট, ধনু	মকব, কুম্ভ
কন্যা	কন্যা, বিছা, ধনু, মীন, মিথুন	মিথুন, কর্কট, বৃষ	সিংহ	কুম্ভ, তুলা, মকর	বিছা
তুলা	তুলা, ধনু, মকর, কর্কট, সিংহ	সিংহ, মিথুন	কর্কট, বৃষ	মেষ, বিছা, কুম্ভ	মিথুন
বৃশ্চিক	বিছা, মকর, কুম্ভ, সিংহ, কন্যা	কর্কট	তুলা	ধনু, মীন	মীন
ধনু	ধনু, কুম্ভ, মীন, কর্কট, তুলা	সিংহ	বিছা	বৃষ	মকর
মকর	মকব, মীন, মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা	কর্কট	ধনু, মিথুন	সিংহ	মীন
কুম্ভ	মীন, মেষ, বৃষ, বিছা, ধনু	মকর	মকব, বিছা	কর্কট	সিংহ
মীন	মীন, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনু, মকব	কুম্ভ	কুম্ভ, সিংহ	কর্কট	

ছয়

হাতের রেখা বিচারের ইতিহাস

হস্তরেখাবিদদের মতে একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বোঝার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সেই মানুষটির হাতের গঠন ও হাতের রেখা এক লহমায় লক্ষ্য করা।

হস্তরেখা বিচারের ইতিহাস ঠিক কতটা প্রাচীন সে বিষয়ে সঠিক করে জানা না গেলেও হস্তরেখাবিদ্ কিংবদন্তী পুরুষ কিরোর মতে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জন-জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে হস্তরেখা বিচারের চর্চা চালিয়ে আসছিলেন।

প্রাচীন গ্রীসেও হাতের রেখা দেখে ভাগ্য-বিচারের চল ছিল। অ্যারিস্টটল, প্লিনি, কার্ডামিস, সম্রাট অগস্টাস, সম্রাট আলেকজাণ্ডার হস্তরেখাবিদ্যা নিয়ে চর্চা করেছিলেন।

প্রাক মধ্যযুগে চার্চগুলো হস্তরেখাবিদ্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা একে ডাইনিবিদ্যা বা পিশাচবিদ্যা বলে ঘোষণা করে। চার্চের কোপ এড়াতে হস্তরেখাবিদ্যার চর্চা থেকে প্রায় সকলেই নিজেকে সরিয়ে আনেন।

এর পরবর্তী কালে হাতের রেখা দেখার চর্চা জিপসী ও ওই ধরনের কিছু ভ্রাম্যমান মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মধ্যযুগে আবার আমরা দেখতে পেলাম হস্তরেখাবিদ্যাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় কিছু মানুষকে এগিয়ে আসতে। বৃটিশ মিউজিয়ামে রাখা হস্তরেখার উপর দুটি প্রকাশিত বই-এর খবর আমরা পাই। একটি "The Kunst Kiromantia", প্রকাশকাল ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। অপরটি "The Cyromantia Aristotelis cum Figures", প্রকাশকাল ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

হস্তরেখাবিদ্যার পুনরুত্থান উনবিংশ শতকে। তারপর কালের গতির সঙ্গে হাত দেখা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। এই মুহূর্তে সাধারণের মধ্যে ছক কষে ভাগ্য বিচার করার চেয়ে হাত দেখে ভাগ্য বিচার অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ-যুগের স্কুল-কলেজের অনেক ছেলে মেয়েই তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের হাত টেনে নিয়ে গড়-গড় করে অনেক কথাই বলে যায়, শোনায় ভবিষ্যতের গল্প, দেখায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। অনেকে অবশ্য মহিলা মহলে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য, সুন্দর হাত ধরার ফন্দিতে, তোষামোদ করে মন-ভেজাতে হস্তরেখাবিদ্ হয়ে যায়। এর জন্য এইসব হস্তরেখাবিদ্‌রা পেশাদার জ্যোতিষীদের মতই হাতের

রেখার চেয়ে মানুষটির পোশাক-আশাক, হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, রুচি, ভাললাগা ইত্যাদির হদিশ বুঝেই ভবিষ্যদ্বাণী করে।

ছক কষে ভাগ্য বিচারের নিযম-কানুনগুলো হাত দেখার নিয়ম-কানুনের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলেই সাধারণের মধ্যে হাত-দেখা শেখার প্রবণতাই বেশি।

হস্তরেখা বিচারের পদ্ধতি

হাতের রেখায় ভবিষ্যৎ

হাতের রেখা বিচার করার আগে হস্তরেখাবিদ্‌রা হাতের অন্যান্য কিছু লক্ষণ দেখে জাতকের চরিত্র বিচার করেন, এবং এটাই হলো হাত দেখার প্রথম পদক্ষেপ।

স্বল্প রেখাযুক্ত পরিষ্কার হাত : এই ধরনের হাতের অধিকারী হন মার্জিত, ঠাণ্ডামাথার শান্ত স্বভাবের মানুষ। এঁরা যে কোনও ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। দুশ্চিন্তায় না ভুগে করণীয কাজ করা পচ্ছন্দ করেন। চট্ করে রাগেন না।

তবে এই ধরনের হাতই যদি শক্ত ও সুগঠিত হয তবে হাতের মালিকের আত্মনিযন্ত্রণক্ষমতা আরো বেশি হয়।

বহু সূক্ষ্ম রেখাযুক্ত হাত : হাতের মালিক স্বল্পে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। এঁরা স্বভাবে নিরীহ, অপাত্রে বিশ্বাসী ও অতিরিক্ত সতর্ক হন।

হাতের রঙ দেখেও জাতকের চরিত্র বিচার করা হয়।

লালচে : হাতের মালিক স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত, উদ্যোগী, আবেগপ্রবণ ও মেজাজি।

গোলাপী : হাতের অধিকারী করিৎকর্মা, উজ্জ্বল ও আশাবাদী ব্যক্তিত্ব।

সাদাটে : অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রীক, তথ্য-গোপনে তৎপর, গর্বিতচিত্ত, দাম্ভিক ও সুবিধাভোগী।

হলদেটে : বিষণ্নচিত্ত, কর্মবিমুখ, উদাসী।

চওড়া তালু, বেঁটে, মোটা আঙুল, কুশ্রী নখ : এদের হাতে প্রধান তিনটি ভাঁজ ছাড়া অন্যান্য রেখা প্রায় থাকেই না, অর্থাৎ থাকলেও সেগুলো থাকে অতি অস্পষ্ট, না থাকার মতই। বুড়ো আঙুল হয মোটা। এরা ক্রোধী, কাপুরুষ, উচ্চাকাঙ্খাহীন হয।

চৌকো হাত : হাতটি বেশ পরিষ্কারভাবেই চৌকো। নখগুলোও চৌকো। এরা ধীরস্থির, গতানুগতিক, আইন-শৃঙখলা মেনে চলেন। ব্যবহারিকজ্ঞান যথেষ্ট।

চৌকো হাতে লম্বা আঙুল : জীবিকা হিসেবে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনও বৃত্তি পছন্দ করেন। সাহিত্য ভালবাসেন, অর্থ সঞ্চয়ী নন।

দার্শনিক হাত : এঁদের আঙুলের পর্বে পর্বে গাঁট থাকে। এঁরা চিন্তাশীল, তথ্যানুসন্ধানী, অন্তর্মুখী।

শিল্পী-হাত : হাতের গঠন সুন্দর। আঙুলগুলো গোল এবং আঙুলের অগ্রভাগ ধীরে ধীরে সরু হয়েছে। এঁরা সৌন্দর্যপ্রিয, মিষ্টভাষী, ভোগী, আবেগপ্রবণ এবং দৈববিশ্বাসী।

আধ্যাত্মিক হাত : হাত লম্বা, সরু এবং পাতলা। আঙুলগুলো ক্রমশঃ সরু। নখগুলো বাদাম আকারের। এঁরা ধার্মিক, স্পর্শকাতর, আবেগপ্রবণ।

নমনীয় বুড়ো আঙুল : শান্ত, নমনীয, পরিশীলিত, উদার এবং অমিতব্যয়ী। যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নেন।

অনমনীয় বুড়ো আঙুল : স্বল্পভাষী, দৃঢ়চেতা, সতর্ক, গোপনীযতা-রক্ষায় তৎপর।

হাতের ভাষা বুঝতে গেলে নখের বিষযেও জানতে হবে, হস্তরেখাবিদ্‌রা এমনটা বিশ্বাস করেন, বলে থাকেন।

নখ থেকে রোগ

খুব লম্বা নখ : শারীরিকভাবে দুর্বল, ফুসফুসের দোষ থাকাব সম্ভাবনা।

খুব লম্বা এবং সরু নখ : শরীর দুর্বল, মেরুদণ্ডের দুর্বলতা থাকার সম্ভাবনা।

খুব লম্বা নীলচে অথবা মলিন বর্ণের নখ : ক্ষযরোগের প্রবণতা নির্দেশ করে।

ছোট নীলচে নখ : বক্ষদেশের দুর্বলতা বোঝায়। হার্টের অসুখ হতে পারে।

ছোট গোলাকার নখ : নাক এবং গলার অসুখ, হাঁপানি, ল্যারিঞ্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ নির্দেশ করে।

ছোট নখ, নখের তলার দিকটা চ্যাপ্টা : হৃদরোগী।

ছোট নখ, নখের তলার দিকে সাদা চাঁদ : হৃদযন্ত্র সবল।

শরীরের ভিতর গভীরভাবে চেপে বসা চ্যাপ্টা নখ : স্নাযুঘটিত ব্যাধি নির্দেশ করে।

নখে সাদা সাদা দাগ : স্নায়বিক রোগ নির্দেশ করে।

খুব পাতলা ভঙ্গুর নখ : দুর্বল স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

নখ থেকে স্বভাব

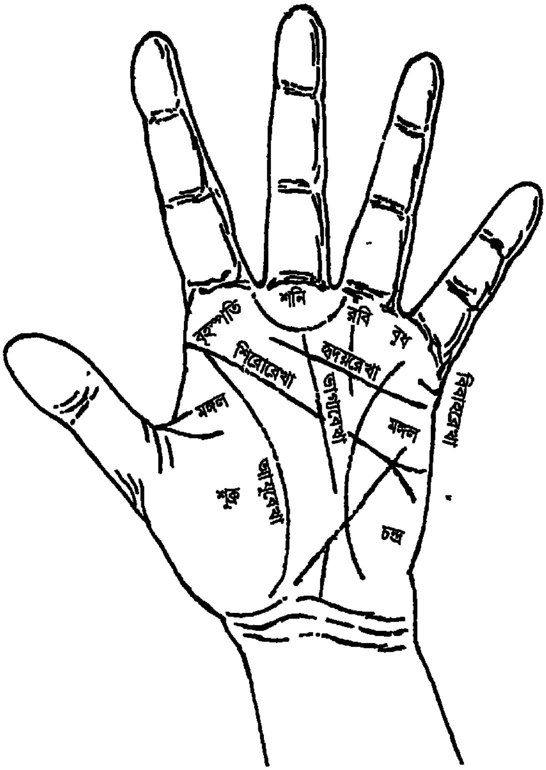
লম্বা নখ : শান্ত, ভদ্র, আদর্শবাদী, শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী।

ছোট নখ : বাস্তববাদী, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা পছন্দ করে, যুক্তিবাদী।

লম্বার চেয়ে চওড়া বেশি যে নখ : ঝগড়ুটে, খিটমিটে, তিলকে তাল করেন।

গ্রহস্থল বা গ্রহের মাউন্ট

হাতে নযটি গ্রহস্থল কল্পনা করেছেন হস্তরেখাবিদ্‌রা। যেমন— ১। শুক্রস্থল ২। প্রথম মঙ্গলস্থল (ভারতীয মতে রাহুস্থল) ৩। বৃহস্পতিস্থল ৪। শনিস্থল ৫। রবিস্থল ৬। বুধস্থল ৭। দ্বিতীয মঙ্গলস্থল ৮। চন্দ্রস্থল ৯। মঙ্গলের সমতল।



গ্রহস্থলের ফল

শুক্রস্থল ঃ বুড়ো আঙুলের মূলে শুক্রের ক্ষেত্র। শুক্র সুখ, প্রেম, ভালোবাসা ও শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠা প্রদানকারী গ্রহ। শুক্রের ক্ষেত্র প্রশস্ত হলে জাতক প্রেম, ভালোবাসা যেমন পায়, তেমনই জীবনে একাধিক প্রেম এসে থাকে অথবা বিয়ের পরও চলে প্রেমের অভিনয়। সৃষ্টিধর্মী কাজে ও কর্মজীবনে সফলতা আসে।

শুক্রের ক্ষেত্রে কাটাকাটি বা জাল রেখা থাকলে জাতকের জীবনে দেখা যায় যৌন দুর্বলতা, পতিতা গমন এবং দুর্নাম।

শুক্রের ক্ষেত্রে তিল থাকলে জাতকের দুর্নাম হয়। প্রেমিক-প্রেমিকাদের দ্বারা প্রতারিত হন।

প্রথম মঙ্গলস্থল বা ভারতীয় মতে রাহুস্থল ঃ তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মাঝে এই ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি উন্নত, কাটাকাটিহীন, সুগঠিত, তিল বর্জিত হলে জাতক কর্মশক্তিতে ভরপুর, সংগঠনের নেতা, জনগণের বিশ্বাস অর্জনকারী, অহংকারী হন। আবার এঁরা বড় গুণ্ডাদলের

নেতা, সমাজবিরোধী নেতা, শিকারী, ক্রোধী, যৌন আসক্তিসম্পন্ন হতে পারেন। জাতক কোন্ দলে পড়বেন সামগ্রিক হাতের রেখা বিচার করে বলা প্রয়োজন।

ক্ষেত্রটিতে কাটাকাটি, জালচিহ্ন বা তিল থাকলে উন্নতিতে পদে পদে বাধা, শুভকাজে বিঘ্ন, প্রাপ্তিতে বিলম্ব ও শত্রুভয়, পেটের রোগ, যৌন রোগ, নেশার রোগ, অঙ্গহানী, আঘাত ইত্যাদি দেখা যায়।

বৃহস্পতিস্থল : তর্জনীর মূলে বৃহস্পতির ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি প্রশস্ত, উচ্চ ও কাটাকাটিহীন হলে ইঙ্গিত করে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, গঠনমূলক কাজে দক্ষতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকারের মানসিকতা। স্বভাবে আনন্দচিত্ত, শান্তিপ্রিয়, উদার, চিন্তাশীল, অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্র অতি শুভ।

বৃহস্পতিস্থল অপ্রশস্ত, নিচন্থ, দুর্বল অপরিষ্কার হলে জাতক হয় সংকীর্ণ-চিত্ত, সন্দেহপ্রবণ, দাম্ভিক, অসৎবন্ধুযুক্ত। জাতকের জীবনে আসে বিড়ম্বনা, দুর্ভোগ ও দুঃখ।

শনিস্থল : শনির ক্ষেত্র মধ্যমার মূলে। শনির ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত, সুউচ্চ হলে জাতক দৃঢ়চেতা, সহনশীলতা, চিন্তাশীল, সাধনমগ্ন, কৃচ্ছ্রসাধনকারী, ধার্মিক, ত্যাগী, গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বসচেতন, নীতিজ্ঞানী ও ধনী হন। শনির ক্ষেত্র অতি শুভ হলে জাতক সম্রাটতুল্য সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ধর্মের জন্য সংসার ত্যাগের প্রবণতা থাকে।

শনির ক্ষেত্র অপ্রশস্ত হলে বোঝায় জাতকের গভীরতার অভাব এবং জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব, আত্মীয়দের সঙ্গে অমিল, অন্যায় পথে আনন্দ।

রবিস্থল : অনামিকার মূলে রবির ক্ষেত্র। রবির ক্ষেত্র সুগঠিত হলে জাতক লোকপ্রিয়, খ্যাতিমান, সম্মানীয়, জীবনযুদ্ধে অজেয়, দাতা, কলাপ্রিয়, ব্যক্তিত্ববান, সৌন্দর্যপূজারী, উদার হৃদয়, স্নেহপ্রবণ এবং উৎফুল্ল মেজাজের হয়। ভণ্ডামী সহ্য করতে পারে না। ঘৃণ্যদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। ভালোবাসে আন্তরিকতার সঙ্গে। অনুগ্রহভাজন হতে অপছন্দ করে। মাথা উঁচু করে চলতে ভালোবাসে, ভালোবাসে নিজের গুণগান শুনতে।

রবির ক্ষেত্র খারাপ হলে জাতক সংকীর্ণমনা, ঈর্ষাকাতর হয়। জীবন-যুদ্ধে ও সম্মানলাভে দেখা দেয় বাধা।

বুধস্থল : কনিষ্ঠার নিচে বুধের ক্ষেত্র। বুধের ক্ষেত্র উন্নত, প্রশস্ত, কাটাকাটিবিহীন হলে বোঝায় জাতকের চিন্তাশক্তির গভীরতা, রসবোধ, বালকসুলভ মানসিকতা। সরলতার পাশাপাশি বিরাজ করে কুটিলতা। চিকিৎসাবিদ্যা, অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, গ্রন্থরচনা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের যে কোনও কাজে সার্থক হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বুধের ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, কাটাকাটিযুক্ত বা তিল চিহ্নযুক্ত হলে জাতক কুপথে চালিত, অহংকারী ও বিবাদপ্রিয় হয়। জাতক পুরুষ হলে নারীর দ্বারা এবং নারী হলে পুরুষ দ্বারা প্রতারিত হয়।

দ্বিতীয় মঙ্গলস্থল : বুধের ক্ষেত্রের ঠিক নিচেই মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্র। মঙ্গলের এই ক্ষেত্রটি উন্নত ও পরিচ্ছন্ন হলে ইঙ্গিত করে তেজ, বীরত্ব, বাস্তববোধ ও পরাক্রম বিস্তারের প্রবণতা। জাতক কঠোর পরিশ্রমী। চাকরি বা ব্যবসায় যে পথেই যাবে উন্নতি করবে। শুভ মঙ্গল ভূ-সম্পত্তি, কৃষিজমি ও বাড়ি দেয়। জাতক কর্মপ্রিয় হলেও নেশার প্রতি আসক্তি থাকা স্বাভাবিক।

মঙ্গলেব এই ক্ষেত্রটি খারাপ হলে জাতক সম্পত্তিহীন হয়—থাকলেও নষ্ট হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামাপ্রিয হয়, আকস্মিক দুর্ঘটনায পড়ার যোগ দেখা যায়।

চন্দ্রস্থল : মঙ্গলের দ্বিতীয় ক্ষেত্রের নিচে, কব্জির উপরে চন্দ্রের ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি উচ্চ, প্রশস্ত ও পরিষ্কার হলে জাতক লেখক, কল্পনাপ্রবণ, ভাবপ্রবণ, রোমান্টিক, আদর্শবাদী, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রমণপ্রিয হয়।

মঙ্গলের সমতল-ক্ষেত্র : হাতেব তালুর কেন্দ্রস্থলই মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটি একটু নিচুই হয। তবে এটি প্রশস্ত ও সুগঠিত হলে শুভ। শুভ হলে সুখ, কর্মজীবনে উন্নতি, যশ, সম্পত্তি, সুউপার্জন-যোগ। জাতক ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হয়।

মঙ্গল অশুভ হলে অর্থাৎ হাতের তালুতে অত্যধিক কাটাকাটি বা তিল থাকলে কাজে অসাফল্য, ব্যবসায় ক্ষতি, সম্পত্তি নষ্ট ও লোকনিন্দার সম্ভাবনা দেখা যায়।

হাতের প্রধান প্রধান রেখা

শিরোরেখা : হস্তরেখাবিদ্‌দের কাছে শিরোরেখা হাত দেখার পক্ষে সবচেযে প্রযোজনীয রেখা। সোজা সরলরেখা জাতকের প্রবল বাস্তববুদ্ধির ও সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয দেয।

যদি শুরুতে সোজা হযে তারপর নিচের দিকে বাঁকা হয়, তাহলে বোঝায বাস্তববুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির মিলন, ব্যবসায় সাফল্য এবং অর্থাগম।

শিরোরেখা যদি নিচের দিকে হৃদয়রেখার দিকে বেঁকে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে হাতের মালিক ঝোগড়ুটে, খিটমিটে, এমন কী তার হাতে খুন-খারাবিও হয়ে যেতে পারে, অর্থের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক।

রেখাটি যদি নিচের দিকে একটু একটু করে ঢালু হযে নামতে থাকে তাহলে জাতকের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি বেশি থাকে। শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, অভিনেতাদের হাতে মিলবে এই জাতীয় শিরোরেখা।

রেখাটি খুব বেশি ঢালু হলে তা অবশ্যই রোম্যান্টিসিজম এবং আদর্শবাদের চূড়ান্ত হযে দাঁড়ায। অনেক সময জাতকের মনে আত্মহত্যার ইচ্ছে জেগে ওঠে।

ঢালু শিরোবেখা চন্দ্রস্থানে দুটি ভাগ হযে গেলে সাহিত্যপ্রতিভা বোঝায।

শিরোরেখা যদি আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায শুরু হয তা জাতকের স্পর্শকাতরতা, সতর্ক-মনোবৃত্তি এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব নির্দেশ করে।

শিরোবেখা আয়ুরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে এবং রেখাটি করতলের অনেকদূর পর্যন্ত থাকলে জাতক হয স্বাধীন ও চিন্তাশীল মানসিকতার। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কাজে এগিযে আসে। জনগণকে নিজের মত সহজ-সবলভাবে বোঝাতে সক্ষম হয।

শিবোবেখাটি খুব ছোট হযে তালুর মাঝখানে শেষ হযে গেলে জাতক অত্যন্ত বাস্তববাদী-মানসিকতার পরিচয দেয।

বেখাটি সংক্ষিপ্ত ও খুব দৃঢ় হলে জাতকের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে হৃদয শাসন করে।

শিরোরেখার উপর বিভিন্ন চিহ্ন

শিরোরেখায় যব চিহ্ন মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ও মস্তিষ্কের অসুখ বোঝায়। কী কারণে মানসিক বৈকল্য দেখা দেবে তা নির্ভর করে কোন্ জায়গায় যব চিহ্ন আছে তার ওপর।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিচে শিরোরেখায় যব চিহ্ন থাকলে জাতক অতি উচ্চাকাঙ্খার জন্য মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অথবা মানসিক রোগের শিকার হয়।

শনির ক্ষেত্রের নিচে শিরোরেখায় যব চিহ্ন থাকলে জাতক অতিমাত্রায় আত্মানুসন্ধান চালাতে গিয়ে নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, অথবা মানসিক রোগের শিকার হয়।

রবির ক্ষেত্রের নিচে শিরোরেখায় যব চিহ্ন থাকলে খ্যাতি ও সাফল্যের পিছনে ছুটতে ছুটতে জাতক এক সময় অতিশ্রমে অথবা নিরাশায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

বুধের ক্ষেত্রের নিচে শিরোরেখায় যব চিহ্ন থাকলে জাতক ব্যবসা বা বিজ্ঞানসাধনার চিন্তায় অতি পীড়িত হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

পুরো শিরোরেখাটা শিকলের মত দেখতে হলে জাতক অতি দুর্বল-মস্তিষ্কের হয়। কোনও মানসিক আঘাত, কোনও গভীর চিন্তা, কোনও দুশ্চিন্তা বা কোনও গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলে এরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, অথবা মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কেবলমাত্র শিরোরেখার শুরুতে শিকল থাকলে দেখা যায় জাতক জীবনের শুরুতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতায় ভুগলেও পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

শিকল শিরোরেখার শুধুমাত্র মধ্যভাগে থাকলে মধ্য-জীবনে মানসিক অসুস্থতা বোঝায়।

শিরোরেখার শেষপ্রান্তে শিকল থাকলে শেষ জীবনে মানসিক অসুস্থতা বোঝায়।

শিরোরেখাটি যখন অভগ্ন না হয়ে কিছু ছোট ছোট রেখার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তখন জাতকের পক্ষাঘাত-প্রবণতা নির্দেশ করে।

আয়ুরেখা

আয়ুরেখা তর্জনীর কিছুটা নিচে থেকে শুরু হয়ে বুড়ো আঙুলের নিচের শুক্রের ক্ষেত্রটিকে ধনুকের মত বাঁক দিয়ে ঘিরে মণিবন্ধের দিকে যায়।

আয়ুরেখা থেকে শারীরিক কাঠামো, জীবনীশক্তি, কর্মক্ষমতা, ভ্রমণ ইত্যাদির হদিশ পাওয়া যায়।

আয়ুরেখা থেকে শুরু হয়ে কোনও রেখা যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে জাতকের উচ্চাকাঙ্খা ও কাজ করার তীব্র ইচ্ছে দেখা যায়। এই বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে যাওয়া রেখাটিতে কোনও যব বা দ্বীপ চিহ্ন থাকার অর্থ, জাতক তীব্র ইচ্ছাকে কার্যকর করতে গিয়ে অত্যধিক পরিশ্রমে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে।

আয়ুরেখা থেকে শুরু হয়ে কোনও রেখা যদি শনির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে জাতকের স্বভাব হবে কঠোর পরিশ্রমী, বিষণ্ণ ও একা থাকতে ইচ্ছুক।

আয়ুরেখা থেকে শুরু হয়ে কোনও রেখা যদি রবির ক্ষেত্র পর্যন্ত যায় তবে বোঝা যায় জাতক বহু মানুষের সঙ্গে চলতে ও তাদের কাছে প্রিয় হতে ইচ্ছুক। এরা সাধারণত সুবক্তা, অভিনেতা, রাজনীতিক হয়।

আয়ুরেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্র থেকে শুরু হলে কোনও জাতকের উচ্চাকাঙ্খা, বয়সের চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিপক্কতা বোঝায়।

আয়ুরেখা মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্র বা ভারতীয় মতে রাহুর ক্ষেত্র থেকে শুরু হলে জাতক অতি সাহসী হয়। বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সামান্যতম দ্বিধা করে না।

আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা বেরিয়ে যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে তা জাতকের বিদেশ ভ্রমণ নির্দেশ করে।

আয়ুরেখাটি মণিবন্ধের কাছাকাছি এসে দুটি ভাগ হয়ে গেলে এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রেখাটি ক্ষেত্রের দিকে গেলে বোঝায় জাতক তাঁর দেশ ছেড়ে বিদেশেই স্থায়ী আস্তানা গড়বে।

আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে এগুলে এবং রেখাটির শেষে যব বা দ্বীপ চিহ্ন থাকলে বোঝায় জাতকের বিদেশ-যাত্রার শেষ পরিণতি হতাশা এবং নৈরাশ্যে ভরা।

আয়ুরেখা থেকে কোনও রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে গিয়ে যদি ক্রস চিহ্নে শেষ হয়, তবে বিদেশযাত্রাকালে দুর্ঘটনায় জলমগ্ন হয়ে জাতকের মৃত্যু ঘটে।

আয়ুরেখা যদি শিকলের মত দেখতে হয় তবে জাতকের জীবনীশক্তির অভাব দেখা যায়।

আয়ুরেখাটি শিরোরেখার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকলে জাতক খুবই স্পর্শকাতর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়।

আয়ুরেখা ও শিরোরেখার মধ্যে যদি সামান্য ফাঁক থাকে তবে দেখা যায় জাতক তার উচ্চাকাঙ্খাকে, কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। তবে স্বভাবে কিছুটা হটকারি মানসিকতাও দেখা যায়।

আয়ুরেখা ও শিরোরেখার মধ্যে ফাঁক অত্যধিক হলে জাতক একরোখা, অবিবেচক ও অতিমাত্রায় হটকারি হন।

আয়ুরেখা, শিরোরেখা ও হৃদযরেখা একই সঙ্গে যুক্ত থাকলে জাতক স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে অসুখী, শোষিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সংগ্রামী হন। এই ধরনের হাতের মালিকই হন উগ্রপন্থী। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও থাকে বেশি।

যদি আয়ুরেখা, শিরোরেখা ও হৃদযরেখা বাঁ হাতে যুক্ত থাকে এবং ডান হাতে যুক্ত না থাকে তবে নির্দেশ করে জাতক এইসব প্রবণতা নিয়ে প্রথম জীবন শুরু করবেন এবং পরবর্তী জীবনে এই প্রবণতার পরিবর্তন ঘটবে।

হৃদয়রেখা

জীবনের প্রেম, প্রীতি, নাটকীয় মুহূর্তগুলির ক্ষেত্রে এই বেখার গুরুত্ব যথেষ্ট। রেখাটি যত স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় ততই ভাল।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রের কেন্দ্র থেকে হৃদযরেখা শুরু হলে প্রেম-প্রীতিব ব্যাপারে জাতকের উচ্চাকাঙ্খা নির্দেশ করে। এবা সাধারণত তার চেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে করে।

হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থানের একেবাবে প্রথম অর্থাৎ তর্জনীর গোড়া থেকে শুরু হলে জাতক সব কিছুতেই বেশি উৎসাহ দেখায। যাকে ভালোবাসে তার কোনও ত্রুটি দেখতে পায না। কাজেই প্রেমিক বা প্রেমিকার দিক থেকে অনেক সময়ই হতাশার সম্মুখীন হয়। তবু ঠেকে শিখতে চায না।

হৃদযরেখাটি যদি আরম্ভ হয তর্জনী এবং মধ্যমার মাঝে তাহলে তা ইঙ্গিত কবে শান্ত এবং গভীর চরিত্রেব, বিশেষ কবে প্রেমের ব্যাপারে। বৃহস্পতিব আদর্শবাদিতা এবং শনির সরল গাম্ভীর্যের সংমিশ্রণ পাওযা যায এ রকম হাতে।

হৃদযবেখা যদি শনির স্থান থেকে শুরু হয়, তাহলে জাতক স্নেহ-প্রীতির বিষযে কম-বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং অহংবোধসম্পন্ন হয়।

হৃদয়রেখাটি হাতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে এবা যাকে ভালোবাসে তার মুহূর্তের অদর্শনও সহ্য করতে পারে না। সুতরাং প্রেমের অতি আবেগ এদের দুঃখ দেয।

হৃদযরেখা থেকে ছোট ছোট রেখা বেরিয়ে এলে তা বোঝায ভালোবাসার ব্যাপাবে জাতক দৈহিক কামনা ছাড়া কিছু বোঝে না।

হৃদয়রেখাটি যদি শনির ক্ষেত্রেব নিচু থেকে শুরু হয় তবে জাতক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করে না।

হৃদযরেখা ভগ্ন হলে তা বোঝায ভালোবাসার ব্যাপারে নৈরাশ্য।

হৃদয়রেখাটি যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে দু-ভাগ হযে শুরু হয তাহলে সেই হাতের অধিকারী হয আদর্শবান, সৎ প্রকৃতির। তার ভালোবাসা হয গভীর ও আন্তরিক।

হৃদযরেখাটি খুব সরু হলে বোঝায বন্ধ্যাত্ব।

ভাগ্যরেখা

ভাগ্যরেখার গুরুত্ব নির্ভর করে হাতেব আকারের ওপর। লম্বাটে দার্শনিক বা শিল্পী-মানসিকতার হাতে ভাগ্যরেখা দীর্ঘ ও গভীব হওযার গুরুত্ব যতটা, একটা চৌকো হাতে ততটাই দীর্ঘ ও গভীর ভাগ্যরেখার গুরুত্ব তারচেযে বেশি।

যদি এই রেখাটি কব্জি থেকে শনির স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয, তাহলে তা ইঙ্গিত কবে জাতকের সাফল্য ও সৌভাগ্যের। জাতকের এই সাফল্যের মূলে থাকে আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র।

রেখাটির উৎস যদি চন্দ্রের স্থান হয় এবং রেখাটি বাঁকাভাবে ওপরে উঠে যায় তাহলে জাতকের ভাগ্য গড়ে উঠবে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতায়।

রেখাটির উৎস যদি আয়ুরেখার সঙ্গে যুক্ত থাকে অথবা খুব কাছাকাছি থাকে তাহলে জাতক পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্যতাড়িত হয়ে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে থাকে।

রেখাটি যদি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তাহলে তা বিশেষ সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে। এরা কর্মজীবনে সর্বোচ্চ পদে পৌঁছে যায়।

ভাগ্যরেখাটি যদি হৃদয়রেখা বা শিরোরেখা পর্যন্ত এসে থেমে যায় তা সৌভাগ্যকে খণ্ডন করার ইঙ্গিত দেয়।

ভাগ্যরেখা যদি একাধিক হয়, তাহলে কর্মজীবনে অনেক সহজে সাফল্য পাওয়া যায়। ভাগ্যরেখা যদি দুটি হয় এবং একটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে অপরটি রবির ক্ষেত্রের দিকে যায় তবে সাধারণভাবে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না জাতক একই সঙ্গে দুটি বৃত্তিতে নিযুক্ত।

সরু-সরু ছোট ছোট রেখা ভাগ্যরেখা থেকে বেরিয়ে এলে বা ভাগ্যরেখার পাশাপাশি থাকলে জাতকের জীবনে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রভাব নির্দেশ করে।

যদি ওই প্রভাবকারী সরু রেখাগুলো আসার পর ভাগ্যরেখা সবল হয়ে ওপরে উঠে যায় তবে জাতকের জীবনে বিপরীত লিঙ্গের প্রভাব সৌভাগ্যজনক হয়।

প্রভাবকারী সরু রেখাগুলো আসার পর যদি ভাগ্যরেখা দুর্বল হয়ে পড়ে তবে প্রভাবকারী জাতকের জীবনে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ নিয়ে আসে।

প্রভাবকারী সরু রেখার মধ্যে দ্বীপ চিহ্ন বা যব চিহ্ন থাকলে প্রভাবকারী জাতকের জীবনে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্কও নিয়ে আসে।

ভাগ্যরেখা না থাকা সত্ত্বেও জাতক যথেষ্ট সুখী হতে পারে যদি তার শিরোরেখাটি সুচিহ্নিত হয়। কিন্তু এই ধরনের মানুষের অনুভূতিশক্তির অভাব দেখা যায়। গভীর বোধশক্তির অভাব থাকার জন্য জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই তুঙ্গে ওঠা সম্ভব নয়।

রবি রেখা

ভাগ্যরেখা যেমন সৌভাগ্য ও সাফল্যের ইঙ্গিতরেখা, রবিরেখা সেই রকম যশ, খ্যাতি ও সাফল্য চিহ্নিত করে।

শিল্পী বা দার্শনিক-হাতে যদি রবিরেখা ঢালু শিরোরেখা থেকে ওঠে তবে জাতকের কাব্যে, সাহিত্যে বা শিল্পে সাফল্য ও খ্যাতি বোঝায়।

রবিরেখা হৃদয়রেখা থেকে আরম্ভ হলে শিল্পকলার প্রতি জাতকের আকর্ষণ ও প্রতিভা নির্দেশ করে।

রবিরেখা আয়ুরেখা থেকে উঠলে এবং হাতটি শিল্পী-হাত হলে জাতক হয় সুন্দরের পূজারী। শিরোরেখাটি ঢালু হলে শিল্পকলায় আসে সাফল্য।

রেখাটি মঙ্গলের স্থান থেকে উঠলে সাফল্য আসে অনেক সমস্যার পর।

রেখাটি চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে উঠলে জাতক অপরের সাহায্য ও সহযোগিতায় সাফল্য

ও সম্মানলাভ করে।

হাতে যদি খুব সুন্দর ভাগ্যরেখা থাকে কিন্তু রবিরেখা না থাকে তবে জাতক জীবিকার ক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে যতই সফল হোক না কেন তাদের জীবনে আনন্দ থাকে না। হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক। সামাজিক জীবনে মেলামেশা পছন্দ করে না।

রবিরেখায় চতুষ্কোণ থাকলে তা শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য যদি হয় জাতকের সুনাম বা সম্মান।

রবিরেখায় যবচিহ্ন বা দ্বীপচিহ্ন থাকলে তা সম্মান ও সাফল্যের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বহু রবিরেখা থাকলে সাফল্য বারবার এড়িয়ে যায়।

বিবাহরেখা

বিয়েররেখা থাকে বুধের ক্ষেত্রে। কড়ে আঙুলের নিচ থেকে অনামিকার নিচের দিকে এগোয় হৃদয়রেখার পাশাপাশি।

দীর্ঘ ও স্পষ্ট বিবাহরেখা বিয়ের নির্দেশ করে।

বুধের ক্ষেত্রে ছোট রেখাগুলো প্রেমের ইঙ্গিত দেয়।

বিবাহরেখা হৃদয়রেখার যত কাছে থাকে বিয়ে তত তাড়াতাড়ি। যত দূরে থাকে বিয়ে ততই দেরিতে।

বিবাহরেখা অভগ্ন থাকলে এবং রেখাটিতে কোনও ক্রশ চিহ্ন না থাকলে সুখী বিয়ে বোঝায়।

বিবাহরেখা উপরে উঠে দু-ভাগ হয়ে গেলে বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর আশা-আকাঙ্খা, ভাবনা-চিন্তা ভিন্নতর হয়।

যদি বিবাহের রেখাটি বেঁকে হৃদয়রেখার দিকে নেমে যায় তবে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মৃত্যু বিচ্ছেদ আনবে ইঙ্গিত করে।

বিবাহরেখা থেকে একটি শাখারেখা হৃদয়রেখার দিকে নেমে এলে অসুখী বিবাহিত-জীবন বোঝায়।

শুক্রের ক্ষেত্র থেকে কোনও রেখা এসে বিবাহরেখার সঙ্গে যুক্ত হলে বিয়েতে অন্যের দিক থেকে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হয়।

বিবাহরেখার শেষে দ্বীপ চিহ্ন থাকলে বিয়ে নিয়ে কেলেঙ্কারী বা শেষপর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ নির্দেশ করে।

বিবাহরেখায় ক্রশ চিহ্ন থাকলে এবং রেখাটি শনির ক্ষেত্রে শেষ হলে জাতক বা জাতিকা ঈর্ষাপ্রবণতা, সন্দেহপ্রবণতা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতেও পিছপা হয় না।

যদি বিবাহরেখা বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার থাকে, কিন্তু তা থেকে অনেক সরু রেখা নিচের দিকে ঢালু হয়ে থাকে তবে সেই হাতের মালিকের সঙ্গী বা সঙ্গিনী দীর্ঘ রোগভোগ করে।

বিবাহরেখা সোজা রবি রেখার ওপর গেলে বা বিবাহরেখার কোনও শাখা রবির ক্ষেত্রের দিকে গেলে জাতক বা জাতিকার বিয়ে হয় তাঁর চেয়ে বিখ্যাত বা বিশিষ্ট কারও সঙ্গে।

বিবাহরেখাটি নিচুর দিকে বেঁকে গিয়ে রবিরেখাতে ছেদ করলে বিয়ের দ্বারা সম্মান হারান বোঝায়।

চিহ্ন

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে হাতের রেখা যেমন জীবন,অতীত ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বয়ে বেড়ায় তেমনই বিশেষ কিছু চিহ্নও জীবন ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করে। যেমন,

তারা চিহ্ন

চিহ্নটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকলে জাতকের জীবনে সম্মান, যশ, সাফল্য, কর্মে উন্নতি সবই বিপুলভাবে এসে হাজিব হয়।

রবির ক্ষেত্রে চিহ্নটি অর্থ, সম্মান, সাফল্য দিলেও শান্তি দেয় না। তবে রবির ক্ষেত্রে রবিরেখা ছুঁয়ে তারা চিহ্ন থাকলে জাতকের জীবনে সম্মান, সাফল্য ও অর্থ অপর্যাপ্ত পরিমাণে আসার সম্ভাবনা প্রবল।

শনির ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন অশুভ। জাতক হয়ে পড়ে ভাগ্যের হাতের পুতুল। এদের জীবনে বিয়োগান্তের ভূমিকাই বেশি দেখা যায়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন আনে বিপুল সম্মান। সাহিত্য, শিল্প, চারুকলা বা আবিষ্কার তা সে যে ক্ষেত্র থেকেই হোক না কেন।

বুধের ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন জাতককে সুবক্তা করে, বিজ্ঞানে সাফল্য এনে দেয়, এনে দেয় আর্থিক সাফল্যও।

শুক্রের ক্ষেত্রে তারা চিহ্ন জাতক-জাতিকাকে বিপরীত লিঙ্গের কাছে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় করে তোলে। জীবনে আসে বহু প্রেম।

ক্রশ চিহ্ন

চিহ্নটি শনির ক্ষেত্রে থাকলে জাতক অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে। চিহ্নটি শনির ক্ষেত্রে ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করে থাকলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়।

চিহ্নটি রবির ক্ষেত্রে থাকলে অর্থ ও যশের ক্ষেত্রে জাতকের প্রতিটি প্রচেষ্টা হতাশায় শেষ হয়।

বুধের ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন জাতকের কুটিলতার প্রমাণ।

চন্দ্রের ক্ষেত্র চিহ্নটি থাকলে জাতক আবেগের তাড়নায় নিজেকে নিজেই বঞ্চিত করে ঠকায়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রের তলায় ক্রশ চিহ্ন থাকলে জলে ডুবে জাতকের মৃত্যু হয়।

শুক্রের ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে জাতক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে আঘাত পায়। বৈভব ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করে চিহ্নটি থাকলে জাতক পেশাগত সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রচুর বাধার মুখোমুখি হয়।

বৃহস্পতি ক্ষেত্রে চিহ্নটি প্রেম-প্রীতিতে সাফল্য আনে।

চতুষ্কোণ 

চতুষ্কোণ চিহ্নটি সাধারণত সমস্যাকে হাল্কা করতে সাহায্য করে, তাই এই চিহ্নটিকে রক্ষাকবচ বলা হয়ে থাকে যদি না চিহ্নটি হৃদযরেখার ওপর থাকে।

শিরোরেখার ওপর চিহ্নটি থাকলে জাতক মস্তিষ্কের আঘাত বা মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়।

ভাগ্যরেখায় চিহ্নটি জাতককে ক্ষতি ও কষ্ট থেকে উদ্ধার করে।

রবির ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে জাতক সুনামহানি থেকে রক্ষা পায়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে ভ্রমণ নিরাপদ হয়।

বুধের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম থেকে রক্ষা করে।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে চিহ্নটি উচ্চাকাঙ্খা থেকে আসা হতাশা থেকে রক্ষা করে।

যব বা দ্বীপ চিহ্ন 

এটিও একটি অশুভ চিহ্ন। এর প্রধান কাজ হচ্ছে যে ক্ষেত্রে এই চিহ্ন আবির্ভূত হয়, তার গুণাবলীকে ধ্বংস করা বা কমিয়ে দেওয়া।

আয়ুরেখায় যবচিহ্ন থাকলে অসুস্থতা ও দুর্বলতা বোঝায়। আয়ুরেখার শুরুতে দ্বীপচিহ্ন থাকলে শৈশবে বা কৈশোরে দুর্বল স্বাস্থ্য বোঝায়। একই ভাবে আয়ুরেখার মাঝে চিহ্নটি থাকলে যৌবনে এবং শেষে থাকলে বার্ধক্যে অসুস্থতা বোঝায়।

শিরোরেখায় চিহ্নটি থাকলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মানসিক দুর্বলতা বোঝায়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে অত্যধিক উচ্চাকাঙ্খার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে মানসিক বা স্নায়বিক রোগী হবার সম্ভাবনা থাকে।

শনির ক্ষেত্রে চিহ্নটি জাতককে বিষাদময় জীবন দেয়।

রবির ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে জাতক সাইনাস বা চোখের রোগ ভোগ করে।

বুধের ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে জাতক মানসিক দুশ্চিন্তায় কষ্ট পায়।

বৃত্ত বা চক্র 

বৃত্ত বা চক্রচিহ্নটি ছোট ছোট রেখা দিয়ে সাধারণত তৈরি হয়। রবির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথায় চিহ্নটি শুভ ফল দেয় না। চিহ্নটি যে ক্ষেত্রে বা যে রেখায় থাকে তাকে দুর্বল করে। চন্দ্রের ক্ষেত্রে চিহ্নটি থাকলে জলে ভ্রমণে বিপদের ইঙ্গিত দেয়।

ত্রিভুজচিহ্ন 

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এটি বোঝায় জনগণকে পরিচালনা করার ক্ষমতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, অপরকে পরামর্শ দেওযার সক্ষমতা, প্রত্যুপন্নমতিত্ব। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ক্ষেত্রে চিহ্নটি অবশ্যই আশীর্বাদস্বরূপ।

শনির ক্ষেত্রে চিহ্নটি জাতককে বিজ্ঞান বা পরামনোবিদ্যা বিষযে গবেষক করে।

রবির ক্ষেত্রে চিহ্নটি ইঙ্গিত করে জাতক দৃঢ়মতি, পেশায সফল, সুনামের অধিকারী এবং শান্ত-ব্যক্তিত্ব।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে এই চিহ্ন বিপদের সময প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের লক্ষণ।

বুধেব ক্ষেত্রে চিহ্নটি দেয মানসিক ধৈর্য এবং প্রতিভা প্রকাশের ক্ষমতা।

শুক্রের ক্ষেত্রে চিহ্নটি কামানা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকে নিযন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়।

চন্দ্রেব ক্ষেত্রে চিহ্নটি চিন্তায সমতা রক্ষা করে।

ত্রিশূল 

এটি অত্যন্ত শুভ চিহ্ন। যে কোনও ক্ষেত্রেই এটি শুভফল দেয। ত্রিশূল চিহ্ন যে ক্ষেত্র বা রেখাস্পর্শ করে থাকে সেই ক্ষেত্র বা রেখা জীবনের যে বিষয নিযন্ত্রণ করে সেই বিষযে অতি শুভফল লাভ করেন জাতক।

জাল চিহ্ন 

এই চিহ্ন যে ক্ষেত্রে বা রেখায থাকে সেই ক্ষেত্রের বা রেখার গুণাবলী থেকে জাতক বঞ্চিত হয।

বৃহস্পতিব ক্ষেত্রে চিহ্নটি জাতককে অহংকারী ও দর্পিত করে।

শনির ক্ষেত্রে চিহ্নটি জাতককে প্রচণ্ড স্বার্থপর করে।

রবিব ক্ষেত্রে চিহ্নটির জাতক মিথ্যে অহমিকায ভুলের পর ভুল করেই চলে।

সাত

জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে যে-সব যুক্তি হাজির করেন

যুক্তি এক : জ্যোতিষশাস্ত্র পৃথিবীব সব ধর্মের কাছেই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কোন ধর্মই এই শাস্ত্রকে কুসংস্কার মনে করে পরিত্যাগ করেনি।

বিপক্ষে যুক্তি : ধর্মকে জ্যোতিষীরা কি চোখে, কিভাবে দেখেন জানি না। আমাদের চোখে একজন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ চরমতর ধার্মিক। তলোয়ারের ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা, আগুনের ধর্ম যেমন দহন, তেমনই মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্বের চরমতর বিকাশ। সেই হিসেবে আমরাই ধার্মিক, কারণ আমরা শোষিত মানুষদের মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত করতে চাইছি, চেতনায বপন করতে চাইছি বাস্তব সত্যকে— তাদের বঞ্চনার প্রতিটি কারণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজের শোষকের দল চায না, শোষিতরা জানুক তাদের প্রতিটি বঞ্চনার কারণ লুকিয়ে রযেছে এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই। স্বর্গের দেবতা, আকাশের নক্ষত্র, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদিকে বঞ্চনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে, বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিযে শোষক-শোষিতের সম্পর্ককে বজায রাখা যায। এই সম্পর্ককে কাযেম রাখাব ফলশ্রুতিতেই শোষকশ্রেণীর স্বার্থে মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিকে গুলিযে দিতে গড়ে উঠেছে ভাববাদী দর্শন অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা, বিশ্বাসবাদ, গুরুবাদ, ঈশ্বরবাদ ও ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠান। স্বভাবতই তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদী দর্শন, বিশ্বাসবাদ, ইত্যাদি যুক্তিবাদের প্রবলতম শত্রু।
ভাববাদীদের কাছে প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের গুরুত্ব অতিসামান্য অথবা অবাস্তব। তাঁরা বিশ্বাস করেন শাস্ত্র-বাক্যকে, ধর্মগুরুদের অন্ধ-বিশ্বাসকে— যার উপর দাঁড়িযে আছে তথাকথিত ধর্ম ও ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠান।

যুক্তির কাছে অন্ধ-বিশ্বাস বা ব্যক্তি-বিশ্বাসের কোনও দাম নেই। যুক্তি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ ধরে। যুক্তিবাদীদের কাছে তথাকথিত ধর্মই যখন অন্ধ-বিশ্বাস হিসেবে বাতিল তালিকাভুক্ত, তখন ধর্মবিশ্বাস কোন্ শাস্ত্রকে গ্রহণ করল কোন্ শাস্ত্রকে গ্রহণ করল না, তাতে যুক্তিবাদীদের কি এলো গেলো ?

ধর্মের হাত ধরাধরি করে ঈশ্বর-বিশ্বাস অলৌকিক-বিশ্বাস— অনেক কিছুই তো এসে পড়ে,

কিন্তু এ-সবই তো একান্তভাবে বিশ্বাসের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, প্রমাণিত সত্য হয়ে দাঁড়ায়নি।

পৃথিবীর সব ধর্মের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাই বিজ্ঞানের সত্যের আদৌ কোনও প্রমাণ নয়, বরং একটি অন্ধ-বিশ্বাসনির্ভর সংস্কারেরই প্রমাণ।

যুক্তি দুই : জ্যেতিষীরা অনেক সময য জ্যোতিষবিচারে ভুল করেন। কিন্তু জ্যোতিষীদের ভুলের দ্বারা প্রমাণিত হয না যে, জ্যোতিষশাস্ত্র ভুল। যেমন, চিকিৎসকরা ভুল করলে প্রমাণ হয় না চিকিৎসাশাস্ত্র ভুল।

বিপক্ষে আমাদের যুক্তি : চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি প্রমাণিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিযেছে। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানের দরবারে বিজ্ঞানের নিযম (Methodology) অনুসরণ করে প্রমাণ করেছে শাস্ত্রের যাথার্থতা। চিকিৎসাশাস্ত্রের তথ্যগুলো একই শর্তাধীন অবস্থায বিভিন্ন পরীক্ষাগাবে পরীক্ষা করে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের সমর্থিত হযেছে। আরও একটু সরল করে বলতে পারি কোন্ কোন্ ভাইরাস বা ব্যাসিলির জন্য কি কি রোগ হয় তা অনুবীক্ষণ বা অন্যান্য যন্ত্রের সহায্যে বিভিন্ন গবেষণাগারে পরীক্ষা করার পর কারও আবিষ্কার বা মতামতকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবিষ্কৃত ওষুধের ক্ষেত্রেও টেস্টটিউবে ওষুধ প্রযোগ কবে দেখা বিশেষ ওষুধে জীবাণু ধ্বংস হচ্ছে কি না। জীবজন্তু ও মানুষের শরীরে প্রযোজনীয জীবাণু প্রবেশ করিযে তারপর ওষুধ প্রযোগ করে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল দেখা হয়। কেবলমাত্র এইসব পরীক্ষার সাফল্য লাভ করলে আসে স্বীকৃতি। তাই একজন চিকিৎসকের ভুলের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অসারতা প্রমাণিত হয না।

একের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই হয। কেউ একের সঙ্গে এক যোগ করলে তিন হয বললে যে অংক কষেছে তার ভুল প্রমাণিত হয় বটে কিন্তু অংকশাস্ত্রের অসারতা প্রমাণ হয না।

চিকিৎসাশাস্ত্র বিজ্ঞানের নিযম অনুসরণ কবে তার যাথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। তাই এই শাস্ত্র প্রযোগে বিফলতা, প্রযোগকারীর বিফলতা হিসেবেই চিহ্নিত হয। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র যেহেতু কখনই নিজেকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, তাই তার বিফলতাকে চিকিৎসকের বিফলতার সঙ্গে তুলনা করা মুর্খতা, কুযুক্তি অথবা শঠতা।

যুক্তি তিন : বিজ্ঞান কি প্রমাণ করতে পাববে—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান নয় ?

বিরুদ্ধ যুক্তি : দাবির যথার্থতা প্রমাণের দাযিত্ব সব সমযেই দাবিদাবের, জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ কবার যাবতীয দায-দাযিত্ব জ্যোতিষীদেব।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনাব উল্লেখ না কর পারলাম না। ২৩শে জানুয়ারী '৯০ কৃষ্ণনগর টাউন হলের মাঠে 'বিবর্তন' পত্রিকা গোষ্ঠির আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের এক বিতর্ক সভায বা আলোচনা সভায। সেই সভায এক জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন, "আপনি প্রমাণ কবতে পারবেন—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান নয ?"

জ্যোতিষীটিব এই চ্যালেঞ্জ শ্রোতাদের যে যথেষ্টই নাড়া দিযেছিল, সেটুকু বুঝতে কোনই

অসুবিধে হয়নি আমার। উত্তরে আমি বলেছিলাম, "জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান, কী বিজ্ঞান নয়, এই প্রসঙ্গটা মুলতুবি রেখে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাব। না, ঘটনাটা অলৌকিক বলছি না, তবে এর কার্য-কারণ সম্পর্কটি এখনও আমার অজানা। আপনার আমার জীবনে কখনও হয়তো এমন ঘটনা ঘটলো, যার ব্যাখ্যা, কার্য-কারণ সম্পর্ক আপনার আমার অজানা। এই সময় যদি আমি ভেবে বসি, এর ব্যাখ্যা শুধু আমাদের পক্ষেই নয়, কারো পক্ষেই দেওয়া অসম্ভব, তখন ঘটনাটিকে লৌকিক-কারণবর্জিত অর্থাৎ অলৌকিক বলে বিশ্বাস করে ফেলি। যুক্তিবাদীরা অবশ্য মনে করেন, প্রতিটি ঘটনার পিছনেই রয়েছে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ। কারণটি তাঁর কাছে অজানা হলেও কারো হয় তো জানা। কারণটি বর্তমানে কারো জানা না থাকার অর্থ এই নয় যে কারণ ছাড়াই ঘটনাটি ঘটেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজানা রহস্যের ঘেরাটোপ প্রতিটি দিনই দূরে সরে যাচ্ছে। আজ যে কারণটি অজানা, ভবিষ্যতে সে কারণটিও এক সময় হয়তো জানা হয়ে যাবে। আর না জানা গেলে বড় জোর এ-কথাই প্রমাণিত হবে কারণটি এখনও আমাদের অজানা, কিন্তু কারণ নেই—এমনটা হয় না। এখন যে ঘটনা আপনাদেব সামনে ঘটিযে দেখাব, তার কারণটি আমার অজানা। হয়তো আপনাদের কারো জানাও থাকতে পাবে। জানা থাকলে অনুগ্রহ করে কারণটি জানাবেন।

"আমি দেখেছি তিন বার জোড়া পাযে লাফালে অনেক সময়ই আমার উচ্চতা তিন ইঞ্চি বেড়ে যায।"

আমি সেই জ্যোতিষীটিকেই মঞ্চে ডেকে নিযেছিলাম, যিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিযেছিলেন।

মঞ্চের পাশে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের সামনে দাঁড়ালাম। আমার অনুরোধে জ্যোতিষী আমার উচ্চতা চিহ্নিত করে স্তম্ভে দাগ দিলেন। জনতা অধীর আগ্রহ আর উত্তেজনা নিযে অপেক্ষা করছিলেন। আমি জোড়া পাযে তিনবার লাফালাম। জ্যোতিষীকে বললাম, "এ-বার মাপলেই দেখতে পারেন তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছি।"

কিছু দর্শকের কথা কানে আসছিল—"ওই তো বেড়ে গেছেন," "বেড়েছেন, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যোতিষীটি আমার উচ্চতা মাপলেন। মাপতে গিযে বোধহয কিছু গণ্ডগোলে পড়লেন। আবার মাপলেন। আবারও। তারপর অবাক গলায় বললেন, "আপনার উচ্চতা তো একটুও বাড়েনি ?"

আমিও কম অবাক হলাম না। "সে কী ? আমি বাড়িনি ? ঠিক মেপেছেন তো ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই মেপেছি। যে কেউ এসে দেখতে পারেন।"

"না না, আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। যাই হোক, আজ আমি আপনাদের অবাক করতে পারলাম না। যে কোনও কারণে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি মানে এই নয় যে আমি পারি না। আমি পারি। কেন আমি তিন লাফে তিন ইঞ্চি লম্বা হই, এটা আজও আমার কাছে রহস্য। এই রহস্যের কারণ আপনারা কেউ বলতে পারবেন ?"

আমার কথায় দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। অনেকেই বোধহয় আমার কথায বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। প্রথম জোরালো প্রতিবাদ জানালেন জ্যোতিষীটিই, "আপনি যে বাড়েন, সে কথাই প্রমাণ করতে পারলেন না, সুতরাং বাড়ার ব্যাখ্যা দেওযার প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে ?"

বললাম, "ভাই, আজ তিন লাফে তিন ইঞ্চি লম্বা হতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই এমনটা ঘটাতে পারি। অনেক বার ঘটিয়েছি। এখন নিশ্চয়ই আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন।"

"স্যরি, আমি অন্ততঃ আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। এবং আশা করি কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনার দাবিকে শুধুমাত্র আপনার মুখের কথার উপর নির্ভর করে মেনে নেবেন না।" জ্যোতিষীটি বললেন।

এবার আমার রাগ হওয়ারই কথা। একটু চড়া গলাতেই বলে ফেললাম, "অর্থাৎ আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন। কিন্তু আমার এই ব্যর্থতার দ্বারা আদৌ প্রমাণ হয় না যে আমি মিথ্যেবাদী। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন—আমি কোনও দিনই তিন লাফে তিন ইঞ্চি লম্বা হইনি?"

জ্যোতিষীটি এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। চড়া গলায় বললেন, "আমার প্রমাণ করার কথা আসছে কোথা থেকে? আপনি ভালোভাবেই জানেন, এমনটা প্রমাণ করা আমার কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। দাবি করেছেন আপনি। সুতরাং দাবির যাথার্থতা প্রমাণের দায়িত্বও আপনারই।"

হেসে ফেললাম, বললাম, "সত্যিই সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। এই যুক্তিটা আপনাব মুখ থেকে বের করতেই লাফিয়ে বাড়ার গল্পটি ফেঁদেছিলাম। আমার কোনো দিনই লাফিয়ে বাড়ার ক্ষমতা ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু তা সত্বেও এমন উদ্ভট দাবি করলে আপনাদের কারো পক্ষেই প্রমাণ করা সম্ভব নয়—আমি কোনও দিনই তিন লাফে তিন ইঞ্চি বাড়িনি। বাস্তবিকই দাবির সমর্থনে প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবিদাবের। আর এই কারণেই জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব জ্যোতিষীদের।"

উপস্থিত শ্রোতারা তুমুল হাসি আর হাততালিতে বুঝিয়ে দিলেন, আমার যুক্তি তাঁদের খুবই মনের মত ও উপভোগ্য হয়েছে।

না। জ্যোতিষীটি এর পর আর কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি হাজির করতে চেষ্টা না করে ফিরে গিয়েছিলেন দর্শকদের মাঝে।

যুক্তি চার : জাতকের ভবিষ্যৎ বিচারে অনেক সময় জ্যোতিষীদের ভুল হয় বই কী। কারণ পুরুষকার দ্বারা নিজের.ভাগ্যকে পাল্টে দিতে পারে মানুষ। প্রাচীন ঋষিরাও ভাগ্য পরিবর্তনে পুরুষকারেব ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "যেমন একটি চাকার সাহায্যে রথের গতি ক্রিয়াশীল হয় না, দুটি চাকাই অপরিহার্য তেমনি পুরুষকার ছাড়া কেবলমাত্র ভাগ্য সহায়ে সব সময় সিদ্ধিলাভ হয় না।"

বিরুদ্ধ যুক্তি : জ্যোতিষশাস্ত্রকার ও জ্যোতিষীরা বলেন—ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। অর্থাৎ একজন জাতকেব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ঘটনাই পূর্বনির্ধারিত। আগে থেকে ঠিক করাই আছে, এব পরিবর্তন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, পরিবর্তন সম্ভব হলে 'পূর্বনির্ধারিত' কথাটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে। একজনও যদি নিজ চেষ্টায় পুরুষকাবের দ্বারা নিজ ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষমই হন, তবে তো জ্যোতিষশাস্ত্রের 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' তত্ত্বই ভেঙে পড়ে। আর এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই তো জ্যোতিষশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে।

এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ গণনা করা হয়।

ধরা গেল, রামবাবু দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। ভাগ্যে নির্ধাতির হয়ে রয়েছে—বিদ্যের দৌড় পাঠশালার গন্ডি পার হয়ে আর এগুবে না। প্রায় রুটিনমাফিক জীবনযাত্রা। সকাল থেকে সন্ধে হাড়ভাঙা খাটুনি ; পরের জমিতে হাল চালান, ফসল বোনা, মজুর খাটা, ঘর ছাওয়া, বিনিময়ে জোটে আধপেটা খাওযা। অল্পবয়সে বিয়ে। বিপুল সংখ্যক রুগ্ন সন্তান। কিছু সন্তানের অকালমৃত্যু। জীবিত সন্তানদের ভাগ্যে রয়েছে শিশু-শ্রমিক হওযা। স্ত্রীর ভাগ্যে রক্ত-স্বল্পতা। পরিবাবের প্রত্যেকের ভাগ্যেই আছে রোগ-ভোগ, বিনা চিকিৎসায রোগকে ভোগ।

রামবাবু পুরুষকারের দ্বারা, প্রয়াস দ্বারা বিদ্যায, বুদ্ধিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। দেশবাসীর কাছে হয়ে উঠলেন পরম শ্রদ্ধেয। বিয়ে করলেন সহকর্মী অধ্যাপিকাকে। সন্তান সংখ্যা দু'যে সীমাবদ্ধ। অসুখ হলে ওষুধ আসে, চিকিৎসক আসেন, সংসারে বৈভব না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। স্বাস্থ্যজ্জ্বল সুন্দর ছেলে উজ্জ্বল ডাক্তারী পড়বার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলে সুন্দর। মেযে জয়া গানের তালিম নেয় প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের কাছে। ক্লাস টেনে পড়ে। ইতিমধ্যেই সঙ্গীত জগতের বিরল প্রতিভা হিসেবে সাড়া জাগিযেছে।

এ-ক্ষেত্রে আমরা কী দেখলাম ? রামবাবু তাঁর পুরুষকার দ্বারা শুধুমাত্র নিজের ভাগ্যের পূর্বনির্ধারিত ঘটনাগুলোকেই বদলে দেননি ; বদলে গেছে তাঁর স্ত্রীর রক্তস্বল্পতায় ভোগা হাড়ভাঙা খাটুনির জীবন। সন্তানদের ভাগ্যে রুগ্নতা থাবা বসাতে ব্যর্থ হয়েছে। থাবা বসাতে ব্যর্থ হযেছে মৃত্যুও। সন্তানরা শিশু-শ্রমিক না হওযায গোল পাকিয়েছে আরো জাযগায়। জয়ার ভাগ্যে ছিল শ্যামবাবুর বাড়ি ঝি খাটবে। খাটতে হয না। শ্যামবাবুর ভাগ্যও তারই সঙ্গে গেল পাল্টে। শ্যামবাবুর বাড়িতে ঝি খাটে কমলা। অথচ কমলার ভাগ্যে শ্যামবাবুর বাড়ি ঝি খাটার কথা লেখা ছিলই না। উজ্জ্বলের যে ইটখোলায় মাটি কাটার কথা, সেখানে যে-সব ইটখোলা শ্রমিকদের উজ্জ্বলকে বন্ধু হিসেবে পাওযার কথা, সে সব পূর্ব নির্ধারিত কথাই বানের জলে ভেসে গেছে এক রামবাবুর পুরুষকারের ধাক্কায়। আর, একটু বেশি তলিযে ভাবতে গেলে দেখতে পাব দৈনন্দিন বহু শত মানুষের ভাগ্যই রামবাবু দিয়েছেন পাল্টে। রামবাবু মজুব না খাটায়, ঘর না ছাওয়ায রামবাবুকে যারা প্রাযশই শ্রমিক হিসেবে নিযোগ করবে বলে ভাগ্য নির্ধারিত ছিল, তাদের ভাগ্য কেন পাল্টে গেল ? তারা তো বাড়তি কোনও পুরুষকার প্রয়োগ কবেনি ? তবে ? রামবাবুর মৃত সন্তানদের নিযে যে সব গ্রামবাসীদের শ্মশানযাত্রী হওয়ার কথা ছিল, রামবাবুর সন্তানরা না মরায় গ্রামবাসীদের শ্মশানযাত্রী হওযার নির্ধারিত ঘটনাই গেল পাল্টে। প্রতি বছর বহু ছাত্র-ছাত্রী রামবাবুর কাছে পাঠ নিচ্ছে, যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যে আদৌ রামবাবুর কাছে শিক্ষালাভের কথা লেখা ছিল না। এমন করে বিচাবে বসলে অবশ্যই দেখব এক রামবাবুর একার পুরষকারই হাজার হাজার মানুষের জীবনের লক্ষ-কোটি পূর্বনির্ধারিত ঘটনা দিযেছে পাল্টে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন প্রতিনিয়ত প্রয়াসী হয, তখন তো সহস্র কোটি মানুষের পূর্বনির্ধারিত জীবনের মুহূর্তগুলো প্রতিনিযত পাল্টে যেতেই থাকে। এরপরও কী করে বেজায় আহাম্মকের মত জ্যোতিষীরা দাবি কবে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হযে রযেছে ? নাকি এইসব জ্যোতিষীরা সাজা আহাম্মক আসলে জ্ঞানপাপী, এক একটি রাম-ধরিবাজ ?

এইপর সাধারণ যুক্তিতে আর একটি প্রশ্ন অবশ্যই বিশালভাবে নাড়া দেয়, তা হলো, জ্যোতিষীরা একই সঙ্গে বলছেন মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ধারিত হযই রয়েছে, অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় , অর্থাৎ কোনভাবেই পরিবর্তন ঘঠান সম্ভব নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে এই পূর্ব নির্ধারিত ঘটনার হদিশই গণনা করে বের করা হয। জীবনের কোনও একটি ঘটনার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হলে ভাগ্য 'নির্ধারিত', 'অলঙ্ঘনীয়' ইত্যাদি দাবিগুলোই চূড়ান্ত মিথ্যে হয়ে যায। পুরুষকার দ্বারা যদি ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানই যায়, তবে ভাগ্যকে অপরিবর্তনীয বলা যায কোন্ যুক্তিতে ? যে-সব জ্যোতিষী এমন উদ্ভট, যুক্তিহীন, স্ববিরোধী বক্তব্য রাখেন, তাঁরা হয আকাট মূর্খ, নয় ধুরন্ধর বদমাইস।

পুরুষকার বিষয়টি নিয়ে দু-একটি কথা বললে নিশ্চযই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পুরুষকার কথার অর্থ 'উদ্যোগ' 'কর্মপ্রচেষ্টা'। প্রাকৃতিক, আর্থসামাজিক, সমাজ-সাংস্কৃতিক সু-পরিবেশযুক্ত সমাজে, উন্নত সমাজে মানুষের উদ্যোগ বা কর্মপ্রচেষ্টা সার্থকতা খুঁজে পায়। কিন্তু অনুন্নত পিছিযে পড়া সমাজে যেখানে জীবনযুদ্ধে পদে পদে অনিশ্চযতা, ন্যাযনীতির অভাব, সেখানে পুরুষকার বা কর্মপ্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রেই ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয় বারবার। উদাহরণ হিসেবে আমরা নিশ্চযই ভাবতে পারি, যে দেশে বারো কোটি বেকার, সে দেশের বারো লক্ষ মানুষের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা যদি হয তবে, শতকরা মাত্র একজনের বেকারত্ব ঘুচবে। শতকরা নিরানব্বইজনই থেকে যাবে বেকার। শতকরা দশজন বেকার যদি কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা, পুরুষকার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাকরি খুঁজে পেতে বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়েও তোলে তবুও প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনের পুরুষকারই জীবনযুদ্ধে বয়ে নিয়ে আসবে কেবলমাত্র ক্লান্তি ও ব্যর্থতা।

কোনও দেশে উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যদি থাকে পঞ্চাশ হাজার মানুষের জন্য, তবে পাঁচ লক্ষ মানুষ পুরুষকার দ্বারা, প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত করে গড়ে তুললেও চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের পুরুষকারই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

একজন মানুষের উদ্যোগ, কর্মপ্রচেষ্টা বা পুরুষকার কতটা সাফল্য পাবে, সেটা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে সেই মানুষটি কোন্ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ তার ওপর। অতএব ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে পুরুষকারের ভূমিকার জ্যোতিষতত্ত্ব শুধুমাত্র পরস্পরবিরোধীই নয, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞাতারও ফসল।

প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরা পুরুষকারকে স্বীকার করেছিলেন বাধ্য হযে। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু সম্রাট ও রাজারা জ্যোতিষীদের কথায আস্থা রেখেও যুদ্ধে পরাজয এড়াতে পারেন নি, প্রাণ দিয়েছেন গুপ্ত-ঘাতকদের হাতে। জয়ী হযেছেন জ্যোতিষবিচারে পরাজিতরা, গুপ্ত হত্যার পর সিংহাসনে বসেছেন চক্রান্তকারী। জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অক্ষমতা ঢাকতে জয়ী ও চক্রান্তকারীদের পুরুষকারকে জ্যোতিষগণনা উল্টে দেওযার জন্য দাযী করেছেন বারবার।

এখনও সেই একই উদ্দেশ্যে জ্যোতিষীরা মানুষদের ভাগ্য বিচারের পাশাপাশি পুরুষকারের অস্তিত্ব এবং প্রভাবের কথাও বলছেন। রাশিচক্র বিচার করে জাতক সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি রাখার অর্থ একটাই, তা হলো প্রত্যেকটি মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত।

কারণ ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত না হলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে কী করে? পূর্বনির্ধারিত হলে পুরুষকার কেন, কোনও কিছুর দ্বারাই কোনও মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বহু মানুষের জীবনের ঘটনার সঙ্গে তার জীবনেব ঘটনাও জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে থাকবে। প্রতিটি মানুষ সমাজ ও পরিবেশেব নিযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। একটি মানুষও যদি পুরুষকার দ্বারা তার পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করে তবে সামগ্রিক নিয়ম শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়বে। জাতকটির জীবনের সঙ্গে প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত মানুষের জীবনের অনেক ঘটনাই বদলে যেতে বাধ্য। তখন দেখা যাবে পুরুষকারকে প্রযোগ না করা সত্ত্বেও বহু মানুষের পূর্বনির্ধাতিব ভাগ্য পাল্টে গেছে। অর্থাৎ ভাগ্য পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ভাগ্য পূর্বনির্ধারিতই নয। অর্থাৎ রাশিচক্র বিচার করে ভবিষ্যদ্বাণী কবা অসম্ভব এবং অবাস্তব একটি দাবি মাত্র।

যুক্তি পাঁচ ঃ গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও অবস্থান ইত্যাদির দ্বারা মানবজীবনের শুভাশুভ ফল গণনাই ফলিত জ্যোতিষের উপজীব্য। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব যে মানবজীবনে স্পষ্টতই আছে এটা বিজ্ঞানের নিযমের সূত্র এবং সমীক্ষার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষশাস্ত্রকে অস্বীকার করার মানসিকতা নিযে পরিচালিত হযে জীবজগতে সূর্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে চূড়ান্ত মূর্খতা, মিথ্যাচারিতা। উষাকালেব সূর্যের স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের সূর্যের প্রখরতা গোধূলি বেলার সূর্যের বিষণ্ণতা মানুষের মনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনই প্রভাব ফেলে বিভিন্ন ঋতুর সূর্য। স্থান ভেদে সূর্যের প্রভাবও ভিন্নতর। রাজস্থান বা সাহারায দুপুরের সূর্য মানুষের শক্তিকে যেমন নিঃস্ব করে, তেমনই শীতপ্রধান দেশগুলোতে সূর্যের উত্তাপই আনে বসন্তের আনন্দ।

সূর্যের পরেই যে গ্রহটি মানবজীবনে সবচেযে বেশি প্রভাব বিস্তার করে রযেছে, সেটি হলো চন্দ্র। চন্দ্রের প্রভাবে জোযার ভাটা হয, অমাবস্যা, পূর্ণিমায বাতের ব্যথা বৃদ্ধি পায, এই পরম সত্যকে অস্বীকার কবার উপায নেই। প্রতি চন্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৮ দিনে নারীদেহে ঋতুকালের আবর্তন হয। চন্দ্রামাসের সঙ্গে নারীদেহের এই ঋতু পরিবর্তন কী চন্দ্রের প্রভাবেরই ফল নয়?

এইসব বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায মানবজীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব রযেছে। অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রই মানবজীবনকে নিযন্ত্রণ কবছে। এই সূত্রগুলো সন্দেহাতীতভাবে যুক্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত।

বিরুদ্ধ যুক্তি ঃ সূর্যের প্রভাব নিশ্চযই মানুষের জীবনে আছে। সূর্যের উপস্থিতিতে দিন, অনুপস্থিতিতে রাত হয। সূর্যের প্রখরতায় খরা, দুর্ভিক্ষ, অনেক কিছুই হতে পারে ; আবার সূর্যের উপস্থিতি আনতে পাবে বসন্তের আনন্দ। চন্দ্র থেকে নিশ্চযই জোযার-ভাটা হতে পাবে পূর্ণিমার চাঁদ অনেক কবিরই কাব্যরসেব উৎস। জ্যোত্স্না অনেক সমযই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মোহময করে তোলে। সূর্য-চন্দ্রেব প্রভাব নিশ্চযই বিজ্ঞান স্বীকার করে। কিন্তু সেই প্রভাবে আপনার স্ত্রী মোটা হবে কী রোগা, কালো হবে কী ফরসা, অথবা আপনার স্বামী পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হবে কী সাড়ে আট ইঞ্চি, এবাব পরীক্ষায় পাশ করব কি না,

এমনি সব বিষয় নির্ধারিত হয়, ভাবার মত কোনও যুক্তি বা প্রমাণ কিন্তু জ্যোতিষীরা হাজির করতে পারেন নি। নানা গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিজ্ঞান স্বীকার করে, এর দ্বারা কখনই প্রমাণিত হয় না, আমার আজ দাড়ি কামাতে গিয়ে ছড়ে যাওয়ার পিছনে স্বাতী নক্ষত্রের হাত ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা কিছু কিছু গ্রহের মানবজীবনে প্রভাব স্বীকার করেও বলা যায়, এর দ্বারা কখনই প্রমাণ হয় না, মানুষের ভাগ্যকে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করছে গ্রহ-নক্ষত্র।

মানবজীবনে প্রভাব সৃষ্টি করাই যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করার অকাট্য প্রমাণ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া অনেক কিছুই আমাদের ভাগ্যকে পূর্বনির্ধারিত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে লোডশেডিং, খরা, বন্যা, বায়ু, আগুন, জল, চাল, ডাল, তেল, আটা, বেবিফুড, ইত্যাদি অনেক কিছুই। জল, বায়ু, খাদ্য বিনা জীবন ধারণ অসম্ভব। সুতরাং মানবজীবনে এদের প্রভাব অস্বীকার করা নেহাতই বাতুলতা ও যুক্তিহীনতা। জলের আর এক নাম জীবন। জল ছাড়া যেমন প্রাণীর প্রাণ বাঁচে না, তেমনই দূষিত জল প্রাণেও মারে। বন্যার জল প্রতি বছর বহু মানুষকে গৃহহীন করে, শস্যহানি ঘটায়, গৃহপালিত পশু ও মানুষদের প্রাণহানী ঘটায়। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের যুক্তিকে মেনে নিলে আমরা অবশ্যই ধরে নিতেই পারি, মানুষের জীবনে জলের প্রভাব যেহেতু অনস্বীকার্য, তাই জল মানুষের ভাগ্যকে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছে। জলই ঠিক করে দেবে এবারের পরীক্ষায় জাতক পাশ করবে কিনা, পার্কের জমিটা লিজ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে কিনা, আগামী বছর প্রমোশনটা পাবে কিনা, আগামী বছর অ্যাডফিল্মের মত চেহারার একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে কি না।

মানবজীবনে লোডশেডি-এর প্রভাব কম নয়। লোডশেডিং-এর ওপর ভিত্তি করে জেনারেটর, ইনভারটার, পাওয়ার প্যাকের শিল্প ও ব্যবসা গড়ে উঠেছে। লোডশেডিং-এর চোটে অনেক ব্যবসা উঠেও গেছে। লোডশেডিং-এ হাঁটতে গিয়ে রাস্তায় গাড্ডায় পড়ে পা ভাঙে। লোডশেডিং-এ ছেনতাইবাজদের ব্যবসা বাড়ে। ফ্রান্সের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে এলেন কলকাতায়। বাড়িতে লোডশেডিং-এ পাখা চলার ব্যবস্থা না থাকায় জীবনসঙ্গিনী জীবন থেকে বিদায় নিতেই পারেন। গরমকালের রাত, লোডশেডিং— সামনে পরীক্ষা সারারাত হাওয়ার অভাবে হাঁসফাঁস করে জেগে কাটিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে অবস্থাটা তেমন সুখকর না হওয়ারই সম্ভবনা। সুতরাং মানবজীবনে লোডশেডিং-এর প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। আর জ্যোতিষ ফর্মুলায় লোডশেডিং নির্ধারিত করে দেবে আমাদের জীবনের অনেক কিছুই, এই যেমন এখনি যে সাদা কলমটা দিয়ে এই কথাগুলো লিখছি তা হয়তো লোডশেডিং দ্বারাই নির্ধারিত ছিল।

ভেজাল তেলে পঙ্গু, বেশি তেলে ক্লোরোস্টোল বৃদ্ধি, তেলের অভাবে চুল ও শরীরে রুক্ষতা, তেল নিখোঁজ হলে লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট, সবই যখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তখন মানবজীবনে তেলের প্রভাবকে অস্বীকার করি কী করে? সুতরাং তেলও নিশ্চয়ই একই যুক্তিতে গ্রহ-নক্ষত্রের মতই ভাগ্যনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু এর পরও অনেকে প্রশ্ন তুলবেন, তাই বলে জন্মকালীন ছকে শুধুমাত্র 'তেল'-এর তৎকালীন

অবস্থান বারোটা ঘরের একটা ঘরে বসিয়ে দিলে বিচারে যথেষ্ট ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। কারণ তেল বহু প্রকার। ভোজ্যতেল যেমনভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, ডিজেল কি পেট্রল তেমনভাবে প্রভাবিত করে না? তার প্রভাব অবশ্য অন্য ধরনের।

এমনভাবে বহু বস্তুর নামই টেনে আনা যায়, যারা আমাদের প্রভাবিত করে। সুতরাং জ্যোতিষীদের যুক্তি মেনে নিলে জন্ম পত্রিকার ১২টি ঘরে এ-সবেরও জন্মকালীন অবস্থান একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু এই একান্ত প্রয়োজনীয় সংযোজনটির অভাবেই যে জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যায় (জ্যোতিষশাস্ত্রের যুক্তিতেই) এটা তো জ্যোতিষীদের অস্বীকার করার কোনও উপায়ই নেই।

"২৮ দিনে চান্দ্রমাস এবং ২৮ দিনে নারীদেহের ঋতুকাল আবর্তিত হয়। অতএব নারীদেহের এই ঋতুকাল চন্দ্রের প্রভাবেরই ফল।" যে সব জ্যোতিষী এই দাবি করেন তাঁদের অদ্ভুত যুক্তিকে মেনে নিলে আরও এমন অনেক আকাট যুক্তিকেই মেনে নিতে হয়; যেমন— "সূর্য এক, মানুষের মাথাও এক, অতএব সূর্যের প্রভাবে মানুষের একটি মাত্র মাথা। ভাগ্যগণনার ক্ষেত্রে দুটি প্রধাণ গ্রহ রবি ও চন্দ্র; নারীদেহের প্রধান আকর্ষণক্ষেত্র দুটি বুক। অতএব নারীবক্ষ চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেরই ফল। মানুষের প্রধান অঙ্গ চারটি— মাথা, হাত, পা ও উদর। বেদও চারটি। মানুষের চারটি প্রধান অঙ্গ কী তবে চার বেদের প্রভাবেরই ফল নয়?

এর বাইরে আরও একটি বিরুদ্ধযুক্তি রয়েছে। একটা বিশেষ বয়সের আগে ও বিশেষ বয়সের পরে নারীদেহে ঋতুকাল দেখা যায় না। এটা শরীরেরই ধর্ম। শরীরের এই ধর্মকে অস্বীকার করে যে স্ব-ঘোষিত জ্যোতিষসম্রাটরা চাঁদের সঙ্গে নারীর ঋতুকালের যোগসূত্র খুঁজতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কি জবাব দেবেন, কেন চন্দ্রের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও কিছু কিছু নারী ঋতুমতি হয় না?

চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার-ভাটা হয়, অমবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যাথা বাড়ে, অতএব চাঁদই ঠিক করবে আমি আজ অফিসে লেট হবো কিনা, আগামীকাল রমেনের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলায় জিতব কিনা, আজ সিনেমার টিকিট পাব না ব্ল্যাকে কিনতে হবে, আমার ছেলেটা আজ স্কুলে কানমলা খাবে কিনা—এমনটা মেনে নিতে যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট অসুবিধে আছে। আর এমন সম্পর্কহীন ঘটনাকে যুক্তি হিসেবে মেনে নিতে হলে এ-কথা মানতেই অসুবিধে কোথায়—গ্রহ-নক্ষত্রই যেহেতু মানুষের ভাগ্যের পুরোপুরি নিয়ন্তা, অতএব ঈশ্বর নামক বস্তুটি কোনওভাবেই মানুষের জীবনকে সামান্যতম প্রভাবিত করে না। আবার ঈশ্বর নামক কেউ মানুষের জীবনকে সামন্যতম প্রভাবিত করলেই কিন্তু 'পূর্ব থেকে নির্ধারিত' জীবনের ঘটনা ভারসাম্য হারাবে। অর্থাৎ জ্যোতিষবিশ্বাসই ঈশ্বর-বিশ্বাসের চূড়ান্ত বিরোধী, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসও একইভাবে পুরোপুরি জ্যোতিষবিরোধী। মজাটা হলো এই— ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং জ্যোতিষবিশ্বাস স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্তোও প্রায় প্রতিটি জ্যোতিষই ঘোর বিশ্বাসী বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। আসলে এই সব জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীরা জ্যোতিষশাস্ত্র ও ঈশ্বর— দুটিরই অস্তিত্বে সামান্যতম বিশ্বাস রাখেনা। জ্যোতিষশাস্ত্র বা ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে মানুষদের বিশ্বস্ততা অর্জন ব্যবসার খাতির অনেকে বেশি প্রয়োজনীয় বিবেচনায় 'যখন যেমন, তখন তেমন' অভিনয় করে।

যুক্তি ছয় : জ্যোতিষীর ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ জাতকের জন্ম সময়ের ভ্রান্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন জন্ম-সময়। বেশির ভাগ ঘড়িই ঠিক সময় দেয় না। দিলেও ঠিক জন্ম মুহূর্তেই ঘড়ির সঠিক সময় দেখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। হাসপাতালে জন্ম-সময় সঠিক রাখার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জাতকের জন্ম-সময় ঠিক থাকে না। জন্ম-সময়ের ত্রুটির জন্য জন্মকালীন গ্রহ-অবস্থান নির্ণয়ের ভুল হয়। ভুলের উপর নির্ভর করে জ্যোতিষবিচার করলে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভুলের দায়িত্ব জাতকের জন্ম-সময় রক্ষাকারীর, জ্যোতিষীর নয়।

বিরুদ্ধ যুক্তি : যাঁরা জ্যোতিষ-ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন, তাঁরা জাতকদের দেওয়া জন্ম-সময় দেখেই তো গণনা করেন এবং সেই গণনার উপর ভিত্তি করে নানা সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে দামি দামি গ্রহরত্ন কেনান। এই সময় তো তাঁরা ভুলে থাকতে ভালবাসেন শতকরা প্রায় একশোভাগ জাতকের ক্ষেত্রেই সঠিক জন্ম-সময় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। জ্যোতিষীরা তখন তো জাতকদের জন্ম-সময় ভ্রান্তির প্রসঙ্গ তুলে জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত করেন না ; বলেন না, আপনাদের জন্ম-সময় যেহেতু সঠিক হওয়ার সম্ভবনা প্রায় শূণ্য, তাই আমাদের এ বিষয়ে সঠিক গণনা করার সম্ভাবনাও শূণ্য। অতএব সেই শতকরা একশোভাগ ভুল গণনার জন্য আপনাদের অর্থগ্রহণ করা যেমন নীতিহীন কাজ, তেমনই নীতিহীন কাজ সেই ভুল গণনার উপর ভিত্তি করে আপনাদের গ্রহরত্ন ধারণ করতে নির্দেশ দিয়ে অর্থের পরিপূর্ণ অপচয় করানো।"

কিন্তু জ্যোতিষীরা তো এমনটা ঘটান না, এমনটা বলেন না! তখন তো জ্যোতিষীরা ছক্-টক কেটে পটাপট জাতকের চারিত্রিক গঠন বিষয়ে, অতীত বিষয়ে বলে বহু ক্ষেত্রেই জাতকদের বিশ্বাস অর্জন করে নেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী, সমস্যা সমাধানের হদিশ দেন।

কেন এমনটা মেলে? কখনই জ্যোতিষীরা জন্ম-সময়ের ভ্রান্তির প্রশ্ন হাজির করেন? জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বাস্তবিকই জন্ম সময় কতটা নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন? একটু দেখা যাক।

ফলিতজ্যোতিষ নিয়ে পড়শুনা করেছি। পড়ে বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে স্পষ্টতই বুঝেছি, ফলিতজ্যোতিষ নেহাতই একটা চান্সের ব্যাপার, অর্থাৎ মিলতেও পারে, নাও মিলতে পারে। আবার জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গণনা না করে, জাতকদের বাহ্যিকভাবে দেখে, তার আচার-আচরণ বিচার করে, কথাবার্তার ধরণ দেখে তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু ঠিক-ঠাক বলে দিয়ে বহু জাতককেই বিস্মিত করে দিয়েছি। একজনের জামা, কাপড়, জুতো, ঘড়ি, চেহারা চোখ, কথাবার্তা অনেক সময়ই তার আর্থিক অবস্থা, রুচি, শিক্ষাদীক্ষা, কোন্ পরিবেশে মানুষ, কোন্ বিষয়ে উৎসাহী ইত্যাদির হদিশ দেয়। চোখ-মুখের চেহারা, শরীরের গঠন, শ্বাস নেবার শব্দ, বসার অস্বস্তি ইত্যাদি দেখে ব্লাড-সুগারের রোগী, কলেস্টোরলের রোগী, হৃদরোগী, পেটের গোলমালের রোগী, হাঁপানী রোগী বা অর্শরোগীকে অনেক সময়ই চিহ্নিত করা যায়। জাতক কি ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন জানা থাকলে অনেক সময় বলা সম্ভব, "আপনি নিজের চেষ্টায় দাঁড়িয়েছেন", 'আপনার প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে অন্যের সাহায্যের হাত" ইত্যাদি। চেহারা দেখেই অনেক সময় বলে দেওয়া যায়, "আপনার জীবনে অনেক নারী পুরুষ আসবে।" অনেক অর্ধ-প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত মানুষকে যদি বলেন, "আপনার যতখানি নাম-যশ, প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিৎ ছিল তা আপনি পাননি।" দেখবেন জাতক আপনার কথায়

বেজায় খুশি হয়ে উঠবে। আপনি একটু বুঝে-সমঝে কাউকে যদি বলেন, "পরিবারের জন্য, বন্ধুবান্ধবদের জন্য আপনি প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিনিময়ে অনেক সময়ই তাঁদের কাছ থেকে আন্তরিক, কৃতজ্ঞ ব্যবহার পাননি, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।" দেখবেন জাতক ভাবাবেগের শিকার হয়ে পড়েছেন, অনেক গোপন খবরই আপনার কাছে গড় গড় করে বলে চলেছেন। একজনের চেহারা দেখলে, কথা শুনলে তার মানসিকতার আঁচ করাও অনেক ক্ষেত্রেই মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। আপনি দু-একটি কথা বলে জাতকের আস্থা পেলেই দেখবেন, জাতক আপনাকে আপনজন মনে করে মনের জানালা খুলে দিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে সহানুভূতি শুনে, মনের মত কথা শুনে এইসব জাতকরাই পরিচিত জনের কাছে আপনার গুণগানে পঞ্চমুখ হবেন। প্রেম বা বিয়ের ক্ষেত্রে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" করলে তো পোয়াবারো, না হলেও সফলতা বা বিফলতা, যে পক্ষেই মত দিন সেই মত মোটামুটি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ঠিক বা ভুল ঘটারই সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। ঠিক হলে নাম আরও বাড়বে। ভুল হলেও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জাতকের আবেগকে ঠিকমত সুড়সুড়ি দিন, তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানান, দেখবেন তিনিও আপনার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। জাতক তখন অন্যদের কাছে আপনার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় আপনার জ্যোতিষবিচারের ব্যর্থতার দিকগুলো এড়িয়ে সফলতার প্রসঙ্গ এনে আপনার জ্যোতিষবিচারের অভ্রান্ততার কথাই প্রমাণ করতে চাইবেন।

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় জ্যোতিষীর কাছে যাঁরা যান, তাঁদের বেশিরভাগই সমস্যাপীড়িত অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁদের এই বিশ্বাস পরিবেশগতভাবেই এসেছে। তাই জ্যোতিষীরা যখন এইসব জাতকদের বাহ্যিকভাবে দেখে আচার-আচরণ শুনে অনেক কিছু বলে যান, তখন জাতকরা মিলে যাওয়া কথাগুলোই মনে রাখেন, না মেলা কথাগুলো ভুলে যান, অথবা উল্লেখ না করাই পছন্দ করেন। এইসব জাতকরা কিন্তু অবশ্যই চান জ্যোতিষীটির প্রতি তাঁর একান্ত বিশ্বাস আপনার মধ্যেও সংক্রামিত করতে।

আবার বলি, এইসব মিলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক বা বেঠিক জন্ম-সময় আদৌ কাজ করে না। তিনিই সফল জ্যোতিষী, যিনি মানুষের মন ভাল বোঝেন। নামী-দামী জ্যোতিষী অমৃতলাল "জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী কেন মেলে না" শিরোনামের প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, ভবিষ্যদ্বাণীকে সফল করতে হলে জ্যোতিষীদের হতে হবে মনস্তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অমৃতলাল বাস্তবিকই ঠিক কথা বলেছেন। সফল জ্যোতিষী হতে এইসব গুণেরই প্রয়োজন, জাতকের সঠিক জন্ম-সময় নয়।

ধরা গেল আপনি আপনার ঠিক জন্ম-সময় জানতে পেরেছেন। তিন জ্যোতিষীকে আপনি ওই একই জন্ম-সময় দিলেন গণনার জন্য। গ্রহ-অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, একজন দিক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা এবং একজন এফিমেরিস-এর সাহায্য গ্রহণ করলেন। ফলে হয়তো দেখা গেল তিন জ্যোতিষী জাতকের লগ্ন বসিয়েছেন সিংহ, কন্যা এবং তুলায়। কিন্তু দেখবেন তা সত্ত্বেও এঁদের প্রত্যেকের ভবিষ্যদ্বাণী কিছু না কিছু সফল হয়েছে। একই জন্ম-সময় দিলেও রাশি বা গ্রহ-অবস্থান বিভিন্ন জ্যোতিষীর গণনায় অনেক সময়ই ভিন্নতর হয়েই থাকে বিভিন্ন পঞ্জিকায় ও এফিমেরিসে গ্রহসংস্থান ভিন্ন ভিন্ন থাকার দরুণ। গ্রহ-অবস্থানেই যেখানে মতান্তর, সেখানে জ্যোতিষী কোন্ মতকে গ্রহণ করবেন? জ্যোতিষী যে

মতটিকে গ্রহণ করবেন সেটাই যে অভ্রান্ত, এই বিষয়ে নিশ্চয় তিনি সোচ্চারে মত প্রকাশ করবেন। বাস্তব সত্য এই যে, সব রকম পদ্ধতিতে গণনা করা ভবিষ্যদ্বাণীই কিছু না কিছু মেলে। আবার জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্য না নিযে মনস্তত্ব, তীক্ষবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেও দেখবেন কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই মেলা বা না মেলার সঙ্গে জাতকের সঠিক ছক বা সঠিক জন্ম-সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই, প্রমাণ হিসেবে আপনি রাশিচক্রের প্রতিটি ঘরকে এক একবার লগ্ন হিসেবে ধেরে গণনা করলেই দেখতে পাবেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাচ্ছে।

বহু শহর ও শহরতলীতেই খাঁচাবন্দী টিযা কী বুলবুলি নিযে বসেন জ্যোতিষী। খাঁচার সামনে সাজান থাকে সারি সারি খাম। জাতক পয়সা দিলে জ্যোতিষী খাঁচার দরজা খুলে দেন। পাখিটি এসে কোনও একটি খামকে টান দেয়। জ্যোতিষী খামের ভিতর থেকে বের করেন এক টুকরো কাগজ। তাতেই লেখা থাকে ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষী কাগজটি পড়ে শোনান জাতককে। জাতক মাথা নেড়ে জানাতে থাকেন তাঁর অনেক কথাই মিলছে। জ্যোতিষী খামটা জায়গা মত গুঁজে রাখার পর আবারও যদি জাতক পয়সা দিতেন, আবারও পাখিটি বেরিয়ে এসে টান লাগাত কোনও একটি খামে। সেটি অন্য কোনও খাম হলেও পড়লেই দেখা যেত জাতকের জীবনে কিছু কিছু ঘটনা এক্ষেত্রেও মিলে যাচ্ছে। আমি এই ধরনের পরীক্ষা করে তারপরই এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

জন্ম-সময় কোন্‌টি এই নিয়েও তো জ্যোতিষীদের মধ্যে রযেছে নানা মত। কোনও জ্যোতিষী মাতৃগর্ভ থেকে শিশুটির পুরোপুরিভাবে বেরিযে আসার সময়কে জন্ম-সময ধরেন, কোনও জ্যোতিষী জন্ম সময় হিসেবে গণ্য করেন শিশুর মস্তিষ্ক মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার সময়কে, কোনও জ্যোতিষী নাড়ি কাটার সময়কে জন্ম-সময হিসেবে গণ্য করেন। আবার কোনও জ্যোতিষী মনে করেন জাতক যে মুহূর্তে মাতৃ জঠরে এলো সেটাই তার জন্ম-সময়। তান্ত্রিক জ্যোতিষী মদনগোপাল সেন 'তন্ত্রের দর্শন ও ভাগ্যদর্শন' শিরোনামের একটি লেখাতেও জানিয়েছেন তান্ত্রিক জ্যোতিষীরা জন্ম সময় বলতে ভূমিষ্ঠ হওযার সময়কে গ্রহণ করেন না। তাঁরা জাতকের মাতৃজঠরে আসার মুহূর্তকেই জন্ম সময বলে গ্রহণ করেন।

জাতকের মাতৃজঠরে আসার মুহূর্ত জানা—সে তো এক দুরূহ কর্ম। তাহলে তো সঠিক জন্ম-সমযের অভাবে জ্যোতিষীরা জাতকদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলতেই পারবে না।

এ বিষয়ে আশার আলো দেখাচ্ছেন জ্যোতিষী-সম্রাট ডঃ অসিত কুমার চক্রবর্তী। তাঁর 'জ্যোতিষবিজ্ঞান কথা' বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠায় বলছেন, "জ্যোতিষশাস্ত্র মতে কোন্ নারী কখন গর্ভবতী হবেন বা হবেন না, তা আগে থেকেই জানিযে দেওযা সম্ভব।"

ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হলে স্বভাবতই কোন্ দিন কোন্ মুহূর্তে একজন নির্দিষ্ট পুরুষ একজন নির্দিষ্ট নারীর সঙ্গে মিলিত হবেন, সে তো তাদের জন্ম মুহূর্তেই নির্ধাবরিত হযে গেছে। যে মুহূর্তে একজন নারীর গর্ভ হওযার কথা ঠিক হযে রযেছে, সেদিন তাকে গর্ভবতী হতেই হবে। আর জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যকে জানা বাস্তব সত্য হলে জ্যোতিষীরা গণনা করে জাতকের মাতৃজঠরে আসার মুহূর্তটি বলে দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে একাধিক 'যদি', 'তবে' 'কিন্তু' ইত্যাদি ভিড় করেছে। 'যদি' ভাগ্যপূর্বনির্ধারিত হয, 'পুরুষকার' নামক ভাগ্য পাল্টে দেওযাব মত উদ্যোগেব বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেব

দ্বারা বাস্তবিকই একজন জাতকের জীবনের প্রতিটি পূর্বনির্ধারিত ঘটনা বা মুহূর্ত গণনা করে বলা সম্ভব হয়, তবেই ডঃ চক্রবর্তীর যুক্তিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু ডঃ চক্রবর্তী এই বইটিতেই তো ফলাও করে পুরুষকারের বাস্তব অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। ধরা গেল 'ক' বাবু একজন লেখক। 'খ' বিবি একজন কর্লগাল। পূর্বনির্ধারিত হয়ে রয়েছে ক'বাবু ও খ'বিবির দেহ-মিলন হেতু ১৯৮৯এর ৩১ জুলাই রাত ১১টা ৩৩ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডে খ'বিবি গর্ভবর্তী হবেন। ক'বাবুর ভিতরকার পুরষকার হঠাৎ জেগে উঠল। তিনি ঠিক করলেন, খ'বিবির পিছনে সময় নষ্ট না করে তার উপন্যাসের বাকি অংশটা শেষ করতে বসবেন। পুজো সংখ্যার লেখা নিয়ে বসলেন ক'বাবু। খ'বিবি মিথ্যেই হা-পিত্তেশ করে ক'বাবুর পথ চেয়ে শেষ পর্যন্ত রাগ থামাতে নিজের বাড়ির ডজন দু'যেক কাপ-ডিস ভাঙলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীট ফল দাঁড়ালো এই ক'বাবুটির পুরুষকার খ'বিবিকে ৩১ জুলাই রাত দুপুরে গর্ভবতী হতে দিল না। অতএব জ্যোতিষগণনা করে ডঃ চক্রবর্তী খ'বিবির গর্ভসঞ্চার এবং জাতকের জন্ম-সময় '৮৯-এর ৩১ জুলাই রাত ১১টা ৩৩ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড বলে যখন জাতকের ভাগ্য গণনা নিয়ে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খরচ করে চলেছেন, তখন ক'বাবুর পুরুষকার প্রমাণ করে দিল, নারী কখন গর্ভবতী হবে জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে তা জানান অসম্ভব।

ডঃ চক্রবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ধর্ম জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করে। কিন্তু তিনি কী জানেন ধর্মীয় নেতা স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মরণের পারে' বইটিতে জানিয়েছেন, "পিতামাতা এই দেহ গঠনের সাহায়ক মাত্র, তাছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করে দেহগঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। পিতামাতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা পিতামাতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণীবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে।" (পৃষ্ঠা-৬২)

অর্থাৎ, একজোড়া সুস্থ-সবল ও জন্মদানে সক্ষম নারী-পুরুষ তাদের দেহ-মিলনের সাহায্যে কখনই কোনও মানুষের জন্ম দিতে পারে না। নতুন মানুষটি জন্ম নেবে কিনা তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে বিদেহী আত্মার ইচ্ছের উপর। কোনও নারীর গর্ভবতী হওযাটা যদি আত্মার একান্তই ইচ্ছাধীনই হয়, তবে গর্ভবতী হওযাটা কখনই পূর্বানির্ধারিত হতে পারে না। আর শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত হলেই জ্যোতিষ-গণনায় নির্ণয় করা সম্ভব যদি অবশ্য দাবি মত বাস্তবিকই জ্যোতিষশাস্ত্র মত গণনা করে ভবিষ্যৎ বলার ব্যাপারটা সত্যি হয়। সাধারণ মানুষ প্রমাণহীন কার ব্যক্তি-বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে? স্বঘোষিত জ্যোতিষসম্রাট ডঃ চক্রবর্তী, না স্বঘোষিত বিজ্ঞানী-ধর্মনেতা স্বামী অভেদানন্দের? জ্যোতিষসম্রাটের কোন্ মতটিকেই বা গ্রহণ করা হবে—ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, না ভাগ্য পুরুষকারের দ্বারা নির্ধারিত? পুরুষকারকে স্বীকার করলে জন্মকালীন গ্রহ অবস্থান দেখে জাতকের ভাগ্য নির্ণয় করা ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করতে হয়, অস্বীকার করতে হয় জ্যোতিষশাস্ত্রকে।

না, কোনও ব্যক্তি-বিশ্বাসেরই এক কাণা-কড়িও দাম নেই যুক্তির কাছে, বিজ্ঞানের কাছে। আবারও সেই পুরোন কথাটাই মনে করিয়ে দিই, যুক্তি ও বিজ্ঞান পরীক্ষিত সত্যকেই শুধু গ্রহণ করে এবং করবে।

জ্যোতিষীদের কাছে পরমশ্রদ্ধেয় বরাহমিহিরের বিহদজ্জাতক-এ বলা হয়েছে—গর্ভধারণকালে শনি ও মঙ্গল উভয়ই যদি কন্যা বা মিথুন রাশির শেষ নবাংশে থাকে এবং বলবান শুভ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, আর ঐ লগ্নে চন্দ্র থাকে, এবং বলবান শুভগ্রহের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে শনি ও মঙ্গলের দ্বারা পূর্ণ-দৃষ্ট হয় তবে কুব্জ জন্ম হয়। মীন লগ্নে গর্ভাধান হলে, যদি ঐ লগ্নে শনি, চন্দ্র ও মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে, কিন্তু শুভ গ্রহের দৃষ্টি বর্জিত হয় তাহলে পঙ্গু জন্ম হয়। গর্ভাধানকালে রবি, মঙ্গল, শনি ও চন্দ্র যদি কর্কট বা মীন রাশির শেষ নবাংশ থেকে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় তবে বধিরের জন্ম হয়। এছাড়া হীনাঙ্গ, অন্ধ ও বামন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গর্ভাধানকালীন বিভিন্ন গ্রহ-অবস্থানের কথা বলা আছে। অনেক জ্যোতিষী এইসব শাস্ত্রবাক্যকে পরম বিশ্বাসে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এইসব শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করতে আজ পর্যন্ত কেউই এগিয়ে আসেন নি। অর্থাৎ এ-সব শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রয়েছে।

এবার ভাবুন তো, জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে নানা মুনির নানা মতের মাঝখান থেকে আমরা জন্ম-সময় বলতে কোন্ মতটিকে গ্রহণ করবো ?

আমরা কী তবে সংখ্যাগুরুদের মতামতকেই গ্রহণ করবো ? কোন্ যুক্তিতে ? সংখ্যাগুরুর মতামত, শুধুমাত্র এই যুক্তিতে ? আমরা তো হাজার হাজার বছর ধরেই দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে সংখ্যাগুরুদের বহু মতামত যুক্তির কাছে বিজ্ঞানের কাছে এক সময় মিথ্যে হয়ে গেছে। সংখ্যাগুরুদের মতামতকে সম্মান দিতে গেলে আমাদের তো আজও সোচ্চারে বলা উচিত, পৃথিবীর চারপাশে সূর্য পাক খেয়ে চলেছে। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের সত্য কোনও নির্বাচনের ব্যাপার নয় যে, সংখ্যাগুরুদের মতামতই শুধু গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

এবার আরও একটা মজার দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ধরুন একজন জাতকের ভাগ্য গণনার জন্য কয়েকজন জ্যোতিষীর সাহায্য নিলাম আমরা। এঁরা একই জাতকের জন্ম-সময় হিসেবে গ্রহণ করলেন মাতৃজঠরে আসার সময়, মাতৃজঠর থেকে মাথাটুকু বের করার সময়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার অর্থাৎ মাতৃজঠর থেকে পুরোপুরি বের হওয়ার সময় এবং নাড়ি কাটার সময়। এইসব বিভিন্ন জন্ম-সময় নিয়ে গণনা করা সত্ত্বেও দেখা যাবে প্রত্যেক জ্যোতিষীরই কিছু কিছু গণনা মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ, 'জন্ম-সময়', 'লগ্ন-নির্ণয়' ইত্যাদি বিষয়গুলোই একান্তভাবে অর্থহীন।

জাতক কখনো কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্যোতিষীর মতামত গ্রহণ করার পর জ্যোতিষবিচার ভ্রান্ত হতে দেখে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে জ্যোতিষী নিজের এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অক্ষমতা ঢাকতে জাতকের জন্ম-সময়ের যাথার্থতা নিয়ে পাল্টা সংশয় প্রকাশ করেন। বাস্তবে জ্যোতিষশাস্ত্রমতে সাধারণভাবে লগ্নমধ্যবর্তীকালে পনের মিনিট, আধ ঘন্টা, এমন কি এক ঘন্টার পার্থক্য জন্ম-সময় ধরলেও লগ্ন অপরিবর্তিতই থাকে। সঠিক সময়ের প্রশ্ন শুধু লগ্ন পরিবর্তনের সন্ধিকালে উঠতে পারে।

যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় দুই-জাতকের ছকই সর্বাংশে এক, এমন কি নক্ষত্রের প্রভেদও থাকে না। অথচ বাস্তব-জীবনে যমজ জাতক বহু ক্ষেত্রেই ভিন্নতর জীবন নির্বাহ করেন। এমনও দেখা যায়, একজন উচ্চশিক্ষিত, অপরজন নিম্নশিক্ষিত, একজন শান্ত, অপরজন অশান্ত, একজন মোটা, অন্যজন রোগা, একজন সাহসী, অন্যজন ভীরু,

একজন ধনী, অপরজন দরিদ্র, একজন প্রতিষ্ঠিত, অন্যজন অপ্রতিষ্ঠিত। এঁদের ক্ষেত্রে বৈপরিত্যের কারণ দর্শাতে জ্যোতিষীরা দুই যমজ জাতকের জন্ম-সময়ের ব্যবধানকে দায়ী করেছেন। সাধারণভাবে যমজ জাতকদের লগ্নকাল, গ্রহ ও নক্ষত্রের সন্নিবেশ কিন্তু একই দেখা যায়।

অতএব জন্ম সময়ের ভ্রান্তির যুক্তিটিও শেষ পর্যন্ত আদৌ ধোপে টেঁকে না।

যুক্তি সাত ঃ '৭৫-এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হিউম্যানিস্ট পত্রিকায ১৮৬জন বিজ্ঞানীর জ্যোতিষ-বিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। ১৮জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এও সত্যি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এ-কথাও সত্যি এই ১৮৬জন বিজ্ঞানী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে তারপর এই ধরনের সিদ্ধান্ত তাঁরা পৌঁছোননি। বক্তব্যটি খসড়া করেছিলেন বিজ্ঞানী বার্ট জে বোক্। অন্যরা জ্যোতিষচর্চা না করেই অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতা আছে কি না তা না জেনেই সাক্ষর করেছিলেন—এই মাত্র।

যে দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ, সেখানে জ্যোতিষবিরোধীতা করেছেন মাত্র ১৮৬জন। যে তথাকথিত স্ব-ঘোষিত যুক্তিবাদীরা ১৮৬জন বিজ্ঞানীর জ্যোতিষবিরোধীতাকে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভ্রান্তির অকাট্য প্রমাণ বলে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছেন তাঁদের যদি প্রমাণ করে দিই এর চেয়েও বেশি সংখ্যক বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, তখন কি তাঁরা মেনে নেবেন—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান?

"পরাশর, ভৃগু, জৈমিনি, বরাহমিহির প্রমুখ ঋষিরা যে শাস্ত্রের প্রণেতা সেই শাস্ত্রকে মিথ্যা বা অসভ্য মানুষের বিশ্বাস বলে মনে করলে, তাঁদেরও মিথ্যাবাদী এবং অসভ্য বলে মেনে নিতে হয়। তাঁরা অসভ্য হলে আমরা তাঁদের বংশধররাও অসভ্য বলে চিহ্নিত হই।

"এছাড়া পৃথিবীখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞানী পিথাগোরাস, টলেমী, গ্যালিলিও, টাইকোব্রাহ্য, কেপলার, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রমুখ এবং বর্তমানকালের বহু বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীরা যে শাস্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছেন, সেই শাস্ত্রে আস্থা জানাতে লজ্জা কোথায়?"

এই যুক্তিটুকু ডঃ অসিত চক্রবর্তীর 'জ্যোতিষ-বিজ্ঞান কথা' বইটির ৫৭ পৃষ্ঠা থেকে তুলে দিয়েছি. জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে এই ধরনের আক্রমণমুখী যুক্তি বহু জ্যোতিষীদের কাছেই খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বিরুদ্ধ যুক্তি ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে বা বিপক্ষে কতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মত প্রকাশ করলেন এমন সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে কোনও মতকে মেনে নেওযা যুক্তিবাদীদের কাছে একান্তভাবেই মূল্যহীন। কারণ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনির্ভর মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। কোন্ পক্ষ সংখ্যাগুরু, কোন্ পক্ষে নামী-দামীদের সমর্থন বেশি, তা দেখে নয। ইতিহাস বার বার এ শিক্ষাই দিয়েছে, বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরুদের, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মতামতও বাতিল হয়েছে আবর্জনার মতই। তেমনটি না হলে আজও আমাদের মেনে নিতে হতো ভু-কেন্দ্রীক বিশ্বতত্ত্বকে। অতএব আমি চাই যুক্তিনির্ভর মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। এ-কথাগুলো আলোচনায আগে এসেছিল, কিন্তু প্রয়োজনে আবারও

উল্লেখ করতে হলো।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যখন জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র এই দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায় তখন বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি কৌতূহলবশত অথবা দ্বিধাগ্রস্থভাবে অথবা বিশ্বাস নিয়ে জ্যোতিষচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে জ্যেতিষশাস্ত্র কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন, অথবা এ-যুগের কিছু বিজ্ঞানী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন এই যুক্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, বিজ্ঞানের কাছে ব্যক্তি-বিশ্বাসের দাম এক কাণা-কড়িও নয়।

প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'অসভ্য' বা 'মিথ্যাবাদী' এমন অভিযোগ কোনও যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তুলেছেন—এমনটা আমার জানা নেই। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করতে, তাঁদের আবেগকে সুড়সুড়ি দিতেই এমন সব অশালীন, স্পর্শকাতর কথা বলা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে। তবে পাশাপাশি এ-কথাটাও স্মরণযোগ্য, প্রাচীনযুগের বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই ভূ-কেন্দ্রীক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন. বরাহমিহির একটি পতাকা পুঁতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, পৃথিবী স্থির বলেই পতাকা একটা নির্দিষ্ট দিকে ওড়ে না। পৃথিবী ঘুরলে বাতাসে পতাকা শুধু একই দিকে উড়তো ; যেমন একটা পতাকা হাতে কেউ দৌড়তে থাকলে পাতাকা তার বিপরীত দিকেই ওড়ে।

অসভ্য মানুষদের বংশধররা অসভ্যই থেকে যাবে, এমনটা ডঃ চক্রবর্তীর কেন মনে হলো, বুঝলাম না। এটা তো বাস্তব-সত্য, এক সময় মানুষ অসভ্যই ছিল. ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই আমরা বর্তমান অবস্থায় পৌঁচেছি।

কেউ যদি মনে করে থাকেন, বুঝতে পেরে থাকেন, কারো ব্যক্তি বিশ্বাস (তা সে যত বড় মানুষই হোন্ না কেন) কখনই বিনা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানের সত্য বলে গৃহীত হতে পারে না, তবে দোষটা কোথায় ? এতে লজ্জিত হওয়ারও কোনও কারণ দেখি না।

একটি বিখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় কলমে জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে লেখা হয়েছিল, "এ আগ্রহ বিজ্ঞানমনস্কর থাকতে পারে এবং আছেও।".....''জ্যোতিষীর কাছে বিজ্ঞানী যান এ ঘটনা বিরল নয়।"

কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটনা কখনই জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার প্রমাণ নয়। বড় জোর এটুকুই প্রমাণিত হতে পাবে, ওই বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান, এ-কথা প্রমাণিত হচ্ছে কী ভাবে ?

যুক্তি আট : কার্ল সেগান, ডিন্সমোর অল্টার, জন ফিলিপস্, ক্যারেন্স ক্রেমিনিশ, বার্ট জে বোক্ প্রমুখ বিজ্ঞান পন্ডিতদের মতে পৃথিবী থেকে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো এতই দূরে রয়েছে যে পৃথিবীর উপর গ্রহগুলোর মহাকর্ষজনিত বল, চুম্বকক্রিয়া ও অন্যান্য ক্রিয়ার প্রভাব নিতান্তই নগন্য।

এইসব জ্যোতিষবিরোধীরা হয় শুধুমাত্র বিরোধীতা করতে, নতুবা এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অভাব থেকেই এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন।

দূরে থাকলেই বা বল কম হলেই যে প্রভাবও কমবে, এমনটা কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জ্বলন্ত উদাহরণ, হোমিওপ্যাথ।

ধরা গেল, একজন রোগীকে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক 'নেট্রাম মিউর ২০০' শক্তিমাত্রা দিলেন। নেট্রাম মিউরের অর্থ সোডিয়াম ক্লোরাইড যা কিনা ওই রোগী বা আমরা সকলেই প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণে খেয়ে থাকি সাধারণ লবণ হিসেবে। রোগী ওই ওষুধ খেয়েই কিন্তু রোগমুক্ত হলেন।

এখন একটা প্রশ্ন আসে, এতদিন রোগী প্রচুর লবণ খেয়েও রোগ মুক্ত হলেন না, আর চিকিৎসক যে ওষুধ দিলেন, তাতে লবণের উপস্থিতি এতই সামান্য যে নেই বললেই চলে। অতি সামান্য পরিমাণ লবণের প্রভাব কি তবে মানব-শরীরে এই ক্ষেত্রে প্রচুর লবণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল?

২০০ শক্তির নেট্রাম মিউর-এ কতটুকু লবণ থাকে একটু দেখা যাক।

১ গ্রাম লবণের সঙ্গে ৯ গ্রাম সুগার মিল্ক অথবা সুরাসার মেশান হলে হবে ১ শক্তি মাত্রার নেট্রাম মিউর। আবার ঐ শক্তিমাত্রা থেকে ১ গ্রাম নিয়ে ৯ গ্রাম সুগার মিল্ক মেশালে শক্তিমাত্রা বেড়ে হবে ২। আবার এই ২ শক্তিমাত্রার ১ গ্রামের সঙ্গে ৯ গ্রাম সুগার মিল্ক মেশালে তৈরি হবে ৩ শক্তিমাত্রার নেট্রাম মিউর। এই প্রক্রিয়ায় বাড়াতে ২০০ শক্তিমাত্রার নেট্রাম মিউর যখন তৈরি হবে তখন তাকে এক অণু লবণও থাকবে না। কারণ শক্তিমত্রা ২২ হলে প্রতি ১০ গ্রামে একটি বেশি অণু থাকবে না। সুতরাং ২০০ শক্তিমাত্রা ওষুধ লবণের অণুর উপস্থিতির প্রশ্ন অবান্তর। তাহলে দেখা যাচ্ছে হোমিওপ্যাথ ওষুধের ক্ষেত্রে বস্তুর উপস্থিতির স্বল্পতা শক্তিমাত্রা বৃদ্ধিই করেছে। অর্থাৎ সব সময় কোনও কিছুর দূরত্বের ব্যাপকতা বা উপস্থিতির পরিমাণগত স্বল্পতার দ্বারা প্রভাবের ক্ষীণতা প্রমাণ হয় না. এমন কি এও প্রমাণিত হয় না, পৃথিবীর জীবের উপর গ্রহদের প্রভাব যেহেতু অতি সামান্য তাই মানুষের উপর ক্রিয়াহীন থাকবে।

এই যুক্তিটি হাজির করেছেন কয়েকজন নামী-দামী জ্যোতিষী, যাঁদের মধ্যে ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তীও অন্যতম।

বিরুদ্ধ যুক্তি ঃ হোমিওপ্যাথ ওষুধে মূল ঔষধির উপস্থিতি যত সূক্ষ্ম মাত্রায় হয়, তার শক্তিমাত্রাও ততটা বৃদ্ধি পায়—এই যুক্তিতে জ্যোতিষীরা ঠিক কী প্রমাণ করতে চাইছেন, আমার কাছে আদৌ স্বচ্ছ হলো না। তবে তাঁদের বক্তব্য বার বার পড়ে মনে হয়েছে তাঁরা হোমিওপ্যাথের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মাত্রার সঙ্গে দূর গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের প্রভাবকে উদাহরণ হিসেবে যুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু জ্যোতিষীদের এই যুক্তিকে স্বীকার করলে জ্যোতিষশাস্ত্রকে যে অস্বীকার করতে হয়। কারণ এই যুক্তি অনুসারে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ চাঁদের প্রভাবই জীব-জগতে সবচেয়ে কম হওয়া উচিত। আর দৃশ্যমান নক্ষত্রের চেয়েও দূরবর্তী কোটি কোটি নক্ষত্রের প্রভাব হওয়া উচিত প্রবলতর।

কিন্তু বাস্তবে এ কী দেখছি? যে সব তা-বড় জ্যোতিষীরা হোমিওপ্যাথির দৃষ্টান্ত হাজির করছেন, তাঁরাই আবার মানুষের ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রে চন্দ্র, সূর্যের প্রভাবকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ওঁরা সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ (জ্যোতিষ মতে গ্রহ) চন্দ্রের অবস্থান অনুসারে জাতকের রাশি নির্ণয় করছেন। এবং বহু ক্ষেত্রেই লগ্নের পরিবর্তে রাশি থেকে গণনা করে জ্যোতিষ-বিচার করছেন।

অনেক গ্রহই পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব, তার চেয়েও বেশি দূরে অবস্থান করে। তখন কোন্ যুক্তিতে ওইসব গ্রহের প্রভাবের চেয়েও সূর্যের প্রভাব বেশি বলে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিবেচিত হয়?

সাতাশটি নক্ষত্রের প্রভাবের কথাই জ্যোতিষশাস্ত্রে লেখা রয়েছে। কিন্তু সাতাশটি নক্ষত্রের চেয়ে বহু গুণ দূরে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রের প্রভাবের কথা তো জ্যোতিষশাস্ত্রে লেখা নেই। অথচ জ্যোতিষীদের এই যুক্তি অনুসারে আরো দূরে অবস্থানের সুবাদে মানব-জীবনে এইসব নক্ষত্রেদের প্রভাব অবশ্যই হওয়া উচিত নয় গ্রহ ও সাতাশ নক্ষত্রের চেযে অনেক গুণ বেশি। এইসব দূরবর্তী নক্ষত্রদের প্রভাব বিচার না করলে তো জ্যোতিষশাস্ত্রই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে কোনও একটি তুচ্ছ গ্রহ-নক্ষত্রেব প্রভাব নির্ণযে সামান্যতম ভুল কবলে, একটি গণনা ভুল হলে যেখানে বহু মানুষের জীবনের বহু পূর্বনির্ধারিত ঘটনা পাল্টে যায, সেখানে কোটি কোটি নক্ষত্রের বিশাল বিশাল প্রভাব গণনার মধ্যে না আনলে জ্যোতিষশাস্ত্র তো 'আহাম্মকের শাস্ত্র' হযে দাঁড়তে বাধ্য।

স্বল্পতাই যদি শক্তিব বা প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে সর্বত্র প্রযোজ্য হয, তবে আমরা নিশ্চযই বলতে পারি—জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষযে যে যত কম জানে, সে তত বড় জ্যোতিষী।

যুক্তি নয়ঃ বিশ্বের বহু বরণ্যে বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেই তাঁদের নবতম আবিষ্কারকে, তাঁদের দেওযা নবতম তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরাই সবচেযে বেশি সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের জয হযেছে। সন্দিগ্ধ বিজ্ঞানীরা ওইসব বরেণ্যদের মতামতকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হযেছেন। আজ কিছু বিজ্ঞানীদের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি সন্দেহে আদৌ প্রমাণিত হয না যে জ্যোতিষশাস্ত্র অপবিজ্ঞান. বিজ্ঞানীদের সন্দেহই যদি শেষ কথা হতো, তবে নিউটন থেকে শুবু কবে বহু বিজ্ঞানীই চূড়ান্ত শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারতেন না।

বিরুদ্ধ যুক্তিঃ বিজ্ঞান যেহেতু পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিযেই সিদ্ধান্তে পৌঁছোয, তাই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আসে পরীক্ষার প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার প্রশ্ন, সন্দেহের প্রশ্ন। এ-সবের পরিবর্তে ব্যক্তি-বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে গেলে, ব্যক্তি-বিশ্বাস বা ব্যক্তির দাবিকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিলে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান থাকতো না. পরীক্ষিত সত্যকে বিজ্ঞান মর্যাদা দেয। জ্যোতিষশাস্ত্র যেদিন তাদের দাবি প্রমাণ কবতে সক্ষম হবে, সেদিন নিশ্চয়ই বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্রকেও মর্যাদা দেবে।

কোনও দাবিকে পরীক্ষা না কবেই সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওযা কী সুযুক্তির লক্ষণ বলে জ্যোতিষীবা মনে করেন? আমিই যদি আজ দাবি জানাই, রাত ঠিক বারোটায আমার হাত দুটো ডানা হযে যায, আমি তখন আকাশে উড়ে বেড়াই। রাত একটায ডানা দুটো আবার হাত হযে যায, তার আগেই আমি নেমে আসি মাটিব পৃথিবীতে ; আমাব এই দাবি কি বিনা সন্দেহে বিনা প্রশ্নে, বিনা পরীক্ষায জ্যোতিষীরা মেনে নেবেন? তেমনটা যদি কোনও জ্যোতিষী মেনে নেন, তবে তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে যুক্তিবাদীবা কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ কববেনই।

যুক্তি দশ : জ্যোতিষীবা অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই মিলিযে দিচ্ছেন। আর মিলিয়ে দিচ্ছেন বলেই জ্যোতিষশাস্ত্র সংখ্যাগুরু মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। জ্যোতিষীরা বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে, সাধাবণ মানুষ জ্যোতিষীদের কাছে আরও বেশি বেশি কবে হাজির হবেন কেন ? জ্যোতিষীরা যে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই মেলান, এবং এটা যে কোনও মিথ্যে প্রচার বা দাবি নয়, তার সাক্ষ্য দিতে মিলবে প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শী বা প্রত্যক্ষভোগী।

বিরুদ্ধ যুক্তি : এর আগে আলোচনা করেছিলাম, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু মেলে, আবার কিছু মেল না ; কেন মেলে, কেন মেলে না। পরবর্তী আলোচনায মাঝে-মধ্যে আবারও এই প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন নতুন কিছু তথ্য শোনাব। এখনই আবার এই প্রসঙ্গ নিযে আলোচনার প্রযোজন দেখি না। তবে "সংখ্যাগুরু মানুষদের জ্যোতিষে বিশ্বাসের কারণ জ্যোতিষীদের অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী" জ্যোতিষীদের এমন দাবিকে মেনে নেওযার পক্ষে কোনও যুক্তি দেখি না।

কিছু কিছু মানুষ অবশ্যই জ্যোতিষীদের কিছু কিছু সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীব দ্বারা প্রভাবিত হযে জ্যোতিষ-বিশ্বাসী হযেছেন। কিন্তু সকলের বিশ্বাসই অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত, এমনটা ভাবলে ভুলই হবে। জ্যোতিষ-বিশ্বাসেব পেছনে অনেক কারণই ক্রিযাশীল। পুরোন কথার পুনবৃত্তি সব সময প্রীতিকর হয না ; অথচ বার বার সে কথা মনে না করিযে দিলে অনেক সমযই সম্যক ফল পাওযা যায না। তাই আর একবার আমবা ফিবে তাকাতে চাই জ্যোতিষ-বিশ্বাসের জন্য ক্রীযাশীল কারণগুলোর দিকে।

মানুষ জ্যোতিষীদের কাছে হাজির হন অনেক কারণে। কেউ জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হন কৌতুহল মেটাতে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উর্ধ্বে থেকে স্রেফ কৌতুহল মেটাতেই কেউ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয বা পরিচিত জ্যোতিষচর্চা করা মানুষদের কাছে হাতটি মেলে দেয, অথবা জন্ম সমযটি জানায। অনেকে আবাব জ্যোতিষশাস্ত্রেব মধ্যে বাস্তবিকই যুক্তিগ্রাহ্য কিছু আছে কিনা জানতে জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ হয।

অনেকেই জ্যোতিষীদের কাছে হাজির হন বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হযে। 'বহু রাজনৈতিক ঘটনার সফল ভবিষ্যদ্বক্তা', 'বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান মানুষদের পরম বিশ্বাসভাজন জ্যোতিষী', 'অলৌকিক ক্ষমতাবান জ্যোতিষী', ইত্যাদি নানা বিশেষণে নিজেদেব বিশেষিত কবে বহু মানুষেব বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে আকর্ষণ কবার কাজও এইসব জ্যোতিষীরা কবে থাকে বলেই বহু মানুষ ওদের ফাঁদে পা দেয, প্রতাবিত হয ; যেভাবে বহু মানুষ প্রতিদিনই প্রতারিত হচ্ছে বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস কবে— সিনেমার নাযক হওযার লোভে সিনেমা কোম্পানীর অংশীদার হযে, বিদেশে চাকরি পেতে গিযে— জমি ও ফ্ল্যাট কিনতে গিযে, বে-সবকারী বিভিন্ন লগ্নি সংস্থায টাকা বাখতে গিযে. বিজ্ঞাপনে এমনি হাজারো ঠকবাজ হাজাবো ফন্দিতে মানুষ টেনে আনছে। ঠকার মত মানুষের কখনই অভাব হয না বলেই ঠকবাজেরা আজও ভালোভাবেই কবে খাচ্ছে। আজও এমন মানুষের সংখ্যা কম নয, যারা প্রতারক অলৌকিক বাবার হাতে মোটা অর্থ বা গহনা তুলে দেয— দ্বিগুন বা আরো বেশি পাবার আশায। ওরা ঠকে, তবু ঠকে যাবার জন্য তৈরি লোভী লোকের অভাব হয় না। এইসব প্রতারকদের কাছে মানুষ প্রতিনিযত প্রতারিত হতে আসে বলে কী এই প্রমাণ হয় যে, প্রতাবকরা আসলে

প্রতারক নয়? এক একটি যুধিষ্ঠিরের সন্তান?

যে সমাজে অনিশ্চয়তা বেশি, সেই সমাজ-ব্যবস্থায় ঈশ্বর, জ্যোতিষ, ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীলতা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। বিপদগ্রস্ত, দিশা না পাওয়া, বাস্তব কোনও কিছুর উপর ভরসা রাখতে না পারা মানুষ শেষ ভরসা হিসেবে অনেক সময়ই নিজেকে ভাগ্যের বা ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেয়। মানুষের জীবনে অনিশ্চযতা যত বাড়তে থাকে, ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতাও ততই বাড়তে থাকে। অনিশ্চযতা থেকেই প্রধানত ভাগ্য-বিশ্বাসের সৃষ্টি। একটা সময় ছিল, স্কুলের গণ্ডি পেরুলেই চাকরি জুটতো। এখনকার মত মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে বেকার বসে থাকতে হতো না। তাই কর্মভাগ্যের তেমন কোনও গুরুত্বই ছিল না। যে সমাজ-ব্যবস্থায় বেকার মানুষের সংখ্যা প্রায় শূণ্যের কোঠায়, সেখানকার মানুষগুলোর দশমপতি অর্থাৎ কর্মপতি নেহাৎই বেকার। যে সমাজে মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, তাঁদের চতুর্থপতি নেহাৎই অসহায। ধনবান দেশের মানুষদের দ্বিতীয়পতির গুরুত্বই নেই। সে বিরূপ বা নিম্নস্থ হলেও জাতকের ধনসম্পদ সামান্যতম কমবে না।

সমাজে যখন ন্যাযনীতির অভাব ও অসাম্য দেখা যায, তখন সুযোগ পাওযা ও সুযোগ না পাওয়া প্রতিটি মানুষ ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

দেশে বেকারের সংখ্যা যদি হয় ১০ কোটি ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয ১ লক্ষ তবে স্বভাবতই আসে দূর্নীতি, অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি। যোগ্যতা থাকতেও বহুকেই বেকার থাকতে হয। অযোগ্যও বেকারত্ব ঘুঁচায় মামা দাদার কৃপায। মন্ত্রীর ছেলেকে ধরে অসংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ সাংস্কৃতিক বিনিমযের কল্যাণে বিদেশ ঘুরে আসে। কেউ বা রাজনৈতিক দলের বিরাগভাজন হযে দূরদর্শনের কালো তালিকাভুক্ত হর্য। এইসব অনিশ্চযতা ও ডামাডোলে সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত, উভযেই এর পিছনে ভাগ্যের ভূমিকাকে খুঁজে পায়। যে গোষ্ঠির মধ্যে অনিশ্চযতা বেশি, ভাগ্যের উপব নির্ভরশীলতাও তাদের বেশি। শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোযাড়, আইনজীবী ইত্যাদির মধ্যে পেশাগত অনিশ্চয়তা বেশি বলে এঁদের মধ্যে ভাগ্য-নির্ভরতাও বেশি। তাঁদের হাতে গ্রহরত্নের উপস্থিতিই এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। আমাদের দেশে অনিশ্চযতা, সামাজিক ন্যাযনীতির অভাব, অসাম্য, বঞ্চনা ইত্যাদি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, ফলে ভাগ্য-নির্ভরতাও বেড়েছে। এই সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তিও চায় না বঞ্চিত মানুষের দল জানুক তাদের প্রতিটি বঞ্চনার পিছনে রযেছে কিছু মানুষ, কিছু বঞ্চনাকারী মানুষ, আকাশের গ্রহ বা স্বর্গের দেবতা নয়। ভাগ্যকে বঞ্চনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে, বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে প্রতিবাদের কণ্ঠকে শান্তিপূর্ণ উপাযে স্তব্ধ করে রেখে বঞ্চনা ও শোষণের গতি অব্যাবহ বাখা যায। তাই রাষ্ট্রশক্তি ও শোষক শ্রেণী নানাভাবে সচেষ্ট রযেছে ভাগ্যবিশ্বাস ও জ্যোতিষ-বিশ্বাসকে পালন করতে, পুষ্ট করতে।

পরিবেশগতভাবেও জ্যোতিষে বিশ্বাস আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জ্ঞান হওযা থেকে মা-বাবা, আত্মীয, প্রতিবেশী, বন্ধু, শিক্ষক প্রত্যেকের একান্ত জোতিষ-বিশ্বাস আমাদের প্রভাবিত কবেই চলে। এই প্রভাব অনেক সময এতই দৃঢ়বদ্ধ হয যে, বিজ্ঞান নিযে পড়াশুনো করলেও, বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে নিলেও বিজ্ঞানের যুক্তিগুলোকে নিজেদের জীবনচর্চায আমরা গ্রহণ করি না। বিজ্ঞান পেশা প্রাযশই আমাদের কাছে আলুব কাববারি, জমির দালালিব মতই একটা পেশা মাত্র, এব বেশি কিছু নয।

শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া অথবা সামান্য শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষই আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। এঁদের অনেকেরই অজানা 'যুক্তিভিত্তিক চিন্তা', 'বিজ্ঞানমনস্কতা' ইত্যাদি ব্যাপারগুলো। এঁরা জন্ম থেকেই কুসংস্কারের ঘেরাটোপেব মধ্যেই মানুষ হচ্ছেন। ছোটবেলা থেকেই কোমরে দুলছে লোহা, তামা, কড়ি. গলায, হাতে শোভা পাচ্ছে শনিথান, শীতলা থান, পাঁচু-ঠাকুর, বনবিবি, ওলাইচণ্ডী, মানিকপীর কি ধর্মঠাকুবের তাবিজ, কবজ, মাদুলী। অসুখ হলে জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়ফুকের দ্বারস্থ হন এখনও। এঁরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সংস্কারকে সঙ্গী করেন। সংস্কারগুলোর পিছনে বাস্তবিকই কোনও যুক্তি আছে কিনা—বিচার করার প্রয়োজন বোধ কবেন না। বরং বহু ক্ষেত্রেই এইসব মূল্যহীন সংস্কাবকেই 'প্রাচীন ঐতিহ্য',' পারিবারিক ঐতিহ্য', 'প্রাচীন মূল্যবোধ' ইত্যাদি মনে করে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন। এঁদের পরিবারে নবজাতকের জন্ম-পত্রিকা আগেও তৈরি হতো, এখনও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেই জন্ম-পত্রিকা তৈরি হচ্ছে ; করছেন জ্যোতিষীরা। ঐতিহ্য ও সংস্কারের বশে আজও পাত্র-পাত্রীর মিলন সুখেব হবে কি না জানতে জ্যোতিষীদেবই দ্বারস্থ হন পাত্র-পাত্রীর পক্ষেরা।

আমাদেব দেশে জ্যোতিষ-বিশ্বাসের নানা কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষভোগীর প্রাচুর্য। জ্যোতিষীরা মানুষেব বাহ্যিক আচরণ দেখে কিছু কিছু বিষযে তাঁদের খদ্দেবদের সন্তুষ্ট করে থাকেন। কীভাবে এগুলো হয সে নিযেও এর আগে যেহেতু বিস্তৃত আলোচনা করেছি, তাই আবার ওই প্রসঙ্গে টেনে এনে পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্যেব ওপর অত্যাচার কবলাম না। জ্যোতিষীরা যেহেতু খদ্দেরদেব সহানুভূতি পাওযাব মত অনেক সুন্দব সুন্দব মন রাখা কথা বলেন, তাই খদ্দেররাও অনেক সমযই কিছুটা আপ্লুত হন। আপ্লুত খদ্দেব স্বাভাবিক নিয়মেই চেষ্টা করেন, যে জ্যোতিষী তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন, সেই জ্যোতিষী সম্বন্ধে পরিচিতজনের মধ্যে ভাল ধাবণা সৃষ্টি করতে। আব এমন ধাবণা সৃষ্টি করতে জ্যোতিষীর যে সব কথা মেলেনি সে সব বিষযে নীরবতা পালন কবে মিলে যাওয়া বিষয নিযে সরব হন। এ-সব ক্ষেত্রে আপ্লুত মানুষ স্বভাবতই তাঁদের কাহিনী-বিন্যাসে আরও রঙ মেশান। তাঁরা চান, তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদেব আপ্লুত ভাব পবিচিতদের মধ্যেও প্রকাশিক হোক।

এ-ছাড়া আরও একটি কারণে প্রত্যক্ষদর্শীর ভীড় বড বেশি। আমরা চমক লাগান ঘটনার গল্প বলতে ভালবাসি। পরের মুখে শোনা চমক লাগান ঘটনাকে নিজের চোখে দেখা বলতে ভালবাসি। বিশিষ্ট মানুষদের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে প্রচার করতে ভালবাসি। বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত না হযেও তাঁদের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্টভাবে পরিচিত, এ কথা প্রমাণ করতে গল্প ফাঁদি। পবিচিত মানুষদের চমকে দিতে আমরা অনেক সময সৃষ্টি করি অতিরঞ্জিত কাহিনীর। আবার অনেক সময কোনও ঘটনা বহু কথিত হওযাব ফলে আমরা বিশ্বাসও করে ফেলি। আমাদেব সেই বিশ্বাসকে অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করতে ভালবাসি বলে প্রযোজনে নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে বর্ণনা কবি। এখনও জাদুসম্রাট পি সি সরকাবের ঘড়ির সময পাল্টে ফেলার অনেক প্রত্যক্ষদর্শীব সাক্ষাৎ মেলে। আব এইসব সাক্ষীরা আমাদেবই আপনজন, আমাদেবই মা, বাবা, জ্যেঠা, কাকা, মামা, মাসি ইত্যাদি। আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে ভালবাসি না আমাদের এই শ্রদ্ধেয মানুষবা মিথ্যাশ্রযী। অথচ

এটাও বাস্তব সত্য, জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার কোনও দিনই এই ধরনের ঘটনা ঘটিযে দেখান নি। দেখান সম্ভবও ছিল না। অনেকেই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যখন মা-বাবার মত পরম শ্রদ্ধেয়দের নাম উচ্চারণ করেন, তখন বলেন, "আমার বাবা-মা কী তবে মিথ্যে কথা বলেছেন ? তাঁরা কী মিথ্যেবাদী ? এমন মিথ্যে কথা বলার পিছনে তাঁদের কী স্বার্থ থাকতে পাবে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে একজন যুক্তিবাদী অথবা ঠোঁটকাটা মানুষও যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েন। তাঁরা সাধারণত পরিচিত মানুষটির এই প্রশ্নের উত্তরে রূঢ় সত্য বলে সুসম্পর্ক নষ্ট করতে চান না। প্রশ্নকর্তা কিন্তু সেই সময় একবাবের জন্যেও ভাবেন না, মিথ্যাচারীরাও কাবো না কারো মা-বাবা, পরমাত্মীয় বা বন্ধু।

অতএব যাঁরা নিজেদের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করছেন, প্রমাণহীন তাঁদের দাবি বা সাক্ষ্য কখনই জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। আর, যুক্তির কাছে 'সংখ্যাগুরুর মতামত' শুধুমাত্র এই কারণে কোনও কিছু গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে না। আমবা বহু সংখ্যাগুরুর মতামত বারবার বাতিল হতে দেখেছি। বিজ্ঞানের কাছে, যুক্তির কাছে, সত্যের কাছে।

যুক্তি এগারো : প্রতিটি মানুষের হাতেব রেখা আঙুলের ছাপ ভিন্নতর। তাই আজও আঙুলের ছাপ, হাতের ছাপ দেখে অপরাধী চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করে চলেছে অপরাধবিজ্ঞান।

একটি মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে আর একটি মানুষের ভাগ্য কখনই পরিপূর্ণভাবে এক নয়, তা সে একই সময়ে জন্মালেও। আর তাই দুটি মানুষের হাতের রেখা এক নয়। এই দুয়ের সম্পর্কই প্রমাণ কবে হস্তবেখার মধ্যেই সাংকেতিক চিহ্নে লিখিত রযেছে মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

এই সংকেত উদ্ধার একদিনে সম্ভব হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে শত-সহস্র হস্তরেখাবিদ্‌দের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিযে গড়ে উঠেছে হস্তরেখা-বিদ্যা। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের মধ্য দিযে গড়ে ওঠা এই সিদ্ধান্ত তাই বিজ্ঞান.

বিরুদ্ধ যুক্তি : অনেক হস্তরেখাবিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে, শুধুমাত্র এই যুক্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে মেনে নেওযা সম্ভব নয়। কারণ অনেক হস্তরেখাবিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মেলেনি, এটাও কিন্তু বাস্তব সত্য।

কেন মেলে, কেন মেলে না সে কথা আগেই আলোচনা কবেছি। তাই সে আলোচনায় আবার ফিবে আসার প্রযোজন দেখি না। বরং আমরা এখন আলোচনা করবো, হাতের বেখা কী, কেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিযে।

চোখের সামনে নিজের হাতটা মেলে ধরলেই দেখতে পাব তিনটি-স্পষ্ট মোটা বেখা এবং তা ছাড়াও অনেক ছোট, বড়, সূক্ষ্ম, স্পষ্ট বহু রেখা। রেখা দিযে তৈরি অনেক চিহ্নও চোখে পড়তে পারে। এ-গুলো কোনও দুটি রেখার কাটা-কুটি, বহু রেখাব কাটা-কুটি, বৃত্তাকারের বেখা, ত্রিকোণাকাবের রেখা, চতুষ্কোণের মত রেখা, ইত্যাদি। এ-ছাড়াও প্রতিটি আঙুলেব ভাঁজেব তিনটি স্থানে থাকে এক বা একাধিক স্পষ্ট মোটা বেখা। মোটা দাগের বেখাগুলোকে

বলা হয় ভাঁজ বা crease। সূক্ষ্ম রেখাগুলোকে বলা হয় ridge।

ভাঁজ বা crease আমরা দেখতে পাব প্রতিটি আঙুলের ভাঁজের জায়গায় এবং হাতের তালুর তিনটি স্থানে। হাতের তালুর এই ভাঁজগুলোকে হস্তরেখাবিদ্‌রা বলেন হৃদয়রেখা (heart-line), শিরোরেখা (head-line) এবং আয়ুরেখা (life-line)।

হাতের ভাঁজ ও রেখাগুলো তৈরি হওয়ার কারণ শিশু গর্ভে থাকাকালীন হাত দুটি মুঠিবদ্ধ করে রাখে। ফলে হাতের তালুতে আঙুলের ভাঁজে বেশি কুঁচকে থাকা জায়গাগুলোতে তৈরি হয় ভাঁজ এবং কম কুঁচকে থাকা জায়গাগুলোতে তৈরি হয় রেখা।

শিশুরা কেন এমনটা হাত মুঠোবন্দী করে রাখে? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা পূর্বপুরুষদের গাছের ডাল মুঠিবদ্ধ করে ধরে রাখার অভ্যেসটাই বংশগতি সূত্রে চলে আসছে। হাত ও আঙুলের ভাঁজগুলো আমাদের হাতের নড়াচড়ায়, আঙুল চালনায় সাহায্য করে। নৃবিজ্ঞানীদের (anthropologists) মতে তালুর প্রধান তিনটি ভাঁজ আমাদের আঙুলগুলোকে চালনা করতে সাহায্য করে। আপনার বুড়ো আঙুলটি চালিয়ে দেখুন, দেখবেন আয়ুরেখাটিও চালিত হচ্ছে।

জন্ম থেকেই যারা বুড়ো আঙুল ছাড়া জন্মায় তারা আয়ুরেখা ছাড়াই জন্মায়। আয়ুরেখাই যদি জাতকের আয়ুর মাপকাঠি হয়, তবে আয়ুরেখা ছাড়া এইসব জাতক জীবনধারণ করে কী করে?

এর দ্বারা স্পষ্টইতই প্রমাণিত হয়, আয়ুরেখা আদৌ আয়ুর পরিমাপক নয়, বুড়ো আঙুল চালনার ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র।

১৯৮৭-র নভেম্বর থেকে ১৯৮৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার চারটি হাসপাতালে একটি বে-সরকারী পরীক্ষা চালান হয় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির উদ্যোগে। জন্মকালীন, জন্মের আগে, অথবা জন্মের অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাওয়া একশোটি শিশুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল ওদের প্রত্যেকেরই আয়ুরেখা ছিল। আয়ুরেখা থাকা সত্ত্বেও ওদের আয়ু কেন শূণ্য? কি জবাব দেবেন জোতিষীরা? জ্যোতিষীরা আবারও এই ধরনের সমীক্ষা চালালে আমার বক্তব্যের সত্যতা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অসারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্যই পাবেন।

বয়েস বাড়লেও হাতের তালু ও আঙুলের ভাঁজগুলো পাল্টায় না। তবে অনেক রেখা ও চিহ্ন পাল্টে যায়, এমন কি মুছেও যায় অনেক সময়। হাতের তালুর চামড়ার নীচের মাংসপেশীগুলোর সংকোচন-প্রসারণের ফলেই রেখার এই ধরনের পরিবর্তন, সৃষ্টি বা বিলোপ ঘটে থাকে। এই পেশী সংকোচণ আবার ব্যক্তির জীবনযাত্রা প্রণালীর ওপরও সাধারণভাবে নির্ভরশীল। রেখাগুলো মানুষের ভাগ্যের নির্দেশক নয়, ভাগ্যের অনিবার্যতার নির্ণয়ক নয়।

এর পরও কোনও জ্যোতিষী যদি গোঁ ধরে বলতেই থাকেন—"হাতের রেখা নির্ধারিত ভাগ্যের নির্দেশক", তবে তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের সবচেয়ে জোরাল প্রশ্ন হলো—যে হাতের

রেখা দেখে জ্যোতিষী জাতকের পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য জানতে পারে, সেই হাতের রেখা পাল্টে গেলে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যই তো ওলট-পালট হয়ে যাবে। আর সেই সঙ্গে জাতকের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কীত কয়েক হাজার মানুষদের জীবনের পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাও যাবে পাল্টে। আবার কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কীত কয়েক হাজার গুণিতক কয়েক হাজার অর্থাৎ কয়েক নিযুত সংখ্যাক মানুষের ভাগ্যের পূর্বনির্ধারিত ঘটনা যাবে পাল্টে। ওই নিযুত সংখ্যক মানুষের ভাগ্য পাল্টে গেলে তার প্রভাব পড়বে কয়েক নিযুত গুণিতক কয়েক নিযুত মানুষের ভাগ্যে। এই ভাগ্য পরিবর্তন চলতেই থাকবে এই ধরনের গুণিতকের নিয়মেই। ভাগ্য বাস্তবিকই নির্ধারিত হলে একটি জাতকের ভাগ্যের সামান্যতম পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষদের নির্ধারিত ভাগ্যের ভারসাম্যকে ওলট-পালট করে দিতে বাধ্য। হাতের রেখা যেহেতু বহু মানুষেরই পাল্টায়, তাই "হস্তরেখা শাস্ত্রটি বিজ্ঞান" এই দাবি মূর্খতা বা শঠতারই নির্দেশক।

যুক্তি বারো : কোনও বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের তিনিই শুধু অধিকারী হতে পারেন, যিনি সেই বিষয়ে সুপণ্ডিত। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা নিতে পারেন শুধুমাত্র একজন পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত মানুষ। একজন রসায়নবিদ্ কী পারেন পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা নিতে? না, পারেন না। এই একই যুক্তিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষা তাঁরাই নিতে পারেন, যাঁরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আজকাল এক নতুন বিপত্তি দেখা দিয়েছে নব্য কিছু যুক্তিবাদীদের নিয়ে। তারা যেখানে-সেখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছে—"কয়েকজনের জন্ম সময় বা হাত দেখতে দিচ্ছি, সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করলে স্বীকার করে নেব জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান।" ওইসব যুক্তিবাদীদের স্বীকার বা অস্বীকারের ওপর জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান নয়—তার মীমাংসা নির্ভর করে না। জ্যোতিষশাস্ত্রকে এভাবে পরীক্ষা করতে চাওয়ার কোনও অধিকারই যুক্তিবাদীদের নেই। আবারও বলি অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা পরীক্ষার একমাত্র অধিকারী জ্যোতিষীরাই।

বিরুদ্ধ যুক্তি : বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখার। মহাকাশবিজ্ঞানী, রকেটবিজ্ঞানী, কম্পিউটরবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, প্রত্যেকেই তাঁর শাখার বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলে সেই বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের অধিকারী হলেও, অন্য শাখায় বিশেষ জ্ঞান না রাখলে সেই শাখার পরীক্ষক হিসেবে অচল, এটা অতি সাধারণ যুক্তিতেই বোঝা যায়।

এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে জ্যোতিষীরা দাবি রেখেছেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরীক্ষা নেওয়ার একমাত্র অধিকারী জ্যোতিষীরাই; অন্য কেউ নয়। বেশ সুন্দর যুক্তি। এই একই যুক্তির ওপর নির্ভর করে অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারও নিশ্চয়ই দাবি তুলতে পারে, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিনা, এ-পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীদেরই।

অলৌকিক ক্ষমতাও আবার নানা ধরনের; কেউ শূন্যে ভাসে, কেউ শূন্য থেকে বস্তু সৃষ্টি করে, কেউ জলে হাঁটে, কেউ মৃতে প্রাণ দান করে, কেউ রোগমুক্ত করে, কেউ অলৌকিক দৃষ্টিতে সব কিছুই দেখতে পায়—দৃশ্য-অদৃশ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ সবই। এমনি নানা

অলৌকিকক্ষমতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। ওরাও নিশ্চযই এই একই যুক্তিতে বলতেই পারে—"শূন্যে ভাসার ক্ষমতা আছে কিনা, তা আমরা সাধারণ মানুষকে দেখাব না, তারা পরীক্ষা নেবার কে? আমার শূন্যে ভাসার ক্ষমতার পরীক্ষা নেবার অধিকারী একমাত্র সেই, যে শূন্যে ভাসতে পারে।" একই ভাবে মৃতকে প্রাণ-দান করার ক্ষমতার অধিকারী দাবি করে বসবে— "বাসি মরাকে যদি আমি বাঁচিয়ে তুলিও, তোমরা কি করে বুঝবে ওকে বাঁচিয়েছি? তোমরা বলার কে— 'মরাটাকে বাঁচিযে দেখিযে দাও তোমার অলৌকিক ক্ষমতা।' আমার এই ক্ষমতা যে আছে সে শুধু বুঝতে পারবে তারাই, যারা মন্ত্রে মরা বাঁচায়।" তারপর কোন্ এক বাবা এসে হেঁকে বসবে, "আমি শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারি গোটা একটা জাম্বো জেট্ প্লেন।" সেই সময কোনও মানুষ (তার মধ্যে জ্যোতিষীও থাকতে পারে) আহাম্মকের মত যদি বলে বসে, "করুন তো, করুন তো।" তখন ওই বাবা মৃদু হেসে যদি বলে বসে, "বৎস আমি এক্ষুনি এই মাঠটায একটি বিশাল জাম্বো জেট্ তৈরি কবে হাজির করলেও তোমরা কি করে বুঝবে যে আমি সত্যিই একটা পেল্লাই এরোপ্লেন তৈরি করেছি? এটা তোমাদের বোঝার কম্মো নয। বুঝবে শুধু তারাই, যারা আমারই মত মন্তবে প্লেন তৈরি করতে পারে।"

শুনে মানুষটি নিশ্চযই বলবে, "ব্যাটা হয পাগল, নয বুজরুক।" কিন্তু ওই বাবার এই কথা শুনে জোতিষী কী বলবে? জানার ইচ্ছে রইল।

আরও এক ধরনের সমস্যা এমন যুক্তি সূত্র ধরে হাজিব হতে পারে। সমাধানের উপায আমার জানা নেই। জ্যোতিষীদের হাতে অবশ্যই আছে ভরসায় এখানে তুলে দিলাম—

গোপালবাবু নরম-সরম, ভোলা-ভালা চেহারার অতি দুষ্টু লোক। পাড়ার জ্যোতিষী গৌতমশ্রীর বাড়িতে গৌতমশ্রীর সঙ্গে গোপালবাবুর একদিন বেজায তর্ক বেধে গেল জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে। গোপালবাবু বললেন, "বেশ তো, আপনাকে কয়েকজনের জন্য সময দিচ্ছি, হাত দেখতে দিচ্ছি। আপনি ওদের আগামী এক ববছবের কযেকটা ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করুন। মিলে গেলে নিশ্চয়ই স্বীকার করব, জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান।"

গৌতমশ্রী বললেন, "আপনাকে কেন বলব মশাই? আপনার কাছে পরীক্ষাই বা দেব কেন? ঠিক বলছি কি ভুল বলছি, আপনি কি কিছু বুঝবেন? পরীক্ষা নেওয়ার অধিকারী সে, যার জ্যোতিষ বিষযে জ্ঞান আছে; যে বুঝবে। আপনি মশাই ফালতু পাবলিক; ঘোর নাস্তিক।"

গোপালবাবু জিব কেটে বললেন, "ছি, ছি, কি যে বলেন মশাই; নাস্তিক হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার নিজেরই দস্তুর মত অলৌকিক ক্ষমতা আছে। যে কোনও লোককে মন্ত্র পড়ে পাঁঠা বানিযে দিতে পারি।"

"তাই নাকি? তা দিন না মশাই আমাকেই পাঁঠা বানিযে। স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিচ্ছি, এর জন্য আপনাকে দাযী করব না।"

গোপালবাবু একগাল হেসে বললেন, "আপনাকে আর পাঁঠা বানাব কী? আপনি তো মশাই পাঁঠাই; তা না হলে যে ক্ষমতা আপনার নেই সে বিষযে পরীক্ষা নিতে চান? আমার পরীক্ষা নেবে সে, যে মন্ত্রে মানুষকে পাঁঠা বানাতে পারে।"

পাড়ার কযেকজন ভদ্রলোক বসে গোপালবাবু ও গৌতমশ্রীর কলহ শুনে আমোদ পাচ্ছিলেন; তাঁদেব একজন হলেন বলরামবাবু। বলরামবাবু উঠে নিপাট গলায় বললেন,

"আমারও ওই ক্ষমতাটা আছে। আমি কালই পরীক্ষা নিযে জানিয়ে দেব গোপালবাবুর সত্যিই পাঁঠা বানাবার ক্ষমতা আছে কিনা। আজকের মত কলহ মুলতুবি থাক।"

পবের দিন বলরামবাবু ও গোপালবাবু ঢুকলেন জ্যোতিষ সম্রাট গৌতমশ্রীর জ্যোতিষ গবেষণালয় অর্থাৎ বাড়িতে। বলরামবাবুর কোলে একটা কুচকুচে কাল নধর পাঁঠা। ওদের দেখে গৌতমশ্রী হেঁকে উঠলেন, "পাঁঠা নিযে এলেন কেন? এবার ওটাকে আবার মানুষ করবেন নাকি?"

বলরামবাবু বললেন, "না মশাই। এটা কাল রাত পর্যন্ত মানুষই ছিল। গোপলবাবু ওকে পাঁঠা বানিযে দিযেছেন।"

গৌতমশ্রী দুই খচ্চরের কারবাব দেখে বেজায চটলেও জুতসই উত্তর দিতে পাবেন নি। অন্য কোনও জ্যোতিষীর এর উত্তর জানা থাকলে অনুগ্রহ করে তিনি গৌতমশ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে উত্তরটা জানিয়ে দিয়ে তাঁকে এই ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন।

জ্যোতিষীরা বিজ্ঞানের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণের পরই শুধু দাবি করতে পারেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষা নেবেন জ্যোতিষীরা।" তখন জ্যোতিষশাস্ত্রেব নানা গণনা পদ্ধতি শিক্ষার্থী জ্যোতিষীদের সঠিকভাবে জানা আছে কিনা পরীক্ষা নিয়ে তবেই বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষীরা মত প্রকাশ করবেন শিক্ষার্থীটি পাশ কী ফেল। কিন্তু এমন দাবি করার আগে জ্যোতিষীদের অবশ্যই প্রমাণ করত হবে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বাস্তবিকই মানুষের জীবনের পল-অণুপলের প্রতিটি ভবিষ্যৎ ঘটনাই বলে দেওয়া সম্ভব। জ্যোতিষীরা সঠিক বলেছেন কিনা, জানার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র জানার সামান্যতম প্রযোজন তো দেখি না। ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে জাতকের জীবনের ঘটনাগুলো মেলালেই অতি স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব—ভাগ্য গণনা মিলেছে, কি মেলেনি। জ্যোতিষী যদি বলেন, আজ থেকে পাঁচ দিনের মাথায আপনাব হাত ভাঙবে, এবং বাস্তবিকই যদি আপনার হাতটি ওই পাঁচ দিনের মাথায ভেঙে যায তবে অতি সাধারণবুদ্ধিব মানুষও মানবে জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ঠিক হযেছে। ভবিষ্যদ্বাণী মিলেছে কিনা, সেটা জানার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়ার তো কোনই প্রযোজন দেখি না, যুক্তির বিচারে। জ্যোতিষীরা এমন কুযুক্তির আমদানী কবেছেন অতি সম্প্রতি। আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখে নিশ্চিত পরাজয জেনে চ্যালেঞ্জ এড়াতেই এই দুর্বল অজুহাতের সৃষ্টি।

যুক্তি তের : "বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষদের মনে জ্যোতিষ যেভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে—এই শাস্ত্র মিথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, নিশ্চযই তা সম্ভব হতো না।"

এই কথাগুলো তুললাম প্রচারে বিশাল জ্যোতিষী অমৃতলালের দেওযা দৈনিক পত্রিকায পুবো পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন থেকে।

বিরুদ্ধ যুক্তি : সংখ্যাধিক্যের ব্যক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যের সম্পর্ক কোথায? বিজ্ঞানের দরবাবে সংখ্যাধিক্যের অন্ধ-বিশ্বাসের দাম এক কানা কড়িও নয। হাজাব হাজার বছর ধরে সংখ্যাধিক্য মানুষ বিশ্বাস করতেন পৃথিবীকে ঘিরেই ঘুরে চলেছে সূর্য। "বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু বিশ্বাস করেন, অতএব এই তথ্য মিথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না"—এই কুযুক্তিকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেই প্রতিষ্ঠিত হযেছে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত—সূর্যকে ঘিবেই পৃথিবী ঘুরছে. সংখ্যাধিক্যের যুক্তিহীন বহু বিশ্বাসই এমনিভাবেই মিথ্যে প্রতিপন্ন হযেছে।

এমন উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে বহু, তার থেকেই একটিকে তুলে দিলাম মাত্র। আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ অবশ্যই—জ্যোতিষশাস্ত্র। অজ্ঞানতা ও যুক্তিহীনতার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা এই শাস্ত্রের শেষ স্থান আবর্জনার ডাস্টবিনে। সাধারণের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রে আঁধার নামতে বাধ্য। সাধারণের মধ্যে চেতনার উন্মেষের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ রাখা কখনই সম্ভব নয়, কারণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলেছে, চলবে।

যুক্তি চোদ্দ : রাশিচক্রের ব্যাপারটা যদি বিজ্ঞান না হয়, তবে রাশিচক্র দেখে জ্যোতিষীরা কি করে জাতকের জন্মমাস, জন্ম সময়, এমন কি জন্মসাল পর্যন্ত বলে দেন?

বিরুদ্ধ যুক্তি : রাশিচক্রে রবি কোন্ রাশিতে আছে দেখে জন্মমাস বলা যায়, যেহেতু কোন্ মাসে জন্ম হলে রবিকে কোন্ ঘরে বসান হবে, তা জ্যোতিষশাস্ত্রে আগেই নির্দেশ দেওয়া আছে।

দিন-রাতের চব্বিশ ঘন্টাকে বারোটি ভাগে ভাগ করে জ্যোতিষশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কোন্ সময়ে জন্ম হলে কোন্ ঘরে লগ্ন ধরা হবে। সুতরাং লগ্ন দেখে জন্ম সময় অনুমান করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

ধরুন আমরা একটি নতুন শাস্ত্র তৈরি করলাম, নাম দিলাম 'অ-জ্যোতিষশাস্ত্র'। তাতে জাতকদের জন্ম সময় অনুসারে তৈরি করা হলো 'রবিচক্র'। রবিচক্রে ঘর করা হলো বাহান্নটি। শাস্ত্রে নির্দেশ দিলাম-বছরের কোন্ সপ্তাহে জাতক জন্মালে রবিকে কোন্ ঘরে বসান হবে। তখন এই অ-জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ মেনেই একজন অজ্যোতিষী জাতকের সূর্যচক্রে সূর্য কোথায় অবস্থান করছে দেখে বলে দিতে সক্ষম হবে, জাতকের জন্ম কোন্ মাসের কোন্ সপ্তাহে। আর রবিচক্রে ৩৬৬টি ঘর রেখে লিপিয়ার ছাড়া ৩৬৫টি ঘর যদি ব্যবহার করি এবং বছরের কোন্ দিনটিতে জন্ম হলে সূর্যের অবস্থান কোন্ ঘরে থাকবে, অ-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তার নির্দেশ দেওয়া থাকলে, সেই সূত্রের সাহায্যেই বলে দেওয়া সম্ভব—জাতক কোন্ মাসের কোন্ তারিখে জন্মেছে।

একই পদ্ধতিতে অজ্যোতিষশাস্ত্র—লগ্ন কোন্ রাশিতে আছে দেখে অবশ্যই বলে দিতে পারবে ঠিক কতটা বেজে কত ঘন্টা, কত মিনিটে জাতক জন্মেছে। তার জন্য আমরা অজ্যোতিষশাস্ত্রে রাখব আলাদা একটা লগ্নচক্রের ব্যবস্থা। লগ্নচক্রে থাকবে ১৪৪০ ঘর। অর্থাৎ সারা দিন রাতকে প্রতিটি মিনিটে ভাগ করে ফেলব।

এইভাবে 'রবিচক্র' বা 'লগ্নচক্র' দেখে জাতক কোন্ দিন কতটা বেজে কত মিনিটে জন্মেছে বলে দেওয়া অবশ্যই সম্ভব হবে। কিন্তু বলতে পারাব জন্য কখনই 'অজ্যোতিষশাস্ত্র' বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াবে না।

যুক্তি পনের : জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র সূর্যকে গ্রহ আখ্যা দেওয়ায় অনেকে জ্যোতিষশাস্ত্রকে উপহাস করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের বক্তব্য, যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতাদের গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহের পার্থক্যের জ্ঞান ছিল না, তাই এই শাস্ত্র গুরুত্ব পেতে পাবে না।

এই সমস্ত তথাকথিত যুক্তিবাদী ও তার্কিকদের জানা প্রয়োজন, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাদেরই গ্রহ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যারা পৃথিবীর মানুষের শুভাশুভ কারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিযে থাকে। কে সূর্যকে আবর্তন করল বা কে গ্রহকে আবর্তন করল তা বিবেচ্য নয। বিবেচ্য কার প্রভাব রয়েছে মানুষের ওপর। আর যাদের প্রভাব আছে, তাদেরই গ্রহ নাম দেওয়া ত্রুটির পরিচয় নয।

এই যুক্তি জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তীসহ অন্তত ডজন-খানেক নামী জ্যোতিষীর। আর এই যুক্তিটা জ্যোতিষ-বিরোধীদের আক্রমণ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তারই প্রমাণ অন্তত একগণ্ডা 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের আলোচনাচক্রে জ্যোতিষরা এই বক্তব্য রেখে আক্রমণ চালিয়েছেন।

বিরুদ্ধ যুক্তি : আমার কাছে সম্প্রতি একটি যুবককে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর মা। যুবকটির বযস বছর পঁযতিরিশ। সুন্দর চেহারা, ফর্সা রঙ। যুবকটির মা'র ধারণা তাঁর ছেলেটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। আর, ছেলেটির ধারণা, সে অতি মাত্রায় সুস্থ। ছেলেটির নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায আমরা ধরে নিলাম ওর নাম অটল। অটল চাকরি করেন একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে। প্রাযই অফিসে যান না। না যাওযার কারণ, অটলের পিছনে সহকর্মীরা বড বেশি লাগেন। বলতে গেলে দস্তুর মত র‍্যাগিং করেন। র‍্যাগিংটা আজ পর্যন্ত শরীরীক পর্যাযে না গেলেও মানসিক অবশ্যই। অটলের কথায়, "ওইসব তথাকথিত শিক্ষিত সহকর্মীরা এক একটি অশিক্ষিতের ধাড়ি। 'যা উড়ে তাই পাখি', এই সত্যটা বুঝতে না পেরে আমাকে নিযে ঠাট্টা-ইযার্কি করে। আসলে ওদের জানা উচিত, শাস্ত্রে আছে পাখিরা আকাশে ওড়ে। শাস্ত্রে তাদেরই পাখি আখ্যা দেওয়া হযেছে, যা ওড়ে।"

অটলের মা বললেন, "ওই হযেছে অসুবিধে। ঘুড়িকে বলবে পাখি, মেঘকে বলবে পাখি, এরোপ্লেনকে বলবে পাখি। ওকে বোঝালেও বোঝে না। তাইতেই অনেকে এই নিযে ওর পেছনে লাগে।"

অটল রাগলেন। মা'কে বললেন, "তুমিও ওদের মতই বড় ফালতু বকো। কে কাগজের তৈরি, কে জলকণা দিযে তৈরি বা কে ধাতু দিযে তৈরি, তা শাস্ত্রের বিবেচ্য নয। বিবেচ্য, সেটা ওড়ে কি না? যদি ওড়ে, তবে অবশ্যই সেটা পাখি।"

জ্যোতিষীদের যুক্তির সঙ্গে অটলের যুক্তির যে দারুণ রকম মিল আছে, এটা নিশ্চযই পাঠক-পাঠিকবা লক্ষ্য করেছেন। অটলকে ঠিক করতে পেরেছিলাম। কারণ তিনি ছিলেন বাস্তবিকই মানসিক রোগী। কিন্তু জ্যোতিষীদের ঠিক করা বেজায মুশকিল। কারণ তারা সাজা মানসিক রোগী। এমন পাগলমার্কা যুক্তি না দিলে লোক ঠকিযে রোজগারের পথটাই যে বন্ধ হযে যাবে, এটা ওঁরা খুব ভালমতই বোঝেন।

জ্যোতিষীদের আর একটি দাবিও দারুণই মজার। তাঁদের মতে—"মানুষের ওপর যাদের প্রভাব আছে তারাই জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গ্রহ।" তর্ক না করে এই দাবি মেনে নিলেও একগাদা বিপদ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে জ্যোতিষশাস্ত্রের ঘাড়ের ওপর। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখতে পাচ্ছি ২৭টি নক্ষত্রের প্রভাবের কথাও আবার বলা হচ্ছে। প্রভাব বিস্তার করার কথা স্বীকার করেও এই ২৭টি নক্ষত্রকে গ্রহ বলা হচ্ছে না কেন? কেন এই স্ববিরোধীতা? কেন জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্বত্র এই ধরনের গোঁজামিল ও স্ববিরোধীতা?

জ্যোতিষীদের এই দাবিটির যুক্তিহীনতার কিন্তু এখানেই শেষ নয। জ্যোতিষীদের

মতে—"মানুষের ওপর যাদের প্রভাব আছে তাদের গ্রহ নাম দেওয়াটা কোনও ত্রুটির পরিচয় নয়।" তার মানে জ্যোতিষ মতে দূষিত বায়ু, দূষিত জল, বন্যা, খরা, নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি প্রকৃতির সব কিছুই গ্রহ— কারণ এ-সবেরই প্রভাব আছে মানুষের ওপর। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও আর্থসামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই তবে গ্রহ, যেহেতু মানুষের ওপর এদের প্রভাব বিদ্যমান। তার মানে ভাষা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, শিল্পকলা, চোরাচালান ইত্যাদি সব কিছুই গ্রহ? বাঃ, ভারি মজা তো? এযে দেখি নির্ভেজাল 'অটল কেস'।

যুক্তি বোল : আমরা পৃথিবীব ক'জন দেখেছি নিজের প্রপিতামহকে? দেখিনি। তবু আমরা প্রপিতামহের নামটি তো বলি। এ কি বিশ্বাসের উদাহরণ নয়? আমাদের পিতার নাম জিজ্ঞেস করলে মায়ের বিবাহিত স্বামীর নামই উল্লেখ করি। তিনিই যে আমাদের জন্মদাতা, তার প্রমাণ কী? এখানেও তো আমরা বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরি। আমরা বায়ু চোখে দেখি না, তাবের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ দেখতে পাই না, দেখতে পাই না শব্দতরঙ্গ, তবু এ-সবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমরা আকববকে দেখিনি, গৌতমবুদ্ধকে দেখিনি। কোনও চাক্ষুস প্রমাণ ছাড়া এমনই হাজারো বিষয়কে আমরা যখন মেনে নিচ্ছি শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কোন্ যুক্তিতে আমরা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরতার বিরোধীতা করে প্রমাণ হাজির করতে বলব?

বিরুদ্ধ যুক্তি : যুক্তিগুলো আপাত জোরাল মনে হলেও, বাস্তবিকপক্ষে এগুলো কোনও যুক্তি নয়। কেন নয়? এই প্রশ্নের আলোচনাতেই এবার ঢুকছি।

প্রাচীন যুগ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পন্ডিত মহল প্রত্যক্ষ প্রমাণকে শ্রেষ্ঠ বললেও প্রত্যক্ষ অনুগামী প্রমাণকে অবশ্যই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'চরক সংহিতা'য় প্রত্যক্ষ অনুগামী তিন প্রকারের অনুমানের কথা বলা হয়েছে (১) বর্তমান ধূম দেখে বর্তমান অগ্নির অনুমান। (২) বর্তমান গর্ভবতী মহিলা দেখে তার অতীত মৈথুনের অনুমান। (৩) বর্তমান সুপুষ্ট বীজ দেখে ভবিষ্যৎ বৃক্ষ ও ফলের অনুমান।

এক্ষেত্রে আমবা দেখতে পাচ্ছি আগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব ওপব ভিত্তি করেই বিভিন্ন অনুমানের কথা বলা হয়েছে; অনুমানগুলো বর্তমান দেখে বর্তমান, বর্তমান দেখে অতীত এবং বর্তমান দেখে ভবিষ্যৎ বিষয়ক। এই নিয়মে এখনও আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিযে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। আমার অস্তিত্ব থেকেই অনুমান করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে পারি, আমার প্রপিতামহের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। প্রপিতামহের অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্বই সম্ভব নয়. একই ভাবে পিতার অস্তিত্ব ছাড়া আমার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আমার জন্মদাতাই যে মায়ের স্বামী, এমনটা হতে পাবে, নাও হতে পারে। প্রতিটি মানুষেব ক্ষেত্রেই এই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু বর্তমান সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে আমরা সাধারণভাবে মা'য়ের বিবাহিত স্বামীকেই 'পিতা' বলে পরিচয় দিযে থাকি। এটা রীতির প্রশ্ন, প্রমাণের প্রশ্ন নয়।

আমরা বায়ুকে চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারি, ওজন নিতে পারি, বায়ুর শক্তিকে কাজে লাগিযে উইন্ড মিল চালাতে পারি। আবও বহু ভাবেই আমরা বায়ুর অস্তিত্বের

প্রমাণ পাই। আমরা জল, কয়লা, ডিজেল, ব্যাটারী, পরমাণু শক্তি ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর সেই বিদ্যুৎ তারের মাধ্যমে পাঠাবার সময় নিশ্চয় দেখা যায় না, কিন্তু বিদ্যুৎচালিত আলো বা যন্ত্র থেকেই অনুমান করতে পারি বিদ্যুৎশক্তির। আমরা কোনও বিদ্যুৎশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে কিন্তু একটি পাঁচ ওয়াটের বাল্বও জ্বালতে সক্ষম হবো না। এই বাল্বই জ্বলে প্রমাণ করে দেয় তারের মধ্য দিয়ে বাহিত বিদুৎশক্তিই তাকে জ্বলতে সাহায্য করছে। একইভাবে বিজ্ঞান শব্দতরঙ্গের অস্তিত্বও প্রমাণ করেছে। বুদ্ধের মূর্তি, শিলালিপি, আকবরের বিভিন্ন দলিলের বর্তমান অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করেই আমরা তাঁদের অতীত অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। কিন্তু এমন ধরনের কোনও প্রমাণই আমাদের সামনে জ্যোতিষীরা হাজির করতে পারেন নি, যার দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত এবং গ্রহ-নক্ষত্রই মানুষের ভাগ্যকে পূর্বনির্ধারিত করেছে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সাহায্যে সেই পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যকে জানা সম্ভব।

যুক্তি সাতের : কিছু নামী-দামী জ্যোতিষীরা বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করতে শুরু করছেন। তাঁরা কিছু জ্যোতিষ-সম্মেলনেও এই যুক্তিটির অবতারণা করেছেন। 'জ্যোতিষবিজ্ঞান-কথা' গ্রন্থেও যুক্তিটি জোরালভাবে রাখা হয়েছে। যুক্তিটি হলো এই—"আইনশাস্ত্রকে আমরা বিজ্ঞান না বললেও এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশেই স্বীকৃত।"..."জ্যোতিষীরাও তাঁদের শাস্ত্র সম্বন্ধে একই মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন, যদি বিচার ব্যবস্থা স্বীকৃতিলাভের যোগ্য হয়ে থাকে তবে তাঁদের জ্যোতিষশাস্ত্র স্বীকৃতি পাবে না কেন?"

বিরুদ্ধ যুক্তি : জ্যোতিষীরা এই যুক্তির অবতারণা করে কি তবে শেষ পর্যন্ত এ-কথাই স্বীকার করছেন না যে— আইনশাস্ত্র যেমন বিজ্ঞান নয়, জ্যোতিষশাস্ত্রও তেমনই বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করার চেষ্টাকে মুলতুবি রেখে, জ্যোতিষশাস্ত্র অ-বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেওয়ার পরই দাবি করা হয়েছে আইন বিজ্ঞান না হয়েও যদি স্বীকৃতি লাভ করে থাকে, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করা হবে না কেন?

"বিজ্ঞান নয় এমন অনেক কিছুই মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক। স্বীকৃতি পেয়েছে বুক্কার পোলভল্টের অসাধারণ প্রতিভা, মারাদোনার ফুটবল খেলার নৈপুণ্য, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা, মহম্মদ আলির বক্সিং প্রতিভা। এ-সবই বিজ্ঞান না হয়েও যদি স্বীকৃতি পেতে পারে, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কেন বিজ্ঞান না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না?" এ-এক বিচিত্র অভিযোগ। সব কিছুর স্বীকৃতিলাভের পেছনে কিছু নিয়ম-কানুন ও কিছু যুক্তি থাকে। একজন মানুষ গুণ্ডা বা মস্তান হিসেবে স্বীকৃতি পায় গুণ্ডামী বা মস্তানী করে। একজন সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে। একজন রাজনীতিক স্বীকৃতি পায় রাজনীতি করার মধ্য দিয়েই। একজন সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতির অধিকারী তখনই যখন সে সাহিত্য সৃষ্টি করে। একজন মানুষ ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে তখনই স্বীকৃতি পেতে পারে, যখন সে ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। ভবিষ্যৎবক্তা বা জ্যোতিষীদের স্বীকৃতির ওপরই নির্ভর করে রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র। জোতিষীদের ক্ষমতা প্রমাণিত হলে তাঁরা যে শাস্ত্রের

সাহায্যে গণনা করছেন, সেই শাস্ত্রও অবশ্যই স্বীকৃতিলাভ করবে। নতুবা জোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র পরধন-লুণ্ঠনকারী প্রতারকদের শাস্ত্র হিসেবেই স্বীকৃত হবে।

যুক্তি আঠারো : অজ্ঞতা ও অন্ধতা থেকে যারা জ্যোতিষশাস্ত্রের অযথা নিন্দা করার সাহস পায়, তাদের যদি রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকত তাহলে অন্যায় দোষারোপ করার আগে মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের কথা—"পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব নেই ? কতটুকু জানো ? জানাটা এতটুকু, না জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বই কি ?"

এক জ্যোতিষসম্রাটের লেখা একটি বহু বিজ্ঞাপিত বই থেকে এই অংশটা তুলে দিলাম।

বিরুদ্ধ যুক্তি : যুক্তিটা এই রকম—"যারা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিন্দা করে তারা না জেনেই করে, অজ্ঞতা থেকেই করে। আর, অজ্ঞতা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই যে সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ। না জানা বিষয়ে মুখ ঘুরিয়ে থাকাটা উচিত নয়। না জানা বিষয়কে অস্বীকার করা উচিত নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের অস্তিত্বকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়।"

এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে যে কোনও অস্তিত্বহীনের অস্তিত্বই কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব। যেমন ধরুন আমি যদি বলি যে, আকাশ থেকে মাঝে মাঝে এক ধরনের ডিম বৃষ্টি হয় কোথাও কোথাও। ডিমগুলো মাটিতে পড়ার আগেই সেগুলো ফুটে বের হয় চব্বিশ ক্যারেট সোনার দুশো গ্রাম ওজনের একটা করে জীবন্ত পাখির বাচ্চা। ওগুলো মাটিতে পড়ার আগেই উড়তে উড়তে চলে যায় কাছাকাছি কোনও সমুদ্রের দিকে। তারপর ওরা দল বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। আপনি কোনও ভাবেই আমার এই বক্তব্যের বিরোধীতা করতে পারছেন না। কারণ বিরোধীতা করতে গেলেই বলব, "পৃথিবীর কতটুকু আপনি জানেন ? এই ধরনের পাখির অস্তিত্ব বিষয়ে আপনার জানা নেই বলে এর অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।"

এখানে আমি আপনার কাছে যে যুক্তি হাজির করেছি তার মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক যুক্তি বা fallacy। আসুন আমরা একটু দেখি এই প্রতারণামূলক যুক্তির প্রতারণার অংশটুকু কোথায় লুকোন রয়েছে। বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত আসে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি অনুসন্ধানের পথ ধরে। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কখন শুরু করি ? যখন কোনও ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে আমরা কিছু অনুমান বা সন্দেহ করতে শুরু করি এবং অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্য থেকে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত খাড়া করি। পরিপূর্ণ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের আগের এই অনুমাননির্ভর পর্যায়কে ন্যায়শাস্ত্রে বলে প্রকল্প বা hypothesis। সোজা বাংলায় এ হলো—"কাকে আপনার কান নিয়ে গেল" শুনে সে কথায় বিশ্বাস করে কাকের পেছনে না ছুটে নিজের কানে আগে হাত বুলিয়ে দেখা—যেহেতু আপনার দুটি হাত আছে এবং সেই হাত দুটিকে ব্যবহার করার সুযোগ আপনার আছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র-বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান নয়, সত্য , না গাঁজা-গপ্পো ; সত্য হলে শতকরা কত ভাগ সত্য ; ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণায় লিপ্ত হওযার আগে আমরা logic বা ন্যায়শাস্ত্রের প্রকল্প অনুসারে জ্যোতিষীদের কিছু আগাম ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে দেখে নিলেই গোল মিটে যায়। ভবিষ্যদ্বাণী মিলিযে দেখার সুযোগও যখন আছে তখন সে সুযোগ গ্রহণ না করেই জ্যোতিষশাস্ত্রের যাথার্থতা নিয়ে কূট-কচকচানিতে নামা কানে হাত না দিয়েই কাকের পেছনে দৌড়নরই নামান্তর. অথবা বলতে পারা যায়, এটা হলো অন্ধকার একটা ঘরে একটা কালো বেড়ালকে খুঁজে বেড়ান, যেটা ঘরেই নেই।

আর বিজ্ঞানের কাছে সংখ্যাধিক্যের কোনও গুরুত্ব নেই, এ-নিয়ে আগেই বিস্তৃত আলোচনায় আমরা এসেছি।

যুক্তি উনিশ ঃ এই যে বেশ কিছু লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছেন, ঠিক তিনিই কি করে পাচ্ছেন ? এটা কী ভাগ্য নয় ? বিমান দুর্ঘটনা হচ্ছে, নৌকোডুবি হচ্ছে, আরো নানা বড় আকারের দুর্ঘটনায় এই যে অনেকে মরছে, অথচ তার মধ্যেই কেউ কেউ কি করে বাঁচছে ? এটা কী ভাগ্য নয় ? যুক্তিবাদীরা এই বিষয়ে কোনও যুক্তি হাজির করতে পারবেন কী ? (এই প্রশ্নটি আজ অনেক জ্যোতিষীদের কাছেই যুক্তিবাদীদের আঘাত হানার প্রশ্ন-বাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেক সাধারণ মানুষও এমন প্রশ্নে বিভ্রান্ত হন।)

বিবুদ্ধ যুক্তি ঃ এমন লটারি জেতা 'ভাগ্য' বা দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া 'ভাগ্য'-র সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের 'ভাগ্য'-র স্পষ্ট একটা পার্থক্য আছে। লটারি (তা সে পাড়ার ক্লাবের লটারিই হোক বা কোটি কোটি টাকা বাজেটের লটারিই হোক) হলেই তাতে একটা নম্বর প্রথম পুরস্কার দেবার জন্য তোলা হবেই। বহুর মধ্যে থেকে কয়েকটি নম্বর তুলে সেইসব নম্বরের টিকিক মালিকদের পুরস্কৃত করার ওপরই লটারি ব্যবসা দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম পুরস্কার এমনিই একটি তোলা নম্বর। এই তোলা টিকিটের একজন ক্রেতা থাকবেই। তাকেই দেওয়া হবে প্রথম পুরস্কারটি। এটি একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বেড়িয়ে আসা ঘটনা মাত্র। অর্থাৎ, মোদ্দা কথায় স্রেফ, একটি ঘটনা মাত্র। এর বেশি কিছুই নয়। যত বেশি বেশি করে নতুন নতুন লটারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠবে ততই বেশি বেশি করে মানুষ এই সব লটারির পুরস্কারও পেতে থাকবে। জ্যোতিষীদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—ততই বেশি বেশি করে মানুষ এমন লটারি বিজেতার 'ভাগ্য' অর্জন করবে। লটারি ব্যবসা, ঘোড়-দৌড় ইত্যাদি জুয়া যত দিন থাকবে, ততদিন বিজেতাও থাকবেই। আইনের খোঁচায় লটারি ব্যবসা বন্ধ হলেই লটারি পাওয়া ভাগ্যবান সৃষ্টির ক্ষমতাও গ্রহ-নক্ষত্র বা ঈশ্বরদের লুপ্ত হয়ে যাবে। আইনের কাছে ওইসব 'ভাগ্য নিয়ন্ত্রা'দের ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ।

বিমান অ্যাকসিডেন্ট বা যে কোনও অ্যাকসিডেন্টের পেছনেই থাকে অবশ্যই কিছু কারণ। বিমান তৈরির কারিগরিগত ত্রুটি বা ওই মডেলের বিমান চালনার বিষয়ে চালকের ট্রেনিংগত ত্রুটি, অথবা অন্তর্ঘাত, কিংবা দুর্যোগ, অথবা বিমান আকাশে ওড়ার আগে পরীক্ষাগত ত্রুটি ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণ দূর্ঘটনার জন্য দায়ি হতেই পারে। দূর্ঘটনা হলে সকলেই মারা যাবে, এমনটা সবক্ষেত্রেই ঘটবে ভাবার মত কোনও কারণ নেই। এ-ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ব্যাপকতার অবশ্যই একটি ভূমিকা রয়েছে। বিমান বিস্ফোরণে আকাশেই টুকরো টুকরো

হয়ে ছড়িয়ে পড়লে একটি যাত্রীকেও বাঁচাবার ক্ষমতা কোনও গ্রহ-নক্ষত্রের হবে না। দুর্ঘটনায় বিমানের কোনও একটি বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে অংশের যাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার এমন কি মৃত্যু হবার সম্ভাবনাও বাড়বে। বিমানেব কোনও অংশ কম ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা অক্ষত থাকলে, সেই অঞ্চলের যাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও কম থাকবে। এরই পাশাপাশি দুর্ঘটনার মুহূর্তে যাত্রীর কোমবে বেল্ট বাঁধা ছিল কি না, যাত্রীর থেকে বাইরে বেববাব দরজা কতটা দূবে ছিল, যাত্রী সেই সময় কোথায় কি ভাবে অবস্থান করছিল, এবং আরও বহুতর কারণই যাত্রীর মৃত্যু হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবে থাকে। এবং এগুলোও নেহাৎই ঘটনা বই কিছুই নয়।

নৌকোডুবি হচ্ছে; মানুষ মরছে। নৌকাডুবির পেছনে ঝড় বা জলোচ্ছ্বাস যেমন বহুক্ষেত্রেই একটি কারণ, তেমনই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাব বেশি যাত্রী-বহনই প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত আমাদের দেশে। প্রশাসনের গাফিলতি, অপ্রতুল পরিবহণ 'ব্যবস্থাব জন্য যাত্রীরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েই নৌকোয উঠতে বাধ্য হন। অনেক সময়ই নির্ধাবিত যাত্রীর দেড়-দু'গুণ যাত্রী ওই সব নৌকো বহন কবে। ফলে দুর্ঘটনাও ঘটে। কেউ বাঁচেন, অনেকেই মারা যান। কিন্তু এই পরিবহণগত সমস্যা মেটাবাব ব্যবস্থা যদি প্রসাশন কবে এবং শক্ত হাতে যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে নৌকোগুলোকে আইন মানতে বাধ্য কবে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশি যাত্রীবহনেব জন্য নৌকোডুবিতে মারা যাওয়া ও বেঁচে যাওযা মানুষগুলোব 'ভাগ্য' পাল্টে যেতে বাধ্য। তখন ওই গ্রহ-নক্ষত্রদেব কেন, তাদেব বাপ-ঠাকুরদাদেরও সাধ্য হবে না, নৌকাডুবিজনিত বাঁচা-মরা নিযন্ত্রণ করা— কারণ নৌকেই তো তখন ডুববে না।

কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের 'ভাগ্য' অবশ্যই অন্য কিছু। সে ভাগ্য হঠাৎ লটারি পাওযা বা দুর্ঘটনায় পড়ে বেঁচে থাকা বা মবে যাওয়ার একটি ঘটনা মাত্র নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রেব 'ভাগ্য'—মানুষেব পূর্বনির্ধারিত জীবন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলো নিযে আলোচনা করলাম। এব বাইবেও কিছু কিছু থেকে গেছে, যেগুলো গুরুত্বহীন ও অত্যন্ত জোলো অথবা এখনও আমি সেইসব যুক্তিগুলো শুনিনি, তাই আলোচনায় আসেনি। এই আক্রমণের পব জ্যোতিষীবা নিশ্চযই নিষ্ক্রিয হয়ে থাকবে না। চেষ্টা কববে আবাবও নতুন কোনও প্রতারণামূলক যুক্তি খুঁজে বের করতে। তেমন কোনও যুক্তি হাজিব হলে বিরুদ্ধ যুক্তি অবশ্যই হাজির কবব, অঙ্গীকারবদ্ধ রইলাম। এই লেখার বাইরে জ্যোতিষীদের হাজির করা কোনও বিরুদ্ধ-যুক্তি আপনাবা জানতে চাইলে নিশ্চযই দেব। শুধু অনুরোধ, চিঠি জবাবী খাম সহ পাঠাবেন।

আট

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের যুক্তি

এক : জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিষীদের মধ্যেই রয়েছে চূড়ান্ত স্ববিরোধীতা। জ্যোতিষশাস্ত্রেব বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আক্রমণ হেনেছে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতিষীবা, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদীবা নয়।

জ্যোতিষীরা মানুষের ভাগ্য গণনা কবেন প্রধানত দু'ভাবে, জাতকের জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসাবে তৈরি রাশিচক্রের সাহায্যে অথবা হাতেব রেখা দেখে। এ-ছাড়াও কপাল, কান ইত্যাদি দেখেও কেউ কেউ মানুষেব ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পাবেন বলে দাবি কবে থাকেন।

কোন্ ভিত্তিভূমির ওপর নির্ভর করে একজন জ্যোতিষী একজন মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে পাবেন? এ-সবেব হদিশ কী যুক্তিতে দেওয়া সম্ভব? নাকি পুরো ব্যাপাবটাই একজন মানুষের চেহারা, চোখ-মুখ, পোশাকআশাক, কথাবার্তা ইত্যাদি বিচার কবে আন্দাজে ঢিল ছোড়া?

এ-ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিষীদেব স্পষ্ট উত্তর—প্রতিটি মানুষেবই ভূত-ভবিষ্যতের হদিশ জানা প্রকৃত জ্যোতিষীদের কাছে নেহাতই জল-ভাত, কারণ মানুষেব ভাগ্য পূর্ব-নির্ধাবিত। অর্থাৎ মানুষের জীবনেব প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে অতিবাহিত হবে, সবই আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। এই ঠিক হয়ে থাকাটা অলঙ্ঘ্য, অপবিবর্তনীয়, পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। এই যে আজ এই মুহূর্তে আপনি আমাব লেখার এই অংশটি পড়বেন, এও আগে থেকেই নির্ধাবিত হয়ে রয়েছে। জ্যোতিষীরা গণনা কবে সেই নির্ধারিত ভাগ্যকে জানতে পারেন।

এই জ্যোতিষীরাই আবার ভাগ্য পবিবর্তনের জন্য গ্রহরত্ন, গাছেব শেকড়, ধাতু, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি ধাবণের ব্যবস্থাপত্র দেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও রয়েছে গ্রহকে তুষ্ট করার নানা ব্যবস্থাপত্র।

জ্যোতিষীরা আবাব প্রয়োজনমাফিক শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে গণনা না মেলার জন্য 'পুরুষকার' অর্থাৎ মানুষের উদ্যোগকেও টেনে আনেন।

এরপর জ্যোতিষী ও জ্যোতিষশাস্ত্রকারদের কাছে যে প্রশ্নটা স্বভাবতই চলে আসে তা

হলো—রত্ন, শেকড়, ধাতু, তাবিজ-কবজ অথবা পুরুষকার দ্বারা যে ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব সেই ভাগ্যকে পূর্বনির্ধারিত বলেন কী যুক্তিতে? ভাগ্যের যদি পরিবর্তনই করা যায় (তা সে যেভাবেই হোক না কেন) তবে ভাগ্যকে 'অপরিবর্তনীয়' বা 'পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে' বলাটা হয়ে পড়ে চূড়ান্ত মূর্খতা নতুবা চূড়ান্ত বদ্‌মাইসি। এমন স্ববিরোধীতার উদগাতা জ্যোতিষীরা কিন্তু তাঁদের নিজেদের তত্ত্বে সামান্যতম আস্থা রাখেন না, তা তাঁদের জীবনচর্যাতেই প্রকট। জ্যোতিষীরা খদ্দের ধরতে বিজ্ঞাপন দেন কেন? ভাগ্যে যা হবার তা যখন হবেই, অপ্রতিবোধ্য, তখন বিজ্ঞাপনে কী একটিও বাড়তি খদ্দের আসতে পারে? গ্রহরত্ন-ব্যবসায়ী ও তথাকথিত জ্যোতিষগবেষণা-কেন্দ্রগুলো মাঝে-মধ্যে যখন তাঁদের দোকানের জন্য জ্যোতিষী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন, তখন তাঁদের বজ্জাতি দেখে তাজ্জব বনে যাই। ওঁরা নিজেরাই "ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত" কথাটায় আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাই "দোকানে বসাতে জ্যোতিষী যখন পাবার তখন ঠিকই পেয়ে যাব" এই ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে জ্যোতিষী খুঁজতে সচেষ্ট হন। আর লোকের কাছে গ্রহরত্ন বেচার তাগিদে নিখুঁত ভাগ্য-গণনার (অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন দেন।

বিষয়টা আরও একটু বিস্তৃতভাবে বোঝাতে আমরা একটা দৃষ্টান্তই টেনে আনছি। ধরা যাক রামবাবুর ভাগ্যে পূর্বনির্ধাবিত হয়ে রয়েছে তিনি একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেবে ফেলবেন। ফলে কারাবাস কবতে হবে। ধরে নিলাম রামবাবুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সাজান সংসাব। বড় কোম্পানীব একজিকিউটিভ। গাড়ি আছে, গাড়ি মোটামুটি চালাতেও পাবেন, কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। অবশ্য ড্রাইভাবের কল্যাণে লাইসেন্সের অভাব বোধ কবেন না। একদিন ড্রাইভার আসবে না। জরুরি প্রয়োজনে গাড়ি বের করতে বাধ্য হবেন। আব সেই দিনটিতেই ঘটবে দুর্ঘটনা। ফলে কারাবাস। জ্যোতিষী ভাগ্য গণনা কবে কাবাবাসেব কথা জানাতেই রামবাবু এর থেকে বাঁচার একটা উপায় করে দিতে বললেন। জ্যোতিষী মুস্কিল আসানেব ব্যবস্থা কবে দিলেন গ্রহরত্ন, মেটাল-ট্যাবলেট বা যাগ-যজ্ঞ কবে, যেভাবেই হোক। দেখা গেল বামবাবু নির্দিষ্ট দিনে দুর্ঘটনা ঘটালেন না। অতএব তাঁকে জেলে যেতে হলো না। ব্যাপাবটা কিন্তু এত সহজে এখানেই শেষ হলো না। রামবাবু জেলে না যাওযায রামবাবুব জাযগায যাঁর প্রমোশন পাওযাব কথা তাঁর প্রমোশন হলো না। তাঁর ক্ষমতা হ্রাস হযেই বইল। তাঁর পরিবাবের ওপরও এর প্রভাব পড়ল, পরিবর্তিত হলো তাঁদের পূর্ব নির্ধাবিত ভাগ্য। রামবাবুর পক্ষে যে উকিলবাবুর কোর্টে দাঁড়াবার কথা ছিল, তাঁকে দাঁড়াতে হলো না। রামবাবুর বিরোধী উকিলবাবুকে সংশ্লিষ্ট থানার বড়বাবুকে কোর্টে হাজিব হতে হলো না—ভাগ্যে পূর্ব নির্ধারিত থাকা সত্বেও। বিচারকের পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য গেল পাল্টে। একটি রায কম দিলেন তিনি। কোর্টেব কেরানীবাবু থেকে কালো ভ্যানের ড্রাইভার পর্যন্ত সবাবই পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য গেল পাল্টে, এক জ্যোতিষীর একটি মাত্র ব্যবস্থাপত্রে। জেলার সাহেবেব কাজ কমল। জেলের খাবার কোটা কমল। জেল কর্মচারীদের কাজ কমল। কযেদীরা রামবাবুব বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হলো।

এদিকে আর এক গণ্ডগোল। নির্ধারিত ছিল রামবাবুব স্ত্রী সীতাদেবী তীব্র অর্থকষ্টে জর্জবিত হযে বাড়িব আসবাবপত্র ও গাড়ি বিক্রি করে দেবেন। কাটা পড়বে ফোনের লাইন। অর্থকষ্ট এলো না। সীতাদেবী কিছুই বিক্রি কবলেন না। ফলে যাদের ওইসব আসবাবপত্র ও গাড়ি

কেনার কথা ছিল তাদের কোনও কিছুই কেনা হলো না। ফোনের লাইন থেকে যাওয়ায় যাদের ফোনে কথা বলার কথা নয়, তারাও কথা বলতে লাগল। সীতাদেবীর দুই ছেলে লব ও কুশ, এক মেয়ে প্রতিমা. দুই ছেলে ও মেয়ের ভাগ্যে নেমে আসার কথা ছিল অন্ধকার কালো দিন। কিন্তু এলো না। প্রতিমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল শ্যামনগরের একটা পান-বিড়ির দোকানের মালিক হরিপদ মণ্ডলের সঙ্গে। কিন্তু বাবার ভাগ্য পাল্টানয় প্রতিমার বিয়ে হলো এক এম. টেক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কিন্তু হরিপদ মণ্ডলের কি হবে? ওর কী বিয়েই হবে না? হরিপদ মণ্ডলের যে তিনটি ছেলে ও চারটি মেয়ের জন্ম হওয়ার কথা ছিল প্রতিমার গর্ভে, সেই ছেলে মেয়েগুলো তো জন্মাতেই পারবে না। প্রতিমার বর্তমান ছেলে রাজা, রাজার হালেই চলে। কিন্তু প্রতিমার পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যে ছিল ওর ছেলে-মেয়েদের জীবন কাটবে ভিখারীর মত।

লব-কুশের একই ভাবে যা যা হওয়া একেবারেই নির্ধারিত ছিল, তার কোনটাই ঘটল না, বাবার এক আংটি পরার চোটে। লবের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল বনগাঁর রঘু ময়রার মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে, বিয়ে হলো সাংবাদিক সুজাতা শান্তারামের সঙ্গে। কুশের ভাগ্য পাল্টে যাওয়ার ইতিহাসও এমনটাই।

যে সীতা অতি-সচ্ছল অবস্থা থেকে দারিদ্র্যের অন্ধকারে পতিত হয়ে প্রতিটি দিন নিজের সঙ্গে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে লড়াইয়ের হাত থেকে বাঁচবে—এমনটাই নির্ধারিত ছিল, সেই সীতা এখন সুখী স্ত্রী, সুখী জননী। যাঁর ভাগ্যে ছিল পরের বাড়ি রান্না করে চার জনের পেট চালাবার সংস্থান করা, তিনি বাবুর্চিকে রান্নার ফরমাস দেন। জানি না রবিন বাঁড়ুয্যের সংসারে সীতাদেবী রান্নার দায়িত্ব না নেওয়ায় ওদের খাওয়া-দাওয়া চলছে কিভাবে। অথবা ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য কেউ রবিন বাড়ুয্যের পরিবারের হাঁড়ি ঠেলছেন কিনা?

সীতাদেবী আছেন 'মাঙ্গলিক' নামের একটি সমাজসেবী সংস্থার কাজে মেতে। নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ানই এখন সীতাদেবীর কাজ। শয়ে শয়ে নির্যাতিত নারীর জীবনের একেবারে ঠিক হয়ে থাকা কত ঘটনা পাল্টে গেছে সীতাদেবীর ভাগ্য পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে। সেই নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু জীবনের পূর্বনির্ধারিত ঘটনাগুলোও একই সঙ্গে কেমনভাবে পাল্টে যাচ্ছে, একবার ভাবুন তো! আবার তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো বহুগুণ মানুষের জীবনের পূর্বনির্ধারিত ঘটনাগুলোও এর ফলে পাল্টে যাচ্ছে। তাদের পাল্টানোর সূত্র ধরে আরো বহুগুণ মানুষের জীবনের পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাই পাল্টে যাচ্ছে। এমন ভাগ্য পাল্টানর খেলা চলতেই থাকবে।

এবার একটু তাকান যাক যার গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাওয়ার কথা সেই মানুষটির দিকে। ধরে নিলাম তার নাম শ্যামবাবু। শ্যামবাবুর ভাগ্যে ছিল গাড়ি চাপা পড়বেন। পড়লেন না। আহত শ্যামবাবুকে নিয়ে যে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল, তিনি হাসপাতালে গেলেন না। শ্যামবাবুর জন্য ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য হাসপাতালকর্মীদের যে বাড়তি খাটুনি ছিল তা. খাটতে হলো না। যেখান থেকে রক্ত ও যে দোকান থেকে ওষুধ কেনা আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল, সে সবই অ্যাক্সিডেন্ট না ঘটায় বেঠিক হয়ে গেল। শ্মশানের ডোমকে পোড়াতে হলো একটি কম মড়া। শ্যামবাবুর পরিবারের ওপরে যে বিপর্যয় নেমে

আসার কথা ছিল, তা নেমে এলো না। শ্যামবাবুর ছেলে হরির ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে ছিল পেট চালাতে সমাজবিরোধী হবে। প্রথমে ছোট মস্তান, তারপর বড় মস্তান, তারপর জমি-বাড়ি বিক্রির দালাল, তারপর প্রমোটার। বেচারা তেমন কিছুই হলো না। ফলে হরির কাছ থেকে যে-সব রাজনৈতিক নেতার দু-পয়সা কামাবার কথা ছিল, যে কর্পোরেশন-কর্মী ও কোতোয়ালদের পকেট ভারি হওয়ার কথা ছিল সেইসব পূর্বনির্ধারিত ঘটনাগুলো আগাগোড়া পাল্টে গেল। হরির ফ্ল্যাট যাদের কেনার কথা ছিল তাদের কেনা হলো না। হরির ফ্ল্যাটবাড়ি ধ্বসে যাদের চাপা পড়ার কথা, তারা চাপা পড়ল না। হরির বোন লক্ষ্মীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল হরির বিজনেস পার্টনার ধনপতির সঙ্গে। সেই সুবাদে লক্ষ্মীর হওয়ার কথা ছিল সিনেমার প্রডিউসার। কিন্তু শ্যামবাবু গাড়ি চাপা না পড়ায় হরির মস্তান হওয়া হলো না। লক্ষ্মী হলো যদু কেরানীর বউ।

এত গেল সংক্ষেপে রামবাবু ও শ্যামবাবুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুজনের মধ্যে থেকে মাত্র গুটি-কয়েকের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য পাল্টে যাওয়ার কাহিনী। রামবাবু ছাড়া এরা কেউই কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কোনও কিছু ধারণ করেনি। তবু এদের সকলের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য পাল্টে গেল রামবাবুর রত্ন, শেকড় বা তাবিজ ধারণের অপার মহিমায়। জ্যোতিষীরা প্রতিটি খদ্দেরকেই গ্রহকোপ থেকে উদ্ধার করার নামে গছিয়ে থাকেন গ্রহরত্ন, মেটাল-ট্যাবলেট, তাবিজ-কবজ, শেকড়-বাকড় ইত্যাদি কত কী। একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব এদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই এইসব ধারণ করে রয়েছেন আঙুলে, বাহুতে, গলায় বা কোমরে। ফলে বিপুলভাবে মানুষের ভাগ্য প্রতিনিয়ত যেভাবে ওলট-পালট হয়েই চলেছে তারপরেও কী বলা চলে ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত? আর ওই ভাগ্যই যদি পূর্বনির্ধারিত না হয়, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য গণনার প্রশ্নই ওঠে না, জ্যোতিষশাস্ত্রের অস্তিত্বই হয়ে পড়ে বিপন্ন। এই বিপন্নতার এক আর একমাত্র কারণ অতি স্পষ্টতই জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিষীদের স্ববিরোধীতা। একই সঙ্গে "ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত" এবং "রত্ন ইত্যাদি ধারণ করে সৌভাগ্যকে অর্জন করা যায়" বলে দাবি করা স্ব-বরোধীতা।

দুই : রাশিচক্র তৈরির ক্ষেত্রে ভূকেন্দ্রীক মতবাদকেই ভিত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র না ধরে পৃথিবীকে কেন্দ্র ধরে গণনা। অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যসহ ভাগ্যনিয়ন্ত্রক গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রগুলো ঘুরছে ধরে নিয়ে গণনা।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছি। ভূকেন্দ্রীক মতবাদকে বিজ্ঞানবিরোধী বলে, ভ্রান্ত বলে বাতিল করেছি। ভ্রান্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতবাদ সম্পূর্ণভাবেই ভ্রান্ত হতেই বাধ্য। অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের রাশিচক্রের গণনাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

তিন : জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে নক্ষত্রগুলো স্থির, অনড়। নক্ষত্রগুলো স্থির, এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে রাশিচক্রের গণনা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউই স্থির নয়। গ্যালাক্সিগুলোও অবিরত ছুটছে। অর্থাৎ নক্ষত্রদের স্থির বলে যে বিশ্বাস জ্যোতিষীদের মধ্যে রয়েছে, সে-বিশ্বাস

চূড়ান্তভাবেই ভুল। এই ভুল মতবাদকে গ্রহণ করে গড়ে ওঠা গণনাও তাই পুরোপুরি ভুল।

চার : ফলিত জ্যোতিষের মতে ভাগ্যনিযন্ত্রক গ্রহগুলো হলো (১) বুধ, (২) শুক্র, (৩) মঙ্গল, (৪) বৃহস্পতি, (৫) শনি, (৬) রবি, (৭) চন্দ্র, (৮) রাহু, (৯) কেতু।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে ন'টির মধ্যে প্রথম পাঁচটি মাত্র গ্রহ। রবি নক্ষত্র। চন্দ্র উপগ্রহ। রাহু ও কেতুর কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত যে-সব গ্রহ আবিষ্কার করেছে—(১) বুধ, (২) শুক্র, (৩) মঙ্গল, (৪) বৃহস্পতি, (৫) শনি, (৬) ইউরেনাস, (৭) নেপচুন, (৮) প্লুটো। এ-ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণিত গণনায় ধরা পড়েছে আরও দুটি গ্রহের অস্তিত্ব, যাদের নাম রাখা হয়েছে এক্স-ওয়ান, এক্স-টু। এছাড়াও পৃথিবী তো আছেই। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউবেনাস, নেপচুন গ্রহগুলোর রয়েছে একাধিক থেকে বহু উপগ্রহ।

যদি ধরেই নিই মানুষের ভাগ্য গ্রহ-নক্ষত্রদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে একই যুক্তির সূত্র ধরে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য—মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি, এই পাঁচটি গ্রহ এবং পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রেব প্রবল ভূমিকা থাকলে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো এবং বিভিন্ন গ্রহগুলোর বিশাল সংখ্যক উপগ্রহের মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা থাকবে না কেন ? জ্যোর্তিবিজ্ঞান আরো গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কার করলে সেগুলোরও একই যুক্তিতে ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকা অবশ্যই উচিত। মানুষের ওপর শুধুমাত্র ২৭টি নক্ষত্র প্রভাব ফেলবে কেন ? অন্য কোটি কোটি নক্ষত্র কেন প্রভাব ফেলবে না ? সেই সব কোটি কোটি নক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয করতে না পারলে জ্যোতিষশাস্ত্র ভাগ্য-বিচার নির্ণযে বিশুদ্ধতা রক্ষা করবে কি করে ?

যেসব গ্রহ-উপগ্রহগুলোর অস্তিত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞাত ছিল, শুধুমাত্র তাদের ভূমিকাই ফলিত-জ্যোতিষীরা গণনা করেছেন। এখন যে সব গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রের খবর আমরা নতুন করে জেনেছি, তাদের ভূমিকা বিষযে জ্যোতিষীরা নীরব। তাঁদের এই নীরবতা একান্ত বাধ্য হযেই, নব-আবিষ্কৃত গ্রহ-উপগ্রহগুলোর ভাগ্য নিযন্ত্রণে সামান্য ভূমিকার কথা স্বীকার কবলে এতদিনকার জ্যোতিষশাস্ত্রকেই পুবোপুরি অস্বীকার করতে হয। কারণ, এতদিনকার গণনার বাইরের কোনও একটি গ্রহ বা উপগ্রহের প্রভাবের দরুণ পূর্ব গণনার সামান্যতম পরিবর্তনের অর্থ—এতদিনকার গণনায় যাকে পূর্বনির্ধারিত বলা হচ্ছিল আদৌ তা পূর্বনির্ধারিত ছিল না।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক—প্রচলিত ফলিত জ্যোতিষ গণনায় দেখা গেল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে চিত্রার বিযে হবে ছাব্বিশ বছর বয়সে এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালকের সঙ্গে। দুটি ছেলে ও একটি মেযে হবে যথাক্রমে বিযের তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম বর্ষে। বড় ছেলে হবে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক, মেজ ছেলে চিত্র পরিচালক হিসেবে পৃথিবী কাঁপাবে। মেযে চলচ্চিত্রের নাযিকা হিসেবে দীর্ঘ বছব এক নম্বর আসনটি নিজেব দখলে রাখবে।

কিন্তু ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও বিভিন্ন উপগ্রহের প্রভাব বিচার কবে দেখা গেল চিত্রা বিযেব এক বছরের মধ্যেই বিধবা হবে। এবং আমরণ বৈধব্যজীবন কাটাবে।

ফলে চিত্রার স্বামী জীবিত থাকলে লক্ষ-কোটি দর্শক যে সব ছবি দেখে আনন্দ পাবে বলে গণনা করা হয়েছিল, কযেক হাজার চলচ্চিত্রকর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিত্রার স্বামীব কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করবেন বলে জ্যোতিষীরা বিচার করেছিলেন, চিত্রার স্বামীর গণনা বহির্ভূত মৃত্যু লক্ষ-কোটি দর্শক ও হাজার হাজার চলচ্চিত্রকর্মীদের গণনা করা ভাগ্যই দিল পাল্টে। অর্থাৎ জ্যোতিষীরা আগে যা যা গণনা করেছিলেন সবই আগা-পাশতালা গেল পাল্টে। ফলে দেখা গেল তিনটি নতুন গ্রহের আবিষ্কার এতদিনকার প্রাচীন পুরো জ্যোতিষশাস্ত্রেব গণনাকে অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রকেই দিল বাতিল করে।

আগেকাব দেওয়া যুক্তির আলোয় আমাদের কাছে স্পষ্ট—একটি পূর্বনির্ধারিত বলে ঘোষিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলে কীভাবে পৃথিবী জুড়ে বহু কোটি মানুষের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যই যায় পাল্টে। মানুষের ভাগ্য গণনাকারী শাস্ত্রে একটি গ্রহ বা উপগ্রহের প্রভাব বিচার না করার অর্থ প্রতিটি মানুষের ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রেই ভুল করা. মানবজীবনে উপগ্রহ, গ্রহ বা নক্ষত্রের প্রভাব যদি স্বীকার করে নিই তবু জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হযে উঠতে হলে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব গণনা করা একান্তই প্রযোজনীয। কিছু কিছু গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রের প্রভাব ধবে কিছু কিছু গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব বাদ দিযে গণনা করলে সে গণনা ভুল হতে বাধ্য, অবিজ্ঞানসম্মত হতে বাধ্য।

পাঁচ : পাশ্চাত্য মতের জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনায ইউবেনাস, নেপচুন, প্লুটোকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে কী পাশ্চাত্য মতের জ্যোতিষ-বিচারকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করব ?

জ্যোতিষীদের মতে প্রাচীনকালের জ্যোতিষীবা, ঋষিবা মানুষের উপর গ্রহের প্রভাব বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন দীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিযে। এই পর্যবেক্ষণ একটি মানুষেব জীবনকালেব মধ্যে আদৌ সম্ভব ছিল না। কারণ গ্রহেব কম কবেও দশটি আবর্তন পর্যবেক্ষণ করার পবই মানুষের ওপব সেই গ্রহটির প্রভাব বিষযে কোনও সিদ্ধান্তে বা মতবাদে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

কম করে দশটি আবর্তন দেখার প্রযোজনের যে কথাগুলো লিখেছি সেগুলো আদৌ আমাব নয়, প্রখ্যাত প্রখ্যাত নামী-দামী জ্যোতিষীদেরই কথা।

উদাহরণ হিসেবে ধবা যাক মানুষেব ভাগ্যের ওপর শনির প্রভাব পর্যবেক্ষণেব কথা। শনি প্রতি বাশিতে অবস্থান করে আড়াই বছরের মত। শনির বাবোটি রাশি ঘুরে আসতে লাগে প্রায তিরিশ বছর। কম করে দশটি আবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রযোজন তিনশো বছর।

ঠিক এমনি কবে মাত্র দশটি আবর্তনের উপর নির্ভর কবে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোব বিষযে পর্যবেক্ষণ করতে সময লাগবে যথাক্রমে আটশো চল্লিশ, এক হাজার ছ'শো চল্লিশ ও দু'হাজাব ছ'শো আশি বছর। অথচ গ্রহগুলি আবিষ্কৃত হযেছে যথাক্রমে ১৭৮১, ১৮৪৬ এবং ১৯৩০ সালে।

সুতরাং এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায—এই তিনটি গ্রহ মানুষের ভাগ্যের ওপর কিভাবে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে কোনও কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোবাব মত ন্যূনতম

পর্যবেক্ষণের সময়ও মানুষ পায়নি। অতএব এই পর্যবেক্ষণহীন গণনা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

প্রাচ্যের কিছু জ্যোতিষীও অবশ্য নেপচুনকে বরুণ এবং প্লুটোকে রুদ্র বলে রাশিচক্রে হাজির করছেন, গণনা করছেন। এ সবই তো নেহাৎই গ্রাহকদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা মাত্র। গ্রহগুলো আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাব হিসেবে 'হিল্লি-বিল্লি' যা হোক কিছু লিখে বসিয়ে দিয়েছে।

ছয় : জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ভাগ্য নিয়ন্তা গ্রহগুলো জীবন্ত। তাদের জীবিত কল্পনা করে গড়ে উঠেছে নানা কাহিনী। সে-সব কাহিনী নিয়ে গোড়াতেই আমরা আলোচনা সেরে নিয়েছি।

বাস্তবে গ্রহগুলো জীব নয় জড়। অজ্ঞতা থেকে কল্পনা থেকে জড়কে জীব বলে কল্পনা করার ফলেই আকাশের শুক্রগ্রহ দৈত্যাচার্য শুক্রাচার্য, জন্মদায়ক শুক্র, রতিবিষয়ক, প্রণয়বিষয়ক, ভোগবিষয়ক ব্যাপার-স্যাপারের প্রতীক বলে গৃহীত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে শুক্র যেহেতু কানা, তাই লগ্ন বা রাশি থেকে দ্বিতীয় ঘরে রবি ও শুক্র একসঙ্গে থাকলে জাতক কানা হয় বলে জ্যোতিষীদের বিশ্বাস। রবি হলো আলোর কারক, দৃষ্টিশক্তির কারক। লগ্ন বা রাশি থেকে দ্বিতীয় ঘরটি জাতকের চোখও বোঝায়।

পৌরাণিক কাহিনীর উপর নির্ভর করে এমনিভাবেই বহু বিচার সমাধা করে থাকেন জ্যোতিষীরা। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীগুলো যেহেতু কল্প-কাহিনী মাত্র, গ্রহ-উপগ্রহগুলো কেবলমাত্র গ্রহ-উপগ্রহই তাই কল্পকাহিনীর ওপর নির্ভর করে গ্রহ অবস্থানের থেকে ভাগ্যের হদিশ পাওয়ার চিন্তা চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

সাত : জ্যোতিষীদের মতে জাতকের জন্ম মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক কোথায় তার ওপরই নির্ধারিত হয়ে যায় জাতকের অদৃষ্ট। কীভাবে হয়? এই বিষয়ে জ্যোতিষীদের বক্তব্য অতি স্পষ্ট। প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে এক একটি বিশেষ ধরনের বিকিরণ ও কম্পন প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে। এই বিকিরণ ও কম্পনই প্রতিটি মানুষের জন্মকালে যেভাবে এসে পড়ে সেভাবেই নির্ধারিত হয়ে যায় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

এই বক্তব্যের মধ্যেও রয়ে গেছে বিশাল এক গোলমাল। জ্যোতিষীদের বক্তব্য অনুসারে জন্ম মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় জরুরি। কেন জরুরি? জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের বিকিরণ ও কম্পনই যেহেতু মানুষের অদৃষ্ট নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

আমরা জানি যে কোনও গ্রহ-নক্ষত্রের আলো, কম্পন বা বিকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগে। অর্থাৎ জন্মকালেই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানকালীন বিকিরণ বা কম্পন জাতকের শরীরে পৌঁচচ্ছে না। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। জ্যোতিষশাস্ত্রে যে নক্ষত্রগুলোর বিকিরণজনিত প্রভাবের কথা বলো হয়েছে সেই নক্ষত্রগুলো এতই দূরে অবস্থান করে যে, নিকটতম নক্ষত্রটির বিকিরিত আলো ও কম্পন পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে লাগবে কম করে সাড়ে চার বছর। এই মত প্রকাশ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের যে বিকিরণ ও কম্পন জাতকের অদৃষ্টকে প্রভাবিত করছে, সেই বিকিরণ জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের বহু আগেকার।

সুতরাং "গ্রহ-নক্ষত্রের বিকিরণ ও কম্পনই ভাগ্যকে নির্দিষ্ট করছে", জ্যোতিষীদের এই বক্তব্যকে ঠিক বলে ধরে নিলে, বিকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছোবার সময় গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর অবস্থান কোথায় কোথায় ছিল, সেটা নির্ণয় করে জন্মকালীন গ্রহ-অবস্থানের চিত্রটি আঁকা একান্তভাবেই আবশ্যক।

আবার, "জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানই ভাগ্যকে নির্দিষ্ট করে", জ্যোতিষীদের এই বক্তব্যকে ঠিক বলে ধরে নিলে গ্রহ-নক্ষত্রের বিকিরণ ও কম্পনজনিত প্রভাবকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে হয়। আর বিকিরণ অস্বীকার করলে, বিকিরণ প্রভাব কাটাতে গ্রহরত্ন, ধাতু ইত্যাদি ধারণ করাও অর্থহীন হয়ে যায়।

'জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জাতকের অদৃষ্ট নির্ধারণ করে', এবং 'জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের বিকরণ জাতকের অদৃষ্ট নির্ধারণ করে' —এই দুটি বক্তব্য পরস্পরবিরোধী একটি মনকে মেনে নিলে অপরটিকে অস্বীকার করতেই হয়। যে শাস্ত্র পরস্পর বিরোধী মতামতকেই স্বীকার করে, তাকে যুক্তিহীন ও বিজ্ঞান-বিরোধীশাস্ত্র ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

আট : "মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কি ঘটবে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তা ঠিক হয়ে যায়। আর এ-সব ঠিক করে জন্মের সময়কার গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান।" জ্যোতিষীরা এমনটাই দাবি করে থাকেন।

মজাটা হলো এই, জ্যোতিষীরা পরের কাছে বুক বাজিয়ে গলা ফুলিয়ে যে দাবিটি করেন, সেই দাবিটির প্রতি নিজেদের আস্থা নেই এক তিলও। নিজের পরিবারের অসুখ হলে দৌড়োন ডাক্তারের কাছে। ছেলে-মেয়েদের ভাল স্কুলে ভর্তি করতে উমেদার ধরেন। পড়াশুনোয় চৌখশ করতে ভাল টিউটরের খোঁজে হন্যে হন। তারপর রয়েছে ভাল কলেজে ভর্তির সমস্যা। সমাধানের উপায় বের করতে বাবাকে উমেদার ধরতে দৌড়তে হয়। ছেলের চাকরী যোগাড় করতে জ্যোতিষী-বাবা গ্রহের চেয়েও 'মামার জোর'কে জোরালো বিবেচনা করে মামাদের শ্রীচরণে তৈলমর্দন করতে বসে পড়েন। মেয়ের জন্যে হন্যে হয়ে পাত্র খোঁজেন। বিয়ের আগে কোষ্ঠি মেলান। শ্বশুরবাড়ি মেয়েকে নিয়ে কি-সব অশান্তি চলছে জ্যোতিষ-বাবা উৎকণ্ঠায় হাঁকপাঁক করেন। মেয়ে মা হতে চলেছে। কোন্ নার্সিংহোমে আধুনিকতম ব্যবস্থা, বড় বড় ডাক্তার, মেয়ের নিরাপত্তাকে পারবে নিশ্চিত করতে জ্যোতিষী-বাবা সেসব খবর সংগ্রহে লেগে পড়েন।

এ-সবই বাস্তব চিত্র। এই জাতীয় ঘটনা প্রতিটি জ্যোতিষীর জীবনেই একটু-আধটু রঙ পাল্টে ঘুরে-ফিরে আসে। কিন্তু কেন জ্যোতিষীদের জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে ? সবই যখন পূর্বনির্ধারিত তখন ভবিষ্যতে যা ঘটবার তা ঘটবেই, শত চেষ্টাতেও ঘটনার গতিকে পাল্টানো যাবে না। তবে কেন জ্যোতিষী ডাক্তারের দ্বারস্থ হবেন ? যতদিন রোগ-ভোগ নির্ধারিত আছে ততদিন তো ভোগ করতেই হবে। তারপর রোগমুক্তি বা মৃত্যু যা হবার তা হবেই, অপ্রতিরোধ্য। যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে মানেন, বিশ্বাস করেন ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিটি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই এই একই যুক্তি প্রযোগযোগ্য। তাঁরা কেন ছেলে-মেয়েদের ভাল স্কুল-কলেজ, টিউটর নিয়ে চিন্তিত হবেন ? ছেলের ভাগ্যে যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই. এ. এস. হওয়া থাকে তবে ছেলেকে স্কুল-কলেজে না পড়ালেও, পড়াশুনা না শেখালেও

ডাক্তাব, ইঞ্জিনিযার, আই. এ. এস. হবেই। ছেলে-মেযেদের পাত্রী-পাত্রের খোঁজই বা বৃথা কেন করা ? কেনই বা কোষ্ঠি মেলাবার অপচেষ্টা ? কেনই বা পাত্রীর ছকে বৈধব্য লেখা আছে কিনা দেখা ? অদৃষ্ট যখন অলঙ্ঘনীয, তখন সমস্ত চেষ্টা বা প্রযাসই তো বৃথা, চূড়ান্ত মূর্খতা। যে-সব রাজনীতিক 'আগুন-খাওয়া বিপ্লবী' বলে নিজেদের প্রোজেক্ট করেন এবং একই সঙ্গে জ্যোতিষীদের দ্বারস্থ হয়ে আংটি-টাংটি পড়েন, গ্রহ-শান্তির জন্য যজ্ঞ-টজ্ঞ করান, তাঁদের উদ্দেশ্যে শুধু এ-কথাই বলতে চাই—'জীবনপণ' করে আপনাদের ওই বিপ্লবকে তরান্বিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। বিপ্লব যখন হওয়ার তখন হবেই, এই বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকুন না কেন। আপনার বা কারও চেষ্টার ওপরই যখন 'বিপ্লব' নির্ভরশীল নয়, এ-পোড়া দেশে বিপ্লব ঘটবে কী ঘটবে না, ঘটলে ঠিক কোন্ সময়, কোন্ মুহূর্তে ঘটবে, সবই যখন ঠিক আছে তখন বৃথা কেন চেষ্টা করা ? সুস্থ শবীরটিকে ব্যস্ত করা ? সময় যখন আসবে তখন জনগণ তৈরি থাকুক বা না থাকুক, বিপ্লব ঠিকই হুড়মুড় করে এসে পড়বে। অতএব জ্যোতিষ-বিশ্বাস এবং বিপ্লব ঘটবার চেষ্টা, এই দুই সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী চিন্তার পরিচয় দিযে সাধাবণেব চোখে নিজেকে 'পতিত' না করে আপনারা বরং কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জ্যোতিষীদের সঙ্গে গলা মিলিযে আসুন, 'মা-ভৈ' বলে গান ধরুন—

যা হবার তা হবেই ভাই
চেষ্টা করা বৃথা তাই

কাজকর্ম ছাড়ার উপদেশে কোনও জ্যোতিষ-বিশ্বাসী যদি প্রশ্ন তোলেন, "কাজকর্ম না কবলে খাব কী মশাই ?" তাঁদের কথার উত্তর কিন্তু তাঁদের ঝুলিতেই আছে—ভাগ্যে যদি খাওযা-পবা-গাড়ি-চড়া লেখাই থাকে, তবে লেখাপড়া শিখুন বা না শিখুন, কাজ করুন বা না কবুন, ও-সবই আপনা থেকে জুটে যাবে। "বিজ্ঞানী, লেখক, বা আইনজ্ঞ হয়ে পৃথিবী কাঁপাতে অক্ষর পরিচযেরও প্রয়োজন নেই, প্রযোজন শুধু ভাগ্যের।" এমন উদ্ভট তত্ত্বের উদগাতা জ্যোতিষীরাও কিন্তু তাঁদের নিজেদের তত্ত্বে সামান্যতম আস্থা যে রাখেন না, তা তাঁদের জীবনচর্যাতেই প্রকট। জ্যোতিষীরা খদ্দের ধরতে বিজ্ঞাপন দেন কেন বলুন তো ? ভাগ্য যদি পূর্বনির্ধারিত হয়, বিজ্ঞাপনে কি খদ্দের বাড়তে পারে ? খদ্দের বাড়া যদি ভাগ্যে থাকে, তাহলে অমনি বাড়বে। গ্রহরত্ন-ব্যবসাযী ও তথাকথিত জ্যোতিষ-গবেষণা কেন্দ্রগুলো মাঝে-মধ্যে যখন তাঁদের দোকানের জন্য জ্যোতিষী চেযে বিজ্ঞাপন দেন, তখন ওঁদের বজ্জাতি দেখে তাজ্জব বনে যাই। ওঁরা নিজেরাই "ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত" কথাটার আদৌ বিশ্বাস করেন না, "দোকানে বসাতে জ্যোতিষী যখন পাবার তখন ঠিকই পেযে যাব" এই ভেবে হাত-পা গুটিযে বসে না থেকে জ্যোতিষী খুঁজতে সচেষ্ট হন। আর লোকের কাছে গ্রহরত্ন বেচার তাগিদে নিখুঁত ভাগ্য-গণনার (অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য) ঢাউস বিজ্ঞাপন দেন।

নয় ঃ এক সময় বাংলাদেশে অষ্টোত্তরী-দশাবিচার করে জাতকের ভাগ্যগণনা করা হতো। এখনও অনেক জ্যোতিষীই অষ্টোত্তরী-দশা-বিচারেই বিশ্বাস স্থাপন কবেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র জ্যোতিষীরা ভাগ্য-গণনা করেন বিংশোত্তরী-দশা বিচার করে। এই দুই প্রধান দশা-বিচাব ছাড়াও আরও নানাবিধ দশা-বিচার কোথাও কোথাও প্রচলিত। অষ্টোত্তবী-দশা-বিচারে দশা-অন্তর্দশার যে ফল পাওযা যায, বিংশোত্তরী-দশা-অন্তর্দশায সে ফল পাওযা

যায় না। একটি রাশিচক্রে অষ্টোত্তরী মতে বর্তমানে যে দশা-অন্তর্দশা চলছে, বিংশোত্তরী মতে অন্য দশা-অন্তর্দশা চলায় অনেক সময়ই উভয়ের ভাগ্যগণনার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। অন্তত ভিন্নতর অবশ্যই। অথচ মজাটা হলো এই—দুই গণনাপদ্ধতির জ্যোতিষীরাই দাবি করতেন ও করেন তাঁদের পদ্ধতি অনুসরণে নিখুঁত ভাগ্য-গণনা করা যায়। দুটি পদ্ধতিই যেহেতু ভিন্নতর এমন কী বিপরীত গণনা-ফল নির্ণয় করে, সুতরাং দুটি পদ্ধতি কখনই একই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হতে পারে না। এরপরও তো রইল আরো নানা দশা-অন্তর্দশা নির্ণয় পদ্ধতি। তারাও বিভিন্ন ধরনের ফল প্রকাশ করে এবং তারাও নিজেদের পদ্ধতিকে অভ্রান্ত বলেই দাবি করে। বিভিন্ন ধরনের গণনার ফল, বিভিন্ন ধরনের ভাগ্য-বিচার করে সবাই কী করে একই সঙ্গে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করবে? বাস্তবে এমনটা একেবারেই অসম্ভব। অথচ প্রতিটি গণনা-পদ্ধতির জ্যোতিষীদের প্রতি আস্থা-রাখা মানুষের অভাব নেই। এই আস্থার কারণ জ্যোতিষীদের না মেলা কথাগুলো ভুলে মেলা কথাকেই আঁকড়ে ধরা ; জ্যোতিষীদের সহানুভূতিসম্পন্ন তোষামদকারী কথায় বিভ্রান্ত হওয়া, ইত্যাদি।

'জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি' অধ্যায়ে 'অষ্টোত্তরী' ও 'বিংশোত্তরী' দশা নিয়ে আলোচনা করেছি। একটু পিছিয়ে গিয়ে ওই পদ্ধতির দিকে নজর দিন, দেখতে পাবেন ওই দুই পদ্ধতির ফল ভিন্ন, এমন কী বিপরীত।

দশ ঃ জ্যোতিষীরা বলে থাকেন 'লগ্ন' ও 'রাশি' দুটির গুরুত্ব ভাগ্য-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যধিক। জাতকের জন্ম সময়ের হেরফেরে লগ্ন ও রাশি পাল্টে যায় বলেই অনেক সময় জ্যোতিষীদের গণনায় ভুল হয়।

একজন জাতকের জীবনের কিছু ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য পাঠক-পাঠিকারা লিখে ফেলুন। যেমন—প্রতিভাবান, আদর্শবাদী, নির্ভীক, বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হয়েছেন, মানুষকে বুঝতে পারেন, মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন, বুদ্ধিমান, অর্থনাশ, আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্যলাভ, আত্মীয় বন্ধুদের বিরোধিতার মুখোমুখি, নানাভাবে ভালোবাসা পাওয়া, পরিচিতদের কাছে সঠিক মূল্য না পাওয়া, জীবনে উত্থান-পতন, জীবনে প্রেমের আগমন ইত্যাদি। এবার আপনার জন্মকুণ্ডলীটি নিয়ে বসুন। লগ্নকেই লগ্ন ধরে বিচার করে দেখুন (জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি অধ্যায়টি এ-বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে), দেখবেন গোটা-চারেক বৈশিষ্ট্য মিলে যাবে। এবার অন্য একটি ঘরকে লগ্ন ধরে বিচার করুন, দেখবেন এবারও গোটা চারেক বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে। এক এক করে বারোটি ঘরকেই লগ্ন ধরে বিচার করুন, দেখবেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গণনা মিলে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, মূল লগ্ন থেকে বিচার করে এর বেশি বৈশিষ্ট্য মেলার সম্ভাবনা নেই।

যে কোনও ঘরকেই রাশি ধরলেও একই ভাবে জাতকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মিলবেই। মূল রাশিরও একই ভাবে বাস্তবিক পক্ষে কোনও অন্য অর্থ বা গুরুত্ব দাবি করতে পারে না।

এগার ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে রাহু ও শনি পাশাপাশি থাকলে তারা যে কোনও লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তম ঘর অর্থাৎ বিবাহস্থান, প্রেমস্থান অথবা পঞ্চম ঘর অর্থাৎ সন্তানস্থানের ক্ষতিসাধন করে।

বিষয়টি একটু ঠাণ্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করুন। রাহু রাশিতে থাকে দেড় বছর এবং এবং শনি আড়াই বছর ("জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি" অধ্যায়টি প্রয়োজনে দেখে নিন)। পাশাপাশি দুটি ঘরে এদের অবস্থানকালও সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ওই দীর্ঘ সময়েব মধ্যে তরুণ-তরুণীদের ভাগ্যে (যার সংখ্যা বাস্তাবিক পক্ষে কোটি কোটি) 'শুভ' প্রেম বা 'শুভ' বিয়ে ঘটবে না। সন্তানদের ভাগ্যও হবে 'অশুভ'। সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধি বলে, এ এক জাতীয় অবাস্তব চিন্তামাত্র।

এত কিছু করার পরও গণনা মেলে না বলেই জ্যোতিষীরা আমদানী করেছে 'পুরুষকার', 'পূর্বজন্মের কর্মফল', 'জ্যোতিষ গণনাই সব নয়, বাক্‌সিদ্ধ বলেও একটা কথা আছে', ইত্যাদি নানা কুযুক্তি।

বারো ঃ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে বিবাহ-যোগ নির্ণীত হয়ে থাকে বলে জ্যোতিষীরা দাবি করে থাকেন। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান তো প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চক্রাকারে একই ভাবে লক্ষ-কোটি বছর ধরেই আবর্তিত হয়ে আসছে। তবে কেন কিছুকাল আগেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাকালীন জাতকদের শৈশবে বিবাহ যোগ থাকত এবং বর্তমানে বেশি বয়সে বিয়ের রীতি চালু হতেই বিবাহ-যোগ যৌবনে পড়ছে? প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ আইন পুরোপুরি মানা হতে থাকলে কি তবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বেশি বয়সের বিয়েকেই মেনে নিতে বাধ্য হবে?

আগে দেশে বাল্যবিধবার প্রবল আধিক্য ছিল। রীতি পাল্টাতে, হিন্দু কোড বিল চালু হতে বাল্যবিধবার সংখ্যা বিলীয়মান। আগে কুলীন ও ব্রাহ্মণ পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ যোগ ছিল, অন্য অনেক পুরুষেরই ভাগ্যে ছিল একাধিক বিবাহ যোগ। হিন্দু কোড বিল পাশ হতেই সেই যোগ ও ভাগ্য বন্ধ হয়ে গেছে। আগে যে সব গ্রহসন্নিবেশের জন্য বাল্যবৈধব্য, 'বহুবিবাহ' অদৃষ্টে লেখা থাকত, এখন কি তবে আর ওই সব গ্রহসন্নিবেশ মানুষের জন্মকালে ঘটছে না? অবশ্যই ঘটছে; ঘটতে বাধ্য। গ্রহগুলো একই ভাবে কোটি কোটি বছর ধরে আবর্তিত হচ্ছে এবং হবে; সুতরাং একই ধরনের গ্রহসন্নিবেশও ঘটছে বই কী। আর একটা কথা ভাবুন, কিছুকাল আগে থেকে বেশ কিছুকাল আগে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাল্যবিবাহ, বাল্যবিধবা, বহুবিবাহ, ইত্যাদি মানুষের ভাগ্যে লেখা থাকত। গ্রহসন্নিবেশের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও, এখন কেন ওই সব কথা ভাগ্যে লেখা থাকে না? গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কি তবে দেশের লোকাচার, আইন ইত্যাদির ওপর লক্ষ্য রেখে নিজেদের অবস্থান, নিজেদের গতিপথই পাল্টে ফেলেছে? তবে তো বলতেই হয়, লোকাচার, দেশাচার ও আইন গ্রহ-নক্ষত্রকেও প্রভাবিত করে; অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য-নির্ণয়েব ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী। আর তেমনটা হলে তো গোটা জ্যোতিষশাস্ত্রকেই ভুলে ভরা শাস্ত্র হিসেবে বাতিল করতেই হয়।

তের ঃ মাস কয়েক আগের ঘটনা। এক মধ্য বয়স্কা মহিলা এলেন ক্যালকাটা ফ্যামেলি

ওয়েলফেয়ার হসপিটালে। সঙ্গী একটি বছর তিরিশের তরুণ, তাঁর একমাত্র সন্তান। মহিলাটি আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, ছেলেটি ভিষণ ভাবে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড। ইনজেক্‌শন ফুঁড়ে ফুঁড়ে শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্থিক অবস্থাকেও ঝাঁঝড়া করেছে। ওর বাবা রিটায়ার করেছেন বছর দেড়েক। ও একটা চাকরি করত। এখন কাজে যায় না। সব সময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

একটু একটু করে অনেক কিছুই জানলাম। ছেলেটি ভালবাসে একটি মেয়েকে। সেই মেয়েটির সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়। ছেলে ও মেয়ের পক্ষ থেকে উভয়ের মা-বাবাই আলোচনা করে বিয়ের দিন ঠিক করেন। সেই দিনই ছেলের বাবা মেয়েটির বাবাকে অনুরোধ করেন, মেয়েটির জন্মকুণ্ডলী থাকলে দিতে। জন্মকুণ্ডলী পাওয়ার পর বাবা জন্মকুণ্ডলী নিয়ে হাজির হলেন তাঁদের পারিবারিক জ্যোতিষীর হাতিবাগানের চেম্বারে। জ্যোতিষী পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচার করে জানান, মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হলে ছেলেটির সর্বনাশ হবে। জ্যোতিষীর মতামত শুনে মা-বাবা বিয়ে ভেঙে দেন ছেলের তীব্র ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য করে। তারপরই ছেলে ড্রাগ নিতে শুরু করে। ড্রাগ নিচ্ছে দেড় বছর ধরে। পঁয়ষট্টি কেজি ওজন পঁয়তাল্লিশে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রমহিলার একান্ত অনুরোধ, আমি যেন ছেলেটিকে ড্রাগের হাত থেকে বাঁচাই।

তরুণটিকে দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। নেশায় অর্ধ অচেতন। কথা বলতে শিথিল ঠোঁট কাঁপে। টেবিলের ওপর রাখা হাতও স্থির থাকছিল না, কাঁপছিল। শুধু জানিয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে না হলে এই ভাবেই নিজেকে শেষ করে দেবে, মা-বাবা যদি মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিতে আন্তরিকভাবে রাজি হন তবেই তরুণটি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। নতুবা চিকিৎসার সাহায্যে কিছুতেই নেবে না। কতবার মা-বাবা ওকে ভাল করার চেষ্টা করেন, দেখবে। ও মরবেই। একমাত্র সন্তান এইভাবে মরেই মা-বাবাকে শাস্তি দিয়ে যাবে।

মাকে জানিয়েছিলাম, ড্রাগ গ্রহণকারী সাহায্যে না করলে তাকে স্বাভাবিক সুস্থজীবনে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসার সাধ্য কোনও চিকিৎসকেরই নেই। আপনারা যদি ওই মেয়েটির সঙ্গেই আপনার ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হন, তবেই ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ করা সম্ভব এবং এ-বিষয়ে অবশ্যই যথাসাধ্য করব।

মা জানালেন, এখন আর মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে সম্ভব নয়। কারণ তিনি এই বিয়ে ভাঙার জন্যেই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিলেন, "বিয়ে একটা চিরজীবনের পবিত্র সম্পর্কের ব্যাপার। তাই তা কোনও প্রতারণার মধ্য দিয়ে শুরু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছেলেটি আমার লম্পট। এ-কথাটা আগেই জানিয়ে রাখতে চাই। লাম্পট্যের ব্যাপারে ও সধবা-বিধবা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ছোট-বড় কোনও বাছ-বিচার করে না। বিয়ের পরে ছেলেটি ওর এমন জীবন-যাপন পদ্ধতি না পাল্টালে যাকে বিয়ে করে আনবে তার জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।"

মেয়েটির হাত থেকে ছেলেটিকে বাঁচাতে, অর্থাৎ জ্যোতিষীর কথামত সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে, মা চেয়েছিলেন বিয়েটা যেন কিছুতেই না হয়। ফলে মেয়েটির বাড়ি গিয়ে নিজের ছেলের সম্বন্ধে আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলে এসেছিলেন। ফল পেয়েছিলেন অব্যর্থ। বিয়ে যায় ভেঙে। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিউদিল্লি, ওর দিদি-জামাইবাবুর কাছে। মাস ছয়েক আগে মেয়েটির বিয়েও হয়ে গেছে।

ছেলেটির জন্য দুঃখ হয়েছিল। জ্যোতিষীটির জন্য সেই মুহূর্তে আমার মনে জমা ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা। মা'কে বলেছিলাম, "জ্যেতিষশাস্ত্রে যখন বিশ্বাসই করেন, তখন তো ভালমতই জানেন অদৃষ্টে যা আছে তা অলঙ্ঘনীয়, ঘটবেই। তবে যোটকবিচার করতে গিয়েছিলেন কেন ? যোটকবিচার কি ভাগ্যের সামান্যতম পরিবর্তন আনতে পারবে ? না, নির্ধারিত বিয়েকে ঠেকাতে পারবে ? আপনি বললেন, জোতিষী যোটকবিচার করে জানিয়েছিলেন, এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হলে আপনার ছেলের সর্বনাশ হবে। ওর সঙ্গে বিয়ে তো হয়নি, তবে কেন সর্বনাশ হচ্ছে ? জোতিষী মেয়েটির জন্মকুণ্ডলী দেখে কেন বললেন, 'ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে....' এত 'যদি', 'তবে' দিয়ে কি করে ভবিষ্যদ্বাণী করে ওইসব জ্যোতিষীরা ? ছক দেখে এত কিছুই বুঝল, আর এইটুকু বুঝল না যে, মেয়েটির বিয়ে হবে অন্য কারো সঙ্গে ? জ্যোতিষীটি তার দাবি মত সত্যিই যদি ভাগ্য গণনা করতে জানত, তবে যোটকবিচার করতে যেত না। কারণ ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত হলে পাত্র-পাত্রীর যোটকবিচার একান্তই অপ্রয়োজনীয়। কার সঙ্গে কার ভাল মিলবে, কার সঙ্গে খারাপ, এসবই জোতিষ-শাস্ত্রে আছে। আর সেই সব মিলিয়ে পাত্র-পাত্রী খোঁজেন আপনারা। আপনারা শিক্ষিত হয়েও একবাবের জন্যেও কেন ভাবেন না, ভাগ্য যখন অপরিবর্তনীয় পূর্বনির্ধারিত, তখন একজনের ভাগ্যকে আর একজনের ভাগ্য এসে কী করে পরিবর্তিত করতে পারে ? জোতিষশাস্ত্রের কথা সত্যি হলে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনই বিচ্ছিন্ন ভাগ্য নিয়ে থেকেও সমগ্র সমাজযন্ত্রের সুনির্দিষ্ট ভাগ্যেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। একজনের ভাগ্যের সামান্যতম পরিবতর্নের অর্থ সমাজযন্ত্রেব সুনির্দিষ্ট ভাগ্যের, সুশৃঙ্খল ভাগ্যের শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়া। কারণ একজনের জীবনের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে বহু জীবনেব ঘটনা জড়িয়ে। একজনের ভাগ্যের পরিবর্তন মানে বহুর পবিবর্তন, বহুর পরিবর্তন মানে আবো বহুতবের পরিবর্তন। এইভাবে পরিবর্তন শুধু বহু থেকে বহুতেই ব্যাপ্ত হতে বাধ্য। আব তাই যদি হয়, তবে যোটকবিচার করে, রত্ন, ধাতু বা মূল ধারণ করে কিচ্ছু হবে না। যা হবে, তা হলো কিছু অর্থদণ্ড এবং একই সঙ্গে জোতিষী ও রত্নব্যবসায়ীদের উদরপূর্তি মাত্র।"

১৯৯১-এর অক্টোবরের গোড়ায় ছেলেটির মা আবার এসেছিলেন। সেই আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। সঙ্গে ছেলেটি নেই। কাঁদতে কাঁদতে আবারও সাহায্য চাইলেন। এবার নিজের ছেলেকে বাঁচাতে সাহায্য নয় ; নিজের ছেলে দিন পনের আগে ট্রেনের নীচে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। চাইলেন, ওই জোতিষীর বিরুদ্ধে, সব জ্যোতিষীব বিরুদ্ধে যেন কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করি ; যাতে আর কোনও মা ওইসব বুজরুক হত্যাকারীদের পাল্লায় পড়ে সন্তান না হারান।

বলেছিলাম, "এ লড়াই তো শুধু আমার বা আমাদের কিছু মানুষের লড়াই নয়, এ লড়াই প্রতারকদের বিরুদ্ধে প্রতিটি সুস্থভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষেরই লড়াই। এ লড়াই আমরা শেষ পর্যন্ত জিতবই। কিছু অসৎ রাজনীতিক, কিছু ধান্ধাবাজ শয়তান ও কিছু শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মূর্খের সাধ্য নেই, ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ করে ওইসব প্রতারকদের বাঁচাতে পারে।

চোদ্দ : নিয়তি, অদৃষ্ট স্পষ্টতই ঈশ্বর-বিরোধী ধারণা, ঈশ্বরে বিশ্বাসীদেব কাছে ঈশ্বর সবকিছুরই নিয়ন্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় অসম্ভব সম্ভব হয়, নির্ধনীর ধন, পঙ্গু পারে লঙ্ঘাতে

গিরি, মৃতে পায় প্রাণ। ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার অর্থই হলো নির্ধারিত জীবনের ছন্দপতন ঘটিয়েই কিছু পাওয়া, অদৃষ্টকে পাল্টে দিয়ে কিছু পাওয়া। "অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয়", জোতিষশাস্ত্রের এই মূল চিন্তারই বিরোধী চিন্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস। পরস্পর-বিরোধী এই দুই বিশ্বাসের একটির প্রতি আস্থা রাখার অর্থ অন্যটির প্রতি অনস্থা।

কিন্তু, মজাটা কী জানেন, এক একজন জ্যোতিষী যেন ঈশ্বরের এক একটি অবতার, এক একটি পুত্র-কন্যা। এদের জীবনে ভগবৎচিন্তা ও জ্যোতিষচিন্তা একসঙ্গে মিলেমিশে খিঁচুড়ি হয়ে বিরাজ করছে। জ্যোতিষীদের এক একটি দোকনঘরে ঢুকলেই দেখতে পাবেন ঠাকুর-দেবতার ছবির ছড়াছড়ি। এরা প্রায় প্রত্যেকেই মানুষের কল্যাণার্থে, সৌভাগ্যকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে ঈশ্বরপূজা, হোমজজ্ঞ ইত্যাদিও করে থাকে। ভাগ্য যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইচ্ছেমত ওলট-পালট করাই যায়, তবে জোতিষশাস্ত্রের—'ভাগ্য নির্ধারিত' কথাটাই তো বেবাক মিথ্যে হয়ে যায়।

অধুনা অনেকেই নিজেদের বিজ্ঞপিত করছে 'জ্যোতিষ ও তন্ত্রবিষারদ' হিসাবে। এদের কেউ 'তারাপীঠসিদ্ধ' কেউ বা 'কামাখ্যাসিদ্ধ', আবার কেউ বা অন্য কিছু 'সিদ্ধ'। এরা তন্ত্রমতে হোমযজ্ঞ করে ব্যর্থপ্রেম জোড়া দেয়। (আমার কাছে একটি রোগী এসেছিলেন, ম্যাডোনার প্রেমে দিওয়ানা। এক তরফা প্রেম, যাকে বলে ব্যর্থপ্রেম। ভাবছি ওঁকে হাজির করব ব্যর্থপ্রেম জুড়ে দেওয়ার দাবিদার তন্ত্রসিদ্ধ জোতিষীদের কাছে। এতে বিজ্ঞাপনদাতা জিতলে হেবেও শান্তি, ম্যাডোনা বাঙালীর ঘরের বউ হবেন।) বিয়ে হচ্ছে না? চিন্তা নেই; এইসব ঈশ্বরের দালালরা ঈশ্বরকে পটিয়ে-পাটিয়ে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের পেছনে লাথি কষিয়ে বিয়ে দেবেনই। মামলায় জয় ঘটিয়ে দেবেন গ্যারান্টি দিয়ে। (বিষয়টা আমাকে খুবই ভাবিত করেছে। ভাবছি গাদা-গাদা খুন করা কয়েকজন বিচারধীন আসামীকে পরামর্শ দেব উকিল ছেড়ে, এইসব ঈশ্বরের উকিলদের সাহায্য নিতে। ভাবুন তো, হাতেনাতে ধরা-পড়া খুনিও গট্-গট্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।) বিশ্বাস করুন আর না করুন, ভাড়াটে তুলে দেবে স্রেফ মন্তরের জোরে। (যাঁরা বিশ-তিরিশ বছর ধরে কেস করেও ভাড়াটে তুলতে পারছেন না, তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আইনেরও ঝামেলা নেই, রাজনীতিকদের দারস্থ হওয়ার ও হ্যাপা নেই। জোতিষী + তান্ত্রিক'কে অর্থ দিলেই ভাড়াটের জীবনে অনর্থ ঘটে যাবে।) অসুখে ভুগছেন, ডাক্তাররা সারাতে পাচ্ছে না? তাও সারিয়ে দেবে ওরা, ঈশ্বরকে ঘুষ দিয়ে। (ওদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে বেকার ডাক্তারদের রাস্তায় রাস্তায় ফেউ ফেউ করে ঘুরতে হবে, অতএব ডাক্তাররা এখনই সাবধান হোন। এমন ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে ওদের বিরত করতে এখুনি আন্দোলনে নামুন।) ভাগ্যে মৃত্যুযোগ থাকলেও চিন্তা নেই, মন্ত্রের জোরেই ঈশ্বরকে ধরে বাঁচিয়ে দেবে জোতিষী।

কেউ কেউ ভাবছেন, বুঝিবা এই মুহূর্তে কিছুটা হালকা হাস্যরস সৃষ্টিতে মনযোগী হয়েছি। বিশ্বাস করুন, যা যা লিখলাম তাই তাই ঘটিয়ে চলেছে একদল জ্যোতিষী স্রেফ ঈশ্বর নামক একজন ঘুষখোরকে ঘুষ দিয়ে।

এই মুহূর্তে আমার হাতের সামনে পড়ে রয়েছে অনেক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতারা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে জোতিষী ও তন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ একই সঙ্গে জোতিষশাস্ত্রবিদ্ ও ঈশ্বরের ডাইরেক্ট এজেন্ট। বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে রয়েছেনঃ

ডঃ পণ্ডিত শ্রীমনসারাম ভট্টাচার্য (দেশ বিদেশ হইতে বহু স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)। ইনিও গণনা করেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে। এঁর স্পেশাল ক্ষমতা—সন্তানহীনাকে মাতৃত্ব দান, (বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান ও ধারণাকে উল্টে দিয়ে মন্তরে গর্ভ উৎপাদন ? নাকি ব্যাপারটা অ-মন্তরেই ঘটে ? মা হওযার তীব্র আকুতিতে গর্ভবতী মহিলারা মুখ খোলেন না, এটাই এই ধরনের ক্ষমতার দাবিদারদের প্রধান সহায়ক। কিন্তু অমন্ত্রেরও কি সকল মহিলাকেই গর্ভবতী করা সম্ভব ? অবশ্যই না। আর এই জন্যেই ওইসব তন্ত্রবিষারদ জ্যোতিষীরা সতর্কতার সঙ্গে খোঁজখবর নিযে দেখেন অসুবিধেটা কার তরফ থেকে। স্বামীর, না স্ত্রীর ? স্বামীর হলে তন্ত্রে (?) কাজ হয।)

ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী—ইনি স্পেশালিস্ট ভৌতিক উপদ্রব বন্ধে, (ভূতের উপদ্রব ? ভূত তবে সত্যিই আছে ? ভূত স্পেশালিস্ট এই ডক্টরেট আমাদের সমিতির সদস্যদের একদিন কৃপা করে ভূত দেখালে দারুণ হয়। আমরা বিজ্ঞানের মুখে ঝামা ঘসে দিয়ে ভূতনাথ ডঃ শাস্ত্রীব চরণাশ্রিত হযে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারি।) এ-ছাড়াও পারেন দাম্পত্য কলহ মেটাতে, প্রেমে শান্তি আনতে, চাকরি দিতে, (বেকাররা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। চাকরি পেলে বুঝবেন—ফিসের টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। না পেলে বুঝবেন—বিজ্ঞাপন দিযে লোক ডেকে এরা ঠকাচ্ছে। আর এদের লোক-ঠকানোর কাজে সহাযতা করতে জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান-বুদ্ধিমানরাই এগিযে এসে অতি জঘন্য এক সমাজিক অপরাধই কবে চলেছেন না কী ? সরকার, পুলিশ ও প্রশাসন এইসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নীরব থেকে এমন কী কখনও কখনও সহযোগিতা করে প্রতারণাকে চালিযে যেতেই উৎসাহিত করছেন না কী ? এই ধরনের ভূমিকার পাশাপাশি সরকার যখন সাধাবণ মানুষকে অন্যাযের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা বলেন, তখন তাঁদেব দ্বিচারিতা, স্ববিবোধীতা এবং ধাপ্পাবাজীই প্রকট হয়ে ওঠে না কী ? সাধাবণ মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, বেকার ভাই-বোনেরা কী বলেন ?) ডঃ শাস্ত্রী বশীকরণ স্পেশালিস্টও। চার্জও খুবই কম, একেবাবে জলের দর বলতে পারেন। 'সানন্দা' পাক্ষিক পত্রিকায এক সাক্ষাৎকারে জানিযেছেন, "খরচ পড়ে দেড় হাজার টাকা থেকে আঠারোশো টাকা, দ্রুত কাজ দেয় বিশেষ বশীকরণ। খরচ আঠারশ টাকা থেকে তিন হাজার টাকা, আর অতি দ্রুত কাজ দেয় পুবশ্চরণসিদ্ধ বশীরকণ, এটা সারা জীবনের জন্য। খরচ, সাড়ে ছ'হাজার টাকা থেকে আট হাজাব টাকা।" সুপার হিবোইনকে চিবকালের জন্য স্ত্রী করার পক্ষে ড্যাম চীপ্। ইনি আবার বাজীব গান্ধীর নিখুত ভবিষ্যদ্বক্তাও।

সিদ্ধতান্ত্রিক শ্রী নিমাইচাঁদ ভট্টাচার্য—B COM । স্মৃতিতন্ত্র. জোতিষপর্ব সামুদ্রিক রত্ন। স্থাযী সভাপতি : The All India Yog Tantra & Astrological Society

শ্রীগোবিন্দ তন্ত্রভারতী—তন্ত্রবাগীশ, সামুদ্রিক রত্ন, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (কাশীধাম) F.R AS. (London), আরো অনেক উপাধী আছে। এঁর স্পেশাল ক্ষমতা বশীকরণ। আমির খান, সালমান খান, রাহুল, মাইকেল জ্যাকসন, মাধুরী, মিনাক্ষী, পূজাভাট ও ম্যাডোনার দিওযানী, দিওযানা মেযে ও ছেলেরা এইসব বশীকরণ-বাবাদের সাহায্যপ্রার্থী হলে বাবাজীরা নির্ঘাৎ মিলন ঘটিযে দেবেন। চাই কী হাজার কুড়ি মেযে মাইকেলেব সঙ্গে আর হাজার তিনিশ ছেলে ম্যাডোনার সঙ্গে বিযেটাও সেরে নিতে পারবেন ঈশ্বরের পরম কৃপায।

ডঃ পণ্ডিত অশোককুমার জ্যোতিষশাস্ত্রী তান্ত্রিকাচার্য—স্পেশালিস্ট ইন্ যে কোনও মনবাঞ্ছা পূরণ। বিশ্বাস করুন, এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে, আমাদের পরিবারের সাহায্যকারী রেণু ওরফে লক্ষ্মী কুচকুচে কালো রঙ, সুপার খাঁদা নাক আর চার ফুট ছ'ইঞ্চি হাইট্ নিয়েই সুপার স্টার নায়িকা হওযার মনবাঞ্ছায আশোককুমারের কাছে যেতে চায। শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠন যাঁরা করতে চাইছেন, তাঁরা প্রচুর ঝুঁকি, প্রচুর প্রচেষ্টা না করেই তাদের মনের মত করে সমাজ গঠন করতে চাইলে একটু কষ্ট করে অশোককুমারের সঙ্গে যোগাযোগ কবে দেখতে পারেন। আমার স্ত্রী'র একান্ত ইচ্ছে, অন্তত দুটি বছরেব জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। ডঃ পণ্ডিত অশোককুমার তাঁর তন্ত্র ও জ্যোতিষক্ষমতায় এমনটা ঘটিযে দিলে ঘোর যুক্তিবাদীও স্বীকার করতে বাধ্য হবে—অলৌকিক বলে এখনও কিছু আছে।

শ্রীমৎ গোপাল শাস্ত্রী ঠাকুর, জ্যোতিষসাধক, যোগীতান্ত্রিক-সম্রাট। এঁর বিশেষ ক্ষমতা—ডাক্তাব কবিরাজ ফেল মেরে যাওযা দূরারোগ্য ব্যাধিমুক্তি। জটিল মকদ্দমায জয়লাভ, যাবতীয বিপদ উদ্ধার, নিঃসন্তানেব সন্তানলাভ, যে কোনও পরীক্ষায় পাশ (লেখাপড়ার পাঠ উঠে যাবে শাস্তি ঠাকুবের মত আব কযেকজনের আবির্ভাব ঘটলে।)

এই মুহূর্তে আমার হাতের সামনে পড়ে রযেছে আব একটি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতা শ্রীগৌতম। উনি জ্যোতিষী এবং 'তারাপীঠ ও কামাক্ষ্যায় সিদ্ধহস্ত'। বিশেষ ক্ষমতা—ব্যর্থপ্রেম জোড়া দিতে পাবেন। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে আকর্ষণ করে নিযে আসতে পারেন। ভাড়াটে তুলে দিতে পবেন। মামলা জেতাতে পারেন। ফাঁড়া কাটাতে পাবেন। শত্রু দমন করতে পাবেন (ইস্ ; সাদ্দাম হোসেনের এই খবরটা জানা থাকলে বুশ দমন করতে পারতেন পরম অবহেলে)। বোগমুক্তি ঘটাতে পারেন (মাননীয স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীগৌতমের এই মহান ক্ষমতাকে দেশের কাজে লাগানোর বিষযটা একটু বিবেচনা কবে দেখতে পাবেন। শুরুতে আমরা শুধুমাত্র দেশেব ক্যানসাব চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর কাজ বন্ধ করে রোগীদেব শ্রীগৌতমের চরণতলে এনে ফেলতে পারি)। ইনিও রাজীব গান্ধীর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

রাজীব গান্ধীকে নিযে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার বিষয়টাকে আমি অবশ্য বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে রাজি নই। যেহেতু আমি এমন নিখুঁৎ ভবিষ্যদ্বাণী যখন তখন যে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধেই করতে পারি। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী করার বিদ্যেটা শেখা এতই সোজা যে, আপনাদের শেখালে আপনারাও টপাটপ্ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, খেলোযাড়—সবার সম্বন্ধেই। সত্যি বলতে কী পৃথিবীব তামাম লোকদের সম্বন্ধেই এমন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পাববেন, যদি শিখিযে দিই। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি হলো—"জাতক মারা যাবে" (জন্মালে মবতেই হবে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ব্যর্থ হওযার সম্ভবনা শূণ্য)।

আমার ভবিষ্যদ্বাণীব দৌড় দেখে হাসি পাচ্ছে আপনার ? বিশ্বাস কবুন, সব জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীব দৌড়ই আমারই মতো। তার চেযে আর একটু এগুলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আমি বলতে পারি—শ্রীনবসিমহা রাও শারীরীক অসুবিধেয ভুগবেন। দেশ নতুন নতুন পদক্ষেপ নেবে তাঁর নেতৃত্বে। ব্যবসা, বানিজ্য ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি আনবেন নতুন হাওযা। তবু দেশের বিভিন্ন সমস্যা তাঁকে ও তাঁর সবকারকে পীড়িত করবে। দক্ষিণ ভারতে তিনি জাতীয নেতার সম্মান পাবেন। সরকারকে মাঝে-মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক চাপের মধ্যে থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর রাশি বিচাবে দেখা যাচ্ছে এই সবকার তার পূর্ণমেযাদ

পর্যন্ত টিঁকবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ফল বিচার করলে এই সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। এই সরকারের-মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী বদলের যোগ দেখা যায়। যদিও প্রধানমন্ত্রীর লগ্নবিচার অনুসারে দেখা যাচ্ছে, সরকার-মেয়াদ পূরণ করার আগে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুযোগ আছে। প্রধানমন্ত্রী কোনও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীর কৃপায় এই মৃত্যুযোগ হয়ত কাটিযেও উঠতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের অন্য কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটবে।

এতক্ষণ এই যে এত সব ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, দেখবেন এর প্রায় সবই মিলে যাবে। আপনারাও আমার মত এই ধরনের গুছিয়ে-গাছিয়ে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানী' মার্কা কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সামান্য সাধারণ বুদ্ধি খরচ করা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিশেল করে বাজারে ছাড়ুন, দেখবেন, প্রায় সব মিলে যাবে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী মেলাবার জন্য 'জ্যোতিষী' বা 'তন্ত্রসিদ্ধ' কোনটাই হওযার প্রযোজন হয় না। আমার আপনার মতই সব জোতিষী ও তন্ত্রসিদ্ধদের দৌড়। আমার এই কথা শুনে কোনও জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক বেজায় রকম ক্ষুব্ধ হলে (ক্ষুব্ধ হতেই পারেন, এমনভাবে ভাণ্ডা-ফোঁড় হলে কে না ক্ষেপবেন মশাই।) তাঁদের মস্তিষ্ককে শীতল রাখতে আমার একটি বিনীত প্রস্তাব পেশ করার ইচ্ছে আছে। প্রস্তাবটা বরং এই সুযোগে পেশ করেই ফেলি। যে সব জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতাধরেরা 'ধবি মাছ না দুঁই-পানী' না কবে বাস্তবিকই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম, তাঁরা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পবে 'অমুকের ভবিষ্যৎদ্বক্তা' বলে বিজ্ঞাপন না দিযে এমনটা করুন। আমরা পাঁচজনের নাম বলছি, এঁদের মৃত্যুর দিন ও সময জানিয়ে দিন মাত্র একটিবাবের জন্য কোনও জনপ্রিয় দৈনিক বিজ্ঞাপন দিযে, অথবা আমার বাড়ির ঠিকানায পাঠিযে দিন লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিললে আমাদের সমিতির বহু সহস্র সদস্য খাঁটি যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয দিযে যুক্তিবাদী আন্দোলনের ঝাঁপ বন্ধ কবে নিখুঁৎ ভবিষ্যৎদ্বক্তার খিদ্‌মদ্‌ ঘটবে বাকি জীবন, পরম হৃষ্টচিত্তে।

যাঁদের মৃত্যু বিষযে ভবিষ্যদ্বাণী করতে অনুরোধ জানাচ্ছি—(১) সত্যজিত রায। (২) জ্যোতি বসু (৩) বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (৪) পণ্ডিত রবিশংকর (৫) পি. ভি. নরসিমহা রাও।

শ্রীগৌতম ও অন্যান্য জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিকদের প্রতি আমাদের সমিতির পক্ষে আমার খোলা চ্যালেঞ্জ রইল। মিথ্যে বিজ্ঞাপনে মানুষকে প্রতারিত না করে আমাদের সমিতির এই সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিযে আসুন, প্রমাণ করুন, আপনারা প্রতারক, বুজরুক, মিথ্যাভাষী ও স্ববিরোধী চরিত্রের মানুষ নন। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এমন উদ্ভট ক্ষমতার দাবিদারবা অর্থাৎ আপনারা যদি এগিযে না আসেন, প্রতিটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধরেই নেবেন—আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে ভয়ে আপনারা মুখ লুকোতে চাইছেন। জানি, নিবেট আহাম্মক ছাড়া কোনও জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক-শিরোমণি এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতে এগিযে আসবেন না। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন তাঁরা এক একটি আদ্যন্ত খাঁটি প্রতারক ভিন্ন কিছুই নন। এঁদের মধ্যে যিনি যত বেশি নামী, তিনি তত বড় প্রতারক। এর পরও যদি কোনও জ্যোতিষী বাস্তবিকই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিযে আসেন, তাঁকে পরাজয স্বীকার করতেই হবে। 'বশীকবণ', 'বোগমুক্তি'র মত ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে এলেও ধরাশাযী হতেই হবে। ওই সব বিজ্ঞাপনদাতাদের বিরুদ্ধে রইল খোলা

চ্যালেঞ্জ।

যে-কটা নাম বললাম, বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা কিন্তু তাতেই শেষ নয, মানুষের দুর্বলতা ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিযে ওদের সংখ্যাও অশেষ।

পনের : জ্যোতিষীরা বলেন, মানুষ জন্মের সময তার ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কোথা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে ? জ্যোতিষীরা বলছেন, পূর্বজন্ম থেকে। পূর্বজন্মের কর্মফল হিসেবে কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে সৌভাগ্য, কেউ দুর্ভাগ্য। এ-জন্মে জাতক পূর্বজন্মের কতটা ফল ভোগ করবে ? কতটা ফল এ-জন্মের প্রচেষ্টার ফলে ভোগ করবে ? নিশ্চয এই জিজ্ঞাসা অনেকের চিন্তাতেই উঠে এসেছে। এ বিষযে 'অমৃতলাল' নামের সবচেযে বেশি প্রচার পাওয়া জ্যোতিষী কি বলছেন একটু দেখা যাক। 'বর্তমান' পত্রিকার ১৯ জুলাই ১৯৮৬তে অমৃতলাল পুরো পাতাজোড়া একটি বিজ্ঞাপন দেন। সেখান থেকেই অমৃতলালের বক্তব্য তুলে দিচ্ছি :

"জ্যোতিষশাস্ত্রকে মানতে গেলে জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন এসেই যায়। আর এই জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক স্বীকৃতি পেতে চলেছে। মানুষ ইহজন্মে যে ফলভোগ করে, তার ৬৫ শতাংশ পূর্ব জন্ম থেকে প্রাপ্ত। এব মধ্যে শুভ ও অশুভ এই দুইয়েরই মিশ্রিত ফল থাকতে পারে। আর ইহজন্মের কর্মফলেব ৩৫ শতাংশ ইহজন্মেই ভোগ করে। বাকি ৬৫ শতাংশ সঞ্চিত থাকে পরজন্মের জন্য। এই যে ইহজন্মের ৩৫ শতাংশ ফল মানুষ পাচ্ছে, তা will force এবং Proper Guidance মাধ্যমে Favour-এ নিয়ে আসা সম্ভব। এবার দেখুন, পূর্বজন্মের নির্ধারিত কিছু অশুভ অংশ এবং ইহজন্মের কৃতকর্মের শুভ অংশ দুটো মিলিযে মানুষ অধিকাংশ সুফল ভোগ করতে পারে। আর এই অধিকাংশ শুভফল লাভের ক্ষেত্রে একজন কৃতী ও বিজ্ঞ জ্যোতিষীর পরামর্শ এবং ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে বাস্তবে শুভকাজ করলেই সুফল পাওয়া যায না। আবাব কুকর্ম করলেই কুফল আসে না।"

অমৃতলালের এত বক্তব্য শোনার পর মনে কিছু প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। যেমন, এ জন্মে এ পর্যন্ত আমি কি কি শুভ বা পুণ্যের কাজ করেছি আমার জানা নেই, আমি হিসেব রাখিনি। হিসেব রাখা সম্ভবও নয়। কাবণ, কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য এই হিসেবটাই তো বড় নড়বড়ে, বড় গোলমেলে। আমি যে দর্শন ও চিন্তাব দ্বাবা পরিচালিত, আমার কাছে যা আদর্শ, আর একজনের দৃষ্টিতে তা অনাচার, অনাদর্শ মনে হতেই পারে। তবে ? কীভাবে হিসেব রাখব ? আমার নিজের সারাজীবনেব পাপ-পুণ্যেব হিসেব বাখা অসম্ভব ব্যাপার। আর পাঁচজনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অসম্ভব। এমন অদ্ভুত হিসেব, বর্তমান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের পাপ-পুণ্যের হিসেব বহু মানুষের জন্য আলাদা আলাদা কবে সংগ্রহ করে রাখা চারটিখানি ব্যাপাব নয়। আর কাজ তো শুধু এজন্মের পাপ-পুণ্যের সঞ্চিত ফল নিয়ে নয়। তারপর আছে গতজন্মের জীবনেব প্রতিটি মুহূর্তের পাপ-পুণ্যের হিসেব সংগ্রহ। জানি না, এইসব অদ্ভুত কাজকর্ম কারা করলেন। তাবপব আবার এ-জীবনেব প্রতিটি মুহূর্তের ফল দেখে ওরা শেষ-পর্যন্ত নিশ্চযই অনেক অংক-টংক কষে এই সিদ্ধান্ত পৌঁচেছেন যে মানুষ ইহজন্মে গতজন্মের ৬৫ শতাংশের ইহজন্মের ৩৫ শতাংশ ফল ভোগ কবে।

জানতে অবশ্যই ইচ্ছে কবে, কে বা কারা এই গবেষণা চালালেন। এ তো চারটিখানি

গবেষণা নয় ? ধরুন গে ইহজন্মে রামবাবুর সঙ্গে জোঁকের মত দিন রাত, বড় বাথরুম থেকে রাতের বেডরুম পর্যন্ত লেগে থেকে প্রতিনিয়ত তাঁর পাপ-পুণ্যের হিসেব কষে রাখলাম। আবার রামবাবু যেই মুহূর্তে মারা গেলেন, সেই মুহূর্তে আমিও মরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রামবাবু জন্মালেন। আমিও রামবাবুর আশেপাশেই জন্মলাম, রামবাবুর দৈনন্দিন পাপ-পুণ্যের হিসেব বাখতে হবে তো। কিন্তু এখানেও এক সমস্যা। জন্মেই কি করে রামবাবুর পাপ-পুণ্যের হিসেব রাখব ? রামবাবুকে প্রতিটি মুহূর্ত নজরে রাখা, খাতা, কলম, হিসেব রাখা। জন্মেই লিখতে পারব কি করে ? রামবাবুর বর্তমান জন্মের শেষ পর্যন্ত হিসেব রাখার পরের জন্মে অর্থাৎ তৃতীয় জন্মে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি হিসেব রেখেছি। কিন্তু তাতে গত জন্মে যে রামবাবু গতজন্মের ৩৫ শতাংশ এবং তার আগের জন্মের ৬৫ শতাংশ ফল ভোগ করেছিলেন, এমনটা প্রমাণ করব কি করে ? ৩৫ শতাংশ না হয়ে ওটা যে ৩৪ শতাংশ বা ৩৭ শতাংশ নয়, এর প্রমাণ কী ? অথবা ৬৫ শতাংশ না হয়ে সেটা যে ৪০ শতাংশ বা ৩০ শতাংশ নয়, তার প্রমাণ কী ?

এ-সব বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ দেবার দায়িত্ব আমার নয়, অমৃতলালের। আমাদের সমিতির সদস্য পাগলা বিশু অবশ্য দাবি করেছেন, অমৃতলালের হিসেবে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। ওটা ৩৫ শতাংশ ও ৬৫ শতাংশ না হয়ে হবে ২৪.৭৬ শতাংশ এবং ৭৫.২৪ শতাংশ। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, "অমৃতলালের হিসেব ভুল এবং আপনার হিসেব ঠিক, এটা প্রমাণ করতে পারবেন ?" পাগলা বিশু উত্তরে বেজায় হেসে বলেছিলেন, "অমৃতলাল ওঁর হিসেবটা প্রমাণ করতে এলে হাতেনাতে ভুল ধরিয়ে দেব।"

অমৃতলালের এই জন্মান্তর ও কর্মফলতত্ত্ব মেনে নিলেও আর এক বিপদ। এ জন্মে ভারতের প্রায় আশি কোটি মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ কোটি মানুষ গতজন্মের ফলভোগের জন্য নির্দিষ্ট ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, কারণ তখন জনসংখ্যা কম ছিল। পৃথিবীর জনসংখ্যাও গতজন্মের হিসেব ধরলে যথেষ্ট কমই ছিল। তাহলে বাড়তি জনসংখ্যা কার কর্মের ফল ভোগ করছে ?

আর এক জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তীর মতেও মানুষ গত জন্মের কর্মফলই এ-জন্মে ভোগ করে। এ জন্মের কর্মফল আগামী জন্মে। তাঁর কথায়, *"হিন্দুধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাই যখন তার পূর্ব-দৈহিক নিজ কর্ম থেকে ভাগ্যের উৎপত্তি হল তখন মানুষ নিজেই নিজ ভাগ্যের জন্মদাতা, অথবা কর্মই ভাগ্যের জনক। পূর্বজন্মাকৃত ফলাফল ভোগের জন্য মানুষ গ্রহের নির্দিষ্ট অবস্থানে জন্মগ্রহণ করে শুভাশুভ ফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। তাদের এই শুভাশুভ ফল গ্রহের ভগণ থেকেই নির্ণয় করা হয় বলেই এর নাম ভাগ্য।"*

ডঃ চক্রবর্তীর মতামত থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, তিনি অমৃতলালের ওই ৬৫ শতাংশ ও ৩৫শতাংশ এর মতামতকে একেবারেই পাত্তা দিতে নারাজ। জানি না, তিনি অমৃতলালের মতই কয়েকজন্ম ধরে গবেষণায় রত ছিলেন কিনা।

এখানেও কিন্তু একটি সমস্যা রয়েছে। একজনের কয়েক জন্মের তথ্যের ওপর কখনই এমন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব খাড়া করা আদৌ উচিত হবে না। এজন্য অ্যাট র‍্যাণ্ডম

সার্ভে করা উচিত। অন্তত হাজারখানেক লোকের ওপর অনুসন্ধান চালান উচিত ছিল। তাতে অবশ্য ওদের হাজারবার জন্ম নিতে হবে। প্রত্যেক জন্মে গড় আয়ু পঞ্চাশ ধরলে পঞ্চাশ হাজার বছর পরে আমরা নিশ্চয়ই তাঁদের মতামতগুলোকে অনেক বেশি গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করব। এবং তখন ওঁদের কাছে প্রমাণ-পত্তর চাইব, পূর্বজন্মের ৬৫ শতাংশ এবং ১০০ শতাংশ মনে হওয়ার পিছনে ওঁদের কি কি যুক্তি আছে।

কিন্তু মুশকিল হলো এখানেও একটা সমস্যা আছে। ডঃ চক্রবর্তী, অমৃতলাল এবং অন্যান্য সহমতের জ্যোতিষীরা আমার ওপর নিশ্চয় যথেষ্টই ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, একের পর এক সমস্যার কথা তোলাতে। আমি এঁদের প্রত্যেকের কাছেই বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ক্রুদ্ধতা উৎপাদনের জন্য। কিন্তু কি করি বলুন মশাই? আপনারা এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব হাজির করেছেন, যেগুলো ধোপে টেঁকে না, শুধু একের পর এক সমস্যাই সৃষ্টি করে।

"হিন্দুধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী"—ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী জোতিষ-সম্রাট এই কথাটি স্বীকার করার মধ্যে দিয়ে স্বীকার করেছেন জন্মান্তরবাদ একটি বিশ্বাসমাত্র, এর পেছনে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। বাস্তবিকই নেই। পুনর্জন্ম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রচণ্ড বিরোধ। বিশ্বে প্রধান ধর্মমত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। হিন্দু ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। আব প্রত্যেকটি ধর্মই তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে।

হিন্দুধর্মের বহু ধর্মীয় নেতারাই মত প্রকাশ করেছেন 'আত্মা' মানে 'চিন্তা', 'চেতনা', 'চৈতন্য' বা 'মন'। শারীর-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি, 'মন' বা 'চিন্তা' মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল। মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা বা মনের অস্তিত্ব অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব। আমাদের মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু ঘটে। এক সময় মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষ পুড়ে, পচে অথবা অন্য প্রাণীর খাদ্যরূপে নিজের স্থূল অস্তিত্বটুকুই শেষ করে দেয়। তারপর স্নায়ুকোষ যেহেতু নেই, তাই তার কাজকর্মও সম্ভব হয় না, তার কাজকর্মের ফল হিসেবে 'চিন্তা', 'মন' বা 'আত্মা'রও অস্তিত্ব থাকে না, থাকতে পারে না। যে আত্মার অস্তিত্ব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে আবার জন্মাবে কী করে? ('আত্মা' এবং 'জন্মান্তর' বিষয়ে অতি বিস্তৃত আলোচনা ১ম খণ্ডে করা হয়েছে বলে এখানে মাত্র কয়েকটা লাইনের বেশি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখি না।)

ষোল : যমজ সন্তান জন্মালে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুই যমজ জাতকের জন্মছকই পুরোপুরি এক। এমন কি নক্ষত্রও একই ঘরে অবস্থান করছে। অথচ দুই যমজের অদৃষ্ট কিন্তু কখনই এক হয় না (যদিও গল্পে হয়)। এদের সব সময় যে একই রকম দেখতে হবে, তেমনটিও ঠিক নয়। অনেক সময় চেহারায়ও বৈপরিত্য দেখা যায়। একজন রোগা, অপরজন মোটা, একজন ফর্সা, অপরজন কালো। কিন্তু একই সময় একই ঘরে একই নক্ষত্র নিয়ে জন্মালে যমজদের ক্ষেত্রে উচিত ছিল বিদ্যায় দু'জন সমমানের হবে, একই শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে, একই ধরনের সুন্দরীকে দু'জনে বিয়ে করবে। দু'জনের একই সংখ্যক শ্যালক-শ্যালিকা থাকবে, দু'জনেই মাসে রোজগার করবে একই অংকের টাকা। একজন একদিন ট্যাক্সিতে চাপলে অন্যজনও সেইদিনই ট্যাক্সিতে চাপবে, একজন গাড়ি চাপা পড়লে অন্যজনও

সেদিনই গাড়ি চাপা পড়বে। কিন্তু এমনটা তাত্ত্বিকভাবেই কখনই সম্ভব নয়।

জ্যোতিষীরা এইক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, দু'জনের জন্ম সময়ের ব্যবধান দেখিয়ে। কিন্তু লগ্নকাল কখনই মাত্র কয়েক মিনিট নয়। বরং দশ-পনের মিনিট বা আধ-ঘন্টা পরে জন্মালেও বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় গ্রহ ও নক্ষত্রসন্নিবেশ একই থাকে। (জ্যোতিষীরা যাতে ভুল বোঝাবার অবকাশ না পান, তাই সুপাঠক-পাঠিকাদের জন্য 'জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচার পদ্ধতি' অধ্যায়টি রচনা করেছি।)

সতের : যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান হেতু মানুষ এক সময় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেই মরত, সেই গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কী এখন আর আগেকার মত মানুষদের জন্মছককে বিরাজ করে না ? নাকি, যক্ষ্মা রোগের ওষুধ আবিস্কৃত হতেই গ্রহ-নক্ষত্রদের প্রভাব-ক্ষমতা কমে গেছে ? কিছু কাল আগেও ম্যালেরিযা, কলেরা, প্লেগে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হযে যেত। ওই সময কী তবে গ্রহ-নক্ষত্রদের যে ক্ষমতার জন্য মানুষ এমন বোগভোগের পর মৃত্যুকে বরণ করত, এখন সেই সব গ্রহ-নক্ষত্র শক্তিহীন হয়ে পড়েছে—ওইসব রোগের ওষুধ আবিস্কৃত হওয়ার জন্য ? হায় গ্রহ-নক্ষত্রের দল ! তোমাদের শক্তিকে প্রভাবিত করে মানুষেরই আবিস্কৃত ওষুধ। পথদুর্ঘটনাকে পথনিরাপত্তা পালনের মধ্য-দিয়েই কমিয়ে ফেলা যায ; দুর্ঘটনা বোধ করতে যা গ্রহ-রত্নের চেযে অবশ্যই কার্যকর।

আঠার : জ্যোতিষীরা ব্যক্তিভাগ্যের কথা বলেন। বলেন, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ভাগ্যই নিদৃষ্ট হযে রযেছে। তাই যদি হয, তবে অবশ্যই বিভিন্ন মানুষের মৃত্যুযোগ ভিন্নতর হতেই বাধ্য। কিন্তু ভূমিকম্পে, যুদ্ধে, ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগে একই সঙ্গে শত-সহস্র মানুষ মারা যাচ্ছে কী করে ? একই দিনে একই সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ হিরোসিমায মরেছিল, হাজার হাজার মানুষ ভুপালে মরেছিল, হাজার হাজার মানুষ ম্যাক্সিকোয মরেছিল, মরেছিল বাংলাদেশের তুফানে, উত্তরকাশীর ভূমিকম্পে। এরপরও কী বিশ্বাস করতে হবে ব্যক্তি-ভাগ্য আছে। ব্যক্তি-ভাগ্যই মানুষের অদৃষ্টের শেষ কথা ?

উনিশ : জ্যোতিষশাস্ত্র বাস্তবিকই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলে পৃথিবীর ইতিহাসের চেহারাই যেত পালটে। প্রাচীন যুগ থেকে হিটলার পর্যন্ত যাঁরা যুদ্ধযাত্রা শুরু করতেন জ্যোতিষ-বিচারেব ওপর নির্ভর করে, যুদ্ধজয় নিশ্চিত করে, তাদের পরাজিত হতে হতো না। অনেক রাজাকেই প্রাণ হারাতে হতো না গুপ্তঘাতকের হাতে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয গান্ধী, রাজীব গান্ধীর ভাগ্য বিচার করেছিলেন কযেক শত জ্যোতিষী, তাঁদের মধ্যে একজনও জাতকদের ওই ওই সমযে ওই ওই ভাবে মৃত্যু বিষযে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি। এই জ্যোতিষীদের অনেকেই তাঁদের আয়ুষ্কামনায়, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছেন। কিন্তু তাতে ফাঁড়া কিছু কাটেনি। (যাঁরা এমন নিজেদের বিজ্ঞপ্তি করেছেন রাজীব গান্ধীর সঞ্জয গান্ধীর বা ইন্দিরা গান্ধীর ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে, তাঁদের ভবিষ্যৎবাণীর দৌড়টা কী ধরনের, সে নিযে একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি। তাঁদের দৌড় আমাদের

সমিতি'র হাজারখানেক সদস্যের চেয়েও খারাপ।)

কুড়ি : আজকাল এক ধরনের জ্যোতিষীর সংখ্যাও বেড়েছে, যাঁরা বলেন, ভাগ্য বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহবিচার প্রধান নয়, বাক্‌সিদ্ধান্তই প্রধান। এই ধরনের 'বাক্‌সিদ্ধা', 'মা-বাবারা আজকাল ভালই করে-কর্মে খাচ্ছেন। এক অধ্যাত্মজগতের মহাপুরুষ হিসেবে সুপরিচিতের কাছে শুনেছি, "জ্যোতিষীদের বিশেষ জ্যোতি থাকা চাই, না হলে সে আবার জ্যোতিষী কী? এই বিশেষ জ্যোতি জ্যোতিষ-শাস্ত্র পড়ে পাওয়া যায় না, এ হলো যোগের ফল, যাকে আমরা বলি বাক্‌সিদ্ধ।" শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ-এর স্নেহধন্য সাধক, যোগী, জোতিষী হরেকৃষ্ণবাবার কথা মতে—জ্যোতিষশাস্ত্রই জোতিষীদের সফল ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে শেষ কথা নয়। ভাল জ্যোতিষী হতে গেলে চাই বিশেষ জ্যোতি, বিশেষ দেখার চোখ। মানুষকে দেখার চোখ, বোঝার চোখ, যা তাকে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীতে সাহায্য করে। একেই কেউ কেউ বলেন 'বাক্‌সিদ্ধ'।

ইংরিজি SUNDAY সাপ্তাহিক পত্রিকার সাপ্তাহিক রাশিফল লেখক, 'মেটাল ট্যাবলেট'খ্যাত সুবিখ্যাত জ্যোতিষী অমৃতলালের কথায়, একজন জ্যোতিষীকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মনস্তাত্ত্বিক হতে হবে।

সাংবাদিক পার্থ মুখোপাধ্যায় পেশায় না হলেও নেশাগতভাবে জ্যোতিষী। তিনি একটি বিখ্যাত পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "জ্যোতিঃদর্শন না হলে জ্যোতিষী হয় না। যিনি ঈশ্বরীয় সত্ত্বাকে দর্শন করেছেন, তিনিই প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।" ভবিষ্যৎ বলতে যদি বিশেষ জ্যোতির ভূমিকাই প্রধান হয়; তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভূমিকা কী? জ্যোতিষশাস্ত্রের চেয়ে যোগই যদি ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে প্রাধান্য পায়, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন কী?

মানুষকে দেখার চোখ, বোঝার চোখ থাকলে একজন মানুষের অনেক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক হদিশই পাওয়া যায়, এটা যুক্তিবাদীমাত্রেই স্বীকার করেন। অনুশীলনে আপনিও এই ক্ষমতা অবশ্যই আয়ত্ব করতে পারেন, যেমন আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত বহুজনই আয়ত্ব করেছেন। শুধুমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি এবং মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে সমিতির অনেক সদস্যই একজনের সম্বন্ধে এত কথা বলে যেতে পারেন যে, তা-বড় জ্যোতিষীরাও সে-ক্ষমতা দেখে ঈর্ষা করবেন।

যুক্তিবাদীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই সেইসব জ্যোতিষীদের যাঁরা অতন্ত একবারের জন্য হলেও সত্যকে স্বীকার করেছেন; জানিয়েছেন, জোতিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে মানুষের মনস্তত্ব বোঝাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরী। এইসব স্বীকারোক্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস কিন্তু প্রকট হয়ে উঠেছে; সেটা হলো, ভাগ্য-গণনার ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের দেউলেপনা।

একুশ : জোতিষশাস্ত্রে রোগের কারণ গ্রহজনিত বলেই স্বীকৃত। শুধুমাত্র কারণ জেনেই এ শাস্ত্র চুপ করে থাকেনি। রোগমুক্তির জন্য ধাতু, রত্ন ইত্যাদি ধারণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন জ্যোতিষীরা। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবেই রত্ন, ধাতুতে রোগ নিরাময় অসম্ভব। কারণ, রোগভোগ

করা ভাগ্যে যদি নির্ধারিতই থাকে, তবে কোনও রত্ন, ধাতু, ওষুধ বা ঈশ্বরকৃপাই সেই রোগভোগ থেকে জাতককে মুক্তি দিতে পারে না।

গ্রহরত্ন বা অন্য কোনও কিছু যদি মানুষের ভাগ্যকে পাল্টেই দিতে পারে, তবে তো বলতেই হয় মানুষের ভাগ্য আদৌ পূর্বনির্ধারিত নয়, প্রচেষ্টা এবং পরিবেশই মানুষের ভাগ্যের নির্ধারক।

বহু রোগের কারণই জীবাণু। বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ধ্বংসে সক্ষম। ওষুধ প্রয়োগে জীবাণু ধ্বংস করে ; ওষুধের এই ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে বার বার। কখনও রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে শরীরে, তারপর ওষুধ প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কখনও বা টেস্টটিউবে সংরক্ষিত রোগ জীবাণুর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। বার বার এই জাতীয় পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই শুধু এইসব ওষুধের ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রত্নের যে এ ধরনের রোগ জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা আছে—এই দাবির পিছনে কোনও বাস্তব সত্যতা নেই। কোনও গবেষণাগারে এই জাতীয় পরীক্ষা হয়েছে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণাগারে বিভিন্ন জীবাণুর ওপর রত্ন প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে, এবং সেই পরীক্ষাগুলোতে রত্নের কার্যকর ভূমিকা সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এমনটা ভাবার মত তথ্য শুধুমাত্র এই লেখকের হাতেই নয়, পৃথিবীর তামাম জ্যোতিষীদের কারও হাতেই নেই। এই বক্তব্যটুকু আমার ধারণাপ্রসূত বলে কোনও চতুর জ্যোতিষী বা উন্নাসিক তার্কিক উড়িয়ে দিতে চাইলে বলব, ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এই বিষয়ে খবর নিয়েছি, মতামত নিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বহু জ্যোতিষ-গবেষণা কেন্দ্রের। প্রতিটি মতামতই আমার বক্তব্যেরই সমর্থক। এর পরও কেউ যদি এমন আলপটকা একটা দাবি করেই বসেন, সেই দাবির সমর্থনে প্রমাণ নিশ্চয়ই তিনি হাজির করবেন। সে-ক্ষেত্রে আমাদের সমিতি (সমিতির সদস্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীও রয়েছেন) সর্বতোভাবে ওই দাবিদারের দাবিকে বিজ্ঞানের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে।

বাইশ : জ্যোতিষীদের মতে, মহাজাগতিক রশ্মি বা cosmic-ray-র যে সাতটি রঙ আছে (বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল) তার প্রভাব বিদ্যমান প্রতিটি মানুষের ওপর। মানুষের শরীরে রয়েছে সাতটি স্নায়ুচক্র। মহাজাগতিক রশ্মির সাতটি রঙই এই সাত স্নায়ুচক্রের নিয়ন্তা। যদি কোনও কারণে মানুষ কোনও একটি বা একাধিক মহাজাগতিক রঙকে কম শোষণ করে বা গ্রহণ করতে অক্ষম হয় তখনই দেখা দেয় শরীর, মনের অসুস্থতা। সেই সময় জ্যোতিষীরা রোগ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, শরীরে কোন্ রঙের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ওই ঘাটতি পূরণের জন্যেই রোগীকে ধারণ করতে বলা হয় গ্রহরত্ন। জ্যোতিষীদের ধারণা, ওই রত্নের মধ্য দিয়ে শরীরে ঘাটতি পড়া রঙটি ধারণকারীর শরীরে শোষিত হয়। ফলে শরীরে রঙের ঘাটতি কমে, এবং শরীর ওই ঘাটতিজনিত অসুখ থেকে মুক্ত হয়।

আরও একরকমভাবে রত্ন-চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। এ-ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের পর,

রোগের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রহরত্নটি সুরাসারে (absolute alcohol) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর ওই সুরাসার জলে মিশিয়ে অথবা সুগার অফ মিল্কে মিশিয়ে নির্দিষ্ট মাপে রোগীকে খাওয়ান হয়। এভাবেও রঙের ঘাটতি মহাজাগতিক রশ্মি থেকে রত্নে, রত্ন থেকে সুরাসারে, সুরাসার থেকে জল বা সুগার অফ মিল্ক হয়ে শরীরে শোষিত হয় বলে বহু জ্যোতিষীই বিশ্বাস করেন।

জ্যোতিষীদের এমন দাবিকে মেনে নিতে আমাদের, বিজ্ঞানমস্ক ও যুক্তিবাদীদের তীব্র আপত্তি আছে। আপত্তির প্রথম কারণ, মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে রামধনুর সাতটি রঙ মিশিয়ে বাস্তব বর্জিত কল্পনা। বাস্তবে মহাজাগতিক রশ্মি বা cosmic ray হলো এক ধরনের তড়িৎ-কণার অদৃশ্য বিকিরণ। শব্দ বা বিদ্যুতের মতই অদৃশ্য এই বিকিরিত তড়িৎ-কণা বর্ণহীন। মহাকাশ থেকে নেমে আসা এই মহাজাগতিক রশ্মির অনেকটাই পৃথিবীতে পৌঁছোবার আগে বাধা পায় পৃথিবীকে ঘিরে রাখা চৌম্বক ক্ষেত্রে। এরপর যেটুকু মহাজাগতিক রশ্মি এসে পড়ে আমাদের পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। আমরা যে জল পান করছি, সেই জলেও রয়েছে অদৃশ্য মহাজাগতিক রশ্মি।

জ্যোতিষীরা তাঁদের অজ্ঞানতা থেকেই এবং সম্ভবত রামধণুর সাতটি রঙ দেখেই মহাজাগতিক রশ্মির সাতটি রঙ আছে বলে কল্পনা করে নিয়েছেন। যে হেতু মহাজাগতিক রশ্মি বর্ণহীন তাই, মহাজাগতিক রশ্মির রঙ মানবদেহে শোষিত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না ; অতএব কম শোষিত বেশি শোষিত হওয়ার প্রশ্নও একেবারেই অবান্তর ও চূড়ান্ত মুর্খতা। সুতরাং মহাজাগতিক রশ্মির রঙ কম শোষণের ঘাটতি পূরণের জন্য রত্নধারণ বা রত্নধোয়া জলের পানের প্রশ্নও উঠতেই পাবে না।

আরও একটা মজা কিন্তু জ্যোতিষীদের এই বিশ্বাসের সঙ্গেই মিশে রয়েছে। সেটা হলো—পৃথিবীর যাবতীয় অসুখ-বিসুখই মাত্র সাতটি ভাগে বিভক্ত (কারণ প্রতিটি রোগই এসেছে সাতটি রঙের কোনও একটির ঘাটতি থেকে)।

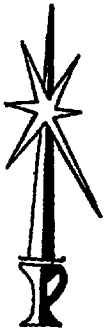
আরও একটি স্ব-বিরোধীতা যে জ্যোতিষীদের এই রত্ন-চিকিৎসার সঙ্গে মিশে রয়েছে তা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকারা ধরতে পেরেছেন। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন—অসুখ যদি নির্ধারিতই থাকে, তাহলে রত্ন-চিকিৎসা ফলপ্রসূ হবে কি করে ? আর রত্ন-চিকিৎসায় ফল পাওয়া গেলে জোতিষশাস্ত্রের গোড়ার কথাই (ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত) যে বাতিল হয়ে যায়।

তেইশ : জোতিষশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিলে অনেক শাস্ত্র অনেক ঘটনাকেই ভ্রান্ত বলে বাতিল করতেই হয়। জোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করলে চিকিৎসাশাস্ত্রকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হয়। কারণ, ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই থাকতে পারে না।

চব্বিশ : জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ, প্রশাসন, আইনের শাসন, সব কিছুকেই অস্বীকার করতে হয়। অপরাধ যখন সংগঠিত হবার, তখন হবেই, শাস্তি যখন পাবার, তখন অপরাধী শাস্তি পাবেই। পুলিশ রেখে পূর্বনির্ধারিত অপরাধ যখন কিছুতেই ঠেকান যাবে না, তখন পুলিশখাতে ব্যায় একান্তই অপ্রয়োজনীয়।

পঁচিশ : জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করলে রাষ্ট্র-বাজেটের সেনা-খাতে ব্যায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যুদ্ধ যদি ভাগ্যে থাকে, তাকে লণ্ডাবে কে ? আর যুদ্ধে হার-জিৎ ? সেও তো ভাগ্যেরই হাতে। পরাজয় ভাগ্যে থাকলে কোনও সেনাবাহিনীই তাকে জয়ে রূপান্তরিত করতে পারবে না। আর জয় যদি হবার থাকে, তবে যে সেনাবাহিনী নিয়েই লড়ি, যে অস্ত্র দিয়েই লড়ি, জয় হবেই ; তা সে পেঁপের ডাঁটা নিয়ে পারমাণবিক বোমা, লেজারগান ও মিশাইলের বিরুদ্ধে লড়লেও হবে। অতএব সেনাবাহিনীর খরচ বহন করা রাষ্ট্রের পক্ষে অতি অপ্রয়োজনীয় ব্যায় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

ছাব্বিশ : আগের তিনটি যুক্তির সূত্র ধরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তালিকা প্রস্তুত করে প্রমাণ করা যায়—জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করে নিলে জীবনের প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই অস্বীকার করতে হয়। কারণ, ভাগ্য যেখানে পূর্বনির্ধারিত, প্রচেষ্টা সেখানে মূল্যহীন, ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই আর প্রচেষ্টার তালিকা দীর্ঘতর না করেই থামছি, কয়েকটি উদাহরণেই পাঠক-পাঠিকরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন, ধরে নিয়ে।



নয়

মানব শরীরে রত্ন ও ধাতুর প্রভাব

আমার অতি পরিচিত বেজায় নাম-ডাকওয়ালা এক চিকিৎসক সম্প্রতি বিদেশ গিয়েছিলেন। বিদেশে উনি মাঝে-মধ্যেই যান বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্তাব্যক্তি হওয়ার সুবাদে। এবার ফিরে আসার পর দেখা হতেই একটা নতুন জিনিস নজরে পড়ল। ডান হাতের চওড়া কব্জিতে দেখতে পেলাম ঘড়ির বেল্টের মত চওড়া একটা ধাতুর বেল্ট। "এটা কী?" জিজ্ঞেস করায় চিকিৎসক-বন্ধু জানালেন, "ম্যাগনেটিক বেল্ট। ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে। শুনেছি এটা ব্লাডপ্রেসার কন্ট্রোলে রাখতে খুবই হেল্প-ফুল। ভাবলাম, একটু পরীক্ষা করেই দেখা যাক, তাই কিনে ফেললাম।"

ডাক্তার-বন্ধুর সঙ্গে ফি-হপ্তায় আমার দেখা হয়। ম্যাগনেটিক বেল্ট দর্শনের দিন পনের বাদে দেখা হতেই উনিই বললেন, "ম্যাগনেটিক বেল্টে কিন্তু বেশ ভালই কাজ হচ্ছে প্রবীরবাবু।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮-র ২৯ জুলাই সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেদনে আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে লেখা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

> *"প্রীতিভাজনেষু জ্যোতিবাবু,*
>
> *আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম আপনি স্পন্ডিলাইটিসে কষ্ট পাচ্ছেন। আমি স্পন্ডিলাইটিসে অনেকদিন ধরে ভুগেছি। তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রতুল মুখার্জী আমাকে একটা বালা দেন যার মধ্যে হাই ইলেকট্রিসিটি ভোল্ট পাশ করানো হয়েছে। সেটা পরে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হই। আমি আপনাকে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা তামার বালা পাঠাব, আশা করি সেটা পরে আপনি উপকার পাবেন।*
>
> *আপনার দ্রুত নিরাময় কামনা করি, আমি এখন আরামবাগে আছি।*

পুনঃ সম্ভব হলে সাইকেলে অন্তত দৈনিক আধঘন্টা চাপবেন। আপনি বোধহয় জানেন, আমি সাইকেলে চেপে একদা ভাল ফল পেয়েছি।

স্বাঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন
২৮. ৭. ৮৮

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান, তামার বালা পরেছিলেন ১৯৭৯-তে। শ্রী সেনের কথায়, "স্পন্ডালাইটিস হয়েছিল। ডঃ নীলকান্ত ঘোষাল দেখছিলেন। কিছুই হলো না। কিন্তু যেই তামার বালা ব্যবহার করলাম, প্রথম ৭ দিনে ব্যথা কমে গেল। পরের ১৫ দিনে গলা থেকে কলার খুলে ফেললাম।"

এই পতিবেদনটি প্রকাশিত হওযার পর নাকি তামার বালা বিক্রি খুবই বেড়ে গিযেছিল শহর কলকাতায। আমাকে বেশ কিছু মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হযেছে—তামার ব্যবহারে সত্যিই কী বাত সারে? ইলেকট্রিসিটি পাশ-করান তামা মাটিতে না ছুঁইয়ে অর্থাৎ "আর্থ" (earth) না করে পরলে কী স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডিলেসিস, আরথ্রারাইটিস ইত্যাদি সারে? বহু বিজ্ঞান সংস্থার সভ্য, বিজ্ঞান-আন্দোলনকর্মী এই ধরনের প্রশ্ন আমাব কাছে রেখেছিলেন। বুঝেছিলাম, প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বক্তব্য ও জ্যোতি বসুকে লেখা চিঠি শুধু সাধাবণের মধ্যে নয়, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, কারণ এব সঙ্গে ডঃ প্রতুল মুখার্জির পরামর্শ এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের রোগমুক্তির স্বীকারক্তি জড়িযে রযেছে।

শবীবের উপর ধাতুর প্রভাব রযেছে; অর্থাৎ ধাতু ধারণ করলে সেই ধাতু শোষিত হযে শরীবে প্রবেশ করে আমাদের অনেক উপকার-টুপকার করে—এই ধরনের একটা ধারণা বা বিশ্বাস শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বহুজনের মধ্যেই রযেছে। এরই সঙ্গে রযেছে বিদ্যুৎ-শক্তি সম্পর্কে কিছু অলীক ধারণা।

"আর্থ" না কবে তামার বালা পরে জীবনধারণ করার চিন্তা মোটেই বাস্তবসম্মত নয। তামাকে 'আর্থ' হওযা থেকে বাঁচাতে বালাধারণকারীকে তবে পৃথিবীর ছোঁযা থেকে নিজেকে সবিযে বেখে জীবন ধারণ কবতে হয। কারণ বালাধারণকারী পৃথিবীব সংস্পর্শে এলেই বালাব তামা 'আর্থ' হযে যাবে। আরও একটি বৈজ্ঞানিক সত্য এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা একান্তই জরুরী, বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওযার পর তাবে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে না।

মানব দেহে অল্প পবিমাণে বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে এবং নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসাতে মৌলিক দ্রব্যেব ব্যবহাব সুবিদিত। গর্ভবতীদেব রক্ত-স্বল্পতার জন্য LIVOGEN CAPSULE বা ঐ জাতীয় ওষুধ ব্যবহাব কবা হয, যাব মধ্যে সংশোধিত অবস্থায রযেছে লোহা। প্রস্রাব সংক্রান্ত অসুখেব জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে MERCUREL DIURETIC (Diamox) দেওযা হয, যার মধ্যে বযেছে সংশোধিত অবস্থায পারদ। এক ধবনের বাতের চিকিৎসায অনেক সময MYOCRISIN দেওযা হয। যার মধ্যে সংশোধিত অবস্থায বযেছে সোনা।

যখন রক্তস্বল্পতার জন্য রোগীকে LIVOGEN CAPSULE বা এই জাতীয় ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন, তখন পরিবর্তে রোগিনীকে এক কুইন্টাল লোহার ওপর শুইয়ে রাখলেও কিছুই ফল পাওয়া যাবে না। কারণ মৌল দ্রব্য বা ধাতু শরীরে ধারণ করলে তা কখনই শোষিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে না। সুতরাং শরীরে প্রবেশ করে ঘাটতি মেটাবার প্রশ্নও তাই একান্তই অবান্তর।

জানি, এখানেই আলোচনা থামবে না। থামেওনি। একটি অতি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক নিজেই বিশ্বাস করেন, শরীরে ধাতুর প্রভাব আছে, রত্নের প্রভাব আছে, ইত্যাদি। তিনি তাঁর বালক পুত্রের রোগমুক্তির জন্য তাই একই সঙ্গে ধাতু, রত্ন ইত্যাদি এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছেন। আর ওই পত্রিকার জনপ্রিয়তার কল্যাণে ভদ্রলোক বিজ্ঞান-আন্দোলন নিয়ে লিখছেনও।

আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর স্ত্রীর আঙুলে একটি ধাতুর আংটি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এটা তো শখে পরেছ বলে মনে হচ্ছে না; ধাতু কাজ করবে ভেবে পরেছ?"

উত্তরটা বন্ধু-পত্নীর বদলে বন্ধুই দিয়েছিলেন, "ঠিকই ধরেছ, এটা মেটাল-ট্যাবলেট দিয়ে তৈরি আংটি। জানি, তুমি এরপর একগাদা লেকচার দেবে—শরীরে ধাতুর কোনও প্রভাব নেই। কিছুদিন আগে হলে হয়তো তোমার কথাটা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিতাম। কিন্তু আজ মানতে পারছি না। তুমি কি জান, বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ এস. এন. চ্যাটার্জি মানব শরীরে ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন?"

"তুমি কোথায় ওঁর মতামত দেখেছ?"

"পত্রিকায়।"

"অমৃতলালের বিজ্ঞাপনে?"

"না, না বিজ্ঞাপনে নয়। একটা প্রবন্ধে ডঃ চ্যাটার্জির মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। কাগজটা আমি যত্ন সহকারে তুলে রেখে দিয়েছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।"

বন্ধুটি একটি পত্রিকা এনে মেলে ধরলেন আমার সামনে। একটা পুরো পাতা জুড়ে পাঁচটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলোই জ্যোতিষ সম্পর্কিত। তারই একটিতে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিষী অমৃতলাল সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্টের মতামত। এঁদের মধ্যে আছেন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং একমাত্র বিজ্ঞানী ডঃ এস. এন চ্যাটার্জি। লেখাটির শিরোনাম— অমৃতলাল : কে কী বলছেন। লেখক— দেবপ্রসাদ দাস :

দেবপ্রসাদ দাসের লেখাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বন্ধুটি বললেন, "এখানটায় পড়।"

লেখাটা আমার আগেই পড়া। এবং ওটা পড়ার পর অনেক জলই গড়িয়েছে। পত্রিকার একেবারে ওপরে বাঁদিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, "এই লেখাটা পড়েছ। ওখানে লেখা ছিল, "বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র"। লেখাটা পড়ে বন্ধুটি একটুক্ষণের জন্য কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে তার পরই উপযুক্ত যুক্তি খুঁজে পেয়ে রুখে দাঁড়ালেন, "বিজ্ঞাপন তো কী হয়েছে? তাতে কী ডঃ চ্যাটার্জির মতামতটা তামাদি হয়ে যাচ্ছে? তোমার মত যুক্তিবাদী কী বলে?"

ওই যে বলেছিলাম, জল অনেক দূরই গড়িয়েছিল, সেই ঘটনার ঘনঘটার কথাগুলোই সেদিন বলতে হয়েছিল বন্ধুকে। আজ আপনাদের বলছি। সেদিন দেবপ্রসাদের ওই লেখায়

(বাস্তবে যেটা একটি বিজ্ঞাপন মাত্র) ছিল—"অমৃতলালের মেটাল ট্যাবলেট বিজ্ঞানভিত্তিক কিনা এই প্রশ্ন রেখেছিলাম "সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স"-এর বায়োফিজিক্সের প্রধান, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ এস. এন. চ্যাটার্জীর কাছে, ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে যে ধাতু জীবসত্তার উপযুক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও আশ্চর্যজনক যে, আবহমানকাল থেকেই জ্যোতিষীরা মানবজীবনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে ধাতুর কার্যকারিতা লক্ষ্য করে এসেছেন। অমৃতলাল যে মেটাল-ট্যাবলেট উদ্ভাবন করেছেন তা কার্যত অষ্ট ধাতুরই অনুপাতিক সংমিশ্রণ যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক কার্যকারিতাকে সুসংহত পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।"

লেখাটি প্রথম যেদিন আমার নজরে আসে, সে-দিন যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলাম এমন একটি বক্তব্যের সঙ্গে ডঃ চ্যাটার্জির নাম যুক্ত হতে দেখে। আমরা জানি, মানবদেহে অল্প পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক দ্রব্যের, ধাতুর অস্তিত্ব আছে এবং শরীরে তার প্রভাবও আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানবদেহে মৌলিক দ্রব্যের প্রয়োগ প্রচলিত এবং কার্যকর। অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা যায়—মানবদেহে মৌলিক পদার্থ ও ধাতুর প্রভাব উপস্থিত। এই সবই সত্য। কিন্তু তাই বলে এমন কথা কি করে বলা যায়—ধাতু শরীরে ধারণ করলে তা কার্যকর ভূমিকা নেবে ? এমন অদ্ভুত বিজ্ঞান-বিরোধী কথা বলেছেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ? তবে কী এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর কাছে কিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে ?

মনস্থির করলাম, এ বিষয়ে বিশিষ্ট কিছু বিজ্ঞানীর মতামত নেব। বেশ কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ২৬ জুন ১৯৮৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স কলেজ রাজাবাজার শাখায় উপস্থিতি থাকতে অনুরোধ জানাই এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করি—ধাতু, রত্ন, ইত্যাদি ধারণ মানবদেহকে কতটা প্রভাবিত করে, সেই বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত জানাতে।

২৬ জুন '৮৬ দীর্ঘ আলোচনার পর ১৮জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সহমত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাতে সাক্ষর দেন। প্রস্তাবটি নীচে দিলাম :

> *আমাদের দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ হস্তরেখা বিচার, ঠিকুজী কোষ্ঠি, তাবিজ, কবজ, মাদুলী, শিকড় ইত্যাদির প্রচলন রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও এই সকল ব্যাবসা শুধুমাত্র মানুষের অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মানুষের অজ্ঞানতাই ছিল ইহাদের ব্যবসার পুঁজি। বর্তমানে যুক্তির প্রতি আকর্ষণ সাধারণ মানুষদের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা প্রবীর ঘোষকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করিয়া অঙ্কুরেই যুক্তিবাদী আনেদালনকে ধ্বংস করিতে সম্প্রতি নামী-দামী জ্যোতিষীরা একের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ লড়াই চালাইয়াও যথেষ্টর চেয়ে বেশি পর্যুদস্ত হইয়াছেন, আকাশবাণী কলকাতা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটির প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সমগ্র ভারতের বহু ভাষাভাষি পত্র-পত্রিকায় অনুষ্ঠানটির বিবরণ প্রকাশিত হইয়া ছিল, প্রকাশিত হইয়া ছিল সম্পাদকীয় পর্যন্ত। এই অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া দর্শনে বহু জ্যোতিষী এবং গ্রহরত্ন ব্যবসায়ীবা যথেষ্টই ভীত হইয়াছেন।*

এই অবস্থাকে সামাল দিতে এইসব লোকঠকান কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য তাহাদের কাজের সমর্থনে তথাকথিত নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করিয়া সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে জুড়িয়া দিতেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংস্থার নাম।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও শংকার সহিত লক্ষ্য করিতেছি, সম্প্রতি এক জ্যোতিষী তাঁহার অবিষ্কৃত "মেটাল-ট্যাবলেট"-এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার এক তথাকথিক "বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" দিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন এবং ওই ব্যাখ্যার সঙ্গে এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নামও ব্যবহার করিয়াছেন।

মানবদেহে অল্প পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের মৌলিক দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে এবং নানা ধরনের রোগের চিকিৎসায় লৌহের ব্যবহার সুবিদিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে 'মেটাল-ট্যাবলেট' মাদুলী করিয়া বা আটিং করিযা ধারণে ফললাভের আকাশ-কুসুম চিন্তার কোনও সম্পর্ক নাই।

আমাদের শরীরে রক্ত আছে। প্রয়োজনে বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া শরীরে রক্ত দেওয়া হয। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি হঠাৎ দাবি কবিয়া বসেন—পশু বা মানুষের রক্ত গায়ে মাখিয়াই শরীরের রক্ত-স্বল্পতা দূর করা সম্ভব, তাহা হইলে তাহার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন—রক্ত-স্বল্পতার ক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়রণ ট্যাবলেট-ক্যাপসুল ইত্যাদির প্রয়োগবিধি আছে, অতএব লৌহ-আংটি ধাবণে ওই একই কার্য সমাধা হইবে না কেন ?—তবে প্রশ্নকর্তার কাণ্ড-জ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হই। এইরূপ প্রশ্নকর্তা তাঁহার নিজের রক্তের-স্বল্পতা দেখা দিলে ভারি লৌহখণ্ড শরীরের সর্বত্র বাঁধিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিলেই তাঁহার প্রশ্ন ও বক্তব্যের অসারতা বুঝিতে পারিবেন।

মেটাল-ট্যাবলেটের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে যে সকল কুযুক্তি হাজির করা হইযাছে সেগুলিকে আমবা বৈজ্ঞানিকগণ কখনই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ ইহা পরীক্ষিত নহে। আমরা স্পষ্টতই মনে করি মানুষ ঠকাইয়া রোজগাবের ধান্ধায় যাহারা এই ধরনের অপব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করে, তাহারা প্রতারক ও সমাজের শত্রু।

একইভাবে গ্রহ-রত্ন বিক্রয়ে অর্থ উপার্জনে ইচ্ছুক কিছু জ্যোতিষী নামধাবীরা বিভিন্ন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করিয়া জনসাধারণকে এইরূপ বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন—Cosmic ray-র বিভিন্ন রঙ গ্রহরত্নের মধ্য দিয়া শোষিত হইয়া মানুষের শরীরের বিভিন্ন ঘাটতি পূরণ করার মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায এবং রোগ নিরাময় কবিয়া থাকে। অর্থাৎ, ভাগ্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রত্নের ভূমিকা অপরিসীম।

আমরা মনে করি এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক প্রচারের পিছনে কোনও ভ্রান্তি ক্রিযাশীল নহে ; ইহার পিছনে রহিয়াছে বৃহৎ রত্ন-ব্যবসায়ীকুল ও জ্যোতিষীদের সংগঠিত মিথ্যাচাবিতা।

বিভিন্ন রত্ন-পাথরের crystal structure বিষয়ক যে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লব্ধ হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে আমরা অবশ্যই এ-কথা বলিতে পারি, রত্নের রশ্মি শোষণ করার বা রশ্মি হইতে বিশেষ কোনও রঙ শোষণ করার ক্ষমতা নাই ; অথবা রত্নের দ্বারা শোষিত রশ্মি বা রঙ মানুষের শরীরে শোষিত হওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নহে। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা একান্ত প্রয়োজনীয়, Cosmic-ray-র সাতটি রঙের কথা জ্যোতিষীদের বর্ণনায় থাকিলেও বাস্তবে Cosmic-ray বর্ণহীন।

অনেক সময় ধাতু, রত্ন ইত্যাদি ধারণাকারীদের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তবে সেই প্রভাব সম্পূর্ণতই মানসিক।

আমরা জ্যোতিষ নামধারী ও গ্রহরত্ন-ব্যবসায়ীদের এই সকল মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং সর্ব-সাধারণকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে ও এইসব প্রতারকদের সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি ; কারণ এই প্রতারণা বন্ধের দায় সমস্ত সচেতন মানুষেরই।

স্বাক্ষরকারী

১. ডঃ দিলীপ বসু—অধ্যাপক, ফলিত পদার্থবিদ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২. ডঃ সন্তোষ সরকার—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ডঃ বিনায়ক দত্ত রায়—অধ্যাপক , সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৪. ডঃ কমলেশ ভৌমিক—রিডার, সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৫. ডঃ দেবজ্যোতি ভৌমিক—রিডার, সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৬. সুবিমল সেন—রিডার, সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৭. ডঃ মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়—অধ্যাপক, সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৮. ডঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—সহ-অধ্যাপক, সাহা ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯ ডঃ জ্যোতির্ময় দত্ত—অধ্যাপক, বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০. ডঃ অনাদিনাথ দাঁ—অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয
১১. ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ—সিনিয়ার সাইনটিস্ট, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স আকাদেমি

১২. *ডঃ এ. কে. ঘোষ—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৩. *ডঃ এস. সি. বোস—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৪. *ডঃ এস. আর. গুপ্ত—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৫. *ডঃ জগদীন্দ্রমোহন মণ্ডল—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৬. *ডঃ স্নেহাংশু দাশগুপ্ত—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

১৭. *ডঃ নৃসিংহ ভট্টাচার্য—অধ্যাপক, অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

পরের দিন ২৭ জুন গেলাম বেলগাছিয়া সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বায়োফিজিক্সের দপ্তরে। দপ্তর-প্রধান ডঃ স্মৃতি-নারায়ণ চ্যাটার্জির দেখাও পেলাম। তাঁকে 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক সংখ্যা খুলে দেবপ্রসাদ দাসের লেখাটা পড়তে দিলাম। ডঃ চ্যাটার্জি পড়লেন। এই বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। বললাম, "বাস্তবিকই কি আপনি ইন্টারভিউতে দেবপ্রসাদ দাসকে এই ধরনের কথা বলেছেন ?"

ডঃ চ্যাটার্জি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনার এমনটা মনে হলো কেন যে, আমি এই ধরনের উদ্ভট বক্তব্য রাখব ?"

"যদি বিজ্ঞাপনের ভাষায় পুরোপুরি বিশ্বাসই করতাম, তাহলে জিজ্ঞেস করতাম না—'আপনি কি এমন কথা বলেছেন ?' জিজ্ঞেস করতাম—'এমন বক্তব্য রাখার পেছনে আপনার যুক্তি কী' ?"

ডঃ চ্যাটার্জি বললেন, "আপনি সরাসরি আমার বক্তব্য জানতে আসায় সত্যিই খুশি হয়েছি। বিজ্ঞাপনটা দেখেই আপনি ও আপনার সমিতি যে আমার বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করে বসেননি এর জন্য ধন্যবাদ। আমি দেবপ্রসাদকে চিনি না, জীবনে দেখিনি, তাঁকে এই ধরনের কোনও কথা বলিনি বা লিখে দিইনি। বছর দু'য়েক আগে অমৃতলাল একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'মানব শরীরে কী ধাতুর প্রভাব আছে ?', বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই। আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রভাবের কথা অবশ্যই স্বীকার করবে।' শরীরে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পদার্থ আছে, এবং তার প্রভাবও আছে, এটাই বলেছিলাম। কিন্তু এই ধাতু-প্রভাবের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ধাতু-ধারণ করার প্রভাবের কোনও সম্পর্কই নেই'।"

বললাম, "অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য লিখে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।"

ডঃ চ্যাটার্জি বললেন, "অবশ্যই পাঠিয়ে দেব। তারই সঙ্গে আর এক দফা ধন্যবাদ জানালেন সত্যানুসন্ধানের ব্যাপারে আন্তরিকতার জন্য।

গতকালই এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা যে সাইন্স কলেজে মিলিত হয়েছিলাম,

জানালাম। ১৮জন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটি তুলে দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, "পড়ে দেখুন, এই বিষয়ে আপনি সহমত পোষণ করলে তবেই এতে আপনার স্বাক্ষরটি দিতে পারেন।"

ডঃ চ্যাটার্জি পড়লেন, এবং এমন অভূতপূর্ব একটি কাজের জন্য আমাকেই একগাদা প্রশংসা করে স্বাক্ষর দিলেন ওই বক্তব্যে।

এরও পর ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আরো ৩৬জন বিজ্ঞানীর কাছে প্রস্তাবের একটি করে কপি পাঠিয়ে এই বিষয়ে সহমত হলে স্বাক্ষর করতে এবং ভিন্নমত পোষণ করলে তাও দ্বিধাহীন ভাষায় জানতে অনুরোধ করেছিলাম। ৩৬জনই সহমত পোষণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ডঃ স্মৃতিনারায়ণ চ্যাটার্জির চিঠি পেলাম, চিঠির তারিখ ১ জুলাই ১৯৮৬। ইংরেজিতে লেখা। বাংলায় অনুবাদ করলে বক্তব্যটা দাঁড়ায় এই রকম :

সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ফোন-৫৬-২৪৫১
বায়োফিজিক্স ল্যাবরোটরি
৩৭, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৭

জুলাই ১, ১৯৮৬

প্রিয় শ্রীঘোষ,

আমার অফিসে এসে অনুসন্ধানের জন্য সরাসরি আমার কাছে ঘটনাটি জানতে চাওযার জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রচেষ্টাকে আমি প্রশংসা করি।

আমার বক্তব্য বলে 'পরিবর্তন'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদেবপ্রসাদ দাসের লেখা একটি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে, আপনার অনুরোধের উত্তরে এই তথ্যগুলো জানাচ্ছি :

আমি শ্রীদেবপ্রসাদ দাসকে চিনি না, কখনও ওঁব সঙ্গে পরিচিত হইনি এবং কখনই ওঁকে কোনও বিষয়েই কিছু বলিনি বা লিখিতভাবে জানাইনি। যাই হোক, অমৃতলালের ব্যক্তিগত অনুরোধে আমি বছর দু'যেক আগে সহজ মন্তব্য করেছিলাম আধুনিক বিজ্ঞানে ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার কবে (এবং এই নিয়ে, আর একটিও বাড়তি কথা বলিনি) এবং এটা খুবই মজার যে জ্যোতিষীরাই ব্যক্তির উপকারের জন্য ধাতু ব্যবহারের পক্ষে ওকালতি কবছে।

আমি কোনও ভাবেই সমর্থন জানাইনি 'অমৃতলাল'-এর 'মেটাল-ট্যাবলেট'-এর বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নিয়ে বা তার মিশ্রণ-পদ্ধতি নিয়ে।

আমি আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিষযটি আমার নজরে আনার জন্য।

আপনার একান্ত
স্ব—এস. এন. চ্যাটার্জি
অধ্যাপক এবং প্রধান

শ্রীপ্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

Phone 56-3451

SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS

BIOPHYSICS LABORATORY

37 BELGACHIA ROAD CALCUTTA-700037

July 1, 1986.

Dear Sri Ghosh,

Thank you for calling on me at my office and enquiring about facts directly . I have appreciated your effort.

In response to your request and with reference to the issue raised by you on an advertisement (!) published in a recent issue of 'Paribartan' by Sri Debaprasad Das, my comments are as follows:

I do not know Sri Debaprasad Das, never met him and have never communicated with him verbally or in writing on any matter. However, at the personal request of 'Amritlal' I made the simple observation some two years ago that modern science acknowledges the vital role of metals (and no further elaboration on this!) and that it is interesting to notethat astrologers are also advocating the use of metals for the welfare of individuals.

There was no question of my confirming either the scientific basis or the composition of the 'Metal Tablet' of Amritlal'.

I thank you again for bringing the matter to my notice.

Yours sincerely,
S N. Chatterjee
(S. N. Chatterjee)
Professor & Head

Sri Prabir Ghosh
72/8 Debi Nibas Road
Calcutta-700 074.

৪/৮/৮৬ তে রেজেস্ট্রি ডাকে আরও একটি চিঠি পাঠালেন ডঃ এস. এন. চ্যাটার্জি। সাহা ইনস্টিটিউটের প্যাডেই লেখা চিঠিতে ডঃ চ্যাটার্জি জানালেন :

প্রিয় শ্রীঘোষ,

আমি খুবই তৃপ্তির সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি 'অমৃতলাল' অতি সম্প্রতি লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির দরুণ তিনি আমার নাম বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছেন ; এবং একই সঙ্গে কথা দিয়েছেন এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে কখনই ঘটবে না।

ইংরিজিতে চিঠির বয়ানটা ছিল এই রকম—"I am happy to inform you that 'Amritlal' has very recently expressed regret (in writing) that he utilized my name in some advertisements out of misunderstanding and has also given me word that this will not recur in future"

এরপর আর একটি বারের জন্যেও অমৃতলাল ডঃ চ্যাটার্জির বক্তব্য বলে কোনও কথা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন নি। এটা অবশ্যই আমাদের সমিতিব এক বিশাল জয়।

এর পরেও যে প্রশ্নটা সবচেযে বড় হযে দেখা দেবে, তা হলো, প্রফুল্লচন্দ্র সেন কি তবে মিথ্যে কথা বলেছিলেন ? মিথ্যে কথা বলেছিলেন আমার চিকিৎসক বন্ধুটি ? বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা মানবদেহে ধাতু ও রত্নের প্রভাব নিযে আলোচনা করতে গিযে বলেছেন, "অনেক সময ধাতু, রত্ন ইত্যাদি ধারণকারীদের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে সেই প্রভাব সম্পূর্ণতই মানসিক"—এটাও তো প্রভাবই, তবে গোলমালটা কোথায ?

প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনায আসছি। আপনি, আমি প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিযেই বুঝতে শিখেছি—সমাজশীর্ষ মানুষরাও মিথ্যাশ্রযী হন ; তবুও প্রফুল্লচন্দ্র বা আমার চিকিৎসক বন্ধুব দাবির মধ্যে এমন অবাস্তব বা অসম্ভব কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যার জন্যে তাঁদে' দাবিটিকে এক কথায নাকচ করে দিতে হবে মিথ্যাভাষণ বলে।

এখন নিশ্চযই আমার কথার মধ্যে কেউ কেউ পরস্পরবিরোধীতা খুঁজে পাচ্ছেন। আপাতভাবে যা আপনার কাছে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বলে মনে হচ্ছে, তা-ই যুক্তি-নির্ভর মনে হবে একটি বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা শোনার পব ; মানুষের মানসিক অবস্থা বিষযে জানার পর।

যে চিকিৎসাপদ্ধতির কথা এবার বলতে যাচ্ছি, তার নাম, 'প্ল্যাসিবো' (placebo) চিকিৎসাপদ্ধতি। 'প্ল্যাসিবো' বিশ্বাসনির্ভর চিকিৎসাপদ্ধতি। 'Placebo' কথাব অর্থ "I will please", বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায, "আমি খুশি করব।" ভাবনুবাদ করে বলতে পারি, "আমি আরোগ্য করব।" বোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে, "আমি নিরামায লাভ করব" এই আন্তবিক বিশ্বাসের গুরুত্ব অসরিসীম। গভীর বিশ্বাসকে কাজে লাগিযে বহু চিকিৎসকই অনেক রোগীকে সারিযে তুলছেন। 'অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডে 'বিশ্বাসে অসুখ সাবে' শিবোনামে এই নিযে রযেছে বিস্তৃত আলোচনা। বহু 'কেস হিস্ট্রি', সেই সব রোগীদের রোগমুক্ত করাব ক্ষেত্রে কিভাবে বিশ্বাসকে কাজে লাগান হযেছিল ইত্যাদি নিযে যেভাবে দীর্ঘ আলোচনা কবা হযেছে, তাতে আবাব এই নিযে আলোচনা নিস্প্রযোজন। তবু যাঁরা প্রথম খণ্ডটি পড়েন

নি তাঁদের কথা মনে রেখে অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা সেরে নিচ্ছি। এবং দুটি মাত্র উদাহরণের মধ্য দিয়ে পুরোন আলোচনার জের টানব, কথা দিচ্ছি।

আমাদের বহু রোগের উৎপত্তি হয ভয, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। আমরা সামাজবদ্ধ জীব। আমাদের মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ওপর। সমাজ-জীবনে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার অন্ধকার ; বেঁচে থাকার জন্য, এগিয়ে যাওয়া জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা ; ধর্মোন্মাদনা ; জাতপাতের লড়াই ইত্যাদি যতই বেড়েছে, দেহমনজনিত অসুখ বা psycho-somaticdisorder ততই বেড়েছে। সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে বলে এই সময তাঁদের অনেকে দেহ-মনজনিত রোগেব শিকার হয়ে পড়েন।

দেহমনজনিত কারণে যেসব অসুখ হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যাথা, মাথায় ব্যাথা, হাড়ে ব্যথা, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, সারা শরীর ঝিম-ঝিম করে ওঠা, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসটিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, পক্ষাঘাত, কাশি, ব্রোঙ্কাইল অ্যাজমা, হার্টেব্যথা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। এইসব রোগ যদি মানসিকভাবে শরীরে এসে থাকে তবে আবার বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিযে ঔষধিমূল্যহীন ক্যাপসুল, ইন্‌জেকশন বা ট্যাবলেট প্রযোগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওযা যায। অর্থাৎ মানসিকভাবে সৃষ্টি রোগকে মানসিকভাবেই আবার দূর করা যায়। এমনি একটি উদাহরণ আপনাদেব সামনে তুলে দিচ্ছি।

'৮৭-র মে মাসের এক সন্ধ্যায কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটু সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী এসেছিলেন আমাব ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক, এক সাহিত্যিক-সাংবাদিক এবং জনৈক ভদ্রলোক।

চিকিৎসক জানালেন বছর আড়াই আগে সম্পাদকেব স্ত্রীব ডান উরুতে একটা ফোঁড়া হযেছিল। ছোট্ট অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও ওষুধে ফোঁড়ার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু এরপর ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান নিয়ে শুরু হয এক নতুন সমস্যা। মাঝে-মাঝেই উরুর শুকিযে যাওযা ক্ষত ও তার আশপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনও ব্যথার তীব্রতায রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে যেসব চিকিৎসকদের দেখান হযেছে ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার শীর্ষস্থানীয়। ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এঁরা খুঁজে পান নি। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র, এক্স-রে ছবি ও রিপোর্ট সবই দেখালেন আমাকে।

রোগিণীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষযে কথা বলতে বলতে উরুর শুকনো ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, "একবার খড়্গপুরে থাকতে দেখেছিলাম একটি লোকের হাতের বিষ-ফোঁড়া সেপটিক হয়ে, পরবর্তীকালে গ্যাংগ্রিন হযে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, সামান্য ফোঁড়া থেকে এই ধরনের ঘটনাও ঘটে।"

রোগিণী বললেন, "আমি নিজেই এই ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী। মেয়েটির হাতে বিষ-ফোঁড়াজাতীয় কিছু একটা হযেছিল। ফোঁড়াটা শুকিযে যাওযার পরও শুকনো ক্ষতের আশেপাশে ব্যথা হতো। এক সময জানা গেল, ব্যথার কারণ গ্যাংগ্রিন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হযে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হাত বাদ দিতে হয়।"

যা জানতে গ্যাংগ্রিনের গল্পের অবতারণা করেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের মতই স্পষ্ট যে, সম্পাদকের স্ত্রীর ফোঁড়া হওয়ার পর থেকেই গ্যাংগ্রিন-স্মৃতি তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই ফোঁড়া থেকেই আবার গ্যাংগ্রিন হবে না তো? এই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক থেকেই এক সময় ভাবতে শুরু করেন, "ফোঁড়া তো শুকিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে-মধ্যেই যেন শুকনো ক্ষতের আশেপাশে ব্যথা অনুভব করছি? আমারও আবার গ্যাংগ্রিন হলো না তো? সেই লোকটার মতোই একটা অসহ্য কষ্টময় জীবন বহন করতে হবে না তো?"

এমনি করেই যত দুশ্চিন্তা বেড়েছে, ততই ব্যথাও বেড়েছে। বিশ্বাস থেকে যে ব্যথার শুরু, তাকে শেষ করতে হবে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই।

আমি আর একবার উরুর শুকনো ক্ষত গভীরভাবে পরীক্ষা করে এবং শরীরের আর কোথায় কোথায় কেমনভাবে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে, ব্যথার অনুভূতিটা কি ধরনের ইত্যাদি প্রশ্ন রেখে গম্ভীর মুখে একটা নিপাট মিথ্যে কথা বললাম, "একটা কঠিন সত্যকে না জানিয়ে পারছি না, আপনারও সম্ভবত গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।"

আমার কথা শুনে রোগিণী মোটেই দুঃখিত হলেন না। বরং উজ্জ্বল মুখে বললেন, "আপনিই সম্ভবত আমার অসুখের সঠিক কারণ ধরতে পেরেছেন।"

আমি আশ্বাস দিলাম, "আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, আমার অনুমান ঠিক কিনা। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে আপনার কর্তাটিতে একটু কষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধপত্তর আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখবেন, তারপর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে জানালাম, ব্যথার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। রোগিণীর মনে সন্দেহের পথ ধরে এক সময় বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তাঁর উরুর ফোঁড়া সারেনি, বরং আপাত শুকনো ফোঁড়ার মধ্যে রয়েছে গ্যাংগ্রিনের বিষ। রোগিণীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কেমনভাবে প্ল্যাসিবো চিকিৎসা চালাতে হবে সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রোগিণীর পারিবারিক ডাক্তার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া উরুর ফোঁড়ার ওপর নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে একটা মেশিনের সাহায্যে রেখাচিত্র তৈরি করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার রেখাচিত্র তুললেন। দু'বারের রেখাচিত্রেই রেখার প্রচণ্ড রকমের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, গ্যাংগ্রিনের বিষের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিউইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দ্রুত আনান হলো এমনই চোরা গ্যাংগ্রিনের বিষের অব্যর্থ ইন্‌জেকশন। সপ্তাহে দু'টি করে ইন্‌জেকশন ও দু'বার করে রেখাচিত্র গ্রহণ চলল তিন সপ্তাহ। প্রতিবার রেখাচিত্রেই দেখা যেতে লাগল রেখার ওঠা-নামা আগের বারের চেয়ে কম। ওষুধের দারুণ গুণে ডাক্তার যেমন অবাক হচ্ছিলেন, তেমন রোগিণীও। প্রতিবার ইন্‌জেকশনেই ব্যথা লক্ষণীয়ভাবে কমছে। তিন সপ্তাহ পরে দেখা গেল রেখা আর আঁকা-বাঁকা নেই, সরল। রোগিণীও এই প্রথম অনুভব করলেন, বাস্তবিকই একটুও ব্যথা নেই। অথচ মজাটা হলো এই যে, বিদেশী দামী ইন্‌জেক্‌শনের নামে তিন সপ্তাহ ধরে রোগিণীকে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ ডিসটিলড্ ওয়াটার।

রোগিণীর রোগমুক্তির সপ্তাহ তিনেক পরেই ১৯৮৭-র ৫ জুলাই রবিবার 'আজকাল' পত্রিকার পাতায় আমার লেখা প্রকাশিত হলো; শিরোনাম—'বিশ্বাসেও অসুখ সারে'। লেখাটি শুরু করেছিলাম এই রোগিণীর কেস দিয়ে। সেদিন যাকে নিয়ে লেখা, সেই ভদ্রমহিলা আমার লেখা পড়ে হেসেছিলেন প্রাণ খুলে। আসল রহস্য ফাঁস হওয়ার পরও কিন্তু আর একটি দিনের জন্যেও তাঁর উরুর ব্যথা আর ফিরে আসেনি।

আবার দেহমনজনিত কারণে সৃষ্ট নয়, এমন অসুখের ক্ষেত্রেও যে অনেক সময় রোগীর বিশ্বাসবোধে অনেক অসম্ভবই যে সম্ভব হয়, তারই এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত কলকাতার ৪৪, বি রাণী হর্ষমুখী রোডের বাসিন্দা মঞ্জু চ্যাটার্জি। মঞ্জুর অসুস্থতার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন এক সময় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচণ্ড রকম হৈ-চৈ ফেলে দেওয়া ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী। মঞ্জু বাতে পঙ্গু ও শয্যাশায়ী, সেই সঙ্গে তীব্র শয্যাক্ষতে আক্রান্ত। এক সময় বিভিন্ন চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। অবস্থা অনবরত অবনতির দিকেই গড়িয়েছে। শেষে হাসপাতালে ছিলেন কিছুদিন। সুস্থ হয়ে ওঠার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে পঙ্গুতা ও শয্যাক্ষত নিয়ে এক তীব্র যন্ত্রণাময় জীবন বহন করে চলেছেন।

৬ জুন '৮৮ মঞ্জুর মামা তারাকুমার মল্লিক প্রথমবার ঈপ্সিতার কাছে আসেন। মঞ্জুর রোগমুক্তির জন্য ঈপ্সিতা নানা ডাইনি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক ধরনের অলৌকিক জল তৈরি করে দেন। সাত দিন ওই জল ব্যবহার করে মঞ্জু নাকি দারুণ ফল পেয়েছেন। ব্যথা-যন্ত্রণা কমতে শুরু করেছে। সামান্য হলেও কমতে শুরু করেছে।

৮ জুলাই '৮৮ বিকেলে গেলাম মঞ্জু চ্যাটার্জির বাড়িতে। শয্যাশায়ী মঞ্জুর ঘরে ঢুকেই শয্যাক্ষতের তীব্র গন্ধ পেলাম। মঞ্জু মধ্যবয়স্কা। কথা বলেছিলাম তিনজনের সঙ্গে—মঞ্জু, তাঁর মা শান্তি সেন এবং মঞ্জুর সেবার দায়িত্বে থাকা মীরা দাস। তিনজনই জানালেন, অনেক চিকিৎসাই তো হলো, কোনও কাজই হয়নি। দিনে দিনে অবস্থা খারাপই হচ্ছিল। মা ঈপ্সিতার দয়ায় কিছুটা কাজ হয়েছে। জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কমেছিল। এখন কয়েক দিন হলো উপসর্গগুলো আবার তীব্র আকার ধারণ করেছে। যন্ত্রণায় ঘুম আসে না। মঞ্জু এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, এ-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি তো ঈপ্সিতা মায়ের কাছ থেকে আসছেন। একটা কিছু করুন, যাতে যন্ত্রণাটা দূর হয়, ঘুমোতে পারি, ভাল হয়ে উঠতে পারি।

বললাম, আপনি চোখ বুজুন। আমি কিছু কথা বলব, সেগুলো এক মনে শুনতে থাকবেন। আপনার যন্ত্রণা কমে যাবে, ভাল লাগবে, ঘুম আসবে।

মঞ্জু চোখ বুজলেন। শান্তি ও মীরার উপস্থিতিতেই মঞ্জুর মস্তিষ্কে কিছু ধারণা সঞ্চার করছিলাম, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'সাজেশন'। বলছিলাম, আপনার ঘুম আসছে....., সমস্ত শরীরের ব্যথা-যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে...., ভাল লাগছে...., আমি চলে যাওয়ার পরও আপনার ভাল লাগবে...., যন্ত্রণা কমে যেতে থাকবে...., সুন্দর ঘুম হবে..... ইত্যাদি।

মিনিট দশেক পরে মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? বললেন, খুব ভাললাগছে, ব্যথা-যন্ত্রণা অনেকটা কম। এবার আমার বিদায় নেবার পালা। বললাম, পরশু সকালে এসে খবর নেব, কেমন আছেন।

১০ জুলাই রবিবার মঞ্জু, শান্তি, মীরা এবং তারাকুমার মল্লিকের সঙ্গে কথা হল। চারজনেই

জানালেন, আমার কথামত সত্যিই যন্ত্রণা কমে গেছে। ভাল ঘুমও হচ্ছে।

মঞ্জুর এই যন্ত্রণা কমা বা অনিদ্রা দূর হওয়ার পিছনে ঈপ্সিতার কোনও অলৌকিক ডাইনি ক্ষমতাই কাজ করেনি। কাজ করেছিল ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি মঞ্জুর অন্ধবিশ্বাস। আমিও মঞ্জুর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই কৃতকার্যতা পেয়েছিলাম।

একইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের রোগমুক্তির ক্ষেত্রে তামা বা বিদ্যুৎ-শক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য বা গুণই কাজ করেনি, কাজ করেছিল তামা, বিদ্যুৎশক্তি এবং সম্ভবত ডঃ প্রতুল মুখার্জির প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের গভীর বিশ্বাস। আমার বন্ধুর ব্লাডপ্রেসার কমার পিছনেরও ধাতুর বেল্টটির প্রতি বন্ধুর পূর্ণ বিশ্বাসই কাজ করেছে।

ধাতু বা রত্নের প্রতি তীব্র বিশ্বাসের দরুণ অথবা যিনি রত্ন বা ধাতু ধারণের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের জন্য এই ধরনের কিছু কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিছু কিছু মানসিকভাবে সৃষ্ট রোগ সেরে যেতে পারেই। এর কোনটির জন্যই ধাতু বা রত্নের কোনও বৈশিষ্ট্য বা গুণকে দায়ী করলে আমরা চূরান্তভাবেই ভুল করব। কারণ এই ক্ষেত্রে ধারণকারী মানুষটিকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করেছে ধাতু, রত্ন বা জ্যোতিষীর প্রতি গভীর বিশ্বাস, ধাতু, রত্ন বা জ্যোতিষী নয়। বিশ্বাস না করে ধারণ করলে এর ফলও হতো অবশ্যই শূন্য। এই কথাগুলোই বিজ্ঞানীরা বলতে চেয়েছিলেন।

গ্রহ-বিচারে রত্নবিধান

"সৃষ্টির মূলে রয়েছে সূর্যরশ্মি। সূর্য থেকে যে রশ্মি বেরয় তা সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের উপর প্রতিভাত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়। এই রশ্মিকে বলা যেতে পারে 'কসমিক রে', বা মহাজগতিক রশ্মি। এই মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে যখন পৌঁছয়, বিভিন্ন মানুষের উপর তার প্রভাব হয় ভিন্ন-ভিন্ন। পদার্থবিজ্ঞান এই মহাজাগতিক রশ্মির কিছু-কিছু প্রভাব ও রহস্য উদঘাটন করতে পেরেছে, এখনও বহু তথ্য অনাবিষ্কৃত রয়েছে। প্রাচীন ঋষিরা এই মহাজাগতিক রশ্মিগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ওই রশ্মিসমূহ মানুষের দেহে ও মনে কী প্রভাব বিস্তার করে ও তার প্রতিক্রিয়া কী তা নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এখনও আমরা এই শাস্ত্রচর্চা করছি। এই মহাজাগতিক রশ্মির অসাম্য মানুষের মানসিক ও শরীরিক ক্ষতি করতে পারে। এই অসাম্য রাশিচক্রের ছক বা হাতের রেখা থেকে নির্নীত হয়। যে কোনও মানুষের রাশিচক্রে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান, সেই সব গ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির প্রভাবের উপর শুভাশুভ ফল নির্ভর করে। ধরুন, একজনের রাশিচক্রে বৃহস্পতির অবস্থান অশুভ। এর ফলে বৃহস্পতি-গ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি সেই জাতকের বা জাতিকার ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতি যাতে না হয়, তাই ওই অসাম্য দূর করার জন্য আমরা রত্নধারণ করতে বলি। বৃহস্পতি-গ্রহের অসাম্য দূর করতে ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট কিছু রত্ন।"

এই যে কথাগুলো আপনাদের কাছে তুলে দিলাম, এগুলো শুনে এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই হাসি সামলাতে পারছেন না। ভাবছেন, এমন বিজ্ঞান-বিরোধী মন্তব্য করেছেন

কোনও এক অশিক্ষিত মানুষ। ভাবছেন, যাকগে, জ্ঞানের আলো থেকে বহু দূরে থাকা এই মানুষটির চেঁচামেচিতে কি বা এসে যায়? পাগলে কিনা, বলে—তাতে আমাদের কি বা এসে যায়? ওর এমন পাগলামী, এমন অশিক্ষার অন্ধকার তো বিশাল প্রচারের হাত ধরে আমাদের এই প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে আসবে না; থাকগে একা, আপন মনে।

বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু তা নয়। এই যুক্তিহীন মূর্খের প্রলাপ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাভাষার এক অতি জনপ্রিয় মহিলা পাক্ষিকে। আমি সেখান থেকেই এই অংশটুকু তুলে দিয়েছি। এরপরও অনেক কিছুই তিনি বলেছেন। যেমন—"এবার আসা যাক রত্নবিদ্যার গভীরে বাযোকেমিস্ট্রি (প্রাণ-রসায়ন) অনুযায়ী দেহে ১২টি অজৈব লবণের সাম্য দরকার। গ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির কোপে এই লবণের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। রত্ন ধারণ করলে, সেই রত্নের মধ্যে দিয়ে যে মহাজাগতিক রশ্মি প্রতিফলিত, প্রতিসরিত ও বিচ্ছুরিত হয়, তা মন ও শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। রাহুর প্রতিকারে গোমেদ দেওয়া হয়। ঠিক যেমন বাতের ব্যথা উপসমের জন্য ইনফ্রা রেড রশ্মি দেওয়া হয়।"

এই বক্তব্য যিনি রেখেছেন, তিনি নাকি বিখ্যাত রত্ন-বিশেষজ্ঞ, রত্ন-চিকিৎসক এবং জ্যোতিষী। বুঝুন ঠেলা। বুঝুন বিখ্যাত জ্যোতিষীর জ্ঞান-গম্যির দৌড়। এই রত্নগর্ভ রত্ন-বিশেষজ্ঞের নাম—জাতবেদ।

আসুন এবার বরং আমরা দেখি জ্যোতিষশাস্ত্র মতে কোন্ কোন্ গ্রহ থেকে কি কি রোগ হতে পারে, আর তার ব্যবস্থাপত্রই বা কী?

রবি ঃ রবির জন্য চুনি ধারণ করতে হয়। রবি অশুভ হলে হৃদরোগ ও শিরঃপীড়ার সম্ভবনা।

চন্দ্র ঃ চন্দ্র প্রভাবিত করে মনকে। চন্দ্র দূর্বল হলে অতি আবেগ প্রবণতা, এবং তার দরুণ মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। বাত ও শ্লেষ্মার কারণ চন্দ্র। এইসব রোগমুক্তির জন্য প্রযোজন চন্দ্রকে তুষ্ট করা। আর তার জন্য মুক্তো বা মুনস্টোন ধারণ করতে হবে।

মঙ্গল ঃ আঘাত, অস্ত্রোপচার, অর্শ, রক্তপাত, ফোঁড়া, ঘাম, বসন্ত ইত্যাদি হয় মঙ্গলের প্রভাবে. এইসব রোগ প্রতিকারের ক্ষেত্রে লাল প্রবাল ধারণ করতে বলা হয়।

বুধ ঃ বুদ্ধি ও বিদ্যার নিয়ন্ত্রক। মানসিক প্রতিবন্ধী, পড়াশুনায় আগ্রহহীনকে বুধের রত্ন পান্না ধারণ করতে নির্দেশ দেওযা হয়। বুধ বাকচতুর করে। বুধ খারাপ হলে জাতক হয় তোৎলা। বুধ পিত্ত সংক্রান্ত রোগের কারক। বুধ দুর্বল হলে চর্মরোগ, ব্রণ, যকৃতের গোলমাল দেখা দিতে পারে। যকৃতের অসুখের ক্ষেত্রে পান্না ছাড়াও পীতপোখরাজও ধারণ করতে বলা হয়। কারণ, যকৃতের নিয়ন্ত্রক বৃহস্পতিও। এবং বৃহস্পতির রত্ন—পীতপোখরাজ। ব্রণর ক্ষেত্রে পান্না ছাড়া লাল প্রবালও ধারণ করা কর্তব্য। কারণ ব্রণর নিয়ন্ত্রক বুধ এবং মঙ্গল।

বৃহস্পতি ঃ বৃহস্পতি যকৃত, সন্তানলাভ ও ভাগ্যের নিযন্ত্রক. নিঃসন্তানের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিই নিয়ন্তা। পীতপোখরাজ ধারণে নেতা বা রাজনৈতিক নেতা হওযার ক্ষেত্রে বৃহস্পতিব ভূমিকা প্রবল। মেযেদের বিয়েব দেবি হওযার কারণই বৃহস্পতি বলে ধরা হয়। এইসব ক্ষেত্রেই ধারণ করতে হবে পীতপোখরাজ।

শুক্র ঃ শুক্র খারাপ হলে মূত্রাশযের রোগ, পুরুষত্বহীনতা, যৌনরোগ, শুক্র-তারল্যের

সমস্যা ইত্যাদি দেখা যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের কারক শুক্র। যে কোনও স্রষ্টার ক্ষেত্রেই শুক্রের প্রভাব অতি প্রবল। শুক্র ভোগেরও প্রতীক। শুক্রের রত্ন হিরে। শুক্রের সঙ্গে বৃহস্পতির অসাম্য দেখা দিলে ডায়াবিটিস হয়। এই ক্ষেত্রে হিরে ও পীতপোখরাজ দুই ধারণ করতে হবে।

শনি ঃ শনি খারাপ হলে দীর্ঘস্থায়ী রোগ, পোলিও , ক্যানসার ইত্যাদি হয়। এইসব রোগের ক্ষেত্রে ধারণ করতে হবে নীলা। শনি প্রজ্ঞা ও নৈরাশ্য দুয়েরই কারক।

রাহু ঃ রাহু দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কারণ। রাহু কাজে, উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। শুভ রাহু অর্থ দেয়। রাহুর রত্ন গোমেদ।

কেতু ঃ কেতু আনে ক্ষয়রোগ ও শুচিবাই। কেতুর সঙ্গে শনিও খারাপ অবস্থায় থাকলে অর্শ, ক্যান্সার ইত্যাদি হতে পারে। কেতুর রত্ন বৈদূর্যমণি, যাকে চলতি কথায় বলে 'ক্যাটস-আই'।

জ্যোতিষীরা এইসব রত্ন প্রয়োগ করেন তাঁদের খদ্দের-রোগীদের ওপর। কিন্তু নিজের পরিবারের কারও রোগ হলে রত্ন-ভরসা না করে চিকিৎসকদের উপরই ভরসা করেন। কেন এমনতর ভণ্ডামী? এই ভণ্ডদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দায় সমস্ত সচেতন মানুষেরই।

দশ

কোলকাতার জ্যোতিষচর্চা

কোলকাতার জ্যোতিষশাস্ত্র-চর্চার ইতিহাস কলকাতারই সমবয়স্ক। কলকাতার জন্ম থেকেই জ্যোতিষীরা ছিলেন। তাঁরা বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীদের কোষ্ঠী বিচার করে দিতেন। গ্রহশান্তির জন্য নানা ধরনের দেবতার পূজা করতেন, যজ্ঞ করতেন, কবচ তৈরী করে দিতেন।

প্রায় ৩০০ বছর আগের কোলকাতার যে দু'জন জ্যোতিষীর নাম আজও জ্যোতিষীরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, তাঁরা হলেন জ্যোতিষ বাচস্পতি ও ফকিরচাঁদ দত্ত। জ্যোতিষ বাচস্পতি কোষ্ঠী ও হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। ফকিরচাঁদ শুধু কোষ্ঠী বিচারের পর প্রয়োজন মত কবচ ধারণের বিধান দিতেন। কবচ তাঁরা তৈরি করে দিতেন বা তৈরির ব্যবস্থা করে দিতেন। কবচের মধ্যে ছিল নবগ্রহ-কবচম্, সূর্য-কবচম্, চন্দ্র-কবচম্ বা সোমস্য-কবচম্, মঙ্গলস্য-কবচম্, বুধস্য-কবচম্, বৃহস্পতে-কবচম্, শুক্রস্য-কবচম্, শনেঃ কবচম্, রাহোঃ-কবচম্, কেতোঃ-কবচম্ ইত্যাদি।

প্রতিটি গ্রহের কবচ করতে ঐ গ্রহের এবং ঐ গ্রহদেবতার পূজো করতেন তাঁরা। রবির দেবতা মাতঙ্গী। রবির কবচের দক্ষিণা ছিল 'ধেনুমূল্য'। চন্দ্রের দেবতা কমলা। দক্ষিণা শঙ্খ ও যথাসাধ্য রজতমুদ্রা। মঙ্গলের দেবতা বগলামুখী। দক্ষিণা 'বৃষমূল্য'। বুধের দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী। দক্ষিণা 'স্বর্ণমুদ্রা'। বৃহস্পতির দেবতা তারা। দক্ষিণা 'পীতাভ যুগলবস্ত্র'। শুক্রের দেবতা ভুবনেশ্বরী। দক্ষিণা 'অশ্বমূল্য'। শনির দেবতা দক্ষিণাকালী। দক্ষিণা 'কৃষ্ণবর্ণ গাভীমূল্য'। রাহুর দেবতা ছিন্নমস্তা। দক্ষিণা লৌহ। কেতুর দেবতা ধূমাবতী। দক্ষিণা 'ছাগমূল্য'।

'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি'র সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত চ্যাটার্জি জ্যোতিষ বাচস্পতি ও ফকিরচাঁদ দত্তের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন, এঁরা প্রবাদপুরুষ। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ সময় পুঁথির প্রতিটি নিয়মনিষ্ঠা মেনে কবচ তৈরি করতেন। তারপর ঐ কবচ গঙ্গাজলপাত্রে ডুবিয়ে রেখে যে গ্রহের জন্য কবচ সেই গ্রহ-মন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যকবার জপ করতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণে পূর্ণ জপসংখ্যা ছাড়া কবচ তৈরি সম্পূর্ণ হয় না। আজ পঞ্জিকা খুললেই বা পত্র-পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে নানা ধরনের শক্তিশালী, মহাশক্তিশালী, কবচের বিজ্ঞাপন দেখবেন। এঁদের বেশিরভাগই কবচে কিছু আশীর্বাদীফুল, বেলপাতা ভরে দেন।

এ তো স্রেফ প্রতারণা। গ্রহশান্তির জন্য গ্রহরত্ন ধারণ করা অনেক সহজ। কারণ ভাল গ্রহরত্ন পাওয়া অনেক সহজ, কিন্তু খাঁটি, ঋষিতুল্য কবচ তৈরি করার মত মানুষ বিরল।

কবচ তৈরির পর সঠিক উচ্চারণ প্রতিনিয়ত বজায় রেখে সঠিক সংখ্যায় জপ বাস্তবিকই কেউ করতে পারতেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। পুরোন পুঁথি ও 'পুরোহিত দর্পণ'-এ দেখেছি শুক্রের কবচের জন্য ২১,০০০ বার জপ করার প্রয়োজন হয় 'ওঁ হ্রীং শুক্রায়'। কেতুর বেলায় ২২,০০০ বার জপতে হয় 'ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে'। সবচেয়ে কম জপতে হয় রবি-কবচের বেলায়। তাও নেই নেই করে ৬,০০০ বার জপতে হবে 'ওঁ' হ্রীং হ্রীং সূর্যায়'। জপের গণনতা কম-বেশি হলেই তো কবচের গুণ ফোক্কা (এটা অবশ্য আমার কথা নয়, পুবোন পুঁথিপত্তর ও পুরোহিত দর্পণের কথা)।

গ্রহের খারাপ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে, জীবনে সাফল্য পেতে কবচের পরিবর্তে রত্ন-ব্যবসায়ে কোলকাতার যিনি প্রথম নেমেছিলেন তাঁর নাম ফণিভূষণ রায়। ফণিবাবু ১৯৪৫ সালে বিবেকানন্দ রোডে প্রতিষ্ঠা করলেন এম. পি. জুয়েলার্স। পত্রপত্রিকায় এম. পি-র বিজ্ঞাপনের সঙ্গী হলো 'কাফি খাঁ'র অসাধারণ কার্টুন যা এম. পি.-র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম জ্যোতিষশাস্ত্র ছাত্রদের শেখান শুরু করেন হৃষিকেশ শাস্ত্রী। তাও এটা বিশ শতকের একেবারে গোড়ার কথা। এর আগে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষণকেন্দ্র বলতে বোঝাত কোলকাতার গ্রে স্ট্রিট বা হাতিবাগান। হাতিবাগানের মতই হাওড়ার জানবাড়িও জ্যোতিষচর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাতিবাগান বা গ্রে স্ট্রিটের শাস্ত্রী পরিবারেরই চার ছেলে কৈলাসচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও কাশীশ্বর জ্যোতিষী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর নামের পবে শাস্ত্রীর পরিবর্তে পুরোন উপাধি ব্যবহার করতেন। রমেশচন্দ্র একটি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠির কৃপায় ব্যাপক প্রচার পেয়েছিলেন এবং পরিচিত হয়েছিলেন 'জ্যোতিষ-সম্রাট' হিসেবে।

বমেশচন্দ্র বসবাস শুরু করেছিলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারেব কাছে। বাসস্থানের লাগোযা গড়ে তুলেছিলেন জ্যোতিষচর্চা ও জ্যোতিষ-শিক্ষণ-কেন্দ্র। তবে এটা ছিল তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ব্যাপার। নাম দিলেন 'অল ইন্ডিয়া অ্যাস্ট্রোলজিকাল অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি'।

কলকাতার জ্যোতিষচর্চার এবং গ্রহরত্ন-ব্যবসাযের রমরমা শুরু বিশ শতকের ষাটের দশকে। ষাটের দশকের শুরুতে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন জারি হতে কোলকাতার বহু সোনার দোকানেরই ঝাপ বন্ধ হয়েছিল। অনেক দোকনই রূপান্তরিত হয়েছিল শয্যা-সামগ্রীর দোকান বা শাড়ি-কাপড়ের দোকানে। বেশ কিছু দোকানের হাত-বদলও ঘটেছিল। অনেক স্বর্ণশিল্পী অর্থাভাবে আত্মহত্যাও করেছিলেন. যে-সব সোনার দোকান তাদের অস্তিত্ব বজার রাখাব সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল তারা প্রত্যেকেই একে একে জ্যোতিষ বিভাগ খুলে গ্রহরত্ন বিক্রি করে ক্রেতাদের ভাগ্য ফেরাবার প্রতিশ্রুতি দিযে নিজেদেব ভাগ্য ফেরাতে চাইল। প্রতিটি পাথর বিক্রিতে ১০০ শতাংশ থেকে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত লাভ। অতএব জ্যোতিষীদের সঙ্গে অনেক রত্ন ব্যবসাযীই কমিশনেব রফা করলেন। নামী দামী জ্যোতিষীরা খদ্দের বুঝে ব্যবস্থাপত্র দিতে লাগলেন। আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবসাযী, ডাক্তাবদেব হাতে তুলে দিতে লাগলেন হিরে, চুনি,

ক্যাটস-আইয়ের ব্যবস্থাপত্র, সেই সঙ্গে খাঁটি রত্ন কোথায় পাওয়া যাবে তার হদিশ। ব্যবসা জমে উঠতে লাগল। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের পালে আবার হাওয়া ফিরতে লাগল। জ্যোতিষ বিভাগে কার কতজন দামী-দামী জ্যোতিষী রয়েছে তার প্রচার নেমে গেলেন ব্যবসায়ীরা। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গ্রহরত্ন ও ভাগ্য ফেরাবার হাতছানি এবং রমরমা শুরু হল। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হওয়ার আগে যেখানে কলকাতায় জ্যোতিষ বিভাগসহ রত্ন-ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল দশজন, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সেই সংখ্যা দাঁড়ায় আশির উপর। বর্তমানে অবশ্য এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতিটি সোনার দোকান মানেই জ্যোতিষ ও গ্রহরত্নের বিভাগ। স্বর্ণ-ব্যবসায়ী নন, শুধুমাত্র গ্রহরত্ন বেচেন এমন দোকানের সংখ্যাও বর্তমানে কলকাতায় দশের বেশি। লালবাজারের দু'পাশে ফুটপাতেও 'ডালা সাজান' একাধিক 'খাঁটি গ্রহরত্ন'এর দোকান গজিয়ে উঠেছে।

সত্তরের দশক কলকাতার জ্যোতিষীদের 'সুবর্ণ দশক' বলে চিহ্নিত। ১৯৭৫-এ জ্যোতিষচর্চা ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষার জন্য গড়ে উঠল 'অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট'। ৭৮-এ গড়ে উঠল 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি'। এই সংস্থাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

কলকাতায় বিভিন্ন জ্যোতিষচর্চাব কেন্দ্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে প্রধানত বিভিন্ন গ্রহরত্ন ব্যবসায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতায়।

কলকাতায় বর্তমানে জ্যোতিষচর্চা কেন্দ্র এবং জ্যোতিষ-শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রধান পাঁচটি।

১। অল ইন্ডিয়া অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি।
   ৮২/২এ, রফি আহমেদ কিদওযাই রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩

২। অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট
   ৭০, কৈলাস বসু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

৩। হাউজ অফ অ্যাস্ট্রোলজি
   ৪৫এ, এস. পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬

৪। বিশ্ব জ্যোতির্বিদ সংঘ
   ২ আদিনাথ সাহা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৮

৫। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি
   ৭এ, বিনয় বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৫

এইসব সংস্থা থেকে যে-সব উপাধি বিলি করা হয় সেগুলো হল, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষশাস্ত্রী, জ্যোতিষভূষণ, জ্যোতিষ আচার্য ইত্যাদি। আপাতত ডক্টবেট ডিগ্রি এইসব প্রতিষ্ঠানের কেউই দেন না। তবে এখানে জ্যোতিষশাস্ত্রের বেশ কিছু ডক্টরেট আছেন যাঁরা ডিগ্রিগুলো পেযেছেন লন্ডন বা আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লন্ডন কনসোলেট অফিস এবং আমেরিকান সেন্টাবের ডিরেক্টরকে আমি বিশ্ববিদ্যালযগুলোর নাম বলে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, এইসব বিশ্ববিদ্যালযের বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিনা? এবং থাকলে বিশ্ববিদ্যালযগুলো জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন কিনা?

উত্তরে তাঁরা জানিযেছিলেন এইসব নামের কোন বিশ্ববিদ্যালয ওইসব দেশে নেই। এই

প্রসঙ্গে পাগলাবাবা (বারাণসী) জানিয়েছিলেন, এঁদের অনেকেই লন্ডন, আমেরিকায় না গিয়ে কলকাতায় বসেই এফিডেভিট করে আমেরিকার ওযাল্ড ইউনিভার্সিটির 'ডক্টরেট' বনে যান, স্বর্ণমূল্যে স্বর্ণপদক কেনেন। রাজজ্যোতিষী প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন, তাও ভারি মজার। বলেছিলেন, জেলের কয়েদিদের বা ফাঁসির আসামীদের প্রয়োজন মেটাতে নিযোজিত পুরোহিতই সরকার বা রাজার নিযোজিত হিসেবে নিজেকে রাজজ্যোতিষী বলে প্রচার করেন। পাগলাবাবা এসব কথা বলেছিলেন ১৯৮৫ সালের ১৮ এপ্রিল আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানে।

জ্যোতিষসম্রাট উপাধি ধারণকারীরাও স্ব-ঘোষিত সম্রাট ছাড়া কিছু নন। অনেক সময় অবশ্য এইসব সম্রাটদের হাতে গড়া জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠানই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের হাতে সম্রাট উপাধি তুলে দেন। আবার কখনও কখনও রত্ন-ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোতিষীকে বিখ্যাত করে তুলতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হয়। বিনিময়ে সংস্থা এই জ্যোতিষ-ব্যবসাযীর প্রতিষ্ঠানের জ্যোতিষীকে সংবর্ধনা জানায়।

সত্তর দশক থেকেই বিভিন্ন জ্যোতিষ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ফি বছর জোতিষ সম্মেলন, আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলন ইত্যাদি করছেন।

প্রত্যেক সম্মেলনের উদ্যোক্তারাই একে অপরকে টেক্কা দিতে অনুষ্ঠানকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করতে অনুষ্ঠানে নিযে আসেন মন্ত্রী, বিচারক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিদের।

প্রতিটি জ্যোতিষচর্চা সংস্থার পিছনেই রযেছে গ্রহরত্ন ব্যবসায়ীদেব অর্থ সাহায্য। তাই রমরমা করতে বাধা নেই। মানুষকে যত বেশি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী এবং জ্যোতিষ-নির্ভব কবে তোলা যাবে ততই ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে, এটা তো স্বাভাবিক।

জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপকতর প্রচারের জন্য শুধুমাত্র জ্যোতিষ নিযে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয চারটি পত্রিকা :

১। জ্যোতির্বাণী
   ৫-এ বিন্দু পালিত লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
২। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত
   ৭০ কৈলাস বসু স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬
৩। রাজজ্যোতিষী
   ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
৪। বিদ্যাজ্যোতি
   ২-এ. এন, সাহা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৮

কলকাতায় পেশাদাব জ্যোতিষীর সংখ্যা কত ? এই বিষযে পরিসংখ্যান নিতে বিভিন্ন জ্যোতিষী, জ্যোতিষী-কেন্দ্র এবং রত্ন-ব্যবসাযীদের কাছে গিযেছিলাম। এই বিষযে তাঁবা কেউই ঠিকমত আলোকপাত করতে পারলেন না। আমার সংগ্রহেও এই বিষযে সঠিক তথ্য নেই। তবে আমাদের সমিতি ১৯৮৮তে এ বিষযে তথ্য সংগ্রহেব জন্য একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষার সূচনা হয ১ মার্চ, 'আন্তর্জাতিক যুক্তিবাদী দিবস'এ। চলে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। এই ছয মাসব্যাপী সমীক্ষার মতামত ইতিমধ্যে 'নাগরিক সমাচার', 'আলোকপাত' এবং আবো কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের অনুমান,

কোলকাতায় জ্যোতিষীর সংখ্যা দু'হাজারের মত। কোলকাতায় পুরোপুরি পেশাদার জ্যোতিষীর সংখ্যা একশোর মত ; যাঁদের আয় মাসিক ২৫০০ টাকা বা তারচেয়ে বেশি।

দেড় হাজার জ্যোতিষীর আয় ৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিষীর সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের মত। কলকাতার পর সবচেয়ে বেশি জ্যোতিষীর বাস মেদিনীপুরে।

এককালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রচর্চার পীঠস্থান ছিল নৈহাটির ভাটপাড়া। এখন এখানে জ্যোতিষী আছেন পাঁচ ঘর।

আগে জ্যোতিষচর্চায় ছিল ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া অধিকার। এখন তাতে বিশাল এক থাবা বসিয়েছে অব্রাহ্মণ জ্যোতিষীরা। এই অব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই কায়স্থ।

জোতিষচর্চার ক্ষেত্রে সেকালে পুরুষদেরই একছত্র আধিপত্য ছিল। এখন যুগ পাল্টাচ্ছে। জ্যোতষচর্চায় এগিয়ে এসেছেন অনেক মহিলা।

কলকাতার প্রথম নামী মহিলা জ্যোতিষী পারমিতা। তারপর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন অঞ্জলি দেবী, প্রিয়াংকা, লোপামুদ্রা, মণিমালা, কৃষ্ণা, কল্যাণী মুখার্জি। এ-ছাড়া আরও অনেক মহিলা জ্যোতিষীরাই উঠে আসছেন ; নামী-দামী- হয়ে উঠছেন। নামটা কতখানি ব্যাপক হবে, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ওপর। যার যত বিজ্ঞাপন, যার যত প্রচার, সে তত নামী। আব যার যত নাম, তাত তত দাম।

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের দৌলতে এক কালের সম্রাট-জ্যোতিষীর দলও আবার এক সময় সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, অন্য জ্যোতিষীদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে। পুরোন দিনের পঞ্জিকা বা পত্রিকার পাতা ওল্টালেই চোখে পড়বে অতীত জ্যোতিষ-সম্রাটদের বিজ্ঞাপন। একটু কষ্ট কবে খোঁজ করলেই দেখতে পাবেন বর্তমানে অচেনা এইসব জ্যোতিষীদের অনেকেই এখনও জীবিত এবং এখনও জ্যোতিষ-পেশা আঁকড়ে আছেন।

বিজ্ঞাপনের দৌলতে নামী-দামী জ্যোতিষীরা হলেন ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সমরেন্দ্র দাস, শ্রীরবি শাস্ত্রী, ডঃ সন্দীপন চৌধুরী, পারমিতা, প্রিয়াংকা, নরোত্তম সেন, শুকদেব গোস্বামী ওরফে ভৃগু-আচার্য, শ্রীভৃগু এবং অমৃতলাল।

অমৃতলাল এক বিষয়ে সবার চেয়ে আলাদা। তিনি রত্ন ধারণের ব্যবস্থাপত্র দেন না। পরিবর্তে দেন মেটাল ট্যাবলেট। দাম ১০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা।

অপেশাদার বা অন্য পেশায় নিযুক্ত থাকলেও কোলকাতায় এমন কিছু জোতিষী আছেন যাঁদের কাছে প্রতিনিয়ত ভাগ্য-বিশ্বাসী মানুষের ভীড় লেগেই আছে। এঁদের দু'জন হলেন অতীন ঘোষ, কর্মস্থল কলকাতা হাইকোর্ট। দ্বিতীয় জন গৌরলাল মুখার্জি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী।

বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মানুষও জ্যোতিষচর্চায় এগিয়ে এসেছেন। সাহিত্যিক প্রফুল্ল বায়, সাংবাদিক সাহিত্যিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদেব রায়চৌধুরী, খেলোয়াড় শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, পি. কে. ব্যানার্জি, জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র), অভিনেতা দিপঙ্কর দে, তবুণকুমার, সাহিত্যক শিল্পী এবং চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী,

রাজনীতিবিদ ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অজিত পাঁজা, যতীন চক্রবর্তী, নির্মল বসু প্রমুখেরা জ্যোতিষচর্চা করেন বলেই প্রচারিত।

জ্যোতিষচর্চা প্রথম যেদিন নাড়া খেল

বেতার অনুষ্ঠানে তা-বড় জ্যোতিষীরা ধরাশায়ী হলেন একের বিরুদ্ধে

১৯৮৫-র ১৮ জুলাই তামাম পৃথিবীর জ্যোতিষীদের কাছে 'কালা দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হযে বযেছে। এই দিন রাত ৮ থেকে ৮-৩০ পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতা 'ক' কেন্দ্র থেকে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয। অনুষ্ঠানটির নাম প্রচারিত হয়েছিল "জ্যোতিষ নিযে দুচার কথা।" অনুষ্ঠানটি শুনে এই বিষযে মতামত জানানোর জন্য পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে চিঠি পাঠান আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের প্রযোজক। চিঠিতে অবশ্য অনুষ্ঠানটিকে "জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান" নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে জ্যোতিষী বা ভাগ্য গণনাকারীদের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী, ভৃগু আচার্য ওরফে শূকদের গোস্বামী, 'এ-যুগের খনা' নামে খ্যাত পারমিতা এবং পাগলাবাবা (বারাণসী)। বিজ্ঞানের পক্ষে বা জ্যোতিষীদের বিপক্ষে ছিলাম আমি একা। তিনজন জ্যোতিষী আকাশবাণীর আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। তাঁরা হলেন, মানবী কম্পুটার শকুন্তলা দেবী, মেটাল ট্যাবলেটখ্যাত অমৃললাল এবং আচার্য গৌরাঙ্গ ভারতী।

আলোচনাটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। এক অংশে ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র 'বিজ্ঞান, কি বিজ্ঞান নয' এই নিযে বিতর্ক। দ্বিতীয অংশে ছিল আমার পরিচিত কযেকজনের হাত ও ছক দেখে সাধারণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওযা, যেমন—তাদের আয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিবাহ, কি ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ইত্যাদি।

বেকর্ডিং-এর মাসখানেক আগে শূকদের গোস্বামীকে আমার এবং আমার দুই বন্ধুর হাত দেখিযেছিলাম। অসিতকুমার চক্রবর্তী ও পারমিতাকে দিযেছিলাম আমার চার পরিচিত বন্ধুর জন্ম সময। এই দুই জ্যোতিষীও গণনার সময় পেয়েছিলেন মাসখানেক। প্রতি জাতক পিছু অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল চারটি করে। প্রশ্নগুলো রাখার সময় জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলোচনা কবে নিযেছিলাম। যে সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে জ্যোতিষীরা সামান্যতম অসুবিধের কথা বলেছেন, সে সব প্রশ্ন আমি তৎক্ষগণাৎ বাতিল কবেছি।

অনুষ্ঠনটির রেকর্ডিং করা হয, অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবার বেশ কিছুদিন আগে।

প্রচারিত অনুষ্ঠানটি জনমানসে এত বিপুলভাবে নাড়া দিযেছিল যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছে দীর্ঘ আলোচনা, চিঠি-পত্র এমন কী সম্পাদকীয পর্যন্ত। বেতার অনুষ্ঠানটির প্রায পুবোটাই বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্রপত্রিকায প্রায বছর দুযেক ধরে বিভিন্ন সমযে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্টি সংসদ (সোনাবপুর) তাঁদের নাটক 'ভাগো ভূত ভগবান'এ বেতাব অনুষ্ঠানটিকে নিযে এসেছেন। এই বেতার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমাব চক্রবর্তী একটি বই লিখেছেন। নাম 'জ্যোতিষবিজ্ঞান-কথা'। বইটি মূলত আমাকে আক্রমণ কবেই লেখা। বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন, যে রাতে আকাশবাণী বেতাব

অনুষ্ঠানটি প্রচার করেছিলেন, "জ্বালা প্রশমনের জন্য সে রাতেই দেবতা এগিয়ে দিল লেখনী"।

হায় জ্যোতিষসম্রাট প্রমুখ অংশ গ্রহণকারী অন্য জোতিষীরা, আপনারা এত লোকের ভাগ্য বলে দেন, ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেন, অথচ আপনাদের চূড়ান্ত অপমানের আগাম খবরটাই আপনারা জানতেন না?

আসুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিই সে-দিনের সেই প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানটির।

অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের দাবিতে একাধিকবার প্রচাতির হয়েছে। এখানে ১৮ জুলাই '৮৫তে প্রচারিত অনুষ্ঠানটি তুলে দিলাম।

প্রথম পর্যায়

আমি : আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি শুকদেব গোস্বামীর, যিনি ভৃগু-আচার্য নামেও খ্যাত। শুকদেরবাবু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় রাশি-ফল বিচারকের কাজ করেছেন।

শুকদেববাবু, আপনি নিশ্চযই একজন জ্যোতিষী হিসেবে বিশ্বাস কবেন যে, গ্রহদের প্রভাবে মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তবে কেন, আপনার পেশেন্টদের আপনি স্টোন পরতে প্রেসক্রাইব করেন?

শুকদেব : ভাগ্য অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত। সেই কারণেই গণনা করে ভাগ্য জানা যায়, তবে আর্য ঋষিগণ যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণযন কবেছেন, তাঁরা কতকগুলো গ্রহের সঙ্গে কতকগুলো রত্নের গভীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রত্যেক গ্রহের এক একটি বর্ণ রয়েছে, এবং সেই বর্ণ বিশিষ্ট রত্নের প্রতি সেই গ্রহের আকর্ষণ থাকায় সেই রত্ন ওই গ্রহের প্রিয রত্ন বলে বলেছেন।

আমি : একটা কথা শুকদেববাবু। ধরুন একজনের ভাগ্যে রযেছে, তিনি তাঁর গাড়িতে চাপা দিয়ে একজনের মৃত্যু ঘটাবেন। তার জন্য তাঁকে জেলে যেতে হবে। এরই সঙ্গে আরও একজনের ভাগ্যের একটা ঘটনা নির্ধারিত হযে রয়েছে, যিনি এই গাড়িতে চাপা পড়ে মারা যাবেন। ধরুন, যিনি মারা যাবেন, তিনি একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ কবেন। ইন্সিওর করেন নি। ভাগ্যে ঠিক হযে রযেছে, লোকটির মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বিধবা হবেন। ছেলে-মেয়েরা বাবাকে হারিযে অনাথ হবে। বিধবা মহিলা কাজ না পেয়ে ভিখারির মত জীবন যাপনে বাধ্য হবেন।

যিনি গাড়ি চাপা দেবেন, তিনি আপনাদের সাহায্য নিলেন, নির্ধারিত ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আপনারা তাঁকে এক বা একাধিক গ্রহরত্ন ধারণ করতে বললেন। লোকটি ধারণ করলেন এবং পূর্ব-নির্ধারিত ঘটনা ঘটল না।

ফলে যাঁর গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাওযার কথা ছিল, কোনও গ্রহরত্ন ধারণ না করেও তাঁর মৃত্যু ঘটল না। এই ঘটনার দরুন যে-সব ডাক্তার ও নার্সদের কর্মব্যস্ত থাকার কথা ছিল, তাঁদের সেই বাড়তি কর্মব্যস্ত থাকতে হলো না। যে ওষুধের দোকানের ভাগ্যে এই দুর্ঘটনার জন্য বাড়তি ওষুধ বিক্রির বিষয়টা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তা হল না। রোগী দেখার দৌড়দৌড়ির জন্য আত্মীয়-বন্ধুরা ট্যাক্সির

পেছনে যে খরচ করতেন, তা ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের পকেটে গেল না। স্ত্রী বিধবা হলেন না। সন্তানরা অনাথ হল না। ছেলে-মেযেদের যিনি পড়াতেন, সেই প্রাইভেট টিউটর টিউশুনি হারালেন না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কোনও গ্রহরত্ন ধারণ না করা সত্বেও এতগুলো লোকের জীবনের ঠিক হয়ে থাকা ঘটনাগুলো ওলট-পালট হযে গেল।

এবার ধরুন, দুর্ঘটনায যাঁর মৃত্যুযোগ ছিল, তাঁর ভাগ্য বিচার করলে কোনও জ্যোতিষী নিশ্চয়ই বলতেন, অমুক সময তাঁর মৃত্যুযোগ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হযেছে।

আমাদের সামাজিক জীবনে আমরা পরস্পরের সঙ্গে এত বেশি যুক্ত যে, একজনের পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলে আরও বহুজনের জীবনের পূর্ব-নির্ধারিত ঘটনাগুলো পাল্টে যাবে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকা ঘটনাগুলোব ভারসাম্য নষ্ট হবে।

আপনারা, জ্যোতিষীরা অনবরত প্রতিকারের মাধ্যমে যদি জাতকদের ভাগ্যের পবিবর্তন করতে থাকেন, তবে কী কবে আপনারা বলবেন যে ভাগ্য পূর্ব-নির্ধাবিত ?

শুকদেব : এখন পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায না; এ-কথা আমরা শাস্ত্রকারগণদের মুখে বারংবার শুনেছি। শাস্ত্রকারগণ যা বলেছেন, তা অভ্রান্ত সত্য। পূর্ব-নির্ধারিত কথা প্রসঙ্গে এ-কথাই আমি বলব—গ্রহাদির রত্ন ধারণ কবে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে উপকৃত হয়েছেন। আর্য মুণি-ঋষিগণ ধ্যান বলে, যোগ বলে জানতে পেরেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকার করা যায। এবং সেই প্রতিকার হিসেবে তাঁবা মণি বা রত্ন ধারণের কথা উল্লেখ কবেছেন।

আমি : কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধাবিত ভাগ্য পাল্টে দেবার অর্থই হলো পৃথিবী জুড়ে পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের ভারসাম্যকে নষ্ট কবে দেওযা।

আপনি কি মনে করেন যে পুরুষকার দ্বারা মানুষ তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করতে পাবে ?

শুকদেব : এবার প্রশ্নটা অতি চমৎকার। বৈদান্তিকগণ যাঁরা, তাঁরা পুরুষকারের প্রতি ভীষণ বিশ্বাসী। এবং বশিষ্ঠ্য মুনি রামচন্দ্রকে পুরুষকাবের কথাই বারংবার বলেছিলেন, "হে বামচন্দ্র, যে পুরুষকারকে মানে, সে সব গ্রহ-নক্ষত্রকে অতিক্রম করে যেতে পাবে। তবে সাধাবণ মানুষের পক্ষে পুরুষকার অনেক ক্ষেত্রে সুলভ হয না বলেই দৈব্যকে আশ্রয কবে চলে।

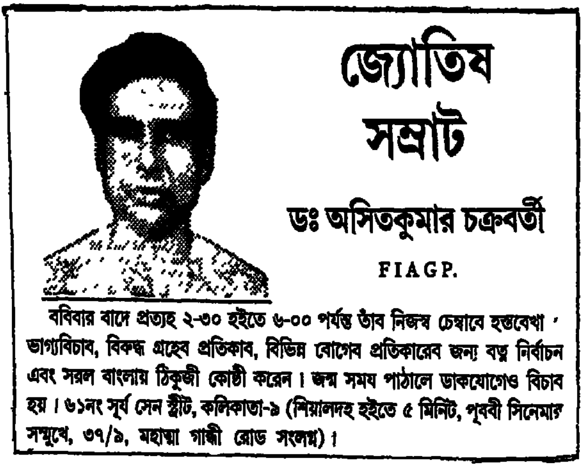
আমি : তবে আপনি একটা কথা বললেন, পুরুষকার দ্বাবা ভাগ্য পরিবর্তন করা, অর্থাৎ কোনও গ্রহের প্রভাবকে অতিক্রম করা যায। রত্ন ও পুরুষকারকে মেনে নিযে তো আপনারা জোতিষশাস্ত্রেরই মূল কথা 'ভাগ্য অপরিবর্তনীয'—এই বক্তব্যেরই বিরোধীতা করছেন।

শুকদেব : নীরব।

আমি : আজকের এই আকর্ষণীয় আলোচনাচক্রে উপস্থিতি হয়েছেন আসিতকুমার চক্রবর্তী। শ্রী চক্রবর্তীর দেওয়া আত্মপরিচয়লিপি থেকে জানতে পারছি ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রর জন্য ওযার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট।

আসিতবাবু, বাংলাদেশে এককালে আমরা অষ্টোত্তরী দশা বিচার করতাম, অর্থাৎ জ্যোতিষীরা করতেন। বর্তমান ভারতবর্ষে বিংশোত্তরী দশা বিচার প্রচলিত। দুটো পিদ্ধতিতে কিন্তু ভাগ্যফল ভিন্নতর। অথচ আগে বহু লোক জ্যোতিষশাস্ত্রকে অভ্রান্ত এবং বিজ্ঞসম্মত মনে করতেন। এখনও বহুলোক তাই মনে করেন। অতএব দেখতে পাচ্ছি জ্যোতিষশাস্ত্র একটা বিশ্বাসের ব্যাপার ; তাই নয় কী ?

অসিতকুমার : কিছু লোকের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস আছে ঠিকই। কিন্তু তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায়, তাঁরা কি যথেষ্ট পরিমাণে এই শাস্ত্র চর্চা করার পর এই ধরনের মনভাব পোষণ করেন ? আবার অগণিত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যাঁদের এই শাস্ত্রে আস্থা আছে ; তাঁরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের দ্বারা এর সত্যতার প্রমাণ পেযেছেন।



আমি : ধাতু বা রত্নেব দ্বারা কি শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিকার সম্ভব বলে আপনার ধারণা ?

অসিতকুমার : রত্নের দ্বারা প্রতিকার সম্ভব। তার কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, বোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করার অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনেই প্রাচীন ঋষিবা দিয়েছেন রত্ন ধারণের নির্দেশ।

আমি : আচ্ছা, আপনারা কি কখনও একটা সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা করে দেখেছেন যে, পাথর পরার পর কতগুলো রোগ সেরেছে? কতকগুলো সারেনি?

অসিতকুমার : এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, রত্নের দ্বারা উপকার পাওয়া সম্ভব।

আমি : সম্ভব। আবার সম্ভব নাও হতে পারে। এটা কোনও পরীক্ষার কথা নয়, গবেষণার কথা নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহলে এলো কোথা থেকে? পাথরের সেখানেই কাজ করতে পারার সম্ভবনা আছে, যেখানে রোগটা মানসিকভাবে এসেছে।

আমি : এখন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি পারমিতার সঙ্গে। পারমিতার আসল নাম, শুভ্রা গঙ্গোপাধ্যায়।

আচ্ছা পারমিতাদেবী, এটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র এক নয়?

পারমিতা : জোতিষশাস্ত্র আর?

আমি : এবং জোতির্বিদ্যা ; দুটো কী এক?

পারমিতা : না।

আমি : যদিও অনেকেই দুটো বিষয়কে একেবারে গুলিয়ে ফেলেন। আর তার ফলেই তাঁরা যুক্তি দেখান—অনেক সময় জ্যোতিষীরা ক্যালকুলেশনে ভুল করতেই পারেন। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ দেখুন ; জোতির্বিজ্ঞানের বিষয় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, দূরত্ব, গতিপথ ইত্যার্দি নিরূপণ করা। আর জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয় মানবদেহে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব নিরুপণ করা। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়?

পারমিতা : হ্যাঁ।

আমি : প্রাচীনকাল থেকে এখনও পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। জোতিষশাস্ত্রে কিন্তু সেই উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেই প্রাচীন ভুল ধারণা থেকে এক পা'ও এগোতে পারেনি। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র যখন মিলে-মিশে ছিল, তখন ওদের ধারণায় চাঁদ ছিল উপগ্রহ নয়, গ্রহ। রাহু ও কেতুকে গ্রহ বলে ভুল করেছিলেন। জ্যোতিষবির্জ্ঞানীরা সেই ভুলকে ত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র এখনও গ্রহ হিসেবে চাঁদ, রাহু, কেতু ইত্যাদির অস্তিত্বকে আঁকড়ে রয়েছে। এর পরে কেউ যদি বলেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞান', তবে জোতিষশাস্ত্রের পক্ষে কী যুক্তি দেবেন?

পারমিতা : জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান এ নিয়ে অনেকের অনেক রকম মত আছে। তবে আমার মতে জ্যোতিষশাস্ত্র পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত।

আমি : এ-ব্যাপারে আপনি আর কিছু বলবেন?

পারমিতা : নীরব।

আমি : আচ্ছা ; আমি একটা তবে অন্য প্রশ্নে যাই, যদি কিছু না বলেন। আপনার কি

মনে হয়, ভূপালের গ্যাস দূর্ঘটনায় নিহতদের সকলেরই জন্ম ছকে একই সময়ে মৃত্যুযোগ ছিল ?

পারমিতা : এটা তো ধরুন আপনার, স্টেটেরও একটা ক্যালকুলেশন থাকে না ?

আমি : আচ্ছা, স্টেট ক্যালকুলেশন মানে কী ? রাজ্যের ক্যালকুলেশন তো ? স্টেট ক্যালকুলেশনে যাই হোক, আমার ভাগ্যে যদি থাকে আমার মৃত্যুটা ওই সময় হবে না, তাহলেও স্টেটের ক্যালকুলেশনে থাকলেই কি এতগুলো লোকের মৃত্যু হয়ে যাবে ?

পারমিতা : না।

আমি : তবে কার মৃত্যুযোগটা ঠিক হবে ? স্টেট ক্যালকুলেশন অনুসারে আমাদের মৃত্যু যোগ ঠিক হয় ? না, মানুষের জন্মছকে যে গ্রহ সন্নিবেশ আছে, তার দ্বারাই মৃত্যুযোগ নির্ধারিত হবে ?

পাবমিতা : জাতকের গ্রহ সন্নিবেশ তো অবশ্যই দেখতে হবে। কিন্তু সে স্টেটে দূর্ঘটনাজনিত যেটা হয়েছে সেটাও তো একটা দেখতে হবে, সেই সময় সেই স্থানে কী ধরনের গ্রহ সমাবেশ ছিল, যার জন্য এই দূর্ঘটনা হলো।

আমি : আপনারা কী স্টেট ক্যালকুলেশন করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন না তাহলে, যে, "এই সময় কেউ ভূপালে থেক না, সবাই ভূপাল ছেড়ে চলে যাও। তাহলে মৃত্যুযোগটা অ্যাভযেড কবা যায়"। আপনারা যখন স্টেট ক্যালকুলেশন করে এটা দেখেছিলেন, তখন এটা জনসাধারণকে জানান নিশ্চয়ই আপনাদের নৈতিক দাযিত্ব ছিল ?

পারমিতা : দেখুন, এ-সম্পর্কে ফোরকাস্ট তো আগেই করা হয়েছিল।

আমি : এই ভূপাল সম্বন্ধে ?

পারমিতা : 'ভূপাল' পার্টিকুলার সম্পর্কে নয়। তবে এই ধরনেব একটা দুর্ঘটনাজনিত কিছু হবে....

আমি : পাঁজি দেখলে প্রতি বছরই দেখতে পাবেন এই ধরনের দূর্ঘটনা, খরা, বন্যা ইত্যাদির কথা লেখা থাকে। ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ। সারা বছবে বেশ কিছু দূর্ঘটনা হবেই। নির্দিষ্টভাবে কোন্ টাউনে দূর্ঘটনা ঘটবে না জানালে এই ধবনের ভবিষ্যদ্বাণী অর্থহীন। কাবণ এতবড় দেশে অনেক দূর্ঘটনা ঘটবেই। নির্দিষ্ট ভাবে বলা যাবে না—এটাকে নিযে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

পারমিতা : হ্যাঁ।

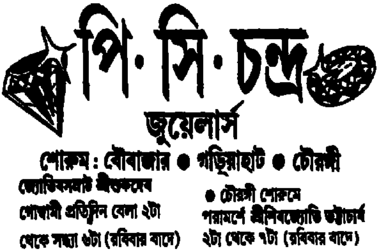
আমি : আচ্ছা, আপনার কী অন্য জ্যোতিষীদের মত মনে হয়, মানুষের ভাগ্য-পূবনির্ধাবিত ? গ্রহের প্রভাবে মানুষের ভাগ্য আগে থেকেই নির্ধারিত হযে রযেছে ?

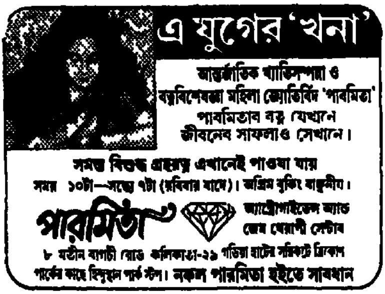
পারমিতা : হ্যাঁ।

আমি : আচ্ছা মানুষের ভাগ্য যদি পূর্ব-নির্ধারিত হযেই থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের পেসেন্টকে স্টোন প্রেসক্রাইব করেন কেন ?

পারমিতা : সূর্যগ্রহেব বিকিরিত রশ্মি ছাড়া জীব-জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সূর্যরশ্মি ও অন্যান্য সব গ্রহের রশ্মি সব সময় দেহকোষ দ্বারা মানুষেব দেহে সঞ্চালিত হয়ে

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শুভাশুভ কাজ করে। দেহের স্নায়ুর দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ এবং সব কাজই সম্পাদিত হয়ে থাকে। রত্নের বিকিরিত রশ্মি দেহকোষের মধ্যে দিয়ে ব্রেনের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে শুভাশুভ ভাবকে উন্মোচিত করে। গ্রহের অশুভ প্রতিক্রিয়াকে শুভমুখী করাই রত্নের কাজ।





আমি : ব্যাপারটা বুঝলাম না। 'নির্ধারিত' কথার অর্থ যা কিছুতেই পাল্টান যাবে না। রত্ন তাহলে ভাগ্য পাল্টাবে কি করে?

আর একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি যে বলেন, রত্নের দ্বারা রোগ সারান সম্ভব; আচ্ছা, এ-রকম কি আপনারা কখনও সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা করে দেখেছেন?

পারমিতা : এইগুলো পরীক্ষা না করলেও স্টোন দেবার পরে যে অনেকের কাজ হয়, এটা কিন্তু দেখা গেছে।

আমি : কোনও সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা করে কী কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দেখেছেন যে, এতজনকে এই স্টোন এই রোগে দিলাম, এবং দেখলাম তাতে এতজনের রোগ সেরেছে। অতএব এই স্টোনটা এই রোগের জন্য দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের কোনও সমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা কী হয়েছে?

পারমিতা : ঠিক সেই রকমভাবে হয়নি।

দ্বিতীয় পর্যায়

আমি : আচ্ছা শুকদেববাবু, আমি কয়েকদিন আগে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আমার দুই পরিচিতকে নিয়ে। তাঁদের দু'জনের আর আমার হাত আপনাকে দেখিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন দীপক ভট্টাচার্য, একজন তপন চৌধুরী, আর একজন তো আমি নিজে। এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে চারটে করে প্রশ্ন রেখেছিলাম। এখন সেগুলোকে নিয়ে আমরা বরং আলোচনা করি।
দীপকবাবুর মা-বাবা দু'জনেই কি বেঁচে আছেন ?

শুকদেব : আমার বিচার-বিবেচনায় তাঁর পিতা মৃত বুঝায়।

আমি : লেখাপড়াতে দীপকবাবু কেমন ছাত্র ছিলেন ?

শুকদেব : মোটামুটি ভালই ছিলেন। সাধারণত ডিগ্রি হিসাবে মাস্টার ডিগ্রির কাছাকাছি বলে হাতের রেখায় দেখা যায়।

আমি : ভাল ছিলেন বলতে কি ধরনের ভাল ? ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশনে যাওয়ার মত ? ঠিক কি ধরনের ভাল ?

শুকদেব : না, যেমন ধরুন অতি ভাল নয়, এই মিডিয়াম যাকে বলে।

আমি : অতি ভাল নয়, মাঝামাঝি যাকে বলে ?

শুকদেব : হ্যাঁ।

আমি : এর জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটা কী বলে আপনার মনে হয়েছে ?

শুকদেব : দেখুন, প্রশ্নটা কঠিন থাকলেও আমি বলতে বাধ্য, মানুষের জীবন অনেক ঘটনাবহুল। এই ঘটনাবহুল জীবনে কোন্‌টা দুঃখময় ঘটনা এটা বলা জ্যোতিষশাস্ত্রে শুধু নয়, এমন কী অধ্যাত্মিকশাস্ত্রেও বলা কঠিন।

আমি : আচ্ছা। আমি চতুর্থ প্রশ্নে যাচ্ছি, বর্তমানে ওর মোট আয় কত বলে আপনার মনে হলো ?

শুকদেব : নিয়ারলি প্রায় ধরুন দু'হাজার থেকে আড়াই হাজারের মত।

আমি : এখানে উপস্থিত রয়েছেন দীপক ভট্টাচার্য ও তপন চৌধুরী। দীপকবাবু বয়সে তরুণ। কাজ করে স্টিল অ্যাথারিটি অফ ইন্ডিয়ার ১০ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিট কলকাতা, ডেপুটি চীপ মার্কেটিং ম্যানেজার পদে।
দীপক, আপনি বলুন তো, আপনার মা-বাবা দু'জনেই বেঁচে আছেন ?

দীপক : হ্যাঁ, দুজনেই বেঁচে আছেন।

আমি : আপনি কী লেখাপড়ায় মোটামুটি পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন ?

দীপক : না, ভালই ছিলাম।

আমি : ভাল মনে কী ধরনের ? আমি শুনেছি আপনি ইউনিভার্সিটিতে স্ট্যান্ড করা ছেলে ছিলেন।

দীপক : হ্যাঁ।

আমি : আপনার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটা কী ?

দীপক : আমি ১৯৬৭ সালে এক দুর্ঘটনায় পড়ে, বি. এস. সি. পার্ট ওয়ানের পরীক্ষায়

বসতে পারিনি। এটাই আমার সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা।

আমি : বর্তমানে আপনার মোট আয় কত?

দীপক : প্রায় হাজার চারেক টাকা।

আমি : এবার তপন চৌধুরীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখছি। তপন চৌধুরীর হাত তো আপনি আগেই দেখে নিয়েছেন। বর্তমানে ও কোথায় কাজ করে? মানে, ওর পেশা কি ধরনের জায়গাতে হতে পারে?

শুকদেব : এই পরিচালনামূলক কাজ করেন, ফ্যাক্‌ট্রিতে; ওভারসিয়ার যাকে বলি আর কী।

আমি : তপনবাবু বিয়ে করেছেন। বিয়েটা কি সম্বন্ধ করে, না প্রেম করে বলে আপনার ধারণা?

শুকদেব : দেখুন, সম্বন্ধ করেই করেছেন। কিন্তু মেয়েটি পূর্ব পরিচিতই, আমরা বলব।

আমি : লেখাপড়া কতদূর হয়েছে?

শুকদেব : উচ্চ ডিগ্রিতে বিঘ্ন হবে। যেমন আই. এ. পাশ, বি. এ. পাশ বা বি. কম. পাশ করল, কিন্তু হাতের চেহারটা কিন্তু প্রাক্‌টিক্যাল। তাই কর্মটাকে প্রাক্‌টিক্যালই করতে হবে।

আমি : শেষ প্রশ্ন, বর্তমানে তপনবাবুর আয় কেমন?

শুকদেব : দেড় হাজার থেকে দু'হাজার টাকা।

আমি : তপনবাবু, আপনাকে প্রশ্ন করার আগে আপনার সম্বন্ধে বলে নিই। তপনবাবু বয়সে তরুণ। কাজ করেন স্টেট ব্যাঙ্কের মেন ব্রাঞ্চে অফিসার পদে। সুতরাং শুকদেববাবুর প্রথম উত্তর ফ্যাকটারিতে কাজ করার ব্যাপারটা মেলেনি।
তপন, আপনার বিয়ে কি সামাজিক প্রথা মত হয়েছিল?

তপন : না।

আমি : আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

তপন : বি. কম।

আমি : বর্তমানে আপনার মোট আয় কেমন?

তপন : তিন হাজার।

আমি : আমার শেষ প্রশ্ন যার সর্ম্পকে রাখছি, সে, আমিই স্বয়ং। আমি কত বছর বয়সে বিয়ে করেছি বলে আপনি দেখলেন।

শুকদেব : হাতের রেখাতে আঠাশ থেকে তিরিশের মধ্যে বিয়ে করেছেন বোঝায়।

আমি : আমার মা-বাবা দু'জনেই কি জীবিত আছেন?

শুকদেব : পিতা মৃত। মা জীবিত।

আমি : কত বছর আগে মারা গেছেন?

শুকদেব : প্রায় আট থেকে দশ বছর আগে।

আমি : কবে থেকে আমার চাকরি-জীবন শুরু হয়েছে?

শুকদেব : পঁচিশ থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে।

আমি : আমার নিজের বাড়ি আছে কী?

শুকদেব : হ্যাঁ, নির্ঘাৎ আছে। এটা হাত থেকেই বোঝা যায়।

আমার বিষয়ে জানাই—আমি বিয়ে করেছি চব্বিশ বছর বয়সে। মা-বাবা দু'জনে জীবিত। চাকরি করছি একুশ বছর বয়স থেকে। আমার নিজের বাড়ি কেন, এক টুকরো জমিও নেই।

জ্যোতিষসম্রাট ভৃগু-আচার্য ওরফে শুকদেব গোস্বামীকে জাতক পিছু চারটি করে প্রশ্ন অর্থাৎ মোট ৩ × ৪ =১২টি প্রশ্ন করেছিলাম। জাতকদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে ১১টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন পুরোপুরি ভুল। তপন চৌধুরীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নটির ক্ষেত্রে তিনটি উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ঠিক হয়েছিল। অর্থাৎ ১২টি প্রশ্নের মধ্যে ১১২/৩টির উত্তরই তিনি ভুল দিয়েছিলেন।

চারজনের জন্ম সময় অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর কিছুদিন আগেই দিয়ে এসেছিলাম জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী এবং 'এ-যুগের খণা' পারমিতা'কে।

ওই চারজন জাতক পিছু চারটি করে প্রশ্ন, অর্থাৎ ৪ × ৪ = ১৬টি মোট প্রশ্ন করেছিলাম। এবার আবার আপনাদের প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি : কলকাতার চারজন মানুষের জন্ম সময় এবং কিছু প্রশ্ন আগে থেকেই দেওযা হয়েছিল জ্যোতিষী অসিতকুমার চক্রবর্তী এবং পারমিতাকে।

অসিতবাবু, আপনাকে চারজন জাতকের জন্ম সময় এবং জন্ম স্থান জানিয়েছিলাম। এঁদের সম্বন্ধে চারটি করে প্রশ্ন রেখেছিলাম। উত্তরগুলো তো আপনি নিয়ে এসেছেন দেখছি।

প্রথম জাতকের জন্ম সময় ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন, সকাল ৫টা ৫৩ মিনিটে কলকাতায। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, জাতক জীবিত? না মৃত?

অসিতকুমার : জন্মসময়ে গ্রহদেব অবস্থান দেখে মনে হয এর মৃত হওযার সম্ভবনাই খুব বেশি।

আমি : দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, লেখাপড়ায় কেমন ছিলেন?

অসিতকুমার : স্নাতকমান হওয়ার সম্ভবনা আছে।

আমি : মোটামুটি? না ভাল?

অসিতকুমার : মোটামুটি, একেবারেই মোটামুটি।

আমি : কর্মজীবন কেমন ছিল?

অসিতকুমার : কর্মজীবন ভাল বা স্থাযী ছিল না।

আমি : বিয়ে করেছিলেন কী ?

অসিতকুমার : বিয়ে সম্ভবত হয়নি। কিন্তু ১৯৮৪ সনে যোগ ছিল।

আমি : পারমিতাদেবী, প্রথম জাতকের জন্ম সময় তো আপনাকে ওটাই দিয়েছি। অর্থাৎ ১৩/৬/১৯৫৩ সালের সকাল ৫টা ৫৩ মিনিটে কলকাতায়।
আমার প্রথম প্রশ্ন, এই জাতকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন বলে আপনার মনে হল ?

পারমিতা : এর তেমন কিছু শিক্ষাগত বিশেষ যোগ্যতা নেই।

আমি : পেশা কী ?

পারমিতা : পৈতৃক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ব্যবসা করেন।

আমি : আর্থিক অবস্থা কেমন ?

পারমিতা : আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। আয়ের অবস্থা কোনও মাসেই স্থির নয়। বার্ষিক আয় মোটামুটি ৫০ হাজার টাকার ওপরে।

আমি : কবে নাগাদ বিয়ে করেছেন বলে মনে হয় ?

পারমিতা : অনেক সময় দেখা যায়, হাতে বা ছকে বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায়, বিয়ে হয়নি। একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, এই জাতক বিয়ে না করলেও কোনও মহিলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

প্রথম জন্ম তারিখটি ডঃ সুভাষ সান্যালের। চাকবি করেন আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নন। স্থায়ী চাকুরে।

আমি : সুভাষ, আপনি কোন্ বিষয়ে ডক্টরেট ?

সুভাষ : আমার বিষয় ছিল ফিজিওলজি।

আমি : আপনার বার্ষিক আয়ের মোটামুটি অংকটা কী ?

সুভাষ : এখনও পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্সের রেঞ্জে পৌঁছতে পারিনি। (অর্থাৎ বার্ষিক ২০ হাজার টাকার মত। এবং আয় স্থায়ী।)

আমি : বিয়ে করেছেন তো ?

সুভাষ : নিশ্চযই ?

আমি : কবে নাগাদ বিয়ে করেছেন ?

সুভাষ : আমার বিয়ে হয়েছিল ১৯৮১ সালেব ডিসেম্বর মাসে।

আমি : দু'নম্বর জাতকের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৩ মে, সকাল ১১টা ১মিনিটে কলকাতায়, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, লেখাপড়ায় কেমন ছিলেন ?

আসিতকুমার : বিদ্যাস্থান উত্তম। ডক্টবেটও হতে পারেন।

আমি : দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, কর্মজীবন কেমন ?

আসিতকুমার : কর্মজীবন খুব ভাল। উচ্চ এবং সম্মানজনক পদে, শিক্ষামূলক এবং সাহিত্যমূলক হতে পাবে।

আমি : তৃতীয় প্রশ্ন, জাতক কি বিদেশে গিয়েছিলেন?

আসিতকুমার : একাধিকবার।

আমি : 'বিদেশ' বলতে এখানে আমি কিন্তু বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটানকে বোঝাতে চাইছি না।

আসিতকুমার : দূরদেশেই একাধিকবার।

আমি : কবে নাগাদ বিয়ে করেছেন?

আসিতকুমার : মার্চ ১৯৬৪ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮-র মধ্যে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু আগস্ট ১৯৬৬ থেকে আগস্ট ১৯৬৭-র মধ্যে প্রবল সম্ভাবনা বিয়ে হওযার।

আমি : পারমিতা, আপনার কি মত?

পারমিতা : ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ মার্চ পর্যন্ত ওনার বিশেষ শারীরিক অসুস্থতা মারকভাবে দেখছি।

আমি : পেশা কী?

পারমিতা : শিল্পী। মনে হয়। সংগীত-জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এছাড়া অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আমি : দ্বিতীয় প্রশ্ন, শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন দেখলেন?

পারমিতা : উচ্চ শিক্ষিত। সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের কোনও শিক্ষায় ডিগ্রি পেযেছেন।

আমি : বিয়ে করেছিলেন কী?

পারমিতা : বিবাহিত-জীবন সুখের হযনি।

আমি : তার মানে, আপনি বলছেন, বিযে কবেছিলেন ; কিন্তু সুখের হযনি। তাই তো?

পারমিতা : হ্যাঁ।

আমি : দ্বিতীয জন্ম তারিখটি অরুণ মুখোপাধ্যায়ের। অরুণবাবু, আপনি কতদূর পর্যন্ত পড়াশুলো করেছেন?

অরুণ মুখো. : আমি বি. এ. প্যাশ করেছি।

আমি : কোথায, কি পোস্টে কাজ করছেন?

অরুণ মুখো. : স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মেন ব্রাঞ্চে এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আমি কাজ করি। হেড ক্লার্ক।

আমি : আপনি গান করেন? মানে ফ্যাংশনে কখনও গেয়েছেন?

অরুণ মুখো. : না, কখনও না।

আমি : দূর বিদেশে গিয়েছেন?

অরুণ মুখো. : দূর বিদেশে কেন? ভারতবর্ষের বাইরেই যাইনি।

আমি : আপনি কোন্ বছর বিয়ে করেছেন?

অরুণ মুখো. : আমি বিয়ে করিনি।

আমি : আমরা তৃতীয় ছকে চলে যাচ্ছি। তৃতীয় ছকের জাতকের জন্ম সময় ২৩ এপ্রিল ১৯৪৭ সালে, সকাল ৮টা ৩০ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড হুগলী জেলার 'জঙ্গলপাড়া' গ্রামে। প্রথম প্রশ্ন হল—লেখাপড়ায় কেমন ?

অসিতকুমার : বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত।

আমি : ওর পেশা কী ?

অসিতকুমার : চিকিৎসক হওয়ার সম্ভবনা।

আমি : দূর দেশে গিয়েছেন কী ?

অসিতকুমার : বিদেশে ভ্রমণ-যোগ আছে।

আমি : বিয়ে করেছেন কী ? করলে কবে নাগাদ ?

অসিতকুমার : বিয়ে হওয়ার যোগ হলো জুন ১৯৮১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩-র মধ্যে। কিন্তু ৯মে ১৯৮২ থেকে নভেম্বর ১৯৮৩-র মধ্যে হওয়ার সম্ভবনাই খুব বেশি।

পারমিতা : এও তো দেখছি শিল্পীর ছক দিয়েছেন। এবং উনি সম্ভবত চিত্রশিল্প পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত।

আমি : উনি কোনও আন্তর্জার্তিক-সম্মান পেযেছেন ?

পারমিতা : পেয়েছেন, বিদেশে বিশেষ সম্মানিত হযেছেন।

আমি : শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন ?

পারমিতা : কমার্স নিযে মাস্টার ডিগ্রি অথবা সমপর্যাযের কোনও ডিগ্রি পেয়েছেন।

আমি : বিযে হযেছে কী ?

পারমিতা : এই সময থেকে দু'বছরের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা দেখা যায।

আমি : তৃতীয জন্ম তারিখটি আর এক অরুণবাবুর। অরুণ চ্যাটার্জির। ভাই অরুণ, তুমি কতদূব পর্যন্ত পড়াশুনো কবেছ ?

অরুণ চ্যাটার্জি : বি. এ. পাস।

আমি : কোথায, কি পোস্টে কাজ করছ ?

অরুণ চ্যাটার্জি : আমি এখন স্টেট ব্যাঙ্কের ক্যালকাটা মেন ব্রাঞ্চে আছি।

আমি : কি পোস্টে ?

অরুণ চ্যাটার্জি : ক্ল্যারিকেল পোস্টেই আছি।

আমি : দূর বিদেশে কখনও গিযেছ ?

অরুণ চ্যাটার্জি : না, বিদেশে কখনও যাইনি।

আমি : সিনেমাশিল্পের সঙ্গে তোমার কোনও যোগাযোগ আছে ?

অরুণ চ্যাটার্জি : হ্যাঁ। দর্শক হিসেবে যোগাযোগ আছে।

আমি : চতুর্থ আর শেষ ছক নিয়ে এবার বলছি। জাতকের জন্ম ১৯৫১ সালের ২০ আগস্ট দুপুর ১টা ৫৮ মিনিটে কলকাতায়। অসিতবাবু, প্রথম প্রশ্ন, বিয়ে করেছেন কী? করলে কবে?

অসিতকুমার : না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তবে জুন ১৯৮৪ থেকে জুন '৮৭-র মধ্যে বিয়ে হওয়ার যোগ রয়েছে। কিন্তু এইটি ফাইভেই হতে পারে।

আমি : আয় কেমন?

অসিতকুমার : হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে হতে পারে।

আমি : শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন?

অসিতকুমার : স্নাতক মান পর্যন্ত আশা করা যায়।

আমি : পেশা কী?

অসিতকুমার : চাকরি হবে।

আমি : পারমিতা, এর ছকে কি দেখলেন?

পারমিতা : রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

আমি : আয় কেমন?

পারমিতা : বহুভাবে প্রচুর আয় দেখা যায়।

আমি : বিদেশে গিয়েছেন।

পারমিতা : বিদেশে গেছেন?

আমি : এর সম্পর্কে আর কিছু বলবেন?

পারমিতা : এর সম্পর্কে আমি বলছি; বক্তা হিসেবে উনি খুবই জনপ্রিয়।

আমি : চতুর্থ জন্ম তারিখটি রাজীব নিয়োগীর। রাজীব আপনি কবে বিয়ে করেছেন?

রাজীব : আমি ১৯৭৮ সালে নভেম্বর মাসে বিয়ে করেছি।

আমি : আপনার পেশা কী?

রাজীব : স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ডেপুটি চীফ মার্কেটিং ম্যানেজার। কলকাতা অফিসেই আছি। (সঙ্গে কলকাতার দুটি বিখ্যাত কোম্পানীর অংশিদার। একটি, 'এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি. পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা, দ্বিতীয়টি 'গিরিশ"—ওষুধ বিক্রয় কেন্দ্র)।

আমি : রাজনীতি করেন?

রাজীব : না

আমি : আয় কেমন?

রাজীব : আমার চাকরি থেকে বছরে আয় প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকার মতন।

আমি : কতদূর লেখাপড়া করেছেন ?

রাজীব : আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে।

আমি : দূর বিদেশে গিয়েছেন ?

রাজীব : না।

আমি : বক্তৃতা দিতে পারেন।

রাজীব : বক্তৃতা দেওযা আমার পেশা নয় ; আমি পরিও না।

পারমিতা ও অসিত চক্রবর্তীকে জাতক পিছু চারটি করে অর্থাৎ মোট ৪ × ৪ =১৬টি প্রশ্ন করেছিলাম। এরা দুজনই ১৬টি প্রশ্নেরই ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে দু'জনে একই জন্ম সময় নিয়ে গণনা করা সত্বেও ১৬টি উত্তরের মধ্যে একটি মাত্র ক্ষেত্রে দু'জনের উত্তরে মিল ছিল। উত্তর না মিললে জ্যোতিষীরা সঠিক জন্ম সময় নিয়ে কূট প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একই জন্ম সময় নিয়ে গণনা করা সত্বেও দু'জনের দু'রকম উত্তরের কি অজুহাত তাঁরা দেবেন ?

উত্তর বেতার অনুষ্ঠান থেকেই তুলে দিচ্ছি।

ডঃ অসিতকুমার চক্রবতী : তার কারণ, কখনও আমাদের অক্ষমতা, আবার কখনও শাস্ত্রের অপূর্ণতা।

পারমিতা : দেখুন, সমস্ত উত্তর হানড্রেড পারসেন্ট নির্ভুল হওয়া কখনই সম্ভব নয।

যাক। আলোচনা শেষে লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্যে হলেও অন্তত একবারের জন্য জ্যোতিষসম্রাট স্বীকার করলেন জ্যোতিষশাস্ত্রের অপূর্ণতার কথা। কিন্তু এ কি কথা শোনালেন 'এ-যুগেব খণা' ? "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ"। এখানে হানড্রেড পারসেন্ট ভুল উত্তর দিযেও ম্যাডাম 'খণা' যে গলাবাজি করলেন, সেটা জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ 'চোরের মাযের বড় গলা'র একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এবার বলি ওদের ফেল করাবার গোপন রহস্য। দু-একটি উদাহরণ দিলেই চলবে। কারণ 'সমাজদারকে লিযে ইশারাই কাফি'।

দীপক ভট্টাচার্যকে বুঝিযে-পড়িয়ে নিয়েই হাজির করেছিলাম। ওর নিজস্ব গাড়িটি ব্যবহার কবতে দিইনি। কথায় কথায় শুকদেববাবুকে দীপক বলেও দিযেছিলেন, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় কাজ করেন। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে, কথাবার্তা শুনে শুকদেববাবু দীপককে অতি সাধারণেব একটুও ওপবে স্থান দেননি।

তপন চৌধুরীকে পরিয়ে ছিলাম ফুটপাথ থেকে কেনা সেকেন্ডহ্যান্ড স্ট্রেচলনের পঁয়তিরিশ টাকা দামেব প্যান্ট। গাযে ছিল পুরোন বুশ-শার্ট যার তলার সেলাই গেছে খুলে। ক্ষযে যাওযা ধুলো-মাখা চটি। রিয়ারসল মাফিক তপন জ্যোতিষীর সামনে কথা বলেছিলেন চড়া গলায়, ভুল ইংরেজিতে। ফলে জ্যোতিষীর চোখে ব্যাঙ্ক অফিসার হয়ে পড়েছিল ফ্যাক্টরির কর্মী। আর এই মোক্ষম ভুলের ফলেই বাকি সব ক্যালকুলেশনই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

স্টেট ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক অরুণ মুখার্জিকে জ্যোতিষসম্রাট অসিতবাবু দেখেছিলেন নিপাট-ধুতি পাঞ্জাবিতে। হাতে মোটা ঢাউস চামড়ার একটা ব্যাগ। ব্যাগের হ্যান্ডেলের তলায় প্লাসটিকের খাপে গোঁজা ছিল একটি ভিজিটিং কার্ড ডঃ অরুণ মুখার্জি পি. এচ. ডি., প্রফেসর, কমপারিজিন লিটারেচন, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা। অ্যাডভাইজার, ল্যাঙ্গোয়েজ-সেল (ইউ.এন.ও)।

অসিতবাবু অরুণ মুখার্জির জন্ম সময়ের চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অরুণ মুখার্জির পোশাক, চোখে দামি চশমাকে। এবং সম্ভবত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যাগে সাঁটা ভিজিটিং-কার্ডটা এড়াতে পারেনি। সদ্য ছাপা এই ভিজিটিং কার্ডটাই যে সব হিসেব ওলট-পালক করে দেবে, এ বিষয়ে আমি অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত ছিলাম।

জাতকদের আমি যে ভাবে, যে রূপে জ্যোতিষীদের কাছে হাজির করেছি, সেই রূপটিকে মাথায় রেখেই জ্যোতিষীরা তাদের নিদান এঁকেছেন এবং মুখ থুবড়ে পড়েছেন।

যুক্তির দিক থেকে নয় ধরেই নিলাম, জাতকদের জন্ম সময় ভুল ছিল। কিন্তু একই জন্ম সমঘ নিয়ে জ্যোতিষীরা একটি ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন ভিন্নতর মত দিলেন? আসলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন; দিতে বাধ্য করেছিলাম আমি। ওরা জাতকের জন্মসময় আর জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর সামান্যতম নির্ভর করলে একই শাস্ত্র বিচারে ভিন্ন বা বিপরীত ফল নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসত না।

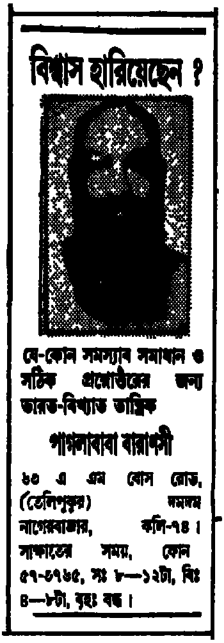
ওরা জাতকদের পোশাক-আশাক কথার্বাতায় নির্ভর করাতেই জ্যোতিষীদের শাস্ত্রের বুলি কপ্চানো মুখোশটি খুলে পড়ে আসল চেহারাটাই বেরিযে পড়েছিল।

আপনারা একই ভাবে নিজেকে আমূল পাল্টে হাজির হন, যে কোনও জ্যোতিষসম্রাট বা ওই জাতীয় কারও কাছে। দেখবেন, আপনি যে সং সেজে নিজেকে হাজির করেছেন, সেটাকে সত্যি ধরে জ্যোতিষী শুধু ভুলই বলে চলেছে। প্রতিটি জ্যোতিষীর ক্ষেত্রেই এই ঘটনাই ঘটবে। এই ঘটনা ঘটতে বাধ্য। আপনি নিজেই হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখুন না।

পাগলাবাবা জ্যোতিষীর চেয়ে বেশি কিছু

পাগলাবাবা ব্রাকেটে 'বারাণসী' কথার ওপর বিজ্ঞাপনে যে চুল দাড়ি, গোঁফ শোভিত পাগল-গাপল একটি প্রৌঢ়ের ছবি ছাপা হয় সেই ছবির ওপরে লেখা থাকে—'আপনি কি বিশ্বাস হারিযেছেন'। পাগলাবাবার দাবি, যে কোনও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন। তাঁর সেই দাবি পরীক্ষার জন্যেই মুখোমুখি হয়েছিলাম বেতার অনুষ্ঠানে। পাগলাবাবা বেতার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এর পর তাঁর ডেরায় গিয়েছিলাম, কিঞ্চিৎ মোলাকাৎ করতে। কারণ, সত্যি বলতে কী অজানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল। সর্ত অনুসারে বেতার অনুষ্ঠানে আমি মাত্র তিনটে প্রশ্ন করতে পারব, তাঁর দাবির পরীক্ষা নিতে। হয়তো এমন হলো, প্রথম প্রশ্নটি হাজির করলাম, পাগলাবাবা সঠিক উত্তর দিয়ে দিলেন, যেমনি হাজার হাজার মানুষকে আজ পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন, এবং আমি এই সঠিক উত্তর দিতে পারার কারণটি ধরতে পারলাম না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হাজির করলাম। পাগলাবাবা সঠিক উত্তর দিলেন। সঠিক উত্তর দিতে পারার কারণটি এবার আমি ধরতে

পাবলাম। ফলে, তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে পাগলাবাবা ভুল উত্তর দিতে বাধ্য হলেন। এত করেও কিন্তু পাগলাবাবার এই সঠিক উত্তর দানের কৌশলটি ধরার সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রয়াসই



ব্যর্থ হবে। শ্রোতারা কি শুনবেন ? কি ধারণা তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হবে ? তাঁরা শুনবেন, বিজ্ঞানের তরফ থেকে হাজির করা তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দুটির ক্ষেত্রেই অলৌকিকক্ষমতা জয়ী। অতএব এই জয়ই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অলৌকিকক্ষমতার জয়ের প্রতীক হয়ে উঠবে ; তখন এই জয় আর প্রবীর ঘোষের বিরুদ্ধে পাগলাবাবার জয় বলে গণ্য হবে না।

যাঁরা জাদু-শিল্পী তাঁরা জানেন, কোনও একটা নতুন জাদু দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোনও একজন দর্শক-জাদুকরের পক্ষে তার কৌশল বুঝে ওঠা সম্ভব নাও হতে পারে ; এমন কি সেই দর্শক-জাদুকরটি ভারতশ্রেষ্ঠ জাদুকর না হয়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর হলেও। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, সাধারণ মানুষ জাদু-জগতের সেরা শিরোপা যাঁদের মাথায় চাপান, তারাই কিন্তু জাদু সংক্রান্ত জ্ঞানের সবচেয়ে সেরাটি নন। আমাদের দেশেও এমন কিছু জাদুকরদের জাদুকর আছেন, যাঁরা জাদুকরদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, এবং তাঁরা কিন্তু জনপ্রিয়তার বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে, সাধারণ মানুষদের দৃষ্টির আড়ালে সৃষ্টির আপন সাধনা চালিয়ে চলেছেন। এমন জাদুকরদের জাদুকরের পক্ষেও সব সময় সম্ভব হয় না কোনও একটি কৌশল দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলার. এখানে নতুন জাদুর স্রষ্টা যিনি, তিনিও হযতো এমনই সব জাদুকরদেরই জাদুকর। আর এই কারণেই বিভিন্ন তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা

ফাঁস করতে গিয়ে ফেঁসে গেছেনদের দলে রয়েছেন অনেক জাদুসম্রাট, জাদুর সুলতান, বাস্তবিকই বিশ্বখ্যাতি আছে এমন জাদুকর, বিজ্ঞানী, অলৌকিকক্ষমতার দাবিদারদের পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থার প্রধান থেকে শুরু করে গাদা গাদা ছোট-বড় বহু সাইন্স ক্লাব, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান আকাদেমি পর্যন্ত। (এমনই বহু বিখ্যাতদের চ্যালেঞ্জ হেরে যাবার এবং তাদের সেই হারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদেব সমিতির জেতার বহু অলিখিত কাহিনী নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সামনে হাজির হবার ইচ্ছে আছে। এতে থাকবে আমাদের সমিতির নিরবিচ্ছিন্ন জয়ের এমন অনেক রোমাঞ্চকব নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, অভিজ্ঞতা ও নেপথ্য প্রস্তুতির কথা যা কল্পনাকে অবশ্যই বার বার হার মানাবে।)

প্রোগ্রাম রেকর্ডিং-এর আগে পাগলাবাবার ক্ষমতাটা একবার দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম প্রচণ্ড রকম। গেলাম। পাগলাবাবা অনেক খাওয়ালেন। অনেক গল্প করলেন। ওই সময় তাঁর কোনও ক্লায়েন্টকেই আমাদের সামনে হাজির হতে দিলেন না। আমার নানা কাযদার অনুরোধকেই পরম অবহেলায় নাক থেকে মাছি তাড়াবার মত করেই সরিয়ে দিলেন। তাঁব সঙ্গে শুধু এ-টুকুই ঠিক হলো, রেকর্ডিং-এর দিন কি কি প্রশ্ন হাজির করব। এক : আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করবেন, তাঁর সিগারেটের প্যাকেটে কটা সিগারেট আছে। দুই : একটা ক্যামেবা হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে এই ক্যামেরায় কটা ফিল্ম তোলা হয়েছে। তিন : এক বন্ধু তাঁর মানিব্যাগ বার করবেন। বলতে হবে কত টাকা আছে (খুচরো পয়সা বাদ)।

ব্যর্থ আমি প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়েই ফিরেছিলাম সেদিন। শুধু এ-কথাই বার বার ঘুরে ফিবে আমাকে তাড়িত করছিল বেকর্ডিং-এব আগেই আমাকে এই রহস্যের সূত্র খুঁজে বের করতেই হবে। নতুবা প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রশ্ন করলে আমাকে হারতেই হবে ; কারণ পাগলাবাবা অবশ্যই ঠিক উত্তর দেবেন এবং অবশ্যই কৌশলের সাহায্যেই।

ওই একই ধরনের ক্ষমতার দাবিদার আচার্য গৌরাঙ্গ ভারতীর সঙ্গে দেখা করলাম। গৌরাঙ্গ ভারতী এই বেতার অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং আমন্ত্রণ গ্রহণ কবেননি। গৌতম ভারতীর সঙ্গে গল্পে-গল্পে জমিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল। "আমি কি বিবাহিত ?"

একটা রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে তাতে উত্তর লিখে কলমটা নামিয়ে রেখে বলেছিলেন, "আপনি কি বিয়ে কবেছেন ?"

বলেছিলাম, "হ্যাঁ', করেছি।"

প্যাডটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল 'বিবাহিত'।

আমি এরপব দ্বিতীয় প্রশ্ন রেখেছিলাম, "বলুন তো আমার প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে ?"

রাইটিং প্যাডে আবার উত্তরটা লিখে নামিয়ে রাখলেন কলমটা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রথম সন্তান কী ?"

বললাম, "ছেলে।"

"দেখুন তো কি লিখেছি ?" প্যাডটা মেলে ধরলেন আমার চোখের সামনে। স্পষ্ট লেখা

"ছেলে।"

তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তর এবং রহস্যভেদ একই সঙ্গে হলো। (কিভাবে এমন সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে দেওয়া যায়, তাঁর প্রযোগ-কৌশল নিযে বিস্তৃত আলোচনা আছে বইটির প্রথম খণ্ডে।)

পাগলাবাবা রেকর্ডিং-এর দিন আকাশবাণী ভবনে এলেন কযেকটা গাড়ি বোঝাই বহু বিশিষ্ট শিষ্য-সাবুদদের নিযে। পরনে রক্তলাল ধুতি ও রক্তলাল হাফ হাতার ফতুযা বা পাঞ্জাবি জাতীয় কিছু। আকণ্ঠ পান করে দরদর করে ঘামছেন, তবে মাতাল নন। আকাশবাণী ভবনেও দেখলাম তার ভক্তের অভাব নেই। পাগলাবাবা বিজ্ঞান প্রযোজকের ঘরে দাঁড়িযেই অনেকের প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছিলেন। অনেকের সম্বন্ধে অতীতের কথা বলে চমক্ সৃষ্টি করছিলেন (আমাদের সমিতির বেশ কিছু সদস্যই মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে এমন অনেক কথা বলে থাকেন, এমন কি বিভিন্ন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানেও বলে থাকেন ; আর এই বলতে পারার ক্ষমতাটা অনেক ক্ষেত্রেই তা-বড় জ্যোতিষীদের চেযেও অনেক বেশি নির্ভুল।) একজনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে পাগলাবাবা রাইটিং প্যাড বের করলেন, এবং সকলকে প্রচণ্ড রকম আশ্চর্য করে (আমাকে বাদে) প্রশ্নের উত্তরটা মিলিযেও দিলেন। তারপর যা শুরু হলো, তাকে বলা চলতে পারে দস্তুর মত পাগলাবাবাকে ঘিরে অন্ধভক্তদের পাগলামী। একজন সরাসরি দাবি করলেন, "এখানেই পাগলাবাবার ক্ষমতার পরীক্ষার রেকর্ডিং করতে অসবিধে কোথায ? এখানেই রেকর্ডিং হোক।" এই দাবির সুরে অনেকেই সুর মেলালেন।

অবস্থাটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে বিজ্ঞান প্রযোজক অমিত চক্রবর্তীকে বললাম, "আপনি বাস্তবিকই প্রোগ্রামটার রেকর্ডিং করতে চাইলে আর একটুও দেরি না করে ওঁকে নিযে স্টুডিওতে চলুন। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। রেকর্ডিং শেষ হলেই আমায সেখানে যেতে হবে। আর একটুও দেরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয।

আমার তরফ থেকে প্রশ্ন করার জন্য হাজির করেছিলোম আমার তিন বন্ধু চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রকাশক মযূখ বসু এবং একাধারে চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকাশক রঞ্জন সেনগুপ্তকে। পাগলাবাবার এমন অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা দর্শনে আমার সাজান ব্যাপারটা তাঁরা না গোলমাল করে ফেলেন, এ-বিষযেও নজর রাখতে হচ্ছিল।

তারপর আমরা স্টুডিওতে ঢুকলাম। রেকর্ডিং শুরু হলো। প্রশ্নত্তোরের পর্ব ঢুকতে পাগলাবাবার দাবি পরীক্ষার সময তাঁকে লিখে উত্তর দিতে দিইনি। এবার আসুন, আপনাদের নিযে যাই সেই অতি বিখ্যাত বেতার অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে, এখানে অবশ্য জ্যোতিষশাস্ত্র সরাসরি নেই, তবু আছে অদৃষ্টবাদের কথা।

তৃতীয় পর্যায়

আমি : এখানে উপস্থিত আছেন পাগলাবাবা (বারাণসী)। পাগলাবাবার আসল নাম সুনীলকুমার ভট্টাচার্য। পাগলাবাবা দাবি করেন, তিনি হাত বা কোষ্ঠি না দেখেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক উত্তরদানে সক্ষম। তিনি দাবি করেন, অলৌকিক শক্তির প্রভাবে যে কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দিতে

পারেন। প্রশ্নগুলো অদ্ভুত ধরনের হতে পারে। যেমন—আমার মানিব্যাগে কত টাকা আছে। আমার বাড়িতে কতগুলো বেড়াল আছে, সবই। এ-সবই তিনি পারেন মায়ের কৃপায় পাওযা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিলাভের ফলে।

সুনীলবাবু, পত্র-পত্রিকায় বহু জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের বিজ্ঞাপন দিতে দেখি, যাঁদের নামের পরেই থাকে কয়েক ইঞ্চি নানা ধরনের অদ্ভুত সব ডিগ্রীর মিছিল। এই যেমন ধরুন M.A.A (Great Britain), L.WI,CWA (New Delhi) F.R.A.S. (London), L.M.K.B.S. (N. Delhi), তান্ত্রিক-জ্যোতিষী, রাজ জ্যোতিষী, অ্যাস্ট্রোপামিস্ট, তান্ত্রিক-আচার্য, জ্যোতিষ সম্রাট, সামুদ্রিক-রত্ন, ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞাপকদের মধ্যে এমন অতি-তরুণ আছেন, যাঁদের দেখলেই মনে প্রশ্ন জাগে, এই এত অল্প বয়সে এত ভারী ভারী সব ডিগ্রী-টিগ্রী পেলেন কী করে ?

পাগলাবাবা : আমার কোনও ডিগ্রী নেই, সব বিষযে আমি বলতে পারব না। 'রাজ-জ্যোতিষী', যেমন 'রাজ-কর্মচারী'। কিছু কিছু জ্যোতিষী আছেন যাঁরা জেলে গিযে কযেদীদের ধর্ম-তত্ব, গীতা-ভগবত ইত্যাদি পাঠ করে শোনান। এর জন্য গরমেন্ট থেকে কিছু পান, আবার কেউ কেউ বিনে পযসায কাজ করেন। এঁদেরকেই রাজ-জ্যোতিষী বলে।

M.A.A.(London), at Calcutta, এ-রকমও আছে। আবার আমি শুনেছি, অনেকে কোর্টে এফিডেভিট কবে যেগুলো চায সেগুলো নিতে পাবেন।

আমি : ডিগ্রীগুলো নিতে পারেন ?

পাগলাবাবা : হ্যাঁ।

আমি : আমাদের সময়ও খুবই কম। তিনজন আপনার সামনে প্রশ্ন রাখবেন। প্রথম প্রশ্ন রাখবেন কল্যাণ চক্রবর্তী। প্রফেশনে প্রেস ফটোগ্রাফার।

কল্যাণ : আমার সঙ্গে যে ক্যামেবা আছে, সেই ক্যামেরায কতগুলো ছবি উঠিযেছি ?

পাগলাবাবা : এই ১৬ থেকে ১৭টা।

আমি : কল্যাণ, কটা ছবি তুলেছ, তুমি একটু দেখাও।

কল্যাণ : আমার ক্যামেবায় ইন্ডিকেটরে তোলা ছবির নম্বরটা দেখে নিন, তিরিশ।

পাগলাবাবা : তাহলে আমার ভুল হয়েছে।

আমি : ময়ূখবাবু, ময়ূখ বোস এবার প্রশ্ন রাখছেন।

ময়ূখ : আমার মানিব্যাগে কত টাকা আছে ?

পাগলাবাবা : সেভেন সেভেন।

ময়ূখ : সেভেন সেভেন ? আমারমানি ব্যাগে ২৭০ টাকা আছে, দেখে নিন।

পাগলাবাবা : ভুল, আমার ভুল।

আমি : এবার প্রশ্ন করছেন রঞ্জনবাবু, রঞ্জন সেনগুপ্ত।

রঞ্জন : আমার একটাই প্রশ্ন, আমার পকেটের সিগারেটের প্যাকেটটা দেখেছেন, এটায় ক'টা সিগারেট আছে ?

পাগলাবাবা : সাতটা।

রঞ্জন : দেখুন, ন'টা আছে।

পাগলাবাবা : তিনটেই আমার ভুল হল।

আমি : আচ্ছা, এই ধরনের ভুল কেন হয়?

পাগলাবাবা : আমাদের একটা মুড আছে। প্রত্যেক মানুষের একটা জায়গা আছে।

আমি : তার মানে নিজের জায়গায় হলে আপনার সুবিধে হয়?

পাগলাবাবা : না, তার কোনও প্রশ্ন নয়। যে কোনও জায়গাযই প্রশ্নের উত্তর দিই। হয়তো আপনি বলবেন যে আমি এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না, অতএব গুল ওসব। হয়তো আমি এখন মুডে নেই। মানুষের সুস্থতা, অসুস্থতা আছে। আর তিনটে প্রশ্নের উত্তরেই ভুল করলাম। এতে আমি খুব আনন্দ পেলাম। বুঝলাম, আমিও ভুল করি।

রহস্য এখানেই শেষ নয়। এর পরও বলার কিছু থেকে যায়। এই লড়াইয়ের নেপথ্যের কিছু কথা তুলে দিলাম, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে আসতে পারে ভেবে।

পাগলাবাবা (বারাণসী)-কে লিখে উত্তর দিতে দিইনি ; শুধুমাত্র এই কারণেই জিতেছি ; এমনটা ভাবলে পুরোপুরি ভুল ভাবা হবে। সেদিন কল্যাণ চক্রবর্তী এবং রঞ্জন সেনগুপ্ত যেমন প্রশ্ন করবেন ভেবেছিলেন, তেমনিটি করলে পাগলাবাবা না লিখেই সঠিক উত্তর দিয়ে দিতে সক্ষম হতেন। আর, তার ফলেও অলৌকিক ক্ষমতারই বিশাল জয় ঘোষিত হতো। যুক্তিবাদী আন্দোলন আজ যে অবস্থায় অবস্থান করছে তা নিঃসন্দেহে অনেকটাই ব্যাহত হতো।

রেকর্ডিং-এর দু'দিন আগে আমার অফিসে এসেছিলেন কল্যাণ। জানালেন, সব তৈরি। একটা ক্যামেরায় কিছু ফিল্ম তুলে রেখে দিয়েছেন। ওটাই পরশু নিয়ে আসবেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "ক'টা ফিল্ম তুলেছ? ১৬-১৭টা?"

কল্যাণ বললেন, "হ্যাঁ, "সতেরটা তুলেছি।"

বললাম, "ওটা তিরিশে নিয়ে যাও।"

"বললে নিয়ে যাব। কিন্তু কোনও দরকার আছে কী?"

"নিশ্চয়ই, কারণ তোমাকে দেখে যেমন আমি অনুমান করতে পেরেছি পরীক্ষার জন্য তুমি এক থেকে ছত্রিশ-এর মধ্যে কত নম্বরকে বেছে নেবে, পাগলাবাবাও তা পারবেন। পাগলাবাবার সঙ্গে একদিন কিছুক্ষণ মেশার সুযোগে যা বুঝেছি, তাতেই মনে হয়েছে বিভিন্ন মানুষের সংখ্যা ভাবার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মানসিকতা কাজ করবে, সেই মনস্তত্ত্ব বিষয়ে উনি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। লিখে উত্তর দেবার সুযোগ বন্ধ করে দিলেই যে উনি ভুল বলতে বাধ্য হবেন, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। উনি তোমার মানসিকতাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন। ছত্রিশটি ফিল্মের মধ্যে কতটি তুলেছ, অর্থাৎ ১ থেকে ৩৬-এর মধ্যে একটা সংখ্যা তোমাকে বেছে নিতে বললে তুমি কোন্ সংখ্যাটি বেছে নিতে চাইবে—এটাই পাগলাবাবা বুঝতে চাইবেন তোমাকে দেখে। এবং পারবেনও, দেখে দিও। কিন্তু তুমি ৩০-এ রেখে দেখ, পাগলাবাবা বলতে পারবেন না। কারণ বাস্তবিকই তাঁর অতীন্দ্রিয়-দৃষ্টিশক্তি নেই ; তাঁর মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ও তাঁর আগাম চিন্তা আমি ধরতে

সক্ষম।"

কল্যাণ আমার কথামত ১৭কে ৩০-এ নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে হেরে যাওয়া বাজিও যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মীরা জিতে নিয়েছিলেন।

রেকর্ডিং-এর একটু আগে রঞ্জন সেনগুপ্তকে একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "প্যাকেট রেডি?"

"হ্যাঁ।"

"কটা রেখেছেন?"

"আপনাকেও বলব না। কেউ না জানলে জেতার সম্ভাবনা বাড়ে।"

বলেছিলাম, "সাতটা রেখেছেন না?"

বিস্মিত রঞ্জন বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন তিনটে সিগারেট সরিয়ে রেখেছি?"

বললাম, "সে পরে বোঝাব, এখন প্যাকেটে আর দুটো সিগারেট পুরে ফেলুন।"

অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পর কল্যাণ চক্রবর্তী তাঁর এক চিত্র-গ্রাহক বন্ধু কল্যাণ বসাককে নিয়ে এসেছিলেন আমার ফ্ল্যাটে। কল্যাণ বসাক আমার অনুমান-শক্তির প্রমাণ নিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলাম, "১ থেকে ১০এর মধ্যে একটা সংখ্যা ভাবুন তো?"

কল্যাণ বসাক বললেন, "ভেবেছি।"

"সাত ভেবেছেন।"

কল্যাণ বসাক যথেষ্টই বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, সাতই ভেবেছিলাম।"

কল্যাণ বসাককে দেখে আর পাঁচজন গড় মানুষের মতই সতর্ক, সাবধানী মানুষটিকে আবিষ্কার করেছিলাম। তাই, ১ থেকে ১০-এর মধ্যে সাধারণভাবে '৭' ভাবার গরপড়তা মানুষের প্রবণতার কথাই বলেছিলাম। এই সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার প্রবণতা সাধারণভাবেই অখ্যাত, বিখ্যাত, সবার মধ্যেই বেশির ভাগ সময়ই বিরাজিত। আপনারা হাতে-কলমে পরীক্ষা করলেই আমার বক্তব্যের যাথার্থতা বিষয়ে আরও আস্থাশীল হবেন। আবার যাঁরা অতি মাত্রায় অগ্রাসী, যাঁরা হঠকারি, যাঁরা জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারেন যখন তখন, তাঁরা নামী বা অনামী যাই হোন না কেন, অন্য ধাতে গড়া। তাঁদের চিন্তায় আবার একই ধরনের সংখ্যা আসবে। এমনি অনেক রকম শ্রেণী-বিভাগ করে বহু ক্ষেত্রেই চিন্তার হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়।

জ্যোতিষচর্চায় দ্বিতীয় আঘাত
জ্যোতিষ-সম্রাজ্ঞী ও মানবী কম্পিউটর শকুন্তলাদেবী
চ্যালেঞ্জের মুখে রণে ভঙ্গ দিলেন

কলকাতা তথা তামাম ভারতবর্ষের জ্যোতিষীরা দ্বিতীয় বিশাল আঘাত পেলেন যখন মানবী কম্পিউটার এবং ভারতবর্ষের বৃহত্তম জ্যোতিষ সংস্থা 'Indian Instutute of Astrology'-র পৃষ্ঠপোষক, জ্যোতিষসম্রাজ্ঞী শকুন্তলাদেবী আমার সরাসরি খোলা-মেলা

চ্যালেঞ্জে সাড়া না দিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালালেন। এতে তিনি ভরা-ডুবির হাত থেকে বাঁচলেও ডোবালেন তাঁর মুখাপেক্ষী সারা ভারতবর্ষের কয়েক হাজার জ্যোতিষীকে।

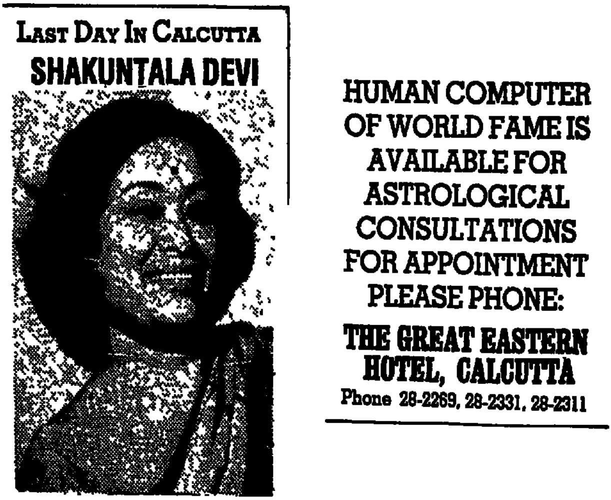
শকুন্তলাদেবী বাস্তবিকই চতুর। প্রথমবার আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে তিনি আমার বিরুদ্ধে হাজির হন নি। জানতেন হাজির না হওয়ার যে অপমান, তাঁর চেয়ে বহুগুণ বড় মাপের অপমান তাঁর জীবনে নেমে আসবে, যদি হাজির হয়ে পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার আমার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গুছোন জ্যোতিষ-ব্যবসা ফেলে স্রেফ পালিয়েছিলেন। পালাবার তাড়ায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল থেকে নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে যাওয়ার মতও সময় দিতে পারেন নি।

৪ ফেব্রুয়ারী '৮৭ কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক 'ইভিনিং ব্রিফ'-এর পাতা জুড়ে 'দ্য মিসটিক্যাল লেডি অব দ্য কমপিউটার' শীর্ষকে তথাকথিত 'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলাদেবীর ছবি ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় শকুন্তলা দেবী বলেছেন, 'অ্যাস্ট্রোলজি ইজ অলসো এ পার্ট অব ম্যাথামেটিক্স'। অর্থাৎ জ্যোতিষ অংকেরই একটি শাখা। অন্যত্র বলেছেন, 'অ্যাট্রোলজি ইজ দ্য কিং অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স' ; অর্থাৎ কিনা জ্যোতিষ হল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রাজা।

শকুন্তলাদেবীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি কোনও অনুষ্ঠানে কখনও অংক কষায় ভুল করেছেন ?"

শকুন্তলাদেবীর উত্তর, 'আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি স্লিপ্স আপস বিকজ আই অ্যাম টু কনফিডেন্ট অব মাইসেলফ্।'



আমি কখনও কোনও ভুল করিনি, কারণ আমার নিজের উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস আছে।

মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল। সময়ে তাই অনেক কিছুরই বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু, শকুন্তলাদেবীর স্মৃতিতো আজ কিংবদন্তী। গিনিজ বুক অব রেকর্ডস-এ তাঁর নাম জ্বলজ্বল করছে। এমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী মহিলাটিকে বিনীতভাবে ১৯৭২ সালের একটি অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দিনটি ছিল সম্ভবত ২ আগস্ট।

স্থান—কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের করেসপনডেন্স হল। শকুন্তলাদেবীকে ঘিরেই অনুষ্ঠান। তখনও শকুন্তলাদেবী পেশাদার জ্যোতিষী হয়ে ওঠেন নি, হয়ে ওঠেন নি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজির সম্মানীয় পৃষ্ঠপোষক। সেদিনের অনুষ্ঠানে শকুন্তলাদেবী অংক কষতে গিয়ে বার বার পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন, বিপর্দস্ত হচ্ছিলেন। এই অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন পোস্টমাস্টার জেনারেলসহ কযেক'শ মানুষ।

শকুন্তলাদেবীর আগেও অনেকেই মুখে মুখে অংক কষার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রামানুজন এবং সোমেশ বসুর নাম তো অংক-প্রিয়দের প্রায় সকলেরই জানা। শকুন্তলাদেবী এবং অন্য যাঁরাই মুখে মুখে বিশেষ ধরনের কিছু অংক কষেন তারা সেগুলো কষেন অংকের কিছু সূত্রের সাহায্যে। এই সূত্রগুলো জানা থাকলে এবং কঠোর অনুশীলন করলে ক্লাস এইটের মধুও 'হিউম্যান কম্পিউটার' হযে উঠতে পারে।

১৯৮৭-৮৮ সালে বিভিন্ন ভাষাভাষি কিছু পত্র-পত্রিকায় মুখে মুখে অংক কষার সূত্র নিযে লিখেছি। এখানে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা উচিত হবে না, তাই আবার আমরা জ্যোতিষী শকুন্তলাদেবীর আলোচনায ফিরে যাচ্ছি।

শকুন্তলাদেবীর সাক্ষাৎকারটির পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরের দিনই 'ইভনিং ব্রিফ' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে জানাই শকুন্তলাদেবীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র এক নয়। জ্যোতির্বিদ্যার বিষয, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, প্রকৃতি ইত্যাদি নিরূপণ করা। আর জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয় হল মানবদেহে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব নিরূপণ করা। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। বহু পরীক্ষার মধ্য দিযে বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষশাস্ত্রকে কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করবে না। বিজ্ঞান স্বীকার করে মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ আকাশের গ্রহগুলোর মধ্যে নিহিত নেই, নিহিত রযেছে সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থায উপর। শকুন্তলাদেবী জ্যোতিষকে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রাজা' এবং 'অংকশাস্ত্রের শাখা' ইত্যাদি মিথ্যে ও উদ্দেশ্যমূলক কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, এবং বাড়াচ্ছেন নিজস্ব ব্যাংক ব্যালেন্স। শকুন্তলাদেবীকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি প্রমাণ করুন তাঁর কথাগুলো সত্যি। শুধু শুকনো আলোচনা নয, শকুন্তলাদেবীকে কযেকজনের হাত, রাশিচক্র বা জন্ম সময দেখে তাঁদের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হবে খুবই সহজ-সরল। জাতকের আয়ু, আয, বিয়ে, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, এইসব প্রচলিত বিষযেই তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখব। শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই তাঁকে আমি ৫০০০০ টাকা দেব। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে শকুন্তলাদেবীকে জামানত হিসেবে ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ জানানোর পর আমি যাতে পিছিয়ে না আসতে পারি তার জন্য পত্রিকা কতৃপক্ষ

আমাকে দিযে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিযে নেন।

Evening Brief আমাকে দিযে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নিলেন, যা বাস্তবে একটি চুক্তিপত্র।

Evening Brief কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত ছিলেন, শকুন্তলাদেবী তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত ইমেজ ধরে রাখতে অবশ্যই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। অপরপক্ষে আমি চুক্তিপত্রে সাক্ষর দেওযার পর আমাকেও হালকাভাবে নিতে পারছিলেন না। অতএব তাঁরা যথেষ্ট রোমাঞ্চিত হলেন। শকুন্তলাদেবী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর সারা ভারতে হৈ-চৈ ফেলে দিযে কী করে কোথায় আমাদের দু'জনকে মুখোমুখি করা যায়, তার পরিকল্পনাও সেইদিনই শুরু হযে গেল Evening-Brief-এর প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পনী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার রঞ্জন সেনগুপ্ত এই পরিকল্পনার আলোচনায় অংশ নিলেন। ওঁরা দু'জনেই একমত হলেন—আমার ও শকুন্তলাদেবীর এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওযার ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক রূপ দিতে হবে। শকুন্তলাদেবী পরাজিত হলে সারা পৃথিবীর আগ্রহী মহলে যে বিশাল চাঞ্চল্য দেখা দেবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনেই একমত হলেন, এই চ্যালেঞ্জ নিযে যে অভূতপূর্ব প্রেস কনফারেন্স হবে তাতে কনফারেন্সের ব্যবস্থাপক হিসেবে 'ইভিনিং ব্রিফ', 'এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী'র সঙ্গে একটি বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠিকেও সামিল করা হবে। আমন্ত্রণ জানান হবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিদেশী দূতাবাসগুলোকে।

শেষ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে মতৈক্যে আসা গেল, (১) শকুন্তলাদেবী যে তারিখ দেবেন সেই তারিখই আমাকে মেনে নিতে হবে। (২) সেদিন কোনওভাবে আমি বা শকুন্তলাদেবীর মধ্যে কেউ হাজির না হলে, অনুপস্থিত ব্যক্তিকেই পরাজিত ও পলাতক হিসেবে ধরে নেওযা হবে। (৩) চ্যালেঞ্জ হবে দুটি পর্যাযে। প্রথম পর্যাযে চ্যালেঞ্জে উভযে মিলিত হবার বেশ কিছুদিন আগে আমি চারজন জাতকের জন্ম সময শকুন্তলাদেবীকে পৌঁছে দেব। এই জাতকদের জন্ম সমযগুলো অবশ্যই হাসপাতাল বা অতি বিখ্যাত নার্সিংহোমের দেওয়া জন্ম সাল, তারিখ, সময় ও ঠিকানাসম্বলিত হতে হবে, যাতে প্রযোজনে যে কেউ সুনির্দিষ্টভাবে ওই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পারেন। (৪) প্রত্যেকের অতীত সম্পর্কে পাঁচটি করে প্রশ্ন রাখতে হবে আমাকে। (৫) ওই জাতকদের সেদিনের (চ্যালেঞ্জের দিনের) অনুষ্ঠানে হাজির করতে হবে আমাকে। (৬) শকুন্তলাদেবীর উত্তর শোনার পর জাতকরা সেই প্রতিটি উত্তর বিষযে মতামত দেবেন ; জানাবেন উত্তর ঠিক, কি ভুল। ভুল হলে জানাবেন সঠিক উত্তরটা কী। (৭) উত্তর শুনে শকুন্তলাদেবী বা আমি সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনজন সাংবাদিক এবং আমার ও শকুন্তলাদেবীর পক্ষে একজন করে অর্থাৎ মোট পাঁচজনকে নিযে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে ওই সাংবাদিক সম্মেলনেই। ওই কমিটি তিন দিনের মাথায় আবার এটি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের অনুসন্ধান-রিপোর্ট পেশ করবেন। ওই রিপোর্ট আমাকে এবং শকুন্তলাদেবীকে মেনে নিতে হবে। (৮) শকুন্তলাদেবী মোট ২০টি প্রশ্নের মধ্যে ১৬টি বা তার বেশি প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিতে পারলে শকুন্তলাদেবী জযী ঘোষিত হবেন। অন্যথায আমি জযী ঘোষিত হবো। (৯) সাংবাদিক সম্মেলনের আগে ব্যবস্থাপকদের হাতে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং শকুন্তলাদেবীকে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। (১০) যিনি জয়ী

হবেন তিনিই মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকার অধিকারী হবেন। (১১) এ-ছাড়াও শকুন্তলাদেবী রাজি হলে তাঁর সঙ্গে আমাকে "Astrology Vs Science" শিরোণামে একটি আলোচনায় অংশ নিতে হবে। (১২) এই আলোচনার মাধ্যমে কোনওভাবেই কারও পূর্ব-ঘোষিত জয়-পরাজযের পরিবর্তন হবে না।

আমি প্রতিটি সর্তেই রাজি হলাম। ফলে পরের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় Evening Brief-এব প্রথম পৃষ্ঠায় চারপাশে বর্ডার দিযে বড় বড় হরফে ছাপা হলো "Shakuntala Devi challaenged"।

Shakuntala Devi challenged

CALCUTTA, Feb.6. - The "human computer" - turned-astrologer, Ms Shakuntala Devi, has been challenged by Mr Prabir Ghosh, a bank employee by profession and rationalist by choice. He has challenged Shakuntala Devi to make a perfect astrological calculation on the hypothesis provided by him.

Mr Ghosh, secretary of the Rationalists' Association of India, has pledged to pay Rs 50,000 if he fails to provide a rationalist explanation to any supernatural event. Astrology is not a science, it is false and vague, Mr Ghosh said.

In his book "Aloukik Noy, Loukik", Mr Ghosh has exposed the myths and mystiques of godmen. The second edition of the book is being translated into English, French and Hindi.

Mr Ghosh's challenge has one precondition. The mathematical wizard has to make a security deposit of Rs 5,000 which, along with the prize money of Rs 50,000, will be refunded if Mr Ghosh is defeated. This is a precautionary measure if she backs out. Shakuntala Devi has avoided him on previous occasions, said Mr Ghosh. - Sambad

৬ ফেব্রুযারি বিকেলেই পত্রিকার তবফ থেকে শকুন্তলা দেবীকে সেদিনের পত্রিকাটি পৌঁছে দেওযা হ্য। ওই দিন সন্ধ্যায় ইভিনিং ব্রিফ ও অন্যান্য কযেকটি পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে কিছু সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে হাজির হন, চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলা দেবীর প্রতিক্রিযা জানতে।

একতলার রিসেপশন কাউন্টার থেকে সাংবাদিকদের বলা হয, শকুন্তলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে হলে দযা করে এখানে থেকে তাঁকে ফোন করুন।

ফোন কবেন 'ইভিনিং-ব্রিফ' প্রতিনিধি। শকুন্তলা দেবীর এক সহকারিণী জানান—শকুন্তলাদেবী চ্যালেঞ্জেব খবরটা পেযেছেন, কিন্তু ভালভাবে পড়ে উঠতে পারেন নি। এখন কাস্টমারদের নিযে খুবই ব্যস্ত আছেন, পরে তিনি এই বিষযে মতামত ও প্রতিক্রিযা জানাবেন। এখন

তিনি কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

নাছোড়বান্দা সাংবাদিকরা আরও কয়েকবার ফোন করে কয়েকটা মিনিট সময় চাইলেন। সময় মিলল না। শকুন্তলাদেবীকে ফোনটা দেবার অনুরোধ জানালেন 'ইভিনিং ব্রিফ'এর প্রতিনিধি। অনুরোধ রক্ষিত হলো না। ক্রুদ্ধ পত্রিকা প্রতিনিধি রাগে ফেটে পড়লেন। ফোনেই বললেন, "আমাদের কি তবে এমন অদ্ভুত কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে যে, শকুন্তলাদেবী তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর খবরটা ভাল করে পড়ার জন্য সময় দেওয়ার চেয়ে খদ্দেরদের ভবিষ্যৎ-গোনাকে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন? আর চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন কে? না, র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী প্রবীর ঘোষ। প্রবীরবাবু তো স্পষ্টতই অভিযোগ এনেছেন শকুন্তলাদেবীর বিরুদ্ধে যে, তিনি কিছুদিন আগে একটা রেডিও প্রোগ্রামেও প্রবীরবাবুর বিরুদ্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হননি হেরে যাবার ভয়ে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তিনি চুপ করে থাকলে এটাই কি আমরা ধরে নেব না যে, এবারও তিনি ভয় থেকেই প্রবীরবাবুকে এড়াতে চাইছেন?"

"দুঃখিত, এর জবাব আমরা দিতে পারছি না। আপনাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতেও পারছি না।"

"ঠিক আছে, শকুন্তলাদেবীকেই ফোন দিন। তাঁকে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করব, তিনি প্রবীরবাবুর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক অথবা অনিচ্ছুক। ইচ্ছুক হলে পরে ডিটেলস্-এ বিভিন্ন ক্লজ এ্যান্ড কন্ডিশন নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

উত্তরে এবার শকুন্তলাদেবীর সহকারিণী জানালেন, "তিনি তো এখন ঘরে নেই। জরুরি ফোন পেয়ে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। আপনাদের শুধু এইটুকুই বলতে পারি, শকুন্তলাদেবী তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর খবর পেয়েছেন। এই বিষয়ে ফিরে এসে মন্তব্য করবেন।"

"ওঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

"তা বলতে পারছি না, তবে এইটুকু বলতে পারি তিনি কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন। ফিরবেন সাত-আট দিন পর। তখনই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই বিষয়ে মতামত জানাবেন।"

"তাহলে যেসব ক্লায়েন্টরা এই ক'দিনের অ্যাপয়েনমেন্ট পেয়েছেন তাঁদের কি হবে?"

"সব বাতিল করে দেওয়া হলো।" জানালেন সহকারিণী।

সেদিন সন্ধ্যায় আমিও সাংবাদিকদের সঙ্গী হয়েছিলাম। ঘটনাগুলো ঘটেছিল আমারও চোখের সামনে।

না, হোটেলের সামনের পথ ধরে শকুন্তলাদেবী বের হন নি। সাংবাদিকদের চোখ এড়াতে পিছনের পথ দিয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পথে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেচারা, তাড়াহুড়োয় হোটেলের বিল মিটিয়ে সহকারিণীটিকে নিয়ে যাওয়ারও সময় সুযোগ পান নি। আর সেই পালানোর সময় পিছনের দরজায় নজর রাখা চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তীর নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে 'সানন্দা', 'আলোকপাত' সহ বিভিন্ন ভাষাভাষীর পত্রিকাতেই চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলাদেবীর পলায়নের উত্তেজক খবরের সঙ্গে কল্যাণের তোলা 'স্বেচ্ছা-নির্বাসনে শকুন্তলা' ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল। হায়, জ্যোতিষসম্রাজ্ঞী। আপনিও শেষ পর্যন্ত পারমিতা, অসিত চক্রবর্তী, শুকদেব গোস্বামী ও পাগলাবাবার মতই শুধু পরের অদৃষ্টই বিচার করে

গেলেন ; নিজের অদৃষ্ট বিচার করতে পারলেন না ?

পরের দিনই, অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে এগারোটায় আমি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে ফোন করি। টেলিফোন অপারেটকে বলি শকুন্তলাদেবীর ঘরে দিতে। ফোন ধরেন শকুন্তলাদেবীর সহকারিণী, জানান, শকুন্তলাদেবী কলকাতার বাইরে। কবে ফিরবেন, বলতে পারছেন না।

এর মাত্র চারদিন আগে অর্থাৎ ৩ ফেব্রয়ারি সকালে ফোনে শকুন্তলাদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ফোন ধরেছিলেন শকুন্তলাদেবীর সহকারিণী। তাঁকে জানাই, "আমি হিন্দি 'পরিবর্তন' পত্রিকার জন্য একটি সাক্ষাৎকার চাই।"

সহকারিণী ফোন দেন শকুন্তলাদেবীকে। শকুন্তলাদেবী যথেষ্ট আন্তরিকতা ও খুশির সঙ্গে আমাকে আসতে অনুরোধ করলেন। সময় দিলেন ৫ তারিখ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট। তারপর অনুরোধ করলেন, আমার নামটি বলতে। বললাম। শুনে বললেন, "আপনি কি র‍্যাশানিলিস্ট অ্যাসোশিযেশনের প্রবীর ঘোষ ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

কিছু বললেন না। ফোনটা নামিযে রাখলেন।

৩ তারিখ বিকেলে পরিবর্তন অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম, গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল থেকে শকুন্তলাদেবীর পি. এ. ফোন করে জানিযেছেন, জরুরি কাজে হঠাৎ আটকে পড়ায় ৫ তারিখের অ্যাপযেনমেন্ট শকুন্তলাদেবী ক্যানসেল করতে বাধ্য হযেছেন। এবার সমযভাবে আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন শকুন্তলাদেবীর তরফে তাঁর পি. এ.।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। শকুন্তলাদেবীকে অনুরোধ জানালাম, "দয়া করে যে কোনও দিন যে কোন সময মাত্র দশটি মিনিট আমার জন্য খরচ করুন। বাড়তি একটি মিনিট নেব না। শুধু কয়েকটি প্রশ্ন করবে দশ মিনিটের মধ্যেই বিদায় নেব।"

উত্তরে শকুন্তলাদেবী জানালেন, "যে ক'টা দিন তিনি কলকাতায থাকবেন, তা ক্লায়েন্টদের অ্যাপযেন্টমেন্ট এতই ঠাসা যে, দশটা মিনিট কেন, পাঁচটা মিনিট সময বের করাও অসম্ভব।"

সত্যিই শকুন্তলাদেবী এতটাই ঠাসা কর্মসূচীর মধ্যে আছেন কিনা, জানতে পবের দিন অর্থাৎ ৪ তারিখ বেলা ১১টা-৩০ নাগাদ বন্ধু জ্ঞান মল্লিককে দিয়ে ফোন করালাম। শকুন্তলাদেবীব পি. এ-কে জ্ঞান জানালেন, ভাগ্য গণনা করাতে চান। ৫ ফেব্রুযাবি দুটো তিরিশে সময পাওয়া গেল। জ্ঞান ওই সময় একটা অসুবিধের অজুহাত দেখিয়ে জানালেন, সমযটা সাড়ে চারটে নাগাদ হলে খুবই সুবিধে হতো। পি. এ. একটু ফোনটা ধরতে বলে, তারপর জানালেন, "তাই আসুন।"

বুঝলাম আমাকে এড়াতেই শকুন্তলাদেবী মিথ্যের আড়ালে নিজেকে লুকোতে চাইছেন। ৪, ৫ ও ৬ তারিখ বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন নামে ফোন করে দেখা করার তারিখ পেযেছিলাম যথাক্রমে ৫, ৬ ও ৭। এই প্রতিটি ঘটনাই শুধু প্রমাণ করে দিচ্ছিল সত্যের মুখোমুখি হতে শকুন্তলাদেবীর তীব্র অনাগ্রহকেই। শকুন্তলাদেবীর মত প্রচার বিষয়ে অতি সচেতন, তীক্ষ্ণ -বুদ্ধির মহিলা স্পষ্টতই বুঝেছিলেন, আমার মুখোমুখি হয়ে অতি কষ্টে তিল তিল করে গড়ে

তোলা সাম্রাজ্যকে একদিনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার চেয়ে পলায়নের অপমান অনেক বেশি শ্রেয়। বিজ্ঞাপন-বেসাতির আড়ালে তাঁর ভাঁওতাবাজী, তাঁর জ্যোতিষচর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। বছরে সাধারণত অন্তত দু-দফায় কলকাতার হোটেলে জ্যোতিষ-ব্যবসা চালাতেন ঢালাও বিজ্ঞাপন ও পত্র-পত্রিকায় নানা সাক্ষাৎকারের আড়ালে প্রচার চালিয়ে।

'৮৭-র ফেব্রুয়ারিই ছিল তাঁর কলকাতায় বাণিজ্য চালাবার, প্রতারণা চালাবার শেষ বছর। তারপর তিনি আর একটি দিনের জন্যেও কোলকাতায় ব্যবসা চালাবার হিম্মত দেখান নি, বা আহাম্মুকী করেনি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলাদেবীর নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে পালিয়ে বাঁচার দুর্বল চেষ্টার কথা প্রকাশিত হয়েছে। এমনও হয়েছে, শকুন্তলাদেবী বোম্বাই বা মাদ্রাজের মত যে বড় শহরগুলোতে গুছিয়ে বসতে গেছেন, সেখানকার স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতেই শকুন্তলাদেবীর পালিয়ে বাঁচার চেষ্টার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে স্থানীয় সাংবাদিকদের বহু অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই সব সাংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকরা যখনই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আমি ওখানে গিয়ে শকুন্তলাদেবীর মুখোমুখি হতে রাজি আছি কিনা, প্রত্যেককে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জানিয়েছি—অবশ্যই রাজি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শকুন্তলাদেবী সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়া শহর ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন অন্য শহরে। শেষ পর্যন্ত তাড়া খেতে খেতে শকুন্তলাদেবী ভারতবর্ষের পাট তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ডিসেম্বর '৯১তে নিউইয়র্ক থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ রণজিৎকুমার দত্ত। ডঃ দত্ত নিউ-ইয়র্ক থেকে 'Cultural Association of Bengal' কর্তৃক প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা 'সংবাদ বিচিত্রা'র সম্পাদক। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন শকুন্তলাদেবীর সঙ্গে আমাদের সমিতির পক্ষে আমার গোলমাল প্রসঙ্গে বাড়তি কিছু খবর। 'বাড়তি' বললাম, কারণ নিউইয়র্কে বসেই কিছু ভারতীয় পত্র-পত্রিকা পড়ে খবরটা আগেই জেনেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, এখনও আমি শকুন্তলাদেবীর মুখোমুখি হতে রাজি আছি কিনা? জানিয়েছিলাম, "অবশ্যই। আপনারা আমার যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিলে ওখানে গিয়েই ওঁর মুখোশ খুলে দিয়ে আসব। আপনারা যে খরচ করবেন, তার কিছুটা আশা করি শোধ করতে পারব ওখানকার উৎসাহীদের শকুন্তলাদেবীর মতই এক একটি হিউম্যান কম্পিউটার তৈরি করে দিয়ে।"

জানি না, সুদূর নিউইয়র্কেও আক্রান্ত হলে শকুন্তলাদেবী কোথায় পালাবেন। পাঠক-পাঠিকাদের সামনে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রধান সম্পাদক হিসেবে স্পষ্ট ঘোষণা রাখছি—শকুন্তলাদেবীর কাছে আমি পরাজিত হলে আমাদের সমিতি সমস্ত শাখা সংগঠন সহ জ্যোতিষ-বিরোধী অলৌকিক-বিরোধী সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে। এই কথা আমি লিখছি আমাদের সমিতিব একজিকিউটিভ কমিটিব মতামত অনুসারে। জানি না, এর পরও শকুন্তলাদেবী আমাদের সমিতির পক্ষে দেওয়া আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত সততা ও হিম্মত দেখাবেন কিনা?

এ-সব দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন ক্ষুদে হিটলার অশোক বন্দোপাধ্যায়

এই প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত চিঠির উল্লেখ না করেই পারছি না। চিঠিটির লেখক 'উৎস মানুষ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক বন্দ্যোপাধ্যায। লিখেছিলেন বর্তমানে তাঁরই কাছের মানুষ এক তথাকথিত বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীকে।

উৎস মানুষের ছাপান প্যাডে লেখা এই চিঠির কিছু অংশ আপনাদের অবগতির জন্য তুলে দিচ্ছি :

"Philipine-এর Faith healer বা শকুন্তলাদেবী কাউকেই "বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরাজিত" কেউ করতে পেরেছেন বলে মনে করি না। শকুন্তলাদেবী কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে উঠে কয়েকদিনে যে পরিমাণ টাকা উপার্জন করে যান, তাতে কলকাতার কোন্ এক বাঙালী বাবুর (তিনি আমাদের কাছে যতই বিখ্যাত হোন না কেন) পঞ্চাশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পাবেন।"

খুবই বাঁচোযা যে, অশোকবাবুর মানা, না মানা ; ইচ্ছে, অনিচ্ছের ওপর পৃথিবীব কোনও কিছুই নির্ভর করে না ; যেমনটা নির্ভর করেনি হিটলাবের ইচ্ছেব ওপর। যা ফেইথ হিলাররা স্বযং মেনে নিলেন, তাই মেনে নিতে পারলেন না ক্ষুদে ডিক্টেটব অশোকবাবু। ফেইথ হিলাররা আমার মুখ বন্ধ রাখার বিনিমযে দিতে চেযেছিলেন ১৫ লক্ষ টাকা। আজকের বাজারদরের হিসেবে যা ৫০ লক্ষ টাকা। (এই বিষযে বিস্তৃত বিবরণ এই বইযের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।) ফেইথ হিলারদেব পক্ষে প্রস্তাবদাতার ভূমিকা পালন কবেছিলেন অলোক খৈতান। আব এ-সব কথা অনেক পত্র-পত্রিকায় এবং বইতে প্রকাশিত হযেছে প্রচণ্ড গুরুত্বের সঙ্গেই। প্রভাবশালী প্রস্তাবদাতা এই বিষযে আমার বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিযে কোর্টে হাজির হওযাব মত বোকা-হিম্মৎ দেখাতে যান নি, কারণ এ-টুকু তাঁর মস্তিষ্কে অবশ্যই আছে প্রমাণ ছাড়া পা আমি ফেলি না। ফেইথ হিলারদের অস্ত্রোপচারের রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন কলকাতা পুলিশের তৎকালীন জযেন্ট কমিশনার স্বয়ং। ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন সন্দোহাতীতভাবে ফেইথ হিলারদের বুজরুকি প্রমাণিত হযেই গেছে, তখনও অশোকবাবুর এমন ধরনের যুক্তিহীন কথা শুনে এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে ষাটের দশকের দমদম মতিঝিল কলেজেব এক অধ্যাপকের কথা। চাঁদে মানুষের পদার্পণের অনেক পরেও ওই অধ্যাপক বলতেন, "মানুষ চাঁদে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পদার্পণ করতে পেরেছে বলে আমি মানি না।"

তাঁর মানা, না মানার ওপর অবশ্য চন্দ্র-অভিযান বা মহাকাশ অভিযান, কোনও কিছুই থমকে থাকেনি। আমাদেব কলেজের মাস্টারমশাই কথাগুলো বলতেন বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা থেকে, প্রাচীন বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকা থেকে। অশোকবাবুর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, না ঈর্ষা—কোন্‌টা বেশি ক্রিয়াশীল, কে জানে?

মাননীয অশোকবাবু, জানি না আপনি CSICOP-র কাছে আত্মসমপর্ণের পর শকুন্তলাদেবী এবং ফেইথ হিলারদেরও এজেন্সি নিয়েছেন কি না? আপনার কথা শুনে ভরসা হচ্ছে, এজেন্সিটা নিযেছেন। তাই এজেন্ট হিসেবে আপনাকেই প্রশ্নটা করছি, শকুন্তলাদেবী যদি আমাকে এক ফুৎকাবে উড়িযে দিতেই পারতেন, তবে দিলেন না কেন? কার ভযে

হোটেলের বিলটুকু পর্যন্ত না মিটিয়েই পালালেন ? আরও একটি বিরাট জিজ্ঞাসা—আপনার কী করেই বা ধারণা হলো শকুন্তলাদেবী জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করে দিতে পারতেন এবং পারবেন ? আপনি কী তবে মুখে বিজ্ঞান আন্দোলনের কথা বললেও আসলে জ্যোতিষে পরম বিশ্বাসী ? নাকি CSICOP-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সূত্রে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতেই হয়ে উঠেছেন জ্যোতিষীশাস্ত্রের পরমবন্ধু ?

মাননীয় অশোকবাবু, আপনি যাঁর হয়ে দালালী করছেন, তাঁকে একবার এই 'বাঙালী বাবু'-টির সামনে হাজির করে দিন। তারপর দেখুনই না, কে কাকে ফুৎকারে ওড়ায়।

আকাশবাণীর 'জ্যোতিষ নিয়ে দু-চার কথা' অনুষ্ঠানটির প্রসঙ্গও চিঠিতে এনেছেন 'উৎস মানুষ'-এর অন্যতম সম্পাদক অশোক বন্দোপাধ্যায়। ওঁর কথায় :

"অনুষ্ঠানে আর কেউ 'contract' পান নি তাই উনি "একা"—এতে বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ? বিজ্ঞান বিভাগ না ডেকে প্রবীরবাবু ডাকলে পারমিতা, পাগলাবাবা etc কি আসতো ?"

মাননীয় অশোকবাবু, আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনার এই ধরনের যুক্তিকে আশ্রয় করে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের কৃতিত্বকেই নস্যাৎ করা যায় ? যেমন—"পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ সাহায্য না করলে সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী তৈরি করতে পারতেন ? ফিল্মটা তৈরি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্য কাউকে 'contract' দেয়নি, তাই সত্যজিৎ রায় "একা"—এতে সত্যজিত রায়ের কৃতিত্ব কোথায় ?"

এমনি উদাহরণ অবিরলধারায় একের পর এক এনে ফেলাই যায়। এমন কী, আর কোনও কিছু বলার মত না পেলে বলা যায়—"অমুক বাবুর এতে বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ? অমুক বাবুর মা-বাবা ওঁর জন্ম না দিলে কি করে উনি পৃথিবীতে আসতেন ?"

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানের জয়ের জন্য যে কৃতিত্ব আশোকবাবু বিজ্ঞান বিভাগকে দিতে চেয়েছেন, সেই বিজ্ঞান বিভাগের এখানে বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ? আকাশবাণী বিজ্ঞান বিভাগ তৈরি না করলে কি বিজ্ঞান বিভাগ পারমিতা, পাগলাবাবা etcদের ডাকতে পারত, না ওরা আসতো ? আর এও বলি, এতে আকাশবাণীর কৃতিত্ব কোথায়, তাও তো বুঝি না। সেই ইংরেজরা যদি আমাদের দেশটাকে পরাধীন করে না রাখত, পরাধীন দেশে রেডিও স্টেশন গড়ে না তুলতো, তাহলে কোথায় থাকতো আকাশবাণী ? কোথায় থাকত তার বিজ্ঞান বিভাগ ? কি করেই বা ডাকত পারমিতা, পাগলাবাবা etcদের ? আকাশবাণীটাই তৈরি না হলে কোন্ হরিদাসের ডাকে ওইসব ব্যঘ্রসদৃশ জ্যোতিষীরা আসতেন শুনি ? এইভাবে যুক্তিব পর যুক্তি খাড়া করে অনবরত বাতিল তালিকা বাড়িয়েই যাওয়া যায় না কী ? অশোকবাবু কি বলেন ?

আরও একটা দিক থেকে আমবা সমস্যাটিকে ভেবে দেখতে পারি। ওই আলোচনায় জ্যোতিষীরা যদি জিততেন ? অশোকবাবু কি বলতেন ? জানতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। তখনও কী অশোকবাবু বলতেন—"এতে জ্যোতিষীদের বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ? বিজ্ঞান বিভাগ না ডেকে জ্যোতিষীরা ডাকলে প্রবীরবাবু কি আসতেন ?" "আর ওই বিষয়ী জ্যোতিষীদেরই

বা কৃতিত্ব কোথায় ? অনুষ্ঠানে আর কেউ 'contract' পান নি তাই ওরা চারজনে ফাঁকতালে বাজি মাৎ করেছে। এতে ওদের বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ?"

'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান', 'জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান' এইজাতীয় শিরোনামে আজ পর্যন্ত বেশ কিছু বিতর্কমূলক আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়েছে। আমাদের সমিতির জানার বাইরেও আরও কিছু আলোচনা-সভা আয়োজিত হতেই পাবে। এই সব আলোচনা-সভার অনেকগুলোতেই প্রকট হয়ে উঠেছিল এক পক্ষের জয়, অপর পক্ষের পরাজয়। অনেক সময়ই জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে যথেষ্ট পর্যুদস্ত হয়েছেন বিরুদ্ধ শিবিরের বক্তারা—এমন সুনির্দিষ্ট ঘটনার তথ্য আমাদের কাছে আছে। অনেক সময় বিপর্যস্ত সংস্থাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমার এবং আমাদের সমিতির সাহায্য প্রার্থনাও করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে অশোকবাবু কী বলবেন ? জানতে কৌতূহল হয়। তখনও কি তিনি বলতে চাইবেন—এই জয় বা পরাজয় সম্পর্কে কৃতিত্ব বা গ্লানির দায় ব্যবস্থাপকদের, আলোচকদের নয়। এর পর একই যুক্তিতে বরিস বেকারেব টেনিস প্রতিভা, বিশ্বনাথন আনন্দের দাবা প্রতিভাকেও এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সত্যিই যায়, ভাবুন তো বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের অনুমোদিত সংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য কাসপারভ, কারপোভ, ইভাচুক etc দের না ডেকে বিশ্বনাথন আনন্দ ডাকলে কি ওঁরা আসতেন ? অতএব এতে আনন্দের বাড়তি কৃতিত্ব কোথায় ? এই একই যুক্তিতে ওলিম্পিক বিজয়ী থেকে শুরু করে কলকাতার ফুটবল লীগ বিজয়ীদের তামাম কৃতিত্বকেই আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা যায় না কী ? অশোকবাবু, বাস্তবিকই আমাদের ভয় হয়, আপনার মত একজন মানুষের হাতে একটি 'যুক্তিনির্ভর', 'বিজ্ঞানমনস্ক' পত্রিকার সম্পাদনার ভার থাকলে সে পত্রিকা জনগণকে কি ধরনের পথ নির্দেশ দেবে, কোথায় নিয়ে যাবে ভেবে !

একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। শকুন্তলাদেবীর অঙ্ক কষার ক্ষমতার কথা বলায় অনেকেই হয়তো এই প্রসঙ্গ জানতে উৎসাহী হয়ে উঠছেন। তাঁদের উৎসাহ মেটাতে ছোট্ট করে একটু আলোচনা সেরে নিচ্ছি।

শকুন্তলা দেবী কোনও অঙ্ক কষার অনুষ্ঠানে প্রথমেই ঘোষণা করতেন যে, তিনি শুধু অ্যারিথমেটিক কষবেন। টিগনোমেট্রি, অ্যালজেবরা বা ওই জাতীয় কিছু কষবেন না। লগ টেবিল ব্যবহার করতে হয় এমন কোনও প্রবলেমও কষে দেখাবেন না। দেখাবেন যোগ, গুণ, ভাগ, মূলনির্ণয়, কোনও বছরের তাবিখের বার নির্ণয় ইত্যাদি। তারপর উপস্থিত দর্শকদের কাছে লিখিত প্রশ্ন চাইতেন এবং উত্তর দিতেন।

শকুন্তলা দেবীর আগেও অনেকেই মুখ মুখে অংক কষার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রামানুজন এবং সোমেশ বসুর নাম তো আগেই বলেছি। রামানুজন মুখে মুখেই কষে ফেলতেন কোন যৌগিক সংখ্যা বা কোন দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। এখনও অনেকেই আছেন যাঁরা শকুন্তলা দেবীর মতই সামান দক্ষতা ও দ্রুততায় মুখে মুখে অংক কষতে পারেন। এঁদেরই একজন দিল্লি প্রবাসী মুরারী পাল।

শকুন্তলা দেবী তাঁর মুখে মুখে অংক কষার ক্ষমতার পিছনে কোনও ফর্মুলা বা গোপন সূত্র আছে কিনা সে বিষয়ে মুখ খোলেন না। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে হাজির করেন বলেই অনেকে তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেন। শকুন্তলা দেবী

বা অন্য যাঁরাই মুখে মুখে বিশেষ ধরনের কিছু অংক কষেন তাঁরা সেগুলি কবেন অংকের কিছু সূত্রের সাহায্যে। এই সূত্রগুলো জানা থাকলে এবং কঠোর অনুশীলন করলে ক্লাস সেভেনের রামু শ্যামুও 'হিউম্যান কম্পিউটার' হয়ে উঠতে পারে।

শকুন্তলা দেবী কি ফর্মুলা ধরে অংক কষেন জানি না। তবে আমি একটা ফর্মুলার কথা লিখেছিলাম যার সাহায্যে মুখে মুখেই শকুন্তলা দেবীর মতই অংক কষে ফেলা যায়। এবং অভ্যেস করলে অংক কষার সময়ও অবশ্যই কমবে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'আলোকপাত' মাসিক পত্রিকার জুলাই ১৯৮৭ সংখ্যায়। তারপর বহু ভাষাভাষি পত্রিকাতেই ফর্মুলাটি প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডটিতে অংক শেখাবার অবকাশ নেই। ভবিষ্যতে কোনও বইতে প্রসঙ্গটি আনার চেষ্টা করব।

জ্যোতিষচর্চায় তৃতীয় আঘাত
আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলনে চ্যালেঞ্জের মুখে জ্যোতিষীরা ছত্রখান

কলকাতা, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের জ্যোতিষীরা একটি বিশাল মাপের ধাক্কা খান ৯ এপ্রিল '৮৮। এই দিনটি জ্যোতিষীদের কাছে 'কালা দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৯ ও ১০ এপ্রিল দু'দিনব্যাপী এক জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন 'অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্ট'। সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়া বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশ থেকেও নাকি প্রতিনিধিরা এসেছিলেন 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রী সম্মেলনেব সাফল্য কামনা কবে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে পবিচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই সময়কার দুই মন্ত্রীও ছিলেন। একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক এবং অন্যজন রেভিলিউশনারি সোসাইলিস্ট পার্টির নেতা ও পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী।

এমন তাজ্জব ঘটনা ঘটাতে পেরে মহা-জ্যোতিষ সম্মেলনের ব্যবস্থাপকরা যেমন উল্লসিত হলেন, তেমনই আমরা অবাক ও শঙ্কিত হলাম।

ফরোয়ার্ড ব্লক-নেতা ও মন্ত্রী সরল দেবকে জ্যোতিষ সম্মেলন উদ্বোধন করতে দেখে বা কংগ্রেস-নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে দেখে আমরা আমরা বিস্মিত হইনা। আমরা বিস্মিত এবং শঙ্কিত হই, যখন দেখি মার্কসবাদে বিশ্বাসী, দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত এবং মার্কসবাদী দলেব দুই বড় মাপের নেতারা সম্মেলনে আহূত জ্যোতিষীদের অভিনন্দন জানিযে এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মার্কসবাদেরই বিরোধিতা কবছেন, কুসংস্কার সৃষ্টিতেই ইন্ধন যোগাচ্ছেন। আমাদের শঙ্কাব কারণ, বিজ্ঞানী ও মার্কসবাদী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অসচ্ছ চিন্তাধারা সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে প্রবলতর ভূমিকা নেয।

সম্মেলনে সরল দেব আমাদের সমাজ-জীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রেব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং এই শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রাখতে জনগণেব প্রতি আহ্বান জানান।

প্রথম দিন বক্তা হিসেবে ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্লাইড

Minister-in-Charge
LABOUR DEPARTMENT
Government of West Beng
West Bengal Secretariat

March 25, 1988

It gives me pleasure to know that a Souvenir will be brought out on the occasion of the Eleventh Annual Indian and Western Astrological Conference under the auspices of the Astrological Research Project to be held on 9th and 10th April 1988 at Bose Institute, Calcutta. Due to preoccupation I regret my inaugurate the Conference.

I convey my greetings and good wishes to the participants in the Conference.

I wish every success of the Conference.

Sd/- Santi Ghatak

Sri Ramkrishna Sastri
President
Astrological Research Project
8, Ashutosh Sil Lane
Calcutta-700 009

দিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত করালেন। শেষে বললেন, যিনি জ্যোতিষী তাঁর জ্যোতিষচর্চার জন্য সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের মহাকাশের নিখুঁত অবস্থান পাওয়ার জন্য পঞ্জিকার তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতে দু'ধরনের পঞ্জিকা প্রচলিত। বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র খুললে দেখতে পাওয়া যাবে দিন-পঞ্জিকায় তিথি, নক্ষত্র, সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের সময় দু'রকম দেওয়া আছে—'দৃক্‌সিদ্ধ মতে' এবং 'অন্য পঞ্জিকা মতে'। অর্থাৎ দু'পঞ্জিকা মতে গ্রহ অবস্থান দু'রকমের। এবারের বিজ্ঞানভিত্তিক পঞ্জিকার গণনাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সারা বিশ্বে আটটি দেশ থেকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রামাণিক তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এফিমারিস' প্রকাশিত হয়, ভারত এই আটটি দেশের অন্যতম। এই গ্রন্থে সূর্য চন্দ্র ও গ্রহগুলির অবস্থান সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলী অনুসারে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে গণনা করা হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে যত মানমন্দির আছে সেই সব মানমন্দির থেকে দূরবীন দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে জ্যোতিষ্কদের গণিত অবস্থান মিলিয়ে দেখা হয়। তারপর একই সূত্রাবলী প্রয়োগ করে এফিমারিস তৈরি করা হয়। ভারতবর্ষে, শুদ্ধ পঞ্জিকা গণনা বা এফিমারিসের পথিকৃৎ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী।

এরপর অমলেন্দুবাবু জ্যোতিষীদের প্রতি আহ্বান জানান, আপনারা যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চান, যাঁরা মানুষের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব প্রমাণ করতে চান, তাঁরা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যুক্তি দিন। আমাদের দেশে প্রায় ৯৫ শতাংশ জ্যোতিষী ছক গণনা করেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, পি. এম. বাগচির পঞ্জিকা দেখে। এই দুই পঞ্জিকায় এবং অধিকাংশ ভারতীয় পঞ্জিকাতেই গ্রহের, সূর্য-চন্দ্রের যে অবস্থান লিপিবদ্ধ থাকে, তা একেবারেই ভুল। এইসব পঞ্জিকার গণনাপদ্ধতি হলো, সূর্য-সিদ্ধান্ত। যে সূর্য-সিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব শতকরা ৯৫ শতাংশ জ্যোতিষী যে গ্রহ অবস্থানের ওপর নির্ভর করে গণনা করে চলেছেন তার কোনও বিজ্ঞান ভিত্তি নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে হলে বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই এগোতে হবে। আপনারা বাস্তবিকই জ্যোতিষশাস্ত্র-বিজ্ঞান প্রমাণ করার বিষয়ে আন্তরিক হতে চাইলে এফিমেরিসের সাহায্যে গ্রহণ করুন।

অমলেন্দুবাবুর বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমি মঞ্চে উঠেছিলাম কিছু প্রশ্ন নিয়ে। বলেছিলাম, ডঃ অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় অতি সু-বক্তা। তাঁর বক্তব্য শুনতে দারুণ লাগছিল ; যদিও কিছুই বুঝিনি। আমার ধারণা, এখানে উপস্থিত প্রায় সকলেই বোঝেন নি। এজন্য অবশ্য ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষ দেওয়া যায় না। দোষটা বক্তব্যের 'বিষয়'এর। কিছু কিছু বক্তা আছেন, যাঁরা বাচনভঙ্গীতে, আবেগে, গলা চড়াই-উৎরাইয়ে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখেন ; তা যে বিষয়ের ওপরই বক্তব্য রাখতে বলুন তা কেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গী সুন্দর। কিন্তু 'জ্যোতিষ' বিষয়টাই এমন নড়বড়ে যে শেষ পর্যন্ত যুক্তির চেয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া সুবক্তার গতি থাকে না।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী, স্বীকার করি। আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী, আপনার আঙুলের গ্রহরত্নের আংটিগুলো দেখে তাও স্বীকার করি। কিন্তু আপনি এক্ষুণি জ্যোতিষীদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশগুলো দিলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রকে

বিজ্ঞান হিসেবে প্রমাণ করতে এফিমেরিসের সাহায্য নিন"—এই বক্তব্যটি স্বীকার করতে যে কোনও যুক্তিবাদীরই অসুবিধা আছে; আমারও আছে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন এফিমেরিসের সাহায্য নিলে জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে পারবেন? এই সম্মেলনে ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সমরেন্দ্র দাস, ডঃ সন্দীপন চৌধুরী সহ অনেক নামী দামী জ্যোতিষীই উপস্থিত রয়েছেন। এঁদের অনেকেই গ্রহ-অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এফিমেরিসেরই সাহায্য নিয়ে থাকেন। এঁরা কেউ কি তাত্ত্বিকভাবে এবং অথবা বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান? ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি কী এঁদের কারও সাহায্য নিয়ে, অথবা অন্য কোনও জ্যোতিষীর সাহায্য নিয়ে কোনও দিন প্রমাণ করতে পারবেন—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান? এখানে উপস্থিত যেসব শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষী যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেও আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা কেউ কি এফিমেরিসের সাহায্য নিয়ে অথবা এফিমেরিসের সাহায্য ছাড়া প্রমাণ করতে পারবেন—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান? আসলে এফিমেরিস কেন, কোনও মেরিসের সাহায্য নিয়েই প্রমাণ করা যাবে না, 'জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান', 'গ্রহরাই মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা', 'ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত' ইত্যাদি কথাগুলো।

ডঃ অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় আমার উত্তরে বললেন, আমি আজ খুবই ব্যস্ত। আপনার কথার জবাব দেওয়ার মত সময় আমার হাতে নেই, মাফ করবেন।

বললাম, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনার উচিত আমার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওযা, তা যত সংক্ষেপেই হোক। আপনি একটি সম্মেলনে এসেছেন বক্তব্য রাখতে। সেই সঙ্গে কিন্তু আপনার কিছু দাযিত্বও থেকে যায়। আপনার বক্তব্য নিযে শ্রোতাদেব তরফ থেকে কোনও জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেওয়া অবশ্যই দাযিত্বের মধ্যে পড়ে, যে বক্তা তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হাজির হওযা প্রশ্নের উত্তরদানে আন্তরিক নন; জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সময ব্যযের কথা ভেবে কুণ্ঠিত; তাঁদের উচিত কোনও আলোচনাসভায় এক তরফা বক্তব্য রাখা থেকে বিরত থাকা।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায আমার প্রায় হাত দুটো ধরে বললেন, আজ সত্যিই ব্যস্ত, আর একদিন আপনার বক্তব্যের উত্তর দেব।

বললাম, বেশ তো, কবে, কোথায উত্তর দেবেন, তার প্রতিশ্রুতি দিন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায উত্তর দিলেন না। পরিবর্তে কিছু স্বাস্থ্যবান জ্যোতষী বা জ্যোতিষীদের তরফে কিছু ম্যাসেল-ম্যানরা মঞ্চের মাইক বন্ধ করে দিলেন। ডঃ অমলেন্দুবাবু দ্রুত বিদায় নিলেন।

মাইক বন্ধ হলেও মুখ আমার বন্ধ হযনি। উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললাম, এই সম্মেলনে বহু সদ্য শিক্ষা-সমাপ্ত করা জ্যোতিষী রযেছেন; যাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ-চেতনা-সম্পন্ন ও যুক্তিবাদী, এঁদের অনেকেই জ্যোতিষচর্চার বাইরে স্ব-স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানীয়। এঁরা জ্যোতিষী হিসেবে আজ ডিগ্রী লাভ করলেও জ্যোতিষীশাস্ত্র বিষয়ে কিন্তু এখনও স্পষ্ট ধারণার অধিকারী নন। এঁদের অনেকের মনেই মাঝে মধ্যে চিন্তা উঁকি-ঝুঁকি মারে—জ্যোতিষশাস্ত্র সত্যিই বিজ্ঞান, না আমরা লোক ঠকাচ্ছি এবং নিজেরাও ঠকছি?

আজ তাঁদের সামনে একটা সুযোগ নিয়ে হাজির হযেছি আমি। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিপক্ষে

বিজ্ঞানের কি যুক্তি, সেই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই। যে কোনও প্রশ্ন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নামী-দামী জ্যোতিষীরা করতে পারেন, এবং আশা রাখবো আমার প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা দেবেন। সেই সঙ্গে এ-কথাও ঘোষণা করছি উপস্থিত কোনও জ্যোতিষী আমার দেওয়া কয়েকটি জন্ম সময় বা হাত দেখে যদি জাতকদের অতীত ও বর্তমান বিষয়ে কিছু প্রশ্নের শতকরা ৮০ ভাগের নির্ভুল উত্তর দিতে সক্ষম হন, তবে তাঁকে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে জ্যোতিষী বা জ্যোতিষীদের দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকার ড্রাফট্ তৈরি। আর জ্যোতিষীদের এখন শুধু হেরে গেলে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেই হবে।

তাত্ত্বিক আলোচনাব পাশাপাশি এমন ধরনের একটা বাস্তবসম্মত পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন। তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা এখনই শুরু করতে পারি। আর হাত, জন্ম-সময় দেখে গণনার জন্য নিশ্চয়ই সময় দেব। তবে চাইলে আজই হাত ও জন্ম-সময় হাজির করতে তৈরি আছি।

এই বক্তব্যেব সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হলো। শুরু করলেন ওঁদের ম্যাসলম্যানরা। ওঁরা ঝাঁপালেন আমার ওপর। শ্রোতাদের মধ্যে আমাদের সমিতির যে সদস্যরা মিশে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজন এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের কাছে। এই চারজনের ওপর দাযিত্ব ছিল গণ্ডগোল শুরু হলে আমার কাছে থাকার, যাতে গণ্ডগোলের সুযোগে আমাকে কেউ মেবে ফেলতে না পারে। অন্যথায, আমাকে মারধোর করা হলে ওরা কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন না, বা প্রতি আক্রমণ চালাবেন না। আমরা চেযেছিলাম, সদ্য-জ্যোতিষীদের সামনে দৃষ্টান্ত হাজির করে বুঝিযে দিতে—ওঁদের শিক্ষাদাতা জ্যোতিষীব, সম্মানীয জ্যোতিষীদের প্রকৃত স্বরূপ ; যেখানে ওবা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চায় যুক্তি নয, শক্তি দিয়ে।

আমার ওপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ হলো, বর্ষিত হলো আমার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীকে তুলে গালাগাল। না, আমি মার খেযে মার দিতে চেষ্টা করিনি একটি মুহূর্তের জন্যেও। শুধু এরই মধ্যে সুধী দর্শকদের কাছে বার-বার আবেদন রেখেছি—আপনারা কি চান যুক্তি হাজির হলে তার পরিবর্তে যুক্তির অবতারণা না করে প্রশ্ন কর্তার কণ্ঠ-রুদ্ধ করা হোক এই ধরনের ফ্যাসিস্ট কাযদায ? আপনারা একবার সোচ্চারে জানান, আপনারা কি জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই দেখতে চান, বহু কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার হযে উঠেছিল—ওঁকে ছেড়ে দিন। আমরা ওঁর কথা শুনতে চাই। আপনারা, আজকের যাঁরা আমন্ত্রিত বক্তা তাঁরা প্রবীর ঘোষের যুক্তি খণ্ডণ করুন।

আমার আক্রমণকারীরা শঙ্কিত হযেছিলেন সোচ্চার কণ্ঠের প্রতিবাদে। শঙ্কিত হযেছিলেন ব্যবস্থাপকরা। কারণ তখন হাওযা পাল্টেছে। মহাজ্যোতিষীদের শক্তি প্রয়োগেব প্রয়াসে তখন প্রায় গোটা সভাই ধিক্কাবে সোচ্চার। আমার বক্তব্য শুনতে এবং এই ধরনের 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের আলোচনা-শুনতে আস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্টের ছাত্র-ছাত্রীরা অতি মাত্রায উৎসাহী হযে পড়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই সমবেন্দ্র দাসকে ধবলেন আমার বিরুদ্ধে আলোচনায অবতীর্ণ হতে। আর অমনি শ্রীদাসের মনে পড়ে গেল, এখন তাঁর অশৌচ চলছে। আমাকে বললেন, কিছু মনে করবেন না প্রবীরবাবু, আমি থাকতে পারছি না। আমাকে এখুনি একটু যেতে হবে। অমার অশৌচ চলছে, পোশক দেখেই নিশ্চযই বুঝতে পারছেন ?

বাস্তবিকই বলছি, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। সমবেন্দ্রবাবু এলেন, সম্মেলনে যোগ দিলেন, আর আমার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতেই তাঁর মনে পড়ে গেল অশৌচের কথা! সত্যিই সমস্ত ব্যাপারটাই অবাক করার মত। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা ধরলেন ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীকে, তারপর শ্রীবিরূপাক্ষকে। এমনি করে একের পর এক প্রতিষ্ঠিতকে। মজাটা হলো, এই সময়ই প্রত্যেকেরই নানা ধরনের অসুবিধে দেখা গেল। ইতিমধ্যে মাইকে শ্রীবিরূপাক্ষের কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। সবটাই আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা। কিন্তু সেই চেষ্টা সব সময় যে বিপক্ষেই গেছে এমনও নয়। যেমন উনি এও বলেছেন, এই সেই কুখ্যাত প্রবীর ঘোষ, যে কতকগুলো কাগুজে-বাঘ মার্কা জ্যোতিষীকে বেতার অনুষ্ঠানে ডেকে হারিয়ে বাজিমাৎ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু এতে বরং সদ্য-জ্যোতিষ ডিগ্রি পাওয়া জ্যোতিষীরা আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে ধাবিত হয়েছেন তাদের শিক্ষকদের আমার মুখোমুখি করতে।

এক সময় ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নামী-দামী জ্যোতিষীদেব দল একটি আলোচনায় বসলেন, যুক্তিবাদীদের নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে। ইতিমধ্যে মাইকে ঘোষিত হলো, জ্যোতিষীরা আলোচনা কবে তাঁদের মতামত জানাচ্ছেন—আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন কিনা. মহা জ্যোতিষ সম্মলনের আলোচনা-সভা বন্ধ। দল দল মানুষ। কি হয়? কি হয়? এক সময় বন্ধ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে উৎকণ্ঠিত শ্রোতাদের সামনে ডঃ শাস্ত্রী ঘোষণা করলেন, প্রবীরবাবু যদি ওই ঘবে আমাদের কযেকজনের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে চান, আমরা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাব।

বন্ধ ঘরে আট-দশজন জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে লড়া ও প্রকাশ্যে আট-দশজন জ্যোতিষীর বিবুদ্ধে লড়া এক কথা নয়। বললাম, ওই বন্ধ ঘবে আলোচনায হারলেও হারব, জিতলেও হারব। ধবুন আলোচনা শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি জানালাম, আমি জিতেছি; আপনারা জানালেন, জিতেছেন আপনারা। এই দুটো দাবি কখনই একই সঙ্গে সত্যি হতে পাবে না। কিন্তু কার কথা তখন মানুষ সত্যি বলে ধরবেন? এই ধরনের বিতর্ক নিয়ে আবারও বিতর্কে নামার বিন্দুমাত্র বোকা-ইচ্ছে নেই। আলোচনা হবে অবশ্যই প্রকাশ্যে।

আবার আলোচনায় বসলেন রথী-মহারথীরা। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন 'লাঞ্চ-ব্রেক'-এব পবে আলোচনা হবে। তখন আপনি বক্তব্য রাখবেন, আমরাও রাখব।

'লাঞ্চ ব্রেক' হলো, ইতি মধ্যে যুক্তিবাদী সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান-মঞ্চের সদস্যরা সভায বিলি করলেন দুটি প্রচারপত্র। একটিতে ছিল ভারতবিখ্যাত এগারজন বিজ্ঞানীর 'গ্রহরত্নের প্রভাব' বিষযে পরীক্ষিত মতামত এবং অপরটিতে ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষ থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরকে লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি। চিঠিতে যা লিখেছিলাম, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

"আমরা জেনেছি 'বসু ইন্স্টিটিউট'-এর 'লেকচার হল'-এ জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর একটি তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৯ ও ১০ এপ্রিল '৮৮।"

এটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখজনক কারণ, যে জ্যোতিষশাস্ত্র কেবলমাত্র অবিজ্ঞান নয়, উপরন্তু বিজ্ঞান-বিরোধী মানসিকতাকে উৎসাহিত করে; সেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিজ্ঞানে নিবেদিত প্রাণ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত সংস্থায। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংস্থার অপব্যববহারের বিষয়টি কোনও কারণে আপনার নজর

এড়িয়ে গেছে। আমরা নিশ্চিত যে সম্মেলনের ব্যবস্থাপকরা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নাম বিজ্ঞান-বিরোধী প্রচারে কাজে লাগাবে।

এই কারণে, আমরা অনুরোধ করছি, আপনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে সচেষ্ট হন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানকে ওদের বিজ্ঞান-বিরোধী প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে দেবেন না।

ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধাসহ

প্রবীর ঘোষ

(সম্পাদক)

এই চিঠিতে সঙ্গে সাক্ষরকারী হিসেবে ছিলেন আমাদের সমিতির সদস্য ১১জন বিজ্ঞানী।

না, কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত কথা রাখেন নি মহা-জ্যোতিষ সম্মেলনের ব্যবস্থাপকরা। আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলেন না ভয় পাওয়া জ্যোতিষী নামের কাগুজে বাঘেরা।

পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠাতেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে খবরটা প্রকাশিত হলো। ১০ এপ্রিলের আনন্দবাজারে দেখি জ্যোতিষসম্মেলনের উদ্দ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে তাঁরা আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

বলপ্রয়োগ করে আমাকে বক্তব্য থেকে বিরত করার জন্য কিছু পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান সংস্থা ও ব্যক্তিদের মতামত এবং চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আনন্দবাজারে একটি চিঠি দিই। তাতে জানাই, উদ্যোক্তরা বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পরে নির্ধারিত কোনও একটি দিনে আমরা মৌলালী যুবকেন্দ্রে উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত হতে

১০ এপ্রিল আনন্দবাজারে একটি খবর : 'জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান : সম্মেলনে দাবি'। সংবাদে একটি জায়গায় আছে, 'অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের একজন জানালেন, বিজ্ঞান চেতনা সমিতির সমর্থকরা এই সম্মেলনে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে প্রস্তুত।'

৯ এপ্রিলের জ্যোতিষ সম্মেলনে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' এবং ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির কিছু সদস্যর উপস্থিতিতে তাঁদের পক্ষ থেকে আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রান্ততাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যবস্থাপকদের তীব্র অসহযোগিতায় আমি প্রশ্ন তোলার সুযোগই পাইনি।

উদ্যোক্তারা বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পরে নির্ধারিত কোনও একটি দিনে আমরা মৌলালী যুবকেন্দ্রে উৎসাহী শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত হতে পারি। 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করার দায়িত্ব নিতে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' প্রস্তুত।

প্রবীর ঘোষ। কলকাতা-৭৪

পারি। 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করার দায়িত্ব নিতে 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' প্রস্তুত। চিঠিটি ২৯ এপ্রিল প্রকাশিত হয় আনন্দবাজারে।

না, এরপর উদ্যোক্তারা আর এগিয়ে আসেন নি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোলজি তারপর বাংলায় একটি ইস্তাহার ছেড়েছেন। তারই একটি আমারও হাতে এসেছে, তাতে আমি জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে সে-সব প্রশ্ন ইতিপূর্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুলেছি, সেগুলো তুলে দিয়ে জানাচ্ছেন, "এইসব প্রশ্নের যুক্তিনির্ভর উত্তর আমাদের সদস্য পাঠকবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে আহ্বান করছি। তাঁরা যদি যুক্তিনির্ভর উত্তর আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন তাহলে পরবর্তী সংখ্যায় আমরা সেগুলি ছাপার চেষ্টা করব। এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের জানা। অতর্কিত আক্রমণে আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা এবং সদস্যরা বিভ্রান্ত না হয়ে যাতে সুষ্ঠু উত্তর দিতে সক্ষম হন তার জন্যই এই চেষ্টা।"

জ্যোতিষীদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও গ্রহরত্ন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র রেশারেশি থাকা সত্ত্বেও এঁদের কেউ বিজ্ঞানমনস্ক কোনও মানুষ যা সংস্থার দ্বারা আক্রান্ত হলেই ওরা রেশারেশি ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, একত্রে লড়াই করেন। এটাই নিয়ম। একটা বিশেষ শ্রেণীস্বার্থে ঈশ্বরতত্ত্ব, অলৌকিকত্ব, আত্মার অমরত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদির মতো অসাধারণ সুন্দর শোষণের হাতিয়ারকে শাসকশ্রেণী ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। হাতিয়ারগুলো পাহাড়ী জোঁকের মত। যার রক্ত শোষিত হয় সে বুঝতে পারে না। এই বোঝানোর দায়িত্ব নেওয়া প্রত্যেকটি যুক্তিবাদী মানুষ ও সংগঠনগুলোর কর্তব্য।

যুক্তিবাদী চেতনার আন্দোলন ভারতবর্ষে কখনও এসেছে। কখনও থমকে দাঁড়িয়েছে, কখনও পিছিয়ে পড়েছে। চার্বাক-দর্শনের মধ্য দিয়ে যার শুরু তাই বর্তমানে আবার নতুন মাত্রা পেয়েছে পশ্চিম বাংলায়। গ্রাম-শহরের হাজার হাজার মানুষ যুক্তিবাদের কথা, বিজ্ঞানের কথা শুনছেন, আন্দোলনের শরিক হচ্ছেন। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকতা পায়, তবে তাদের এই নব চেতনাই জন্ম দেবে নতুন নেতৃত্বের। এই নেতারা আর যাই হোক ধান্দাবাজ হবে না। নীতি আর দুর্নীতিকে এক সঙ্গে মেশাবে না।

এই প্রসঙ্গে যুক্তিবাদীদের পক্ষে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক একটা খবর জানাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার'-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্যোতিষ-বিশ্বাস ও আঙুলের গ্রহ-রত্নকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং আমাদের যুক্তিবাদী শিবিরেরই 'আপনজন' হয়েছেন ; এটা আমাদের বিশেষ করে যুক্তিবাদীদের কাছে অবশ্যই একটা বড় মাপের জয় বই কী। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এর পরই যে অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল, সেটি হল ২৭ জুলাই ১৯৮৮। 'স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ঢাকুরিয়া সাইন্স ক্লাব'-এর যৌথ উদ্দ্যোগে ঢাকুরিয়া এন্ড্রুজ স্কুলের অডিটরিয়মে 'জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান' শিরোনামে আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। খোলা আমন্ত্রণ রাখা হয়েছিল জ্যোতিষীদের উদ্দেশ্যে। ওখানেই আবার দেখা হলো ডঃ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেখানে আমার বক্তব্যের শেষ অংশে বলেছিলাম, শেষ করার আগে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমরা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কিন্তু কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য

করছি। আমাদের আশেপাশের শ্রদ্ধেয় মানুষদের বিপরীত চরিত্র। এঁরা একই সঙ্গে জ্যোতিষ-বিরোধীতাও করেন, আবার জ্যোতিষশাস্ত্রের পক্ষেও থাকেন। অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে এবং বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে দু'রকম। অমাদের জীবনচর্চার সঙ্গে জীবনের সত্যকে যদি না মিশিয়ে নিতে পারি, সেটা কিন্তু আমাদেরই ভণ্ডামী। গত ৯ এপ্রিল যে আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলন হয়েছিল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে, সেখানে কিন্তু বেশ কিছু মন্ত্রীরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি দুঃখিত হয়েছি, অবাক হয়েছি, যখন দেখেছি, যাঁরা নিজেদের চরম-যুক্তিনিষ্ঠ বলে প্রচার করেন, সেই মার্কসবাদী দলের নেতা মন্ত্রী হয়ে কথার সঙ্গে কাজকে মেলাবার চেষ্টা না করে জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন। আমরা আতংকিত হয়েছি, যখন দেখেছি, একজন জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতিষীদের উদ্দেশে উপদেশ দিয়েছেন—আপনারা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চাইলে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সূর্য-সিদ্ধান্তনির্ভর পাঁজিকে বিসর্জন দিয়ে এফিমেরিসের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে গণনা করুন। এই উপদেশে স্পষ্টভাবেই ওই বিজ্ঞানীর জ্যোতিষ-বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে। এমনটা প্রত্যাশিত নয়। আশা করব, ভবিষ্যতে তিনি কোনও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে বক্তব্য না রেখে বিজ্ঞান-প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ওপর নির্ভব করে বক্তব্য রাখবেন।

উত্তর দিতে ডঃ বন্দোপাধ্যায উঠলেন। বললেন, প্রবীরবাবুর বক্তব্যের লক্ষ্য আমি। তাই এই বিষযে উত্তর দেওযার প্রযোজনীযতা অনুভব করছি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায তাঁর ব্যক্তব্যে স্বীকার করলেন, আমি তাঁর জ্যোতিষ সম্মেলনে দেওযা বক্তব্য বিকৃত করে পেশ করিনি। তবে সেই সঙ্গে তিনি একাধিক যুক্তি সহ বললেন, জ্যোতিষশাস্ত্র আদৌ বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোনও শাস্ত্র নয়।

উত্তর দিতে গিযে আমি বলেছিলাম, গত ৯ জুলাই প্রসঙ্গে অমলেন্দুবাবু একটু আগে যে কথাগুলো বললেন, খুব সুন্দর বললেন। কিন্তু বক্তাদের এখানে বক্তব্য রাখার আগে সচেতন হবার প্রযোজন আছে যে, এটা কোনও 'তাৎক্ষণিক বিতর্ক সভা' নয। সুতরাং কাল যে কথা বলেছি, আজ তার বিপরীত কথা বলে বাজিমাৎ করে দেব—এমন ধারণা নিযে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখা উচিত নয়। আমরা অনেকেই বোধহয় সেই ল-ইয়ারের গল্পটা শুনেছি, যিনি কোর্টে দাঁড়িযে তাঁর মক্কেলের হযে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখার পর মক্কেল দৌড়ে ল-ইয়াবের কানে কানে বললেন, "হুজুর ওসব কি বলছেন? ও-সবই তো আমার বিরুদ্ধে হুজুর।" "তাই? তা ঠিক আছে।" বলে ল-ইয়ার আবার শুরু করলেন, "ধর্মাবতার, এতক্ষণ আমি যা বললাম, তা আমার বিপক্ষের উকিলের সম্ভাব্য যুক্তি। ওর বাইরে বিপক্ষের উকিলের আর কি বলাব থাকতে পারে? পারে না। কিন্তু এর বিপক্ষে আমার যুক্তিগুলো একটু শুনুন।" বলে ল-ইযার তাঁব মক্কেলের পক্ষের যুক্তিগুলো একে একে হাজির করতে লাগলেন। আমার বক্তব্য হলো, আমবা কোনও বিতর্কসভায বসিনি, বা প্রফেশনাল ল'ইয়ার নই যে আজ এ-পক্ষে, কাল ও-পক্ষে যাব। আমরা জ্যোতিষবিরোধীতা কেন করব, এটা না জানা পর্যন্ত আমরা হযতো বিরোধীতা কবতে নাও পারি, কিন্তু সমর্থনও করতে পারি না; অবশ্যই করতে পারি না। অমলেন্দুবাবু, ৯ জুলাইযে

আপনার যে বক্তব্য ছিল তা মনযোগ সহকারেই শুনেছিলাম। আপনার বক্তব্য শুনে আমার স্পষ্টতই মনে হয়েছিল—আপনি জ্যোতিষীদের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছিলেন— জ্যোতিষকে যদি বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চান, তাহলে এফিমেরিস ফলো করুন। আমার মনে হয়েছে কোনও কিছুকে ফলো করেই জ্যোতিষীরা জ্যোতিষাশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে পারবে না ; যেহেতু ভাগ্য কখনই পূর্ব-নির্ধারিত নয়।

ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শক-আসনের প্রথম সারিতেই বসেছিলেন। মনযোগ দিয়ে আমার এই বক্তব্য শুনেছিলেন। সভার সভাপতি শংকর চক্রবর্তী সম্ভবত অমলেন্দুবাবুর উত্তর প্রত্যাশা করে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এই প্রসঙ্গে আর কেউ বক্তব্য রাখতে চান কি না ? অমলেন্দুবাবু এই প্রসঙ্গে কোনও প্রতিবাদ বা উত্তর দেন নি।

কথাগুলো আমার স্মৃতি থেকে লিখছি না। লিখছি সেদিনের ধরে রাখা পুরো অনুষ্ঠানের রেকর্ড বাজিয়েই।

এর কয়েকদিন পরেই অমলেন্দুবাবুর এক দীর্ঘ চিঠি পাই। চিঠিটি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিধাহীন ভাষায় জানান—ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোক। আমি আপনাদেরই লোক। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আন্তরিক, এবং ব্যক্তিগত ইগোর গন্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার এমন সাহসিক প্রচেষ্টার জন্য অবশ্যই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

চতুর্থ আঘাত
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে
বে-হাজির বেহায়া জ্যোতিষী

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ জ্যোতিষীদের হৃদয়ে দেগে দেওয়া আর একটি 'কালা বিদস'। ১১ ডিসেম্বরই টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল একটি অসাধারণ খবর—'বয়েজ স্কাউট অফ বেঙ্গল'-এর ময়দান টেন্টে এক দারুন লড়াই জমবে। এ-এক অভূতপূর্ব লড়াই। সাঁই শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশানালের উপাচার্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সাইন্স অ্যান্ড র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে—সাঁইবাবার বিভূতি খাইয়ে দেবেন উপাচার্য। খাওয়ার তিন-দিনের মধ্যে প্রবীরবাবুর পেটে তৈরি হবে তিন থেকে পাঁচটা খাঁটি সোনার টাকা। প্রবীরবাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মেদিনীপুরের বিখ্যাত হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো। তিনি প্রমাণ করেই ছাড়বেন হস্তরেখাবিদ্যা বিজ্ঞান। আর, যুক্তিবাদীদের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ জানান হয়েছে এ-যুগের কাঁপিয়ে দেওয়া একটি নাম—ডাইনি সম্রাজী ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তীকে।

সত্যিই, এক অসাধারণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১ ডিসেম্বরের বিকেলে। সম্মেলনে এত বিপুল সংখ্যক সাংবাদিকের উপস্থিতি বাস্তবিকই আমাদের সমস্ত রকম কল্পনার বাইরে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনের দিন এবং তার আগে-পরের দিনগুলো ছিল উত্তেজনার বারুদে ঠাসা, ঘটনার ঘনঘটায় জমজমাট। তিন চ্যালেঞ্জারের একজন ছিলেন জ্যোতিষী। তাঁর প্রসঙ্গ এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আনলাম। অন্য দুই আরও বেশি উত্তেজক ঘটনার প্রসঙ্গ এখানে

আনলাম না অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায়। ('যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' বইতে আরও বহু চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে এই দুই চ্যালেঞ্জারকেও হাজির করব আপনাদের সামনে।)

তবে নরেন্দ্রনাথের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম জেনে আপনারা অবশ্যই বুঝে ফেলেছেন, এর একটা পূর্ব ইতিহাস আছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহতো হস্তরেখাবিদ-এর ২৮.১০.৮৮তে লেখা একটি চিঠি পাই। ঘ্যমচ্যক্ ছাপান প্যাডে লেখা চিঠি। প্যাডের ছাপান অংশ পড়ে জানতে পারলাম, তিনি মেদিনীপুর শহর, মুখবেড়িয়া, বেলদা ও ঝাড়গ্রামে হাত দেখতে বসেন সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে। চিঠিটি এই :

মাননীয় প্রবীর ঘোষ,
সম্পাদক ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
কলকাতা-৭৪।

মহাশয়,

আপনার মানসিকতা যুক্তিবাদী হওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখাবিদ্যা যে অবিজ্ঞান নয়, একথা আমি আপনাকে দিয়েই প্রমাণ করে দিতে পারি। আর যদি না পারি তবে আমি আপনার যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হবো।

আমি হস্তরেখাবিদ্যার ছাত্র, সুতরাং এই বিদ্যা সংক্রান্ত যুক্তিসম্মত প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিব। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ আমার নেই।

হস্তরেখাবিদ্যার মধ্যে মহান সত্য নিহিত আছে এবং মানবকল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এ-কথা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। আশা করি আমার পত্রের গুরুত্ব দিবেন মানুষ হিসেবে।

নমস্কারান্তে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাতো
সুজাগঞ্জ
পোঃ. + জেলা.—মেনিদীপুর।

উত্তরে ৫.১১.৮৮ শ্রীমাহাতোকে একটি চিঠি পাঠাই। চিঠির প্রতিলিপি এখানে তুলে দিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাতো
সুজাগঞ্জ ॥ পোস্ট. + জেলা.—মেনিদীপুর ২৫.১১.৮৮.

মহাশয়,

গত ২৮.১০.৮৮ তারিখে লেখা আপনার চিঠিটি পেয়েছি। চিঠিতে জানিয়েছেন, আপনি প্রমাণ করে দেবেন জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখাবিদ্যা অপ-বিজ্ঞান নয়। আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য আপনি যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আগামী ১১ ডিসেম্বর '৮৮ বিকেল চারটের সময় 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র ময়দান তাঁবুতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। ওই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে আপনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জামানত হিসাবে ৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাত দিনের মধ্যে আপনাকে দশ ব্যক্তির হাত বা হাতের ছাপ (যা আপনি চাইবেন) দেখতে দেব। দেখে প্রত্যেক হাতের বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্ততঃ চারটি করে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে এক মাসের মধ্যে।

সর্বসমক্ষে আপনি আমি এবং আপনার ও আমার পক্ষে দুজন করে ব্যক্তি বা কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে আপনি এবং আমি অনুসন্ধান করে নেব যে আপনার উত্তর ঠিক কি ভুল। অনুসন্ধান আপনার উত্তর পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে শেষ করা হবে।

আপনি জিতলে অনুসন্ধান শেষের সাত দিনের মধ্যে দেব আপনার জমা দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা ও আমার প্রণামী পঞ্চাশ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট পঞ্চান্ন হাজার টাকা। আশা রাখি আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটবেন না।

যুক্তিবাদী অভিনন্দন সহ
প্রবীর ঘোষ
সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

প্রেস কনফারেন্সে শেষ পর্যন্ত অনেক মজাই ঘটেছিল। কিন্তু যা ঘটেনি, তা হলো শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাতোর উপস্থিতি। পরের দিন বহু ভাষাভাষী পত্রিকাতেই দারুণ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ওই সাংবাদিক সম্মেলনের কথা। বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এক বা একাধিক ছবিও। তারপরও এর জের চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। আনন্দবাজার ও বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই সম্পাদকীয়। বহু পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েই চলেছিল খবর, প্রবন্ধ, চিঠি-চাপাটি। বিভিন্ন পত্রিকাতেই যখন বারবার ঘোষিত হচ্ছিল যুক্তিবাদের জয়যাত্রার কাহিনী, ঠিক তখনই ২৮ জানুয়ারী ১৯৮৯ 'আজকাল' পত্রিকায় 'প্রিয় সম্পাদক' কলমে প্রকাশিত হলো নরেন্দ্রনাথ মাহাতোর এক বিস্ফোরক চিঠি।

'বিস্ফোরক' কথাটি ব্যবহার করার কারণ, চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-দিনে আমার বহু প্রিয়জন, বহু শ্রদ্ধেয় মানুষ, বহু সহযোদ্ধা এবং বহু শুভানুধ্যায়ী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিলেন প্রকৃত ঘটনা। এই সময় এমনও বহু অভিযোগ পেয়েছি—কিছু কিছু বাবাজীদের চ্যালারা এই নিয়ে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের উত্ত্যক্তও করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মাহাতোর চিঠিটা এখানে তুলে দিলাম।

প্রবীর ঘোষকে ফের চ্যালেঞ্জ

"যুক্তিবাদী প্রবীরের চ্যালেঞ্জে ঈপ্সিতা, অগ্নিতা, নরেন্দ্রনাথ কেউ এলেন না।" আমার

নামে এই শিরোনামে ১২ ডিসেম্বর, আজকালে, যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা অসত্য। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এবং অন্যান্য যাঁরা নিজেদের যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক বলে মনে করেন, তাঁরা প্রায়ই হস্তরেখাবিদ্যা সম্বন্ধে না জেনে এই বিদ্যাকে বুজরুকি ধরে নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহুদিন ধরে কাল্পনিক গল্প ও প্রবন্ধ লিখে আসছেন। আমি প্রবীরবাবুকে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে, হস্তরেখাবিদ্যা একটি বিজ্ঞান এবং তা আমি প্রমাণ করে দেব। আমার চিঠির উত্তরে ২৮ নভেম্বর '৮৮তে প্রবীরবাবু জানালেন যে, পাঁচ হাজার টাকা জামানত নিয়ে ১১ ডিসেম্বর '৮৮তে ময়দান-তাঁবুর সাংবাদিক সম্মেলনে আসুন। এই হল প্রবীবাবুর আমন্ত্রণ পত্রের নমুনা। ঐ চিঠির উত্তরে ৬ ডিসেম্বর '৮৮ প্রবীরবাবুকে জানিয়েছি যে, কিভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে হস্তরেখাবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান, তা প্রমাণ করব। প্রবীরবাবু ১১ ডিসেম্বরের আগে ঐ চিঠি পেয়েছেন, কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে আমার ৬ ডিসেম্ববের লেখা চিঠি পড়ে শোনান নি। এর থেকে বুঝলাম প্রবীরবাবু সততার সঙ্গে সত্যতা যাচাই করতে চাইছেন না। আমি অলৌকিকত্বের প্রমাণ দেখাতে চাইনি। আমি চেয়েছি হস্তরেখাবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান, তা প্রমাণ করতে। বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সাধুবাবাদের অলৌকিকতা বা ভাঁওতার সঙ্গে হস্তরেখাবিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। আমার কিছু শর্ত আছে। তাতে যদি প্রবীরবাবু রাজি থাকেন, তাহলে এপ্রিল '৮৯ মাসের কোন একদিন হস্তরেখাবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান, তা আমি এবং আর একজন প্রমাণ করে দেব।

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো। মেদিনীপুর।

৩০ জানুয়ারী '৮৯ আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে দেওযা নরেন্দ্রনাথ মাহাতোর চিঠির উত্তরও প্রকাশিত হলো 'প্রিয সম্পাদক' কলমেই।

নরেন্দ্র মাহাতোকে চ্যালেঞ্জ ৫ হাজার টাকা জমা দিন

"প্রবীর ঘোষকে ফের চ্যালেঞ্জ" শিরোনামে ২৮ ডিসেম্বর'৮৯ আজকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মাহাতোর একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিতে শ্রীমাহাতোর প্রথম দাবি, "যুক্তিবাদী প্রবীরের চ্যালেঞ্জ ঈপ্সিতা, 'অম্বিতা, নরেন্দ্রনাথ কেউ এলেন না?" শিরোনামে ১২ ডিসেম্বর আজকালে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা অসত্য। শ্রীমাহাতোব বক্তব্যের সরল অর্থ আমার মাথায় না ঢোকার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সেই সঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চাইছি, প্রকৃত সত্যটা তবে কী? সেদিনই বাস্তবিকই ওই তিনজনের কেউ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আজকাল সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকেরা সত্য গোপন করেছিলেন বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন বলে শ্রীমাহাতো দাবি করেছেন? তেমন দাবি করলে শ্রীমাহাতোর মানসিক সুস্থতার বিষয়ে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষই সন্দেহ প্রকাশ করবে।

শ্রীমাহাতোর ২য় দাবি, "৬ ডিসেম্বর '৮৮ প্রবীববাবুকে জানিয়েছি যে কিভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে হস্তবেখাবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান তা প্রমাণ করব। প্রবীববাবু ১১ ডিসেম্বরের আগে ঐ চিঠি পেযেছেন কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে আমার ৬ ডিসেম্বরে লেখা চিঠি পড়ে শোনান

নি। এর থেকে বুঝলাম প্রবীরবাবু সততার সঙ্গে সত্যতা যাচাই করতে চাইছেন না।"

শ্রীমাহাতো রেজিস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন। রেজিস্ট্রি নম্বর আর এল ৪৬১৪, তারিখ ৬.১২.৮৮। ১২ ডিসেম্বর সেই চিঠি আমার স্ত্রী পান। আমার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে হলে শ্রীমাহাতো মতিঝিল পোস্ট অফিস পিন ৭০০ ০৭৪এ খোঁজ নিতে পারেন। সেখানে আমার স্ত্রীর তারিখ সহ স্বাক্ষর রক্ষিত আছে। অতএব ১১ ডিসেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পাওয়া চিঠি পড়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যে চিঠি পেয়েছি সেটাও খুব মজার। তাতে শ্রীমাহাতো জানিয়েছেন, বিশ বা তিরিশজন সাধারণ মানুষের মধ্যে আমি দশজন হৃদরোগী মিশিয়ে দিলে তিনি সেইসব হৃদরোগীদের চিহ্নিত করে দিয়ে প্রমাণ করবেন হস্তরেখাবিদ্যা একটি বিজ্ঞান।

শ্রীমাহাতোর চিঠি পড়ে জেনেছি তিনি চারটি শহরে হস্তরেখা বিচারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বসেন। আমার বড়ই কৌতহল হচ্ছে এই জানতে যে তিনি কি হাত দেখে শুধুমাত্র হৃদরোগীদেরই চিহ্নিত করেন? হাত দেখে তিনি যদি মানুষের ভবিষ্যৎ ও অতীত বলতে সক্ষম বলে দাবি করেন তবে নিশ্চয়ই আমার হাজির করা দশজন মানুষের হাত দেখেও অতীত বলতে সক্ষম হবেন। তিনি বাস্তবিকই যদি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হন তবে অবশ্যই তাঁকে মানুষের অতীত বলে দেবার মধ্য দিয়েই হস্তরেখাবিদ্যার যথার্থতাই প্রমাণ করতে হবে। হৃদরোগী চিহ্নিতকরণে তিনি সফলতা পেলে বড় বেশি হলে এটাই প্রমাণ হতে পারে-হাত দেখেও হৃদয়ের গোলমাল বোঝা যায়, কিন্তু এর ফলে ভাগ্যগণনায় হস্তরেখার কৃতকার্যতা প্রমাণ হবে কী? (যদি অবশ্যই বাস্তবিকই তিনি তা পারেন!)

শ্রীমাহাতোর ৩য় দাবি, "এপ্রিল ('৮৯) মাসের কোনও একদিন, হস্তবরেখাবিদ্যা যে একটি বিজ্ঞান, তা আমি এবং আর একজন প্রমাণ করে দেব।"

একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই। শ্রীমাহাতো যদি বাস্তবিকই আমার হাজির করা দশজন মানুষের অতীত সম্পর্কে করা পাঁচটি করে প্রশ্নের অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব, এবং প্রণামী হিসেবে দেব ৫০ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সম্পাদক হিসেবে এও ঘোষণা করছি যে, পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমিতিও ভেঙে দেব, কারণ তার প্রয়োজনীয়তা ফুরবে।

ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখের মধ্যে শ্রীমাহাতো আমাদের সমিতির কার্যালয়ে ৫ হাজার টাকা জমা দিলে বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন বলে ধরে নেব, এবং ৮ এপ্রিল শনিবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে আমরা দু'জনে সাংবাদিকবন্ধুদের সামনে হাজির হতে পারি।

আপনি আরও একজন চ্যালেঞ্জারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকেও ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে ৫ হাজার টাকা। ৮ এপ্রিল তাঁর জন্যও ধার্য রইল।

প্রবীর ঘোষ

সম্পাদক—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৪

না, নরেন্দ্রনাথ মাহাতো ২৮ ফেব্রুয়ারি '৮৯ কেন, ডিসেম্বর '৯১-এ এই অংশটি লেখা পর্যন্ত 'চ্যালেঞ্জমানি' জমা দিতে আসেন নি, পরিবর্তে কিছু কিছু পত্রিকায় আবারও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন, আবারও গা ঢাকা দিয়েছেন। তবে যেটা করে চলেছেন, সেটা হলো, মাঝে মধ্যেই আমাকে একটি করে দীর্ঘ চিঠি পাঠাচ্ছেন। তাতে থাকছে সপ্রচুর গালমন্দ।

পঞ্চম আঘাত
কলির খনাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও
পাল্টা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড়

২১ মার্চ '৯০। সকালের 'আনন্দবাজার' পত্রিকাটি হাতে পেয়েই জ্যোতিষ-বিশ্বাসীদের মন চন্‌মন্‌ করে উঠল ; আর জ্যোতিষীদের রক্তে উচ্ছ্বাসের জোয়ার। কালার সাপলিমেন্টের প্রায় আধ পৃষ্ঠা জুড়ে রঙিন ছবিতে ও সাক্ষাৎকারে মাতিয়ে রেখেছেন তিন জ্যোতিষী ; মহিলা জ্যোতিষী। যদিও ছবি ছাপা হয়েছে চারজন জ্যোতষীর, কিন্তু পারমিতার ছবি থাকলেও সাক্ষাৎকার ছিল অনুপস্থিত।

সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাটির শিরোনাম 'কলির খনারা'। প্রথম সাক্ষাৎকারটি মণিমালা'র। সঙ্গীতশিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। দশ বছর বয়েস থেকেই জ্যোতিষচর্চা এবং প্ল্যানচেটের সাহায্যে আত্মা নামানো শুরু। (প্ল্যানচেটে আত্মা নামানোর সমস্ত রকম বুজরুকি ফাঁস করা হয়েছে বইটির প্রথম খণ্ডে। পড়লে, অমন আত্মা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই ইচ্ছেমত যখন তখন নামাতে পারবেন। তার জন্য মণিমালাদের দারস্থ হওয়ার কোনও প্রযোজন হবে না।) সতের বছরে বিয়ে হয় মণিমালার। এক সময় একটি জুয়েলারি দোকান থেকে ডাক আসে জ্যোতিষচর্চাকে পেশা হিসেবে নিতে। এক দিকে স্বামীর মতামত অন্য দিকে জ্যোতিষ-পেশার হাতছানি।

'সেই সময় একদিন প্ল্যানচেটে বসলাম আর তখনই অনুভব করলাম যে জ্যোতিষই আমার উপযুক্ত প্রোফেশন হবে। স্বামীর কাছ থেকেও কোনও বাধা আসবে না। সেই-ই শুরু।'

'শুধু কি হাতের রেখা দেখেই ভবিষ্যত সম্পর্কে বলেন ?' লেখিকা টুলটুল গাঙ্গুলি'র প্রশ্নের উত্তরে মণিমালা জানিয়েছেন, 'শুধু হাত দেখেই নয়, কারও ছবি দেখে মিডিয়াম নামিয়ে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি।'

মণিমালা শুধু অদৃষ্টই বলে দেন না, তার সঙ্গে অদৃষ্ট পাল্টাবার জন্যে স্টোনও প্রেসক্রাইব করেন। আবার অনেক সময় কাস্টমারদের অদৃষ্ট পাল্টাতে ইষ্টদেব গোপালের কাছে তাঁদের নামে তুলসীও দেন।

ফর্সা, দোহারা চোহারা, হাসি-খুসি মুখের লোপামুদ্রা বাংলায এম. এ। পার্ট-টাইম গবেষণাও করছেন বাংলা নাটক নিযে। (অভিনয সম্বন্ধে তবে জ্ঞান-গম্যি ভালই।)

টুলটুল গাঙ্গুলির প্রশ্ন, 'জ্যোতিষচর্চার সবটাই কি ইনটিউশন-নির্ভব ?'

লোপামুদ্রার উত্তর, 'কখনই নয়, এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক শাস্ত্র। তবে জ্যোতিষচর্চা

রলে পুজো, যোগ, প্রাণায়াম এসব করাও দরকার। (জ্যোতিষশাস্ত্র যদি পুজোর সঙ্গেই ভীর ভাবে সম্পর্কিত হয়, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের ওইসব অংক-টংক কষার ভূমিকা কী?)



মণিমালা

'ভবিষ্যদ্বাণী কি সব সময় ঠিক ঠিক হয়?' টুলটুল-এর প্রশ্ন।

'বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই মিলে গেছে, হাত দেখে কোনও সন্তান-সম্ভবা মাকে বলে দিতে পারি ছেলে কি মেয়ে হবে। একেবারে গ্যারান্টি। শতকরা ৮০ ভাগ মিলে যায়।'

আর এক খনা প্রিযাংকার এখন রমরমা বাজার। দারুণ ব্যস্ত। না, ওই দুই জ্যোতিষীর মত বড় বড় দাবি-টাবি করেন নি এই সাক্ষাৎকারে। অথবা করলেও তা প্রকাশিত হয়নি। তিনি ক্লায়েন্টদের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'পুরুষ, মহিলা সকলেই আসেন। সবার সঙ্গে গড়ে ওঠে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বিশেষ করে মেয়েদের শরীরিক, মানসিক এমন অনেক সমস্যা থাকে যা কোনও অচেনা পুরুষের কাছে বলাটা সংকোচের। কিন্তু আমার কাছে ওঁদের কোনও সংকোচ হয না, খোলামেলা আলোচনার ফলে আমিও মূল সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারি, এতে গণনার সুবিধে হয।' (কথায কথায জাতকের অতীত, বর্তমান জেনে নিয়ে ভবিষ্যতের অনুমান করার বিষয়ে মনে হয, আমাদের সমিতির সদস্য-সদস্যাবা এঁদের চেয়ে খারাপ বলবেন না। এমন কী, অনেক সময় এঁদেব চেয়ে ভালই বলবেন। তারপব সমস্যা সমাধানেব ব্যবস্থাপত্র? সেটা অনেক সমযেই বুদ্ধি খাটিয়েই তৈরি করা যায; এর

জন্য যুক্তিবাদীদের জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গণনা করার কোনও প্রয়োজন হয় না।)



প্রিয়াংকা



লোপামুদ্রা

এই লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের সমিতির তরফ থেকে একটি চিঠি পাঠালাম। চিঠিটা ১৩ এপ্রিল 'সম্পাদক সমীপেষু' কলমে প্রকাশিত হলো। চিঠিটা এই :

কলির খনাদের প্রতি যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ

'কলির খনারা' লেখাটি (২১ মার্চ) পড়ে জানলাম : মণিমালা দাবি করেছেন, তিনি শুধু হাত দেখেই নয়, কারও ছবি দেখে মিডিয়াম নামিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম। আশা রাখি মণিমালা মিথ্যাচারী নন। তিনি তাঁর দাবির যথার্থতা প্রমাণ করে আমাদের নতুন আলো দেখাবেন।

কোনও অলৌকিক ঘটনা, অলৌকিক ক্ষমতাধর মানুষ বা অভ্রান্ত গণনাকারী জ্যোতিষীর কথা শুনলে আমরা 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' তাঁদের দাবির যাথার্থতা জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। মণিমালা নিশ্চয়ই একজন সৎ মানুষ হিসেবে আমাদের এই

সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর দাবির ক্ষেত্রে আমাদের সত্যানুসন্ধান চালাতে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন।

পরীক্ষার ব্যাপারটা এই রকম—মণিমালাকে চারজনের চারটি ছবি দেব। সঙ্গে দেব প্রত্যেকের অতীত সম্পর্কে চারটি করে প্রশ্ন। ষোলটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর পেলে ধরেই নেব, প্ল্যানচেট সত্যি, জ্যোতিষ সত্যি। অতএব খাঁটি যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রমাণ রাখতে আমরা আমাদের কয়েক'শ সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনসহ সমস্ত রকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ-বিরোধী কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলব। সেই সঙ্গে মণিমালা করুণা করলে আমি তাঁর শিষ্য হয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। গুরু প্রণামী হিসেবে দেব ৫০ হাজার টাকা। এই চিঠিটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সাতদিনের মধ্যে মণিমালা আমাদের এই সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে না এলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব—তাঁর দাবিগুলো পুরোপুরি মিথ্যা। তাঁর দাবির পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করার প্রয়াস।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তিরিশ দিনের মধ্যে তাঁকে দেব ছবি ও প্রশ্ন। তার দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ নেব।

জ্যোতিষী লোপামুদ্রা দাবি করেছেন : 'সন্তানসম্ভবা মা-কে দেখে বলে দিতে পারেন সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে। একেবারে গ্যারান্টি। শতকরা ৮০ ভাগ মিলে যায়।'

কথাগুলোর মানে বুঝলাম না। ৮০ শতাংশ মিললে একেবারে গ্যারান্টি দেন কী করে ? ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা তো সব সময়ই কম-বেশি আধা-আধি। অতএব কখন-সখন ৮০ শতাংশ তো মিলতেই পারে। এতে কি প্রমাণ হয় জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান ? আরও একটু পুজো-আর্চা, যোগ ও প্রাণায়াম করে যেদিন লোপামুদ্রা গ্যারান্টি দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি জানাবেন, সেদিনের জন্য চ্যালেঞ্জটা তুলে রাখলাম।

না, প্রিয়াংকা জ্যোতিষী হিসেবে কোনও দাবিই জানান নি। এবং লেখা পড়ে মনে হল : মন-টন নিয়ে চর্চা করেছেন, তাই এখনই জ্যোতিষীর ভান করে দু-একটার চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে মিলিয়েও দিচ্ছেন। সত্য স্বীকার করার জন্য প্রিয়াংকাকে ধন্যবাদ।

পারমিতার ছবি চোখে পড়ল, লেখা নয়। পারমিতা '৮৫-র আকাশবাণীর বেতার অনুষ্ঠানে আমার কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আশা রাখি তিনি আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চাইবেন। এড়াতে না চাইলে, আবার তাঁর দাবির অসারতা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।

প্রবীর ঘোষ।
সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি,
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪

২৭ এপ্রিল '৯০ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চারটি চিঠি প্রকাশিত হলো। তার মধ্যে একটি চিঠি সেই হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতোর। পত্রগুচ্ছের শিরোনাম ছিল "জ্যোতিষী চ্যালেঞ্জ নিলেন।" চিঠি চারটি এই :

জ্যোতিষী চ্যালেঞ্জ নিলেন

॥ ১ ॥

'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষের বক্তব্য ও চ্যালেঞ্জের কথা জানলাম (চিঠি, ১৩/৪)। ওঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই জানাই ওঁর প্রদত্ত চারটি ছবির সহায়তায় ষোলটি প্রশ্নের সঠিক জবাব আমি জ্যোতিষ পদ্ধতিতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে দিতে চাই। তবে অবশ্যই প্রশ্নগুলিতে যেন প্রবীরবাবুর পূর্বের ক্রিয়াকলাপের মতো কোনও ভাঁওতাবাজি না থাকে।

মণিমালা। ৩৫/১৭এ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০

॥ ২ ॥

'কলির খনাদের প্রতি যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে দুটি চিঠি (১৩/৪) পড়লাম। আমি যুক্তিবাদীদের জানাই : হস্তরেখাবিদ্যা একটি বিজ্ঞান এবং তা আমি প্রমাণ করে দেখাতে চাই।

প্রবীর ঘোষ ও অন্যান্যেরা সত্যানুসন্ধানী বলেই জানি। সুতরাং আশা করি—তাঁরা আমার প্রস্তাবে রাজি হবেন এবং মে মাসের কোনও একদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আমাকে আহ্বান জানাবেন।

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো। সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর

॥ ৩ ॥

প্রবীর ঘোষের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে (১৩/৪) যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে কিছু বলার তাগিদ অনুভব করছি।

'যুক্তিবাদী' বনাম 'জ্যোতিষীর' যে চ্যালেঞ্জ শুরু হয়েছে তার অবসান কবে হবে কে জানে। কারণ, যে সরিষা দিয়ে (?) ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা চলছে সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত ঢুকে থাকে তাহলে ভূত ছাড়ানো যাবে কি? তার একটি প্রমাণ পাঠালাম।

৩১ ডিসেম্বর '৮৮ তারিখে রেজিস্টার্ড উইথ এ/ডি (রিসদ নং ৫৭৭৩ ও ৫৭৭৪) ডাকযোগে প্রবীর ঘোষের বাড়ির ঠিকানায় এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১নং স্ট্র্যান্ড রোড, প্রধান শাখা, কলকাতা-৭০০ ০০১, প্রবীর ঘোষের কর্মস্থলের ঠিকানায় চিঠির মাধ্যমে প্রবীর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম।

এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেল, আমার চিঠির (৩১/১২/১৯৮৮ তারিখের) যথাযথ জবাব নেই কেন?

কাশীনাথ কংসবণিক। ১৬/১ নন্দলাল বোস লেন ; কলিকাতা-৩

॥ ৪ ॥

'কলির খনাদের প্রতি যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে যুক্তিবাদী প্রবীরবাবুর চিঠি পড়লাম। প্রবীরবাবুর সঙ্গে আমিও একমত। সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনার কত রকম পন্থা

আজকাল চলছে। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র। যুক্তি দিয়ে সকল কিছু বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু যুক্তিবাদী মনও অনেক সময় ভাববাদে ভাবিত হয়। আমার এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য প্রবীরবাবুর উদ্দেশ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া নয়। যুক্তিবাদী মনে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাববাদের দ্বন্দ্ব তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য এ চিঠির অবতারণা।

বীরভূম জেলার নানুর থানার পাকুড়হাস গ্রামে এক ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে যিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছেন। ইনি পূর্বে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ওষুধ হচ্ছে বাড়িতে অধিষ্ঠিতা দেবী দূর্গার মৃত্তিকা, ফুল ও চবণামৃত। অসুখ সারানোর জন্য তিনি কোনও অর্থের দাবি করেন না। ভক্তরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুঠো মুঠো অর্থ দিয়ে যান। বাড়িতে রোগীদের মেলা। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু নিশ্চয়ই উল্লিখিত বিষযটির যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেবেন। সব থেকে ভাল হয তিনি যদি সরজমিনে পাকুড়হাস গ্রামে ঘুরে আসেন।

বীরেন আচার্য। দিগড়া সারদাপল্লী, হুগলি

চিঠিগুলো প্রকাশিত হতেই সংবাদ শিকাবী অনেক সাংবাদিক বন্ধুই জানতে চাইলেন, এবার আমাদের সমিতি কি করবে? এগিযে এলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন 'INDIA TODAY' পত্রিকা। বিজ্ঞানকর্মী ও সাধাবণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি কবেছিল 'তিন' নম্বর চিঠিটি। আমি কেন কাশীনাথ কংসবণিক-এর দু-দুটি রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান চিঠি পেযেও উত্তর দিইনি?

এ-সবেরই উত্তর নিয়ে আমাদের সমিতির পক্ষে আমার দেওযা চিঠি আনন্দবাজারেব প্রকাশিত হলো ৭ মে ১৯৯০। শিরোনাম, "যুক্তিবাদী ও জ্যোতিষী"।

যুক্তিবাদী ও জ্যোতিষী

২৭ এপ্রিল আমাদেব সমিতি সংক্রান্ত চারটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিগুলোব উত্তব প্রকাশিত না হলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে জেনে চারজনেব উত্তর দিচ্ছি।

(১) মণিমালার সহযোগিতাব জন্য ধনাবাদ। চাবটি ছবি ও প্রশ্ন তাঁব কাছে এ মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দেব। ছবি ও প্রশ্ন তিনি গ্রহণ কবলে ১৬ জুন শনিবার বিকাল চারটেব সময় আমবা কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে মিলিত হব। সেখানেই তাঁর দাবির যাথার্থতা প্রমাণ হবে। চিঠিব শেষ লাইনে মণিমালা লিখেছেনঃ তবে অবশ্যই প্রশ্নগুলোতে যেন প্রবীববাবুর পূর্বের ক্রিয়াকলাপেব মতো কোনও ভাওতাবাজি না থাকে।" এর সঙ্গে অতীতেব প্রসঙ্গ জড়িত। জ্যোতিষীদের ভাঁওতাবাজি ধবতে একটু ভাঁওতাবাজির আশ্রয় নেওয়া আমার একান্তই প্রযোজন ছিল।

(আকাশবাণীব সেই কিংবদন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জ্যোতিষীদেব সামনে জাতকদেব পোশাকআশাক পাল্টে পেশ করেছিলাম; স্বীকাব করছি। কিন্তু আমার সেই ভাঁওতাবাজিতে তাঁবা কেন বধ হলেন? জ্যোতিষশাস্ত্র কি তবে জন্ম সমযেব চেযে জাতকের পোশাকআশাককে বেশি গুরুত্ব দেয?)

(২) হস্তরেখাবিদ নমবেন্দ্রনাথ মাহাতো ২৮.১০ ৮৮ তাবিখে আমাকে প্রথমবাব চ্যালেঞ্জ

জানিয়েছিলেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১১ ডিসেম্বর '৮৮ আমাদেব সমিতির ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে হাজিব হতে আহ্বান জানাই এবং জামানত হিসেবে ৫ হাজার টাকা জমা দিতে বলি। জয়ী হলে তিনি প্রণামী ৫০ হাজার টাকাসহ মোট ৫৫ হাজার টাকা পাবেন। পরাজিত হলে ৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। শ্রীমাহাতো সাংবাদিক সম্মেলনে আসেন নি। এই নিয়ে তৃতীয়বার তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে দেখছি। তিনি বাস্তবিকই সততার সঙ্গে হস্তরেখাবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চান কিনা, এ ব্যাপারে আমাদের সমিতির পরিপূর্ণ সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমবা আশা রাখব আমাদের সমিতির দেওয়া তৃতীয় ও শেষ সুযোগ তিনি গ্রহণ করবেন। শ্রীমাহাতো যেন ১৫ মে'র মধ্যে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪-এ জামানতেব ৫ হাজার টাকা জমা দেবেন। ৫ জুনের মধ্যে তাঁকে ১০জন জাতকের হাত দেখতে দেব এবং ৫টি কবে প্রশ্ন দেব। প্রত্যেক জাতকের অন্তত ৪টি করে প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিতে পারলে পরাজয় মেনে নেব। প্রণামী দেব ৫০ হাজার টাকা, ফেরত দেব জামানতের ৫ হাজার টাকা। ভেঙে দেব সমিতি।

(৩) কাশীনাথ কংসবণিকের চিঠি পেয়েছি, পড়েছি ; কিন্তু উত্তর দেওয়াব প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবিনি। যতদূব মনে পড়ে : তিনি জানিয়েছিলেন—আমবা যেন একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকি, সেখানে তিনি আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন। এই অদ্ভুত আবদার পড়ে পত্রলেখকের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ জেগেছিল। প্রায় প্রতিদিনই এমন চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি পাই। তাঁরা প্রত্যেকেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার বায়না ধবেন এবং জামানতের টাকা জমা দিতে বললেই সরে পড়েন। শ্রীকংসবণিক ১৫ মে'র মধ্যে টাকা জমা দিলে তাঁর মুখোমুখি হব ১৬ জুনেব সাংবাদিক সম্মেলনেই।

(সেই সম্মেলনে শ্রীকংসবণিক যদি প্রমাণ কবতে পাবেন তাঁর বা তাঁর পরিচিত কারও অলৌকিক ক্ষমতা আছে অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান, তবে জিতে নিবেন পঞ্চাশ হাজাব টাকা ; ফেরৎ পাবেন জমা রাখা পাঁচ হাজার।)

(৪) বীবেন আচার্যেব চিঠিব উত্তবে জানাই : রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধেব গুরুত্ব অপরিসীম। শরীরেব নানা স্থানের ব্যথা, হাড়ে, বুকে বা মাথায ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটেব গোলমাল, গ্যাসট্রিকেব অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজ্‌মা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি বোগেব ক্ষেত্রে বোগীব বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ঔষধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট প্রযোগ কবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওযা যায়। একে বলে 'প্লাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি।

পাঁকুড়হাস গ্রামেব দেবীদুর্গার মৃত্তিকা ও চরণামৃত খেযে যাঁরা রোগমুক্ত হযেছেন তাঁদেব আবোগ্যের পিছনে দেবীদুর্গার কোনও বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ কবেনি, কবেছে দেবীদুর্গার প্রতি বোগীদের অন্ধবিশ্বাস। শ্রীআচার্য একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন, বোগমুক্তরা সেইসব রোগেই ভুগছিলেন, 'প্লাসিবো' চিকিৎসায যে সব বোগ আরোগ্য সম্ভব। প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতার জন্য শ্রীআচার্য আমাদের সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ করলে বাধিত হব।

প্রবীব ঘোষ। কলকাতা-৭৪

২৬ মে '৯০ বরানগর পোস্ট অফিস থেকে রেজিস্টার্ড উইথ এ/ডি (রসিদ নম্বর ২৯২৪) একটি চিঠি চারটি ছবি সমেত পাঠালাম মণিমালাকে। ঠিকানা লিখেছিলাম ৩৫/১৭ এ, পদ্ম পুকুর রোড, কলিকাতা-২০, পিন্ ৭০০ ০২০। আপনাদের কৌতূহল মেটাতে চিঠিটি তুলে দিচ্ছি।

মাননীয়া মণিমালা,

আপনার অলৌকিক জ্যোতিষ-ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের সমিতিকে পরীক্ষা চালাতে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চারটি ছবি চিঠির সঙ্গে পাঠালাম। প্রতিটি ছবির পিছনে আমার স্বাক্ষর সহ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা রয়েছে।

প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রে চারটি করে প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হলো—

১। বর্তমান শিক্ষাগত যোগ্যতা

২। বর্তমান পেশা

৩। বর্তমান আয়

৪। কোন্ সালে বিয়ে করেছে

১৬ জুন '৯০ শনিবার বিকেল চারটের সময় কলকাতা প্রেস ক্লাবে আপনার মুখোমুখি হবো, উত্তরগুলো তখনই শোনা যাবে। এবং উত্তরের যথার্থতা বিষয়ে প্রমাণ আমি হাজির রাখবো। হাজির করা প্রমাণ মিথ্যে প্রমাণিত হলে আমি এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' পরাজয় স্বীকার করে নেব। সাংবাদিক সম্মেলনে ছবি চারটি সঙ্গে আনবেন।

আপনি ব্যর্থ হলে আশা রাখি একজন সৎ মানুষ হিসেবে জ্যোতিষ পেশা থেকে বিরত থাকবেন।

শুভেচ্ছাসহ
প্রবীর ঘোষ

চিঠিটা ফেরৎ এলো N/K লিখে। N/K অর্থে Not Known অর্থাৎ ওই ঠিকানায় মণিমালা থাকেন না।

তাহলে ব্যাপারটা কি হলো? হলো, অনেক মজাই হলো। মণিমালার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল ২৭ তারিখ। ২৯ তারিখ রবিবার বিকেলে গিয়েছিলাম মণিমালার দেওয়া ঠিকানায়। ওটা সংগীত শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। কথা বললেন তরুণবাবুর স্ত্রী। আমি 'সাংবাদিক' পরিচয়ে দেখা করেছিলাম। সঙ্গী আশিস-এর পরিচয় দিয়েছিলাম প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে। তরুণবাবুর স্ত্রী জানিয়ে ছিলেন, এ-বাড়িতে তো মণিমালা থাকে না। এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানের ঠিকানা দিয়ে বললেন, ওখানে গেলে পেয়ে যাবেন। বাড়ির ঠিকানা এবং ফোন নম্বরও দিলেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য মণিমালাকে ধন্যবাদ জানাতে বলায় বললেন, এই দু-দিনে প্রচুর মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন ওঁকে।

পরের দিনই মণিমালার বাড়িতে ফোন করলাম মেদিনীপুরের এক জ্যোতিষী হিসেবে পরিচয় দিয়ে। চ্যালেঞ্জ জানানর জন্য অভিনন্দন জানালাম এবং তাঁর লড়াইতে আমরা

মেদিনীপুরের জ্যোতিষীরা এক কাট্টাভাবে তাঁর পাশে আছি—এই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মণিমালা বললেন, প্রবীর ঘোষকে প্রতিরোধ করার দরকার ছিল। অনেক আগেই দরকার ছিল। কোনও জ্যোতিষী সাহস করে যা করলেন না, আমি তাই করেছি। আপনারা পাশে আছেন শুনে ভাল লাগল। প্রয়োজনে নিশ্চয়ই সাহায্য চাইব ভাই।

কিন্তু মণিমালাব চিঠি প্রকাশ ও আমার চিঠি প্রকাশের মধ্যেকার সময়ে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল।

৫ মে'র দুপুর। মণিমালাকে ওঁর মানিকতলার বাড়িতে ফোন করলাম, মেদিনীপুরের সেই জ্যোতিষীব পরিচয়ে। জানালাম, "দিদি, আমার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাল আপনাকে একটু প্রণাম জানাতে যেতে চাই। ওঁরা আপনাকে একটু চোখে দেখে নয়ন সার্থক করতে চায়।"

মণিমালা জানালেন, কাল সময় বেব করাই মুশকিল।

শেষ পর্যন্ত তোষামোদ আব বিনয় দিয়ে মন ভেজালাম। পরদিন সকাল দশটায় দেখা করার অনুমতি পেলাম।

পবেব দিন সময় মত পৌঁছে গেলাম মণিমালার বাড়িতে, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে বাড়ি। খুঁজে পেতে একটুও অসুবিধে হলো না। দরজায় 'নক্' করতে যিনি দবজা খুললেন, তিনিই মণিমালা। স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী, মধ্য বয়স্কা, গলায় বিশাল রুদ্রাক্ষের মালা। দরজা খুলতেই পবিচয দিলাম। পরিচয় পেযে চোখে-মুখে যেমন প্রচণ্ড অস্বস্তি প্রকাশিত হলো এবং যে অতি বিরসভাবে ভেতবে আসতে বললেন, তাতে বুঝলাম, কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে।

আমবা ঢুকলাম, আমবা অর্থে আমি ও আমাব কযেকজন সহযোদ্ধা। আমার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। গলায় বিশাল এক রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে একগুচ্ছ গ্রহবত্নেব আংটি। কপালে গোলা সিঁদুবের দীর্ঘ টিপ। আর চুলে চশমায কিছুটা অন্যরকম প্রবীর।

ঘবে ঢুকে বুঝলাম, সতর্কতার জন্য মানিকতলা অঞ্চলে ছড়িযে ছিটিযে নানা-ভাবে যে-সব সহযোদ্ধাবা নানা অলস পথচারী কি মটোরবাইক ও স্কুটার দাঁড় করিয়ে কযেকজন আড্ডাবাজ তবুণ-তরুণীর ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা মোটেই অপ্রযোজনীয ছিল না। লক্ষ্য করলাম, চব্বিশ ঘন্টাবও কম সময়ে মণিমালার ব্যবহারটাও কেমন পাল্টে গেছে। ঘবে তিনজন যুবক হাজিব ছিলেন। তাঁদের মণিমালা 'আমাদের পাড়াব ছেলে, ভাই আর কী' বলে পবিচয দিলেন। তাদেব চেহাবা-চালচলন দেখে তেমন 'নিবীহ' পাড়ার ছেলে বা ভাই বলে মনে হলো না। আমরা গুছিয়ে বসে মণিমালাকে কিছু জিজ্ঞেস কবার আগেই ভেতরের ভেজান দরজা ঠেলে ঢুকলেন এক তবুণ। জানালেন, মণিমালাকে ভেতবে ডাকছেন।

মণিমালা ফিবে আসতেই জিজ্ঞেস কবলাম, প্রেস কনফারেন্সটা কবে হচ্ছে? সেটাব তাবিখ কি আপনিই ঠিক করবেন?

মণিমালা তৎপবতাব সঙ্গে জবাব দিলেন, "না না, সে-বকম কোনও ব্যাপার নেই। কনফাবেন্সেব ব্যাপাবে আমার কোনও, মানে নিজস্ব মাথাব্যথা নেই এবং সেই বিষয়ে আমাব

কোনও মতামতও নেই। এটা কোনও ব্যাপারও নয়। সে-বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাই না।"

মাত্র চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়েব মধ্যে এমন কী ঘটল, যাতে মণিমালার কথা-বার্তা ও ব্যবহারই গেল পাল্টে। তবে কি ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণিমালাকে জানিয়ে দেওয়া হলো, জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে সম্ভবত প্রবীরই এসেছেন? ভেজান দরজার আড়ালে কয়েক জোড়া চোখের দৃষ্টি যে আমাদেরই দিকে, কথা বলতে বলতে দবজার ফাঁকে মাঝে-মধ্যে আলতো কবে চোখ ঘুবিয়ে নিতেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

বললাম, আমাদের যদি কোনও কিছু করণীয় বলেন, যদি গায়ে গতরে খাটতে বলেন, ঠিকানাই দিয়ে দিচ্ছি; আমাদেব আসতে বললে আসব, আপনি যেখানে যেখানে পাঠাবেন, আপনাব নেতৃত্বে যেমনভাবে বলবেন, তেমনভাবে কাজ কবতে পারি।

"আপনাদেব অ্যাড্রেসটা বেখে যেতে পাবেন।" কথা বললেন একটি 'পাড়ার ছেলে'।

আমি ওর কথা না শুনেই ডাবাবিষ্টের মত, বা বক্‌বক্ করা আধ-পাগলা মানুষের মত বলেই যেতে লাগলাম, আমাদেব যেমনভাবে বলবেন, আমবা সমস্ত রকমভাবে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা কবব। এ-কথা আগেই বলেছি, আবারও বলছি।

"হ্যাঁ, সেটা তো বলেছেন।" বললেন, মণিমালা। আমি আবার শুরু কবলাম। "হয়তো কিছুই লাগবে না; তা সত্তেও যদি বলেন যে কিছু চাঁদা-পত্তর তুলে দিতে, আমরা তাও করব। আপনাব নেতৃত্বে আমবা সবাই আছি। যে কথা আগেও বলেছি; আপনি বললেই আমাদেব অঞ্চলেব অনেক জ্যোতিষীকে নিয়ে আসতে পাবব। এবং আপনাকে আমারা একটি অভিনন্দনও দিতে চাই।'

আমার মুখেব কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে মণিমালা বললেন, "না, এটা যেটা বলছেন, অভিনন্দন দিতে চাই, আমি তো অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কথাবার্তাগুলো ঠিক বাড়িতে খুব একটা বলি না, যা কিছু বলি চেম্বাবেই বলি।"

প্রমাদ গুণলাম, চেম্বার মানে সেই জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীব দোকান, যেখানে এক সময় 'এ-যুগেব খনা' পারমিতা বসতেন। দোকানের মালিকেব এক লক্ষ জেরাব পাহাড় ডিঙিয়ে সেবাব খনার মুখোমুখি হতে পেবেছিলাম। বেতাব অনুষ্ঠানের সময়কার সে সব স্মৃতি মুহূর্তে ভেসে উঠল। তিনিই কি তবে এমন নির্দেশ দিয়েছেন মণিমালাকে? মণিমালা কি তবে আমাব চ্যালেঞ্জকে এড়িয়ে যাবার বাস্তাব খোঁজ করছেন? আজকেব কথাগুলো এমন বিদ্‌ঘুটে কেন? সরাসবি ফয়সলাব এমন একটা সুযোগ কি মণিমালার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের জন্য ব্যর্থ হবে? শঙ্কিত হলাম। সত্যি বলতে কি, এমন আশঙ্কাও হলো ভেজান দবজার আড়ালে একজোড়া চোখের মালিক ওই জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী নন্‌তো?

মণিমালা বলেই চললেন, "আমি তো মহিলা একজন, সেই হিসেবে ক্লোজ ধবুন, এই আমাব ভাই-টাইয়েরা এলো, বা বোন-টোনেবা এলো, এ-ছাড়া, চেম্বাবে আসুন। আমি যেটা বলছি, কনফাবেন্স বা ইত্যাদি ব্যাপাব, যে-সব ব্যাপাব নিয়ে ঠিক এখন আমি কথা বলতে চাইছি না। তাব কারণ আমি প্রস্তুতও নই, মানসিকভাবেও প্রস্তুতি আমাব কোনও নেই।" (কথাগুলো হয়তো যথেষ্ট অগোছালো মনে হতে পারে, কিছু কিছু পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে। কেমন যেন ভাষাব বাঁধুনিব অভাব। কি করি বলুন? মণিমালা যেভাবে কথাগুলো

বলেছিলেন, সে-ভাবেই আমার লেখায় যতটা সম্ভব তুলে ধরতে চাইছি টেপ বাজিয়ে শুনে শুনে।)

"না, ওই যে একটা চিঠি যে বেরিয়েছে, সেই চিঠিতে তো, আপনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে প্রেস কনফারেন্সেই ফেস করবেন......" বলছিলাম আমি। কিন্তু আমার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই মণিমালা বললেন, "প্রেস কনফারেন্সে ঠিক ফেস করব বা কিছু, বা করতে চাই, চিঠিটা সে ধরনের গেছে ঠিক কথাই, কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ব্যাপার আছে।"

"কী ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"মানে, সেই ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছি না। এটা নিয়ে আমি, আপনারা দেখতেই পাবেন, এটা নিয়েই কিছু একটা বেরুবে। এটা নিয়ে এখন আমি কিছু বলতে চাইছি না। এটা নিয়ে কথাটা পবে আপনারা জানতে পারবেন। এর বেশি কিছু জানতে হয়, চেম্বারে চলে আসুন, চেম্বারে কোনও অসুবিধেই হবে না। কোন আপত্তিও নেই। আপনি যাবেন ওখানে, ওখানে গিয়ে কথা বলবেন।"

বললাম, "আপনি একা ভাবার কোনও দরকার নেই। এবং আপনি জয়ী হলে নিঃসন্দেহে আমাদের সবারই জয়। আপনার জয়ের অমবা শেয়ার করব অন্যভাবে।"

"জয়ের কথা নয়। ব্যাপারটা জানেন তো, এরা মনে করে জ্যোতিষটার একটা বুজরুকি। অ্যাসট্রোলজিও একটা বিজ্ঞান। পাঁচজন মানুষ যে ছুটে ছুটে আজকে যাচ্ছে, এটার নিশ্চয় কোনও একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।" বললেন মণিমালা।

গতকাল ফোনে মণিমালার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ টেনে বললাম, "কালকেই তো আপনাকে বলেছি রেডিও প্রোগ্রামের ক্যাসেটটা আমরা করেছি। প্রয়োজনে আপনাকে ক্যাসেটটা দেব। আপনার যে-সব তথ্যের প্রয়োজন বলবেন , চেষ্টা কবব সেগুলো আপনার কাছে হাজির করতে।"

"আচ্ছা, আপনাদের অনেক রিসার্চ ওয়ার্ক আছে।"

"কাল ফোনে তো আপনাকে বলেইছি, ওই রেডিও প্রোগ্রামটার ব্যাপাবে ; দিদি, আপনাকে যা যা বলা হয়েছে, ঠিক সে-রকমভাবে কিছু হয়নি। আমি ফোনে বলেছিলাম, প্রবীরবাবু সাজিয়ে লোক হাজির করে অ্যাস্ট্রোলজারদের চীট করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনি যে বলছিলেন, প্রবীরবাবু প্রশ্নগুলোও হাজির কবেছিলেন আলতু ফালতু ; মানে—"

"হ্যাঁ, কার ব্যাগে ক'টা পযসা আছে ? আমি এ-রকমই শুনেছি। আমি তো রেডিও প্রোগ্রামটা শুনিইনি।" বললেন মণিমালা।

বললাম, "যাঁরা বলছেন, তাঁবা যদি মিথ্যে কথা বলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অন্য রকম বলেন, তাতে লড়াই করতে আপনারই অসুবিধে হবে।"

তাবপব বেতার অনুষ্ঠানটিতে কি কি প্রশ্ন জ্যোতিষীদেব কাছে হাজির করা হয়েছিল, তাঁবা কি কি জবাব দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কিছু কথা বললাম। এক সময় এও বললাম, "আপনি যদি নিতে চান, আমার ফোন নম্বব ও ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।" তারপর

আবারও জিজ্ঞেস করলাম। "প্রেস কনফারেন্সটা কবে নাগাদ হবে, কিছু —"

"না, সেটা সম্বন্ধে কোনও আভাসও আমি পাইনি, সেটা আপনাকে বললাম। যদি কিছু জানতে পারি, যদি কিছু হয়, জানতে পারবেন।"

মণিমালা আরও একটা কথা জানালেন, তাঁরা পত্রিকায় একটা চিঠি দিচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "ওই প্রেসকনফারেন্সের ব্যাপারে?"

"প্রেস কনফারেন্সের ব্যাপারটা, বা যেটা আমি 'চ্যালেঞ্জ' মানে আমার নাম করে যেটা 'চ্যালেঞ্জ' বলে...' দেওয়া হয়েছে। সে-ব্যাপার সম্বন্ধে ডিটেলসভাবে আপনি জানতে পারবেন।" বললেন মণিমালা। (পাঠক-পাঠিকারা, অনুগ্রহ করে একটু লক্ষ্য রাখবেন, মণিমালা 'আমি চ্যালেঞ্জ মানে আমার নাম করে যেটা চ্যালেঞ্জ বলে....' কথাগুলো বলেছিলেন।)

"তারমানে কী, আপনার নাম করে যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিক নয়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটার মধ্যেও অনেক গণ্ডগোল আছে।"

"উপস্থিত একজন পাড়ার ছেলে" মুখ খুললেন, "প্রবীরবাবু তো অ্যাকসেপ্টও করেন নি।"

"কাজেই সেই হিসেবে এখনও পর্যন্ত আমি ঠিক, মানে ডিসিশনে আসিনি যে কি করব। এই নিয়ে কথা চলছে। কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করছি।" জানালেন মণিমালা।

অবাক আমি বললাম, "কি করব মানে? চ্যালেঞ্জ তো আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেনই। কাল পর্যন্ত অন্তত তাই তো বললেন।"

"না, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করার ব্যাপারে ঠিক ; এ-ব্যাপারটা এমন একটা ব্যাপার নয় যে এটা একটা চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।" বললেন মণিমালা।

"আপনি কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিয়ে আবার পিছিয়ে আসবেন না।" বললাম আমি।

"পিছিয়ে আসার প্রশ্ন নেই। তবে এখানে শুধু আমি কেন? জেনারেলভাবে আজ যদি জ্যোতিষীদের একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকত, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতো? তখন সকলে মিলে সার্বিকভাবে জিনিসটা করতেন।" বললেন মণিমালা।

"চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করায় অনেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন বলছিলেন।" একটু উস্কে দিতে চাইলাম।

"হ্যাঁ, চেম্বারে অনেকে এসেছেন-টেসেছেন। এসে বলেছেন-টলেছেন। তবে আমি এখনও এটাকে এত সিরিয়াসলি নিইনি। তার কারণটা একটা জিনিস তো ঠিক, এটা তো একটা গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার তো বটেই। যতটা সূচারুভাবে বা যতটা নিখুঁতভাবে উত্তরটা দিতে পারা যাবে জ্যোতিষীদের, মানে আমাদের তরফ থেকে, ততটাই তো আমরা লাভবান হবো। এ ব্যাপারটা নিয়েও আর একটু গবেষণা বা আরো চর্চার প্রয়োজন। সেই জন্যেই আমি একটু চুপ করে আছি।"

"চুপ কোথায়? একেবারে তো বোমা ফাটিয়ে দিয়েছেন দেখছি।" বললাম।

"ঠিক কথাই, তবে আপনারা শিগগিরিই এ-ব্যাপারে জানতে পারবেন।"

"কাগজে কি আপনার স্টেটমেন্ট কিছু বিকৃত করা হয়েছে?"

আমার কথা শুনে একজন "পাড়ার ছেলে" বললেন, "মানে একটুখানি —ওটা জাস্ট....
"একটা ব্যাপারে আমি হয়তো বিশ্বাস নাও করতে পারি। সেখানে আমি আপনার প্রফেশন নিয়ে আমি কেন ঘাঁটাঘাটি করব ?"

মণিমালা এবার আলোচনায় ছেদ টানতে চাইলেন, "আপনারা যেমনভাবে এলেন, আমার খুবই ভাল লাগল। আসলে এখানে ক-জন জ্যোতিষী রয়েছেন তো, তাঁরাও মানে, এখানে একসঙ্গে মিলে আলোচনা রয়েছে।"

বিদায় নিলাম আমরা।

৭ মে আমাদের সমিতির পক্ষে আমার চিঠি প্রকাশিত হতেই আবার একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন INDIA TODAY-র Principal correspondent উত্তম সেনগুপ্ত। উত্তমবাবুর কাছ থেকে এক নতুন খবর পেলাম। উনি মণিমালার সঙ্গে পত্রিকার তরফ থেকে দেখা করেছিলেন। মণিমালা এবং মণিমালা যে দোকানে বসেন, তাঁর মালিক নাকি উত্তমবাবুকে জানিয়েছেন প্রেস কনফারেন্সে প্রবীরবাবুর মুখোমুখি হওয়ার বা প্রবীরবাবুর পাঠান প্রশ্ন ও চারজনের ছবি গ্রহণ করার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। কারণ মণিমালার চিঠি বলে যে চিঠি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা নাকি মণিমালার চিঠিই নয়। উত্তরে উত্তমবাবু জানিয়েছিলেন, তবে আনন্দবাজারে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন না কেন, ওই চিঠির লেখিকা মণিমালা নন। তাঁর উত্তরে ওরা নাকি জানিয়েছেন, এই ধরনের চিঠি দেবেন কিনা, সেটা ভেবে দেখছেন। এবং ওঁরা নাকি আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করছেন।

মণিমালার সঙ্গে আমার কয়েকদিনের কথাবার্তার ক্যাসেট শুনিয়ে বললাম, "চ্যালেঞ্জ যে মণিমালাই গ্রহণ করেছিলেন এটা তো বুঝলেন ? এখন পরাজয় নিশ্চিত বুঝে চ্যালেঞ্জ এড়াবার রাস্তা খুঁজছেন। আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে জাল চিঠি ছাপার অভিযোগ এনে কেস করে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেবেন, এমন আহাম্মক ওরা কখনই হবে না। আবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মত বোকামো করতেও নারাজ।"

তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, আজ পর্যন্ত মণিমালার কোনও প্রতিবাদ-পত্র আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়নি। মণিমালা কোনও মামলাও আনেন নি আনন্দবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে। আর আমার রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠান চিঠি যে ফেরৎ এসেছিল, সে খবর তো আগেই জানিয়েছি।

হায়, মণিমালা। এত-বড় বড় কথা বলে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষে-বিশ্বাসীদের মনে আশার সঞ্চার করে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পথে বসিয়ে শকুন্তলাদেবীর মতই পলায়নই বাঁচার একমাত্র রাস্তা বলে ধরে নিলেন ? আপনি অন্যের ভাগ্য বিচার করেন, আর নিজের ভাগ্যটুকু বিচার করতে পারলেন না ? আপনি ভূত নামিয়ে, অংক কষে এতে কিছু জানতে পারেন , কিন্তু আর সব পরাজিত, বিধ্বস্ত, পলাতক জ্যোতিষীর মতই জানতে পারলেন না শুধু নিজের অপমানজনক পরিণতির কথা।

বেতার অনুষ্ঠানে পরাজিত জ্যোতিষসম্রাট ডঃ অসিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর লেখা বই 'জ্যোতিষ-বিজ্ঞান কথা'র ভূমিকাতে লিখেছেন, "সেদিন ফাঁদ রচনাকারীরা সুকৌশলে চাতুরীর

মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমার অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যর্থতা প্রচার করে যে বিদ্রুপের হাসি হেসেছিলেন, তারই জ্বালা প্রশমনের জন্য সে রাতেই ভাগ্য-দেবতা এগিয়ে দিল লেখনী", তিনিও আপনারই মত জ্যোতিষী হয়েও নিজ ভাগ্য বিপর্যয়ের আগাম খবরটাই জানতেন না ? এমন কী, চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক মাস ধরে অনেক আঁক কষেও পোশাক পরিচ্ছদের আড়ালে আসল মানুষগুলোর লুকিয়ে থাকা পরিচয় বের করতে পারলেন না ? প্রতারকদের ধরতে ফাঁদ পাতার রেওয়াজ তো আজকে নতুন নয়হে জ্যোতিষসম্রাট। সম্রাটকে উপদেশ দেওয়া আমার মত সাধারণের শোভা পায় না, তবু বলি, সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে কি আপনার কিল খেয়ে কিল হজম করা উচিত ছিল না ? সাধারণ মানুষেব রচিত একটি ফাঁদকে যিনি গুণেও ধবতে পারেন না, তাঁকে সাধারণ মানুষ যদি 'জ্যোতিষসম্রাট' না বলে 'জ্যোতিষ-চামচিকে' বলেন, তখন কী একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে ভাবুন তো ?

মণিমালা দেবী, আপনার সঙ্গে ডঃ অসিতকুমাব চক্রবর্তীর একটা দারুণ বকম মিল আছে। তিনিও চেয়ে আছেন ভবিষ্যতেব দিকে। যেদিন আরো জ্যোতিষচর্চা ও জ্যোতিষগবেষণার মধ্য দিয়ে এমন একজন মহাজ্যোতিষীর আবির্ভাব ঘটবে, যিনি আমাকে ধ্বংস কবে জ্যোতিষ-কণ্টক দূর করবেন, প্রতিষ্ঠা করবেন জ্যোতিষশাস্ত্রকে। অসিত চক্রবর্তী তো তাঁর লেখা ওই বইটিতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রসঙ্গ টেনে সেই প্রত্যাশার কথাই লিখে ফেললেন। ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখছেন "যখন প্রকাশক বইটি (অলৌকিক নয়, লৌকিক) প্রচারের জন্য "প্রকাশনার পর তিন মাস অতিক্রান্ত তবু চ্যালেঞ্জ জানাবার সৎ সাহস দেখাতে পারলেন না কেউ" বলে পত্রিকায বিজ্ঞাপন দেন, তখন আমাদের মনে এসে যায় বাতাবি আব ইল্বলেব কথা।"

'বাতাবি' ও 'ইল্বল' কে ? বঙ্গীয শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড থেকে তুলে দিচ্ছি— ইল্বল প্রহ্লাদের গোত্রজাত অসুরবিশেষ। ইল্বল কোন ব্রাহ্মণের নিকটে ইন্দ্রতুল্য একটি পুত্র প্রার্থনা কবে। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা পূর্ণ না করায, ইল্বল তদবধি ব্রহ্মঘাতক হয। মাযাকৃত মেষরূপী বাতাবির মাংস ব্রাহ্মণকে খাওযাইয়া ইল্বল পরক্ষনেই বাতাবির নাম ধরিযা ডাকিত ও বাতাবি উদর বিদীর্ণ কবিযা নির্গত হইত। এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ নিহত হইলে, মহর্ষি অগস্ত্য মেষরূপী বাতাবিকে উদরস্থ ও জীর্ণ করিযা ব্রহ্মকণ্টক দূর কবেন।

ভাল কথা। আপনাদের সাধ্যে তাহলে কুলোল না, অতএব আপনারা কোনও এক অগস্ত্য মুনির আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনুন, যেদিন তিনি এসে চ্যালেঞ্জরূপী বাতাপিকে হজম করে যুক্তিবাদীদের মাযা থেকে আপনাদের উদ্ধার করবেন। আচ্ছা, একটি কথা বলতে পারবেন গুণে, গেঁথে ওই অগস্ত্য, আগমন কবে ঘটবে, এবং ঘটবে আপনাদের উত্তরণ ? এখানেও আপনাদের গণনা, আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হবে। কারণ, আপনাদেব অগস্ত্য কোনও দিনই আসবেন না। যদিও বা আসেন, 'বাতাবি'র সিংয়ের গুঁতোয ফাঁসবে তাঁরও পেট। আপনারা অনেক ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিযেছেন। কিন্তু ভাগ্য না গুণেই যে ভবিষ্যদ্বাণী শোনালাম, সে একেবারেই অব্যর্থ। আপনাদের ভবিষ্যৎ বলে সত্যিই কিছু দেখছি না। এক 'বাতাবি,' 'ইল্বলকে' ঠেকানই আপনাদের কম্মো নয় ; এই বই যে হাজার হাজার 'বাতাবি', 'ইল্বল'-এর জন্ম দেবে ; তারা যে আপনাদের ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দেবে মশাই।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ মাহাতোকে নিয়ে আর এক কেলেংকারি। একই দিনে একই সঙ্গে নরেনবাবুর পাঠান দু'টি খাম পেলাম। দুটি চিঠিই উনি লিখেছেন ৮ মে '৯০ তারিখে। সঙ্গে 'বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস' পত্রিকায কিছু কপি, সেগুলোতে নরেনবাবুর ধারবাহিক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। লাল ও নীল উড পেন্সিলে প্রায় প্রতিটি লাইনে ছাপার ভুল সংশোধন করে পাঠিয়েছেন নরেনবাবু। চিঠি দুটিতে 'মজার ছত্রিশ ভাজা' পরিবেশিত হয়েছে। (সমস্ত মজাই পরের বই 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা'তে নিয়ে আসব।) শেষে এক জায়গায় জানিয়েছেন, তিনি নীতিগতভাবে জমানতের পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে রাজি নন। এবং তা সত্ত্বেও যেন ১৬ জুন ৯০এর প্রেস কনফারেন্সে আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই।

উত্তরে জানিয়েছিলাম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিনা ঝুঁকিতে ফালতু কিছু কামানোর ধান্ধায় অনেকেই আমার সময়ের প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে থাবা বসাতে চায়, তাদের সামাল দিতেই এই জামানতের ব্যবস্থা। জামানত রাখি না শুধু বিখ্যাতদের ক্ষেত্রে। তবে নতুন একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি পরাজিত হলে আপনার মাথার আধখানা কামিয়ে দেব। আর লিখিতভাবে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আর কোনও দিনই হস্তরেখাচর্চা, জ্যোতিষচর্চা করবেন না। এতে রাজি হলে ওই দিনের সম্মেলনে আপনার মুখোমুখি হবো।

আবারও নরেন্দ্রনাথ রণে ভঙ্গ দিলেন। সাহস করে আধমাথা চুলের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে রাজি হলেন না।

এই যুক্তিবাদী আন্দোলনের শ্রমিক হওয়ার সূত্রে এবং চ্যালেঞ্জ ঘোষণার কল্যাণে মজার মজার অনেক অভিজ্ঞতা এই ১৩৬০ গ্রাম ওজনের ছোট-খাট, মোটা-সোটা মগজটিতে জমা হয়ে রয়েছে। জমা থেকে খরচ করে আমি আসলে এক ঢিলে দুই পাখি মারব ঠিক করেছি। এক নম্বর পাখি ; অভিজ্ঞতা খরচে মাথা কিছুটা কৃশ হবে। দু'নম্বর পাখি ; আপনাদের কিছু মজার ঘটনা শোনানো। এতে প্রতারক বাবাজী মাতাজীদের প্রতারণার নানা ক্রিয়াকাণ্ড ও গোপন রহস্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পাশাপাশি কিছু মজাও পেতে পাবেন আপনারা। অবশ্য মজা দিতে পারব কিনা, সে বিষয়ে নিজেরই ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ লক্ষ্য করেছি, রসের ঘটনা আমার মস্তিষ্ক-কোষ থেকে কলমের ডগায় যখন এসে হাজির হয়, তখন সেগুলো বেমালুম নিরস হয়ে পড়ে। রসের লক্ষ্যভেদে আমি চিরকালই আনাড়ি। পরের বই 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা'তে পরাজিত, বিধ্বস্ত, পলাতক ও হামাগুড়ি দেওয়া জ্যোতিষীদের বহু কাহিনীই নিয়ে আসব, অনেক অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের চরম ব্যর্থতার কাহিনীর পাশাপাশি। কোন্ কোন্ জ্যোতিষীরা আসবেন ওই বইতে ? কারা কারা পরাজিত পলাতকের তালিকায় আছেন ? কতজনের নাম বলব বলুন তো ? তারচেয়ে বলা অনেক সোজা কারা নেই ? সে তালিকায় কেউই তো প্রায় নেই। সে সব জ্যোতিষীদের এই খণ্ডটিতে হাজির করলে কলেবরের সঙ্গে সঙ্গে বইটির কি ধরনের মূল্য বৃদ্ধি পাবে ভাবতে গিয়েই অন্য বইটিতে তাদের হাজির করার কথা ভেবেছি। যাঁরা এখনও পরাজিত হন নি, তাঁদের বিনীত অনুরোধ, চ্যালেঞ্জ আপনাদের প্রতিও দেওয়াই রয়েছে। যুক্তিবাদের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা থামাতে একবার চেষ্টা করেই দেখুন না।

এগার

কিভাবে বার-বার মেলান যায় জ্যোতিষ না পড়েই

এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের বাড়িতে গিয়েছি একদিন, সেদিন সেই সাহিত্যিকের বাড়ি এক বিশিষ্ট জ্যোতিষীর আগমন উপলক্ষে দেখলাম মোটামুটি কিছু বাড়তি মানুষের সমাগম হয়েছে। সাহিত্যিক আমার পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়। ব্যস্ত সাহিত্যিককে কোনও অস্বস্তির মধ্যে না ফেলে দরজার এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম জ্যোতিষীর হাত দেখা ও শুনছিলাম জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো। এক উত্তর-চল্লিশ স্থূলাঙ্গী মধ্যবিত্ত ঘরোয়া বধূকে নিয়ে এসেছিলেন এক তরুণ। জ্যোতিষীর কাছে তরুণ নিয়ে গেলেন বধূটিকে। জ্যোতিষী বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে অনেকেরই হাত দেখেই যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলার হাত দেখে দু-একটি কথা বলেই জ্যোতিষী সম্ভবত হাত দেখার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতেই এড়াতে চাইলেন। বললেন, "আজ অনেক দেখেছি। আর পারছি না, এরপর যেদিন আসব, সেদিন আপনার হাত দিয়েই আরম্ভ করব।" বধূর সঙ্গী তরুণটি বললেন, "আপনি যেদিন আসবেন, সেদিন তো ওঁর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। উনি থাকেন চক্রধরপুর। কালই চলে যাবেন।" কিন্তু এ-কথাতেও জ্যোতিষীর মন গলল না। মহিলাটি যখন আমার পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, "কিছু মনে না করলে এক মিনিট আপনার হাতটা একটু দেখাবেন?" ভদ্রমহিলা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বলতে শুরু করলাম, "আপনি যথেষ্ট পরিশ্রমী, সহজ সরল জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। আপনার অনেক বান্ধবী। বিপদ-আপদে বান্ধবীরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসেন বার বার। আপনার ভাগ্যে মাঝে মাঝেই যেভাবে একঝাঁক করে বান্ধবীরা বদলে যাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শহরে বেশ কিছু বছর করে বসবাস করেছেন। আপনার স্বামী চাকরি করেন। স্থায়ী চাকরি। একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তিনি। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চক্রাকারে ঘোরার একটা সম্পর্ক আছে?"

ভদ্রমহিলা মুখ খুললেন, "হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, উনি রেলে কাজ করেন।" বললাম, "আর যে যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো মিলেছে?" "হ্যাঁ, সব।" কথার সঙ্গে সামান্য

ঘাড় নেড়ে বললেন মহিলা। পাশের তরুণটিও খুবই চমক খেয়েছিলেন সম্ভবত। বললেন, "অদ্ভুত, আপনার এমন ক্ষমতা দেখার সুযোগ না পেলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না, স্ত্রীর হাত দেখে স্বামীর কর্মক্ষেত্র এত ডিটেল্‌সে বলা যায়।"

তারপর আরও অনেক কথাই মিলিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু শুরুতে আমি ভদ্রমহিলাকে প্রধান ধাক্কাটি যে কথা বলে দিয়েছিলাম, সেটা হল—আপনার স্বামীর চাকরির সঙ্গে চক্রাকারে ঘোবার একটা সম্পর্ক আছে। এটা বলতে পেরেছিলাম, ওঁর স্বামী রেলওয়েতে কাজ করেন, এটা অনুমান করে নেওয়ার সূত্রে। আব এই অনুমানটা করেছিলাম, ভদ্রমহিলা রেল-শহর চক্রধরপুরে থাকেন বলায়। বেলে কাজ করলে বদলির সম্ভাবনাই প্রবল। বদলি হলে বান্ধবীরা পাল্টে যাবেন। মহিলার পোশাক-আশাক দেখে মধ্যবিত্ত পরিবাবের বলে অনুমান করেছিলাম। মধ্যবিত্ত বেলকর্মীদের বেল-পাড়া কালচাবের মধ্যে পড়ে বাড়িব গিন্নিদের দুপুরের আড্ডা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। ওঁরা জমিয়ে আড্ডা দেন, পরনিন্দা করেন, ঝগড়া করেন, আবার একের বিপদে সকলেই বুক দিয়ে পড়েন। ওঁদের এই সমাজ-সাংস্কৃতিক পবিবেশেব খবর জানা থাকায় সেগুলোই সামান্য ঘুরিয়ে বলতেই বাজিমাৎ।

গিয়েছিলাম বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষে এক আধা শহবে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিবোনামে একটি অনুষ্ঠান কবতে। যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম, তিনি বেশ পয়সাওয়ালা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। অসুবিধে হচ্ছিল তাঁব আতিথেয়তার আতিশয্যে। গৃহকর্তা এক সময় আমাব সামনে হাজির করলেন এক দম্পতিকে। বললেন, "আপনি বলেন, যে যতবড় জ্যোতিষী, সে ততবড় বুজরুক। আপনি নাকি যে কোনও মানুষ দেখেই অনেক কিছু বলতে পাবেন, এবং জোতিষীদের চেয়েও ভাল বলতে পাবেন। বলুন তো এঁদেব দু'জনের সম্বন্ধে। এঁবা স্বামী-স্ত্রী, এ-কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।"

একটু দেখে নিয়েই শুরু করলাম, "দু'জনের মধ্যে পরিচয়, ভালবাসা, তারপর বিয়ে, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"দু-বাড়িতেই দেখছি, প্রবল আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও যদি বিয়ে কবলেনই তবে এখন কেন দু-জনে মানিয়ে নিতে পারছেন না? কেন এত অশান্তি? অতি সামান্য কারণ নিয়ে কেন যে এমন অসামান্য ঝগড়া-ঝাটি বাধিয়ে তুলছেন? এতকাল দু'জনেই তো ভালবাসার ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিলেন, সহানুভূতিশীল ছিলেন। আজ এমন অবস্থা কেন? আজকাল আপনাদের দু'জনেরই ধৈর্য থাকছে না?"

আর বিশেষ কিছু বলার আগেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই স্বীকার করলেন যা যা বলে গেছি সবই বর্ণে বর্ণে সত্যি। তারপব দু'জনে পালা কবে বলে যেতে লাগলেন একেব পর এক ঘটনা; এবং একে অন্যের প্রতি আনতে লাগলেন নানা অভিযোগ। সেসব জেনে নেওয়া ঘটনা ও অভিযোগের সূত্র ধবে একের পর এক অতীত ও ভবিষ্যৎ-এব কথা বলে মিলিয়ে দিয়ে চমক সৃষ্টি করা আর কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু প্রথম যে কথাগুলো বলে মেলানর শুরু এবং স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে আমার প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার শুরু, আমার প্রতি ওঁদের দুর্বল কবে তোলার শুরু, সে কথাগুলো কী কবে বললাম? এটাই নিশ্চয় আপনাদের চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে? খুব সোজা ব্যাপার। ওদেব দু'জনকে দেখে বুঝতে আমাব অসুবিধে হয়নি,

মহিলাটি তাঁর সুন্দর দেহ-সম্পদে বয়সের ছাপ আসতে না দিলেও যুবকটির তুলনায় ছ-আট বছরের বড়ই হবেন। আমাদের বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই অপ্রচলিত বয়স পার্থক্যের বিয়ে এবং তার থেকে দুই পরিবারের একেবারেই মেনে না নেওয়া ; আত্মীয়দের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, তার জন্য কিছুটা বিপন্ন বোধ করা, বন্ধুবান্ধবদের কাছে মাঝে-মধ্যে এই নিয়ে হাসির খোরাক হওয়া এবং পরিণতিতে দু'জনের মধ্যে একটা মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এইটুকু বুঝতে পারার ওপরই নির্ভর করে আমার অনুমানগুলো বেরিয়ে আসছিল এবং মিলেও গিয়েছিল।

'খড়দহ উৎসব '৯০ উপলক্ষে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে দর্শক ও শ্রোতারা যে-সব অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছেন বা দেখেছেন, সেগুলোর উল্লেখ করছিলেন, আর আমাদের সমিতির সদস্যরা সে-সবই হাতে-কলমে করে দেখাচ্ছিলেন ; তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কেমনভাবে ঘটালেন সে-সব। একটা সময় এক যুবক বললেন, "এক জ্যোতিষীকে দেখেছিলাম, তিনি আবার তান্ত্রিকও ; আমাকে দেখে অনেক কিছুই মিলেয়ে দিয়েছিলেন। আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডে আপনি কামদেবপুরের পীর ও আগরতলার ফুলবাবার কথা লিখেছেন। জানিয়েছেন, ওঁরা প্রচুর ইনফরমার ছড়িয়ে রাখেন কৃপাপ্রার্থী, দোকানদার, রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে। আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি একদমই ওদের মত নন। অথচ আমার অনেক কথাই উনি বলে দিয়েছিলেন। এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল ?"

ওই যুবকটির কথা শুনে জানাই, "বেশ তো, এমনই একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন আমাদের সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকেই কেউ একজন। আমরা আপনাদের মধ্য থেকেই কোনও একজনকে মঞ্চে তুলে তাঁর অতীতের ঘটনা একটাব পর একটা বলে মিলিয়ে দেব।"

হাত তুললেন অনেকেই। সকলেই মঞ্চে উঠতে চান। সময়াভাবে ওঁরাই নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করে মঞ্চে পাঠিয়ে দেন। তাঁব অতীতের অনেক কিছুই একের পর এক মেলাতে থাকেন আমাদের সমিতির এক তরুণ সদস্য দেবু।

এই ঘটনার সূত্র ধরেই এর ঠিক দু-দিন পরেই ঘটল একটি ঘটনা। সকালে যখন তোড়জোড় করছি কাজে বেব হবো বলে, তখনই এসে হাজির হলো এক ভদ্রলোক। সীমা (আমার স্ত্রী) তাঁকে সমিতির অফিসে দেখা করতে বলা সত্ত্বেও তিনি নাছোড়বান্দা, আমাব সঙ্গে অন্তত দু-মিনিট কথা না বলে যাবেন না। অগত্যা ভদ্রলোকের মুখোমুখি হতেই হলো। উত্তর পঞ্চাশ, স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট, প্যান্ট ও একটি পোর্টস কোট পবেছেন ; পায়ে পাওযাব জুতো। এর সঙ্গে গলায় পাতলা মাফলারটা তেমন মানাচ্ছিল না। ভদ্রলোক সরাসরি নিজেব কথায় এলনে। "আপনার কাছে দু-মিনিট সময় চেয়েছি, দু-মিনিট সময়ই নেব। আপনি আমার সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলুন তো। আমার অতীত নিয়েই বুলন।"

আমাব হাতেও সময নেই। বলতে শুরু করলাম। "আপনি স্পষ্টবক্তা, দৃঢ়চেতা। অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী। অন্যের ওপর আপনি যথেষ্ট ছড়ি ঘোরাতে পাবেন। স্পষ্টবাদীতার জন্য যেমন অনেকের অপ্রিয় হবেন, আবাব আপনার জ্ঞানতৃষ্ণাব জন্য অনেকেব শ্রদ্ধাভাজন হবেন। সংসাবের জন্য আপনি যতটা করবেন, কর্মক্ষেত্রের জন্য আপনি যতটা করবেন, তার প্রকৃত মূল্যায়ন সংসার বা কর্মক্ষেত্রে কেউই করতে পারবে না। আপনি

জ্যোতিষে অবিশ্বাসী নন, আবার অন্ধ-বিশ্বাসীও নন। আপনার একটা ক্রনিক অসুখ আছে, অসুখটি হলো হাঁপানি। আপনি অধ্যাবসায়ী। জীবনে যত বিপদেই পড়েছেন, শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেয়েছেন। অর্থভাগ্যও ভাল। এই হিসেবে ভাল বলতে চাইছি—জীবনে কখনও কর্থকষ্টে শেষ হয়ে যাবেন না। যেখান থেকেই হোক, শেষ পর্যন্ত আপনার অর্থের যোগান ঠিকই এসে যাবে। আপনার বন্ধুত্ব আপনার চেয়ে কম বয়েসীদের সঙ্গে। সমবয়স্ক বা বেশি বয়স্কদের সঙ্গে তেমন মনের মিল হয় না। তেমন মানিয়ে নিতে পারেন না। সম্প্রতি এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে যথেষ্ট দ্বিধায় পড়েছেন। আসলে আপনি পুরোপুরিই ঠকে গেছেন।"

আর কিছু বলার আগেই আমার হাত দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সত্যিই আপনি অসাধারণ। এসব কি করে বললেন বলুন তো? আপনার প্রতিটি কথা কমা সেমিকোলন সহ একেবারে ঠিক। সত্যিই, সবই মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই বলে গেলেন?" ভদ্রলোকের দু'চোখ ভার অপার বিস্ময়।

আমি যেভাবে আমার অনুমানগুলোতে পৌঁচেছিলাম, সেগুলোতেই সরাসরি আসছি। যিনি প্রথম সাক্ষাতে সামান্যতম ভনিতা না করে আমার পরীক্ষা নিয়ে দেখতে চান, পরশুর ঘটনাটা সাজান ছিল কিনা ; জ্যোতিষীদের মিলিয়ে দেওয়া ঘটনাগুলোকে গুরুত্বহীন করতেই আমি 'মানুষ দেখে অনেক কিছুই মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব' বলে গপ্পো ফেঁদেছি কিনা ; লোক দেখে কতটা পর্যন্ত মেলানর ক্ষমতা আছে ; তিনি যে স্পষ্টবক্তা, দৃঢ়চেতা ও জিজ্ঞাসু মনের মানুষ, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় কী? যিনি স্পষ্টভাষী ও যাঁর মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল তাঁর কিছু গুণগ্রাহী থাকবে, তাঁকে কিছু মানুষ শ্রদ্ধা করবে এটাই স্বাভাবিক।

"সংসারের জন্য কর্মক্ষেত্রের জন্য যতই করুন এর জন্য যতটা সম্মান আপনার প্রাপ্য ততটা পাবেন না"—এই কথাটা শুনতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন। প্রায় সকলেই মনে করেন, তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মানের কিছু কম পাচ্ছেন, তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, ইত্যাদি।

যিনি পরীক্ষা নিয়ে দেখতে চান আমার জ্যোতিষ-বিরোধীতার পিছনে যুক্তি কতটা, তিনি যে জ্যোতিষ বিষয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছেন, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢোকার পর ভদ্রলোকের শ্বাস নেওয়ার জোরাল শব্দ ও গলায় মাফলার দেখে হাঁপানির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলাম।

যাঁরা জীবিত তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই যদি বলেন, "যতই বিপদে আপনি পড়েছেন, শেষ পর্যন্ত সবই অতিক্রম করেছেন।" দেখবেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। জীবিত থাকাটাই সমস্ত বিপদকে অতিক্রম করারই সমার্থক। এর পর কেউ যদি বলেন, "আমার স্ত্রী'কে তো হারিয়েছি, সন্তানকে শত চেষ্টাতেও বাঁচাতে পারিনি"—তখন আপনার পুঁজিতে উত্তর থেকেই যায়—মৃত্যুকে কে আজ পর্যন্ত এড়াতে পেরেছে? জন্মালে মরতে হবে, এ তো অনিবার্য। মৃত্যুর সঙ্গে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

"জীবনে কখনও অর্থকষ্টে শেষ হয়ে যাবেন না।" কথাটা বেঁচে থাকা প্রায় গরীব মানুষটিকে পর্যন্ত বলে দেখবেন—তিনিও মনে মনে বিচার করে আপনাকে বলবেন, "ঠিকই বলেছেন।"

ভদ্রলোকের পোশাক-আশাকই আমাকে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিয়েছিল—তরুণদেরই উনি

বেশি পছন্দ করেন।

একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ যখন অনুষ্ঠানের একদিন পরেই সাত-সকালে আমার কাছে দৌড়ে আসেন পরীক্ষা করতে, তখন তিনি যে জ্যোতিষ বিষয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ইচ্ছুক, এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কেন এই তড়িঘড়ি? ভদ্রলোক সম্ভবত চাকুরে, (ব্যবসা করলে ব্যবসার স্বার্থেই স্পষ্টবক্তা ও কট্টর হওয়ার চেয়ে আপস করে চলার দিকে ঝোঁক থাকত বেশি) কাজে না গিয়েই দৌড়ে এসেছেন আমার কাছে, কেন? দ্বিধা? দ্বন্দ্ব? কিসের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব পরশুর অনুষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারে? কোনও জ্যোতিষীর মিলিয়ে দেওয়া ঘটনাকে সত্যি বলে ধরে নেওয়ার পর পরশুর অনুষ্ঠান তাঁর বিশ্বাসকে প্রচণ্ড রকম আঘাত করেছে—এমনটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। আর, জ্যোতিষীর ধাপ্পাবাজীতে বিশ্বাস করা মানেই পুরোপুরি ঠকে যাওয়া। আর একটা কথা বলি, সেদিনই ভদ্রলোক জানিয়ে ছিলেন, চাকরি করেন।

এমনি অভিজ্ঞতার কথা কত শোনাব? এর যেন শেষ নেই। প্রতিদিনই প্রায় এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছিই। নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে সম্মোহনের সাহায্যে রোগমুক্তি ঘটাতে আমার কাছে আসেন, তাঁদের সমস্যার মূলটুকু ধরার জন্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনিভাবেই এগোই। কারও প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা পোষণ না করেই বলছি—যে কোনও কারণে রোগীর মূল সমস্যাটা অনেক সময় বিখ্যাত চিকিৎসকরা ধরতে না পারার জন্যে, (অক্ষমতা বা নিশ্চেষ্ট মানসিকতার কারণে) যেখানে মানসিক রোগী রোগভোগ করেছেন, সেখানে মূল কারণ খুঁজে পাওয়ার কারণেই কিন্তু তাঁদের ব্যর্থ হওয়া কেসেও বহু সাফল্য পেয়েছি। (সে-সব উদাহরণ নিয়ে ভবিষ্যতে 'সম্মোহন ও রোগমুক্তি' নামে একটি বই লেখার আন্তরিক ইচ্ছে রয়েছে।)

একজন মানুষকে দেখে তার অতীত ও বর্তমানের হদিশ পাওয়া গেলে ভবিষ্যতের হদিশ পাওয়াও অনেক সময়ই কঠিক হয় না। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে হাজির করছি। এক তরুণ যুক্তিবাদী-আন্দোলনকর্মীকে মনের মত করে গড়ে নিচ্ছিলাম পরম মমতায়। একটু একটু করে ছেলেটি হয়ে উঠল বলিয়ে-কইয়ে, চৌখস। এক সময় ছেলেটি W.B C S. দিল। পাশ করল। অফিসার হয়ে ঢুকল এমন একটি অফিসে, যে অফিসের দেওয়ালগুলোও নাকি ঘুষ খায়। যুক্তিবাদী-আন্দোলনের অমন সোনামানিক গরীব ঘরের ছেলের পকেটে যখন 555 আর ক্ল্যাসিক সিগারেটের প্যাকেট শোভা পেতে লাগল, তখনই শঙ্কিত হলাম। বুঝলাম, ঘুষ ওকে যেভাবে খেতে শুরু করেছে, তাতে ব্যক্তিস্বার্থে ও আন্দোলনকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য। যার সততা নেই, সে কোনও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলে, সেই আন্দোলন যে কোনও মুহূর্তে লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে। ওর তরফ থেকে ভবিষ্যতে আসা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম সহযোদ্ধাদের। কেউ কেউ, যাঁরা 'পার্টির' দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট গ্রহণ করাটা নিতান্তই সৌজন্যমূলক বলে বিষয়টাকে লঘু করে দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সেই অনুমানকে মিথ্যে প্রমাণ করে একদিন অমন হিরে-মানিক সেজে থাকা ছেলেটিই নখদন্ত বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটি রাজনৈতিক দলের হাতে সমিতিকে তুলে দিয়ে পুরস্কৃত হতে। সামান্য '555' সিগারেটের প্যাকেট দেখে ভবিষ্যৎ চিত্রটা আমরা কিছু অভিজ্ঞরা অনুমান করতে পেরেছিলাম বলেই ওর চরম বিশ্বাসঘাতকতা সেদিন ব্যর্থ

হয়েছিল। পাখা ছেঁটে দেওয়া মৈনাক পর্বত সমুদ্রে ডুব মেরেছিল, সেই পৌরাণীক কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাখা-ছাঁটা আর এক মৈনাক কিছুদিন ডুব মেরে থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা করল আমার সঙ্গে। অতি বিনয় ও অনুশোচনা প্রকাশ করে জানাল, এমনভাবে ওকে বিতাড়িত করলে অফিসে ও পরিচিত মহলে নাকি মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। স্রেফ ব্যক্তিস্বার্থে আমাদের সমিতিতে থেকে যাওয়ার জন্যে বলে গেল কোন্ রাজনৈতিক দলের অফিসে বসে যুক্তিবাদী সমিতিকে রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল , সেই ষড়যন্ত্রে আমাদের সমিতির কোন্ কোন্ সদস্য যুক্ত ছিল। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থে আর এক দফা বিশ্বাসঘাতকতা ?

আপনি যখন একজন মানুষের চরিত্র বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তখন চরিত্রটি যদি গড়-মধ্যবিত্ত ধরনের হয়, তবে এভাবে শুরু করতে পারেন—"আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা সহজাত, আপনি পরিবারের জন্য যতই করুন, পরিবারের কাছ থেকে বিনিময়ে ততটা অভিনন্দন বা কৃতজ্ঞতা পাবেন না। কর্মক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু প্রাপ্য মর্যাদা লাভে বঞ্চিত। (মজাটা হলো, প্রায় সকলেই নিজের সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে।) শরীর মাঝে-মধ্যে একটু গোলমাল করে। পেট ও অম্বল নিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দিতে পারে। জীবনে অনেক সময় সামান্যর জন্য অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। (একটা চাকরি জোটান বা একটা ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দু'চোখে নিয়ে মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীরা রাজনৈতিক নেতা, প্রতিষ্ঠিত পরিচিত ব্যক্তি, আত্মীয় এবং ব্যাঙ্কের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ান। অনেক সময়ই যাদের দোরে ঘোরা, তারা মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে যেতেই থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত কাজটা না হওয়ার পেছনে বা ব্যাঙ্ক ঋণ না পাওয়ার পেছনে এমন একটি কারণ দর্শায় যা দেখে বঞ্চিত মানুষটি অনেক ক্ষেত্রেই ধারণা পোষণ করে, একটুর জন্য সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। যেখানে চাহিদার তুলনায় যোগান কম সেখানে বঞ্চনা থাকবেই। বোঝার ভুলে অনেকে বঞ্চনাকে মনে করেন সুযোগ পিছলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত।) আপনি অর্থ সমস্যা সহ বহু সমস্যাতেই পড়বেন, এবং শেষ পর্যন্ত উদ্ধারও পাবেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে শুভার্থী যেমন আছেন, তেমনই ঈর্ষাপরায়ণও আছেন। প্রত্যাশা রাখেন নি, এমন মানুষের কাছ থেকেও সাহায্য পাবেন।"

যাঁর সম্বন্ধে বলছেন তিনি মহিলা এবং সুশ্রী হলে নিশ্চিন্তে বলতে পারেন—"আপনার কাছে অনেকেই প্রেম নিবেদন করেছেন।" কৈশোর অতিক্রান্ত সুন্দরী হলে বলে দিন, "জীবনে একাধিক পুরুষ এসেছেন" (বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার কথা ঠিক হবার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ ভাগ)। তবে এই কথাগুলোই যদি একটু নরমভাবে বলেন, "আপনার গুণমুগ্ধ পুরুষের সংখ্যা কম নয়।" অথবা, "পুরুষেরা আপনার প্রতি আকর্ষিত হন," বা "ইচ্ছে করলেই আপনি যে কোনও পুরুষের মন জয় করতে পারেন" দেখবেন যাঁর সম্বন্ধে কথাগুলো বললেন, তিনি স্বয়ং গদগদভাবেই স্বীকার করবেন, "আপনি ঠিক বলেছেন।"

পুরুষদের দেখেও প্রেম বিষয়ে এভাবেই অনেক কিছুই বলে দেওয়া সম্ভব। সুদর্শন, স্মার্ট, বাকচতুর, ড্যাশি বা আওয়ারা লোফার মার্কা ছেলেদের সম্বন্ধে জীবনে একাধিক মহিলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে-ভাবেই কথাগুলো বলুন, মিলে যাবে।

যাঁকে দেখে আপনি রাগী বলে অনুমান করছেন, তাকে বলুন, "আপনি রেগে গেলে

সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন, কিন্তু রেগে গেলেও আপনার বুদ্ধিভ্রম হয় না।" দেখবেন যাঁর সম্বন্ধে বলা, তিনি খুশি। আসলে, সাধারণভাবে তোমামোদে সকলেই খুশি, নিজের সম্বন্ধে ভাল-ভাল কথা শুনলে সকলেই খুশি। আর এভাবে খুশির জোয়ার আনতে পারলে না-মেলা কথাগুলো ওঁরা মনে রাখতেই চাইবেন না ; মনে রাখবেন না। ফলে আপনি ওঁর চোখে এবং ওঁর প্রচারে অন্যের চোখেও হয়ে উঠবেন দারুণ ভবিষ্যদ্বক্তা।

আপনি বলুন, "আপনি সাধারণভাবে সহজ-সরল পথে চলতে চান বটে, কিন্তু প্রয়োজনে বাঁকা পথও ধরতে পারেন।" অনেকের ক্ষেত্রেই এই কথা মিলে যেতে বাধ্য।

চাকরি বা বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলুন না কেন, "আজ উষা লগ্ন থেকে এ বিষয়ে আপনার সময় শুভ হতে শুরু করেছে। অনেক বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় হতে হতে না হওয়া সত্ত্বেও আশা করছি আগামী চার বছর পাঁচ মাসের মধ্যে আপনি সফলতা পাবেন। সফলতা আজও আসতে পারে, এক বছর পরেও আসতে পারে, কিন্তু এই চার বছর পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার আয়ের পথ-নির্দেশ সুস্পষ্ট (মনে রাখবেন, কথাটা বলবেন "আয়" ; আয় তো বেঁচে থাকার জন্য করতেই হবে, তা সে ব্যবসা করেই হোক, কি চুরি করেই হোক)। বিয়ের সম্ভাবনার কথাও বলে দিয়ে তো বসে থাকুন। মিললে দারুণ নাম (মিলতেই পারে)। না মিললে বয়েই গেল। যাদের মেলে প্রচার তো তারাই করে। অতএব 'মা ভৈ'।

যার সম্বন্ধে বলছেন, তিনি যদি ধনী হন, বলতে থাকুন, "মানুষ বোঝার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ, আপনার দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস অসাধারণ। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মানুষের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতে পারেন, আবার প্রয়োজনে কড়া হতেও জানেন (কড়া কথা যাঁরা আদপেই বলেন না, তাঁদের ক্ষেত্রেও কথাটা অর্থবহ হবে)। মানুষের সঙ্গে মেশার সহজাত ক্ষমতা আছে। ক্রোধ আছে, ক্রোধ সংবরণও করতে জানেন। (জাতক যদি বলেন, "আমি কখনই রাগি না মশাই", বলতে পারবেন, "আপনি তো মেরুদণ্ডহীন নন, সুতরাং রাগ যেখানে হওয়াটা স্বাভাবিক, সেখানে রাগ হলেও তা সংযত করে রাখেন বলেই রাগের বহিঃপ্রকাশ নেই।) দৈব্যকে মানেন, আবার পুরুষকার আছে। তাও বিশ্বাস করেন। জীবনে একাধিক নারী/পুরুষ এসেছেন। আপনি বাস্তববাদী, প্রেমের চেয়ে 'অ্যাডজাস্টমেন্টে' বেশি বিশ্বাসী। বিবাহিত জীবনেও নারী/পুরুষ সংস্পর্শে আসবেন। আপনি উদার-মনা। অনেক সংস্কারের ঊর্ধ্বে। আবার অনেক সংস্কারকে মেনেও চলেন। গোপন প্রণয় আপনার অজ্ঞাতসারে মাঝে-মধ্যে সামান্য অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সন্তানের ভাগ্যবৃদ্ধির লক্ষণ আছে।

"বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও শেষ পর্যন্ত প্রায় ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে না। (সফল ধনী, তা সে ব্যবসায়ী, কী রাজনীতিক যাই হোন না কেন, তাঁদের সঙ্গে নতুন নতুন মানুষের পরিচয় ঘটতেই থাকে, এবং এক এক ধাপ উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরোন বন্ধু বিদায় নেন।) অনেক বন্ধুর কাছে যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই অনেক বন্ধুর ঈর্ষার ও বিরোধীতার মুখোমুখি হবেন।

"আপনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সতর্ক, সুযোগসন্ধানী, প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে জানেন। ('সতর্ক' এবং 'ঝুঁকি নিতে পারেন', দুই বিপরীত কথাই বলা হলো। এর মধ্যে সকলে পড়বেন।)

আপনি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ, আপনাব মধ্যে রয়েছে অনেক উচ্চাশা, অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা (উচ্চাশাব কথা মধ্যবিত্ত তরুণদের সম্বন্ধেও অবশ্য একইভাবে প্রয়োগ করতে পাবেন)। আপনি প্রযোজনে তথ্য গুপ্ত রাখতে জানেন।"

শিল্পী, লেখক, বুদ্ধিজীবিদের ক্ষেত্রে বলুন, "আপনি সৃজনশীল, উন্নত হৃদযবৃত্তির মানুষ। নব উদ্ভাবনে সচেষ্ট। কোনও কোনও বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। আপনি একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। আপনাব জ্ঞানতৃষ্ণা প্রচণ্ড, আপনি যুক্তিপ্রিয।

"ভালবাসাব ক্ষেত্রে প্রেম বুদ্ধিদীপ্ত ও সতর্ক। আযবৃদ্ধির লক্ষণ আছে। অর্থাভাব হবে না। বহু ভ্রমণ যোগ আছে। বহুর মধ্যে থেকেও মাঝে-মাঝে একাকিত্বে পীড়িত হবেন। শত্রু থাকবে। বন্ধুদেব মধ্যে থেকেও শত্রুতা আসবে। সম্মান অবশ্যই পাবেন ; তবে ঠিক যতটা পাওযা উচিত ছিল, ততটা পাবেন না। (প্রাপ্য সম্মান পান নি, এঁরা এমনটা ভেবেই থাকেন।) প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনও এগিযে নিযে যাবে, কখনও কিছুটা থমকে থাকবে। নৈসর্গিক শোভা, সংগীত আপনাব ভাল লাগবে।

"গার্হস্থ্যজীবনে শান্তি ও অশান্তি থাকবে মিলেমিশে ; যদিও শান্তিই আপনি সর্বদা কামনা কবেন। আপনি চিরকালই মনের গভীরে একজন ভালবাসার মানুষের সন্ধানে থাকবেন।

"আপনাব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। আপনি সংস্কৃতিবান ও দযালু, মানব-চরিত্রজ্ঞ। নতুনকে গ্রহণ করতে জানেন, কিন্তু যা নতুন তাই বিনা বিচারে গ্রহণ করতে রাজি নন।"

মানুষের নানা শ্রেণীবিন্যাসের ওপব নির্ভর কবে এমনি কত কিছুই যে ঠিক-ঠাক বলে দেওযা যায, সে-নিযেই একটা বৃহদাকাবের বই লিখে ফেলা যায। জ্যোতিষীরা মনুষ্যচরিত্র বুঝে মোটামুটি বহু আভাসই সার্থকভাবে দিতে পারেন বলেই, এখনও মানুষ প্রতারিত হযেই চলেছেন এবং জ্যোতিষবিশ্বাসও সাধারণের মধ্যে রযেছে অটুট। জ্যোতিষশাস্ত্রের নাম করে জ্যোতিষীদের লোক ঠকানই ব্যবসা ; তাই মনুষ্য চবিত্র বুঝতে তাঁরা যতখানি পরিশ্রমী সাধারণ মানুষ ততটা নন। সাধারণ মানুষও মানুষের চরিত্র বোঝার ব্যাপাবে পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ হলে জ্যোতিষশাস্ত্র না পড়েই জ্যোতিষীদের চেযেও ভাল ভবিষ্যদ্বক্তা হযে উঠতেই পারেন।

জ্যোতিষীবা জানেন জোতিষশাস্ত্রের দৌড় কতদূর। তাই তাঁরা বর্তমানে এক নতুন কথার আমদানী করেছেন, এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলোর সাহায্যে সে-কথা প্রচারও করছেন—"জাতকের কবে কখন সুদিন-দুর্দিন আসবে, ঠিক কি ডিগ্রী পাবে ; প্রেমেব পরিণতি ঠিক কেমন হবে, যশ ঠিক কতটা আসবে, ঠিক কবে চাকরি জুটবে, কবে কোন্ পদে প্রমশন মিলবে, জ্যোতিষ সেই সঠিক পবিমাপ বা দিনক্ষণ বাতলাতে পারে না। সময বা পরিমাপ বা সম্ভাবনার একটা মোটামুটি আভাস দিতে পারেন মাত্র।"

কেন পারেন না? তার যুক্তিও ওঁবা হাজির কবেছেন বহুভাবে ; (১) ভাগ্য + প্রচেষ্টা = ফল, (২) ভাগ্য + পূর্বজন্মের কর্মফল = ফল ; (৩) ভাগ্য + প্রচেষ্টা + পূর্বজন্মের কর্মফল = ফল ; (৪) ভাগ্য + গ্রহরত্ন বা ধাতু ইত্যাদিব ফল = ফল , (৫) ভাগ্য + গ্রহরত্ন ইত্যাদি + গ্রহস্তব = ফল ; (৬) ভাগ্য + গ্রহরত্ন ইত্যাদি + প্রচেষ্টা = ফল ; (৭) ভাগ্য + প্রচেষ্টা + পূর্বজন্মেব কর্মফল + গ্রহরত্ন ইত্যাদি = ফল ; (৮) ভাগ্য + প্রচেষ্টা + ঈশ্বরকৃপা = ফল ; (৯) ভাগ্য + ঈশ্বব কৃপা + গ্রহরত্ন ইত্যাদি = ফল ; (১০) ভাগ্য + পূর্বজন্মের কর্মফল + ঈশ্ববকৃপা = ফল ; (১১) ভাগ্য + প্রচেষ্টা + ঈশ্বর কৃপা + গ্রহবত্ন ইত্যাদি = ফল ; (১২)

ভাগ্য + পূর্বজন্মের কর্মফল + প্রচেষ্টা + ঈশ্বরকৃপা + গ্রহরত্ন ইত্যাদি = ফল ....

এমনি আরো বহু যুক্তি (?) টেনে যাওয়াই যায় এবং জ্যোতিষীরা তা টানতেও শুরু করেছেন। কারণ তাঁরা যুক্তিবাদীদের কাছে আক্রান্ত হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জাতকের জীবনের নানা সম্ভাবনার কথা বলার মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। কিন্তু তাঁদের এইসব অকিঞ্চিৎকর যুক্তি আদৌ ধোপে টেকে কী? আমাদের এই জীবনে আমরা যে ফল ভোগ করছি, তার জন্য কতটা ভাগ্য দায়ী? কতটাই বা কর্মফল? ঠিক কতটা ঈশ্বরকৃপা বা কোপ আমাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে? ঠিক কতটা করে গ্রহরত্ন? কতটুকু ভূমিকা আছে প্রচেষ্টার? কতটুকুই বা গ্রহস্তবের? আমাদের ভাগ্যের ক্ষেত্রে যদি এমন বহুবিধ বিষয়ের সুনির্দিষ্ট প্রভাব বাস্তবিকই থেকে থাকে, তবে তার প্রভাবগত শক্তির পরিমাপ বিষয়ে মীমাংসারও একান্তই প্রয়োজন। এই মীমাংসা ভিন্ন ভাগ্য গণনা যে ভুলে ভুলে ছয়লাপ হয়ে যাবে। এমন মীমাংসার আগে সঠিক ভাগ্যগণনার দাবি করা যে অতিমাত্রায় অসংগত এবং এমন দাবি করা যে নিছকই প্রতারণা, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই জ্যোতিষচর্চাকারীরা একমত হবেন। জ্যোতিষ-পেশার মানুষগুলোর অবশ্য একমত না হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, এই প্রতারণার উপর নির্ভর করেই চলে তাঁদের সংসারের প্রতিপালন, তাঁদের ঠাঁট-বাট, তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি। এইসব জ্যোতিষীরা তাঁদের এই প্রতারণার পাশাপাশি মানুষকে যেভাবে অদৃষ্টবাদী করে চলেছেন, তাতে শাসক ও শোষককুলের স্বার্থই রক্ষিত হচ্ছে। আর তাই, নিজেদের শোষণের যন্ত্রকে তৈলমসৃণ রাখার স্বার্থেই অদৃষ্টবাদীচিন্তার ধারক ও বাহক এই জ্যোতিষশাস্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে শাসক ও শোষকশ্রেণী নানাভাবেই চেষ্টা ও পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁরা জানেন অদৃষ্টবাদীচিন্তার আগ্রাসী ক্ষমতা পৃথিবীর সেরা সেনাবাহিনীর চেয়েও বহুগুণ শক্তিশালী। আর আমরা জানি—শেষ কথা বলে শাসক বা শোষক নয়; জনগণ।

বারো

জ্যোতিষী ও অলৌকিকক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থায় সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—'চ্যালেঞ্জ'। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতরদের কাছে চ্যালেঞ্জ 'অশোভন' মনে হতেই পারে, কেন না, 'চ্যালেঞ্জ' বাস্তবসত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাই—অলৌকিকত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকায়, ধর্মগ্রন্থে, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে। তাই ঘোষণা করছি—

আমি প্রবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঘোষণা করছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে সমর্থ হন, তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি কৌশল ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যেই ঘটিয়ে দেখাতে হবে—

১। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।

২। যোগবলে শূন্যে ভাসা।

৩। একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজির হওয়া।

৪। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জেনে দেওয়া।

৫। জলের ওপর হাঁটা।

৬। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করা, যার ছবি তোলা যায়।

৭। বিদেহী আত্মা এনে তার সাহায্যে পকেট-বন্দী বা খাম-বন্দী নোটের নম্বর বলা।

৮। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৯। একটা নোট দেখাবো, সেই নোটের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।

১০। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চলন্ত গাড়ি থামাতে হবে।

১১। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

১২। জলকে পেট্রলে বা ডিজেলে পরিণত করতে হবে।

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপা দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হবে।

১৪। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জে গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে—

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলার জন্য এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী ছাড়া কারও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৪। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তির সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৫। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে অথবা দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারী তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ কবতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। একই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ-বিরোধী প্রচার অভিযান ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আপনাবা নিশ্চযই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলো নিযে বিভিন্ন অবতারদের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত বযেছে বা কিংবদন্তিব রূপ পেযেছে।

একই সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি বিনীত অনুবোধ, জ্যোতিষী ও অলৌকিক ক্ষমতার নামধারী প্রতারকদেব প্রতারণা বন্ধে সচেষ্ট হোন। আপনাদের সব রকম সহযোগিতা করার জন্য আমাদের সমিতি এবং আমি সব সময়ই থাকব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই ধরনের প্রতাবণা বন্ধ কোনও একটি বা গুটিকযেক সংগঠন বা ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। এ-কাজ প্রতিটি সমাজ-সচেতন মানুষের কাজ। আপনাদেব সক্রিয় সহযোগিতা ও সক্রিয় প্রতিবোধই পারে গোটা সমাজকে আন্দোলিত কবতে। মানুষ বঞ্চিত হতে হতে আজ বারুদের হযে রযেছে। আপনাদের সোচ্চার আন্দোলনই পাবে সেই বারুদেব স্তূপে আগুন লাগাতে, যে আগুনে বুজবুক ও তার পৃষ্ঠপোষকরা জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হযে যাবে।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

৩য় খণ্ড

২য় পর্ব

নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর আসল রহস্য

পিনাকী ঘোষ

কিছু কথা

নস্ট্রাডামুস প্রসঙ্গে

নস্ট্রাডামুস নিয়ে দুনিয়া জুড়ে একটা হৈ-হুলুস্থুলু চলছে। ডিসেম্বর ৯১তে ন্যুইয়র্ক থেকে কলকাতা উড়ে এসেছিলেন ওদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ রণজিৎকুমার দত্ত ও শ্রীমতী ডঃ দত্ত। জানালেন ন্যুইয়র্কের অনেক তা-বড় বিজ্ঞানীরা নস্ট্রাডামুসের প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ার খবরে নাকি দস্তুর মতো জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন।

নস্ট্রাডামুস কে? না সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী এবং সবচেয়ে বেশি প্রচার পাওয়া জোতিষী। পৃথিবীর বহু দেশে কয়েকশো ভাষায় লেখা হয়েছে নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কয়েকশো বই। বিক্রিতে দস্তুর মত বাইবেলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। যুক্তিবাদীরা যদি জোতিষীদের এখন জিজ্ঞেস করেন, "জ্যোতিষশাস্ত্র যে বিজ্ঞান, তার প্রমাণ কী?" জোতিষীরা একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে, একটিও ঢোক না গিলে বলবেন, "নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী।"

নস্ট্রাডামুস এখন আর কিংবদন্তী নন, এখন কিংবদন্তী পুরুষদের মধ্যে মেগাস্টার, নস্ট্রাডামুস নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক ভিডিও ক্যাসেট, কোটি কোটি ডলার খরচ করে। ঝড়ের গতিতে বিক্রি হচ্ছে সে সব। আমার পুরোন স্কুলের মাস্টার মশাই থেকে বড় পত্রিকার বড় সাংবাদিক, অনেকে আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন, নস্ট্রাডামুসের এই যে এত এত ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল, এর পর তোমরা কী বলবে?

সত্যি তো, ভাববার বিষয় বই কী? এই যে কোটি কোটি মানুষ নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী করার অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করে বসে আছেন, এর সবটাই কী হুজুক? এর সবটাই কী মিথ্যে?

পত্র-পত্রিকা-বই ও ভিডিও ক্যাসেটের সর্বগ্রাসী প্রচারে মানুষ উত্তেজনায় টানটান হয়ে পরিচিত হয়েছে নস্ট্রাডামুসের সঙ্গে, নস্ট্রাডামুসের অসাধারণ সব ভবিষ্যবাণীর সঙ্গে। এত দিনের তাবৎ বিজ্ঞান-চেতনাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মত পৃথিবী তোলপাড় করা সে-সব ভবিষ্যদ্বাণী। নেপোলিয়ান, হিটলার, মুসোলিনি, জন এফ্ কেনেডি, সাদ্দাম হুসেন, আয়াতুল্লা খুমেইনি, গদ্দাফি—সবারই আবির্ভাব ও তাঁদের অদৃষ্ট-লিখন জানতে পেরেছিলেন এঁদের জন্মের অনেক আগে। অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এঁদের জন্মেরও অনেক আগে। অভ্রান্ত

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ফরাসী বিপ্লব, লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ওয়াটারলুর যুদ্ধ, হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আনবিক বোমা বিস্ফোরণ, এইড্‌স রোগের ভয়াবহ আবির্ভাব, পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ, অলিম্পিক গেমস ইত্যাদি নিয়ে। কত রকম আবিষ্কার নিয়েই যে তিনি আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে-সব নস্ট্রাডামুসের ব্যাখ্যাকারদের তথ্য থেকে যতই জানবেন, ততই অবাক হয়ে যাবেন। সাবমেরিন, এরোপ্লেন, মিসাইল, রকেট, রেডিওর বাডার, বিদ্যুৎ, বেতার-যোগাযোগ, এই সব কিছু আবিষ্কারের কথাই আগাম ধরা পড়েছিল তাঁর মস্তিষ্কের রাডারে। এইড্‌স রোগের ওষুধ আবিষ্কার হবে, এই ভরসার কথাও তিনি শুনিয়েছেন। এই সবই আমরা জেনেছি, শুনেছি, নস্ট্রাডামুসের ওপর গবেষকদের দেওয়া ব্যাখ্যা থেকে।

নস্ট্রাডামুস পৃথিবীতে নেই প্রায় চারশো বছর হলো। তবু তিনি আছেন, জীবিত মানুষদের চেয়েও অনেক বেশি প্রবলভাবে আছেন বহু কোটি মানুষের চেতনা জুড়ে। নস্ট্রাডামুসের রহস্য অশেষ ; পেঁয়াজের মতই যতই খোসা ছাড়ান যায়, শুধুই পেঁয়াজ, পেয়াজ, আর পেঁয়াজ।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় এবং বইয়ের জগতেও নস্ট্রাডামুস এসে ঢুকে পড়েছেন হুড়মুড় করে। ১৯৮৬'র সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'আলোকপাত' মাসিক পত্রিকায় নস্ট্রাডামুসের যে জয়যাত্রার শুরু বাঙালাভাষীদের হৃদয়কে থর থর আবেগে কম্পিত করে, এই জয়ের রথকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে জনপ্রিয়তম ছোটদের পাক্ষিক 'আনন্দমেলা' ১৪ নভেম্বর '৯০ সংখ্যায়। এই দুয়ের মাঝে এবং পরেও বহু পত্র-পত্রিকাতেই ঘুরে ফিরে বহুবার বহুভাবে হাজির হয়েছেন নস্ট্রাডামুস। ইতিমধ্যে অনেক বইও বেরিয়েছে বাংলা ভাষায় ; কোনটা শীর্ণ কলেবরে, কোনটা সুস্বাস্থ্য নিয়ে। প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাও পেয়েছে ডঃ সুধীর বেরার লেখা 'নস্ট্রাডামের ভবিষ্যদ্বাণী ও ভারতের ভবিষ্যৎ', শিবপ্রসাদ রায়ের 'নস্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ', শম্ভুনাথ বাগচীর 'নোস্ট্রাডামের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ'। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে অনিল ভট্টাচার্য নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনিয়ে হিন্দুজাতীয়তাবাদকে জাগরিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শুনিয়েছেন হিন্দুদের বিশ্ব বিজয় ও মুসলমানদের ধ্বংসের দিন দ্রুত এগিয়ে আসার কথা। অনিল ভট্টাচার্যের যুক্তি, অতীতের প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু মিলেছে সুতরাং অবশ্যই আমরা ধরে নিতে পারি, ভবিষ্যতে হিন্দুদের বিশ্ব বিজয়ের যে কথা নস্ট্রাডামুস বলেছেন তাও অবশ্যই মিলবে।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রতিটি পত্র-পত্রিকা এবং বই পড়ে স্পষ্টতই এ-কথা মনে হওয়ার অবকাশ আছে—ওঁরা প্রত্যেকেই একে অন্যের লেখা দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে লিখে গেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক লেখাই হয়েছে একে অন্যের 'টুকে মারা'। তবে এই সব লেখার প্রধান সূত্র অবশ্যই নস্ট্রাডামুসের শ্লোকগুলোর প্রধানতম ব্যাখ্যাকারী এরিকা চিটহ্যাম-এর বই। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা কল্পনা এবং উদ্দেশ্য।

জানি, এর পরই যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেবে, সেটা হলো, 'টুকেই মারুক আর যাই মারুক, তাতে কী ? আসল কথা, নস্ট্রাডামুস সত্যিই এইসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কী না ? যদি না করে থাকেন, তবে যুক্তি, তথ্য দিয়ে প্রমাণ করুন এতাবৎকাল এই বিষয়ে যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সবই মিথ্যে, গুলগপ্পো। আর যদি বাস্তবিকই মিলে গিয়ে থাকে, তবে

তাকে স্বীকার করে নেওয়ার সততা কেন যুক্তিবাদীরা দেখাবেন না? যুক্তিবাদীরা কী শুধু নামেই 'যুক্তিবাদী'? কাজের বেলায় মুক্তমনা কী ওঁরা হবেন না? খোলামেলা মন নিয়ে নস্ট্রাডামুসকে গ্রহণ করতে অসুবিধে কোথায়? ভয়? অদৃষ্টবাদের বিরোধিতা করার ব্যাপারটাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়?"

আসলে যুক্তিবাদীদের, বিজ্ঞানমনস্কদের সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখার কোনও উপায় নেই। সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে যুক্তিবাদী, আর 'সোনার পাথর বাটি'—একই ব্যাপার। সুতরাং খোলামনে সত্যানুসন্ধান যুক্তিবাদীদের মূল-মন্ত্রগুলোর অন্যতম। আবার কথাটা উচ্চারণ করছি, "বহুলোক বলছে, অতএব সত্যি" এই কথাটা মেনে না নিয়ে আমরা, যুক্তিবাদীরা 'সত্যানুসন্ধান'-এ নামি। তারপর যে সত্য প্রকাশিত হয়, তাই মেনে নিই আমরা। একই ভাবে খোলামনে প্রত্যেককেই সত্যকে মেনে নেওয়ার কথাই বলি আমরা। যুক্তি দিয়ে বিচারের পরেই আসা উচিত কোনও তথ্য বা তত্ত্বকে গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন। বহু লোক বহু কিছুই এক সময় মানতেন, কিন্তু সে সব ধারণা কি আপনি আমিই বাতিল করে দিইনি? এক কালের সর্বজনীন ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব কি আজ বাতিল হয়ে যায়নি? সব সময় অজ্ঞানতা থেকেই যে আমরা ভুল বুঝি—এও সত্য নয়। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ দেখেছেন, এক নাগাড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে মিথ্যে প্রচার চালিয়ে গেলে মানুষের মগজে মিথ্যেকেও সত্যি বলে চালান করা যায়। তাই অনেক সময় যুক্তিবাদীদের লড়াইটা শুধুমাত্র অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে না; মিথ্যে প্রচারের বিরুদ্ধেও চালাতে হয়। মিথ্যে প্রচার কিন্তু সব সময় যে সব সময় দুর্বল প্রচার হবে, এমনটা ভাবারও কোনও কারণ দেখি না। অনেক সময় এই মিথ্যে প্রচারের পেছনে থাকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা। তবু সত্যি জয়ী হয়, যুক্তি জয়ী হয়; কারণ বেসিকেলি মানুষ যুক্তিকেই ভালবাসে।

এতক্ষণ নস্ট্রাডামুসের বিষয়ে যে-সব লিখেছি, সে-সবই নস্ট্রাডামুসের ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যার কথা। এইসব ব্যাখ্যা অনেক মানুষকে রাতারাতি জনপ্রিয়তা দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে—এই সম্মান ও স্বর্ণতৃষ্ণাতেও কেউ কেউ আকর্ষিত হতেই পারেন। "বিষয়টা পাবলিক খাচ্ছে ভালো"—এই চিন্তাতেই অনেক সুযোগসন্ধানী আখের গোছাতে ফিল্ডে নামতেই পারেন; যেমন আগে 'বার্মুডা ট্রায়াঙ্গেল' ও 'দানিকেন' নিয়ে অনেকে আসরে নেমেছিলেন।

সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষতা একান্তই প্রয়োজনীয়, যে সততা অনিবার্য, যে শ্রম অমোঘ, সে-সবই চূড়ান্তভাবে বজায় রেখেই নস্ট্রাডামুসের আশ্চর্য রহস্যময়তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। লেখার শুরুতেই আপনাদের এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, শুধুমাত্র বাংলা-পত্র-পত্রিকা ও বইপত্তরের ওপর নির্ভর করে যুক্তির কাটাকুটি খেলতে বসবো না। নস্ট্রাডামুস নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিদেশী ভিডিও ক্যাসেট, বিদেশী বইপত্তর, নস্ট্রাডামুসের মূল লেখা, তার ফরাসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ-সব কিছু নিয়েই সত্যানুসন্ধানে নেমেছিলাম। সমস্ত দুর্মূল্য তথ্য আমার হাতে তুলে দিতে সাহায্য করায় আমি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কাছে ঋণী, কৃতজ্ঞ।

এরপরও কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, বিষয়টা সমিতির অন্য কেউ না লিখে আমি কেন লিখছি। সমিতির বহু শ্রদ্ধেয় সদস্য আছেন, যাঁরা কলম ধরেন; বলিষ্ঠভাবেই ধরেন। খুশবন্ত সিং, ডঃ পবিত্র সরকার, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ চৌধুরী, নারায়ণ স্যান্যাল, ডা বিষ্ণু

মুখার্জি, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, পথিক গুহ, ডঃ অমিত চক্রবর্তী, যুগলকান্তি রায় এবং আরো অনেক শক্তিমান লেখক-লেখিকাই তো আমাদের সমিতির সঙ্গে, আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই সব শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধেয়াদের কাছে আমি নিশ্চয়ই অতি সামান্য। কিন্তু আমাদের সমিতির চিন্তা-ভাবনার নিরিখে কারো সন্তান হওয়াটা লেখার পক্ষে যোগ্যতা অর্জনকারী বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নয় ; তাই লিখছি।

নস্ট্রাডামুসের সমস্ত শ্লোক নিয়ে (৯৪২টা) আলোচনা করিনি, বইটা স্বাস্থ্যবান হলে দামটাও হৃষ্টপুষ্ট হতে বাধ্য হবে ভেবে। আলোড়নসৃষ্টিকারী প্রধান প্রতিটি শ্লোকই অবশ্য আমার লেখায় এনেছি।

সবটা পড়ার পড়েও যদি কোনও সন্দেহ জাগে বা খট্‌কা লাগে, দ্বিধা না করে চিঠি লিখবেন। শুধু একটি অনুরোধ ; সঙ্গে একটা জবাবী খাম পাঠাতে ভুবলেন না। উত্তর অবশ্যই দেব।

নস্ট্রাডামুসের সমস্ত শ্লোক নিয়ে আরো তথ্য দিয়ে একটা পরিপূর্ণ কাজ করার প্রচণ্ড ইচ্ছে রয়েছে। আমার মনে হয়, অদৃষ্টবাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই নস্ট্রাডামুসের রহস্যজালকে ছিন্নভিন্ন করা খুবই প্রয়োজনীয় , বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়তে অদৃষ্টবাদকে ভাঙতে হবে বলেই প্রয়োজনীয়। আপনাদের ভালোলাগা, আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছের দিকে তাকিয়ে আছে আমার কলম, আমার অন্তরস্থল। আপনাদের ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছে গেঁথেই তৈরি হতে পারে আমার পরবর্তী বই।

এবার আসুন, আমরা নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করি।

পিনাকী ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

পুনঃ 'আজকাল' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৯৯১) নস্ট্রাডামুস নিয়ে আমার যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বক্তব্য নাকি আমেরিকার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের সাড়া ফেলে দিয়েছে। লেখাটার Xerox কপিও নাকি করা হয়েছে হাজারে হাজারে। বাংলার ইংরেজি অনুবাদ টাইপ করিয়ে তার Xerox কপি করা হয়েছে। অতি সাগ্রহে সেই কপি সংগ্রহ করছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। খবরটা দিয়েছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞনী এবং ওখানকার একমাত্র বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ রণজিৎকুমার দত্ত। ইতিমধ্যে ওই সূত্র ধরে আমেরিকা ও কানাডা থেকে চিঠির ঝাঁক আসা শুরু হয়েছে।

অধ্যায় এক : নস্ট্রাডামুসের সঙ্গে পরিচয়

নস্ট্রাডামুসের 'আশ্চর্য' ভবিষ্যদ্বাণী কতটা 'আশ্চর্যজনক'?

"ফরাসি রাজপরিবারে একমুহূর্তে নেমে এল শোকের ছায়া। থেমে গেল আনন্দ উৎসব। একসঙ্গে একজোড়া বিয়ে হচ্ছে রাজ পরিবারে, সেই আনন্দে মেতে উঠেছিল সারা দেশ। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই। দুই রাজপুরুষ, রাজা দ্বিতীয় হেনরি আর গ্যাব্রিয়েল ডে লরজেস। যিনি মনটোগোমারির অধিকর্তা। বিয়ের উৎসব পালনের অঙ্গ হিসেবে পরস্পরের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ তলোয়ার খেলায় নেমে পড়লেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মাঝে মাঝেই ঝলসে উঠছে দুই অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণ, দর্শকরা যদিও জানেন এই লড়াইয়ে কোনো রক্তপিপাসা নেই, আছে কেবল হালকা প্রতিযোগিতা—তবু এই যুদ্ধ ক্রীড়ামুগ্ধ করে রেখেছিল তাঁদের অনেকক্ষণ। খেলা শেষ হল। সকলেই বললেন দুজনের কেউই জেতেনি, কেউই হারেনি, আনন্দ দিয়েছে সকলকে। সোনার অলঙ্কারে সুসজ্জিত বাদামি ঘোড়ায় চড়া কিং হেনরি বললেন, আর একদান লড়াই হয়ে যাক। কাউন্ট অব মনটোগোমারির খুব ইচ্ছে ছিল না। তবু হেনরির পীড়াপীড়িতে রাজি হয়ে গেলেন। এই দ্বিতীয় লড়াই শুরু হতে না হতেই ঘটলো দুর্ঘটনা। যুযুধান দুটি তলোয়ার আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল। মনটোগোমারির তলোয়ারের সামনের অংশটা ছিটকে হেনরির মুখের সোনার মুখবর্ম ভেদ করে বিঁধে গেল তার চোখের মধ্যে। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই রক্তাপ্লুত রাজা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। চারদিকে বিষাদের ছায়া নেমে এল।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সম্ভ্রান্ত মহিলারা। তখন বেদনায় উদ্বেল হয়ে অ্যানে ডে মনটমোরেনসি বললেন, "অভিশাপ দাও সেই মানুষটিকে, যিনি দৈববলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই দুর্ঘটনার, অশুভ লগ্নের। কী নির্ভুল, কী অভ্রান্ত তাঁর উচ্চারণ।"

যাঁর উদ্দেশ্যে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন মনটমোরেনসি, তিনি আর কেউ নন, মানব-ইতিহাসের এক বিস্ময়ব্যক্তিত্ব মিশেল ডে নসট্রেডেম। যিনি চার শতক জুড়ে সারা পৃথিবীর কোণে-কোণে 'নস্ট্রাডামুস' নামে খ্যাত। ফরাসি রাজবংশে এই ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি করেছিলেন, ওই দিনের চার বছর আগে, তাঁর প্রকাশিত দশ খণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে। এই খণ্ডে পঁয়ত্রিশ নম্বর ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি লিখেছিলেন ফরাসি দেশের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে এই পঙ্‌ক্তিগুলি :

তরুণ সিংহ তার বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাবে

যুদ্ধক্ষেত্রে—প্রথমবার নয়, দ্বিতীয়বার
সোনার মুখচ্ছেদ ভেদ করে খুলে আসবে চোখ

রক্তাক্ত ক্ষত, হায় কী বীভৎস মৃত্যু রাজার।"

কী? অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন নস্ট্রাডামুসের ক্ষমতা অসাধারণ? এই প্রশ্নও নিশ্চয়ই মাথায় এসেছে যে, কেন আমি নস্ট্রাডামুসের পক্ষে প্রচারে নেমেছি?

আসলে উপরের লেখার অংশটুকু আমার নয়। অভীক মজুমদারের। বেরিয়েছিল ছোটদের পাক্ষিক পত্রিকা 'আনন্দমেলা'র ১৪ নভেম্বর, ১৯৯০ সংখ্যায়। লেখক নস্ট্রাডামুসের ক্ষমতার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ভূরি ভূরি প্রমাণ হাজির করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু নস্ট্রাডামুসের উপরের ভবিষ্যদ্বাণীটা সত্যিই কতখানি সত্যি তা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। নস্ট্রাডামুসের বইয়ের প্রথম খণ্ডের পঁয়ত্রিশ নম্বর ভবিষ্যদ্বাণীটা ছিল এই :

Le lion jeune le vieux surmontera, En champ bellique par singulier duelle Dans caige d'or pes yeux pui crevera, Deux classes une, puis mourir, mort cruelle

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিকৃত ও অবিকল অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই :—

"অল্পবয়সী সিংহ তার বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে—প্রথমবারের যুদ্ধেই : সে সোনার খাঁচায় চোখ গেলে দেবে, একই যায়গায় দুটো ক্ষত, তারপর সে বীভৎসভাবে মরবে।"

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে অভীকবাবু নির্বিকভাবে নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীকে অনুবাদের সময় প্রয়োজনমতো বিকৃত করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইতিহাসকেও বিকৃত করেছেন। আসল ইতিহাসে আছে যে, হেনরির কপালে তলোয়ারের খোঁচা লেগেছিল ; চোখে নয়।

ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা ছিল Singulier duelle, অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধেই নিহত হবেন রাজা, কিন্তু অভীকবাবু সেটাকে বানালেন—"প্রথমবার নয়, দ্বিতীয়বার।" ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা আছে—সোনার খাঁচায় চোখ গেলে দেবে। এই লাইনটা ইতিহাসের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কোথায় সোনার খাঁচা? কোথায় চোখ? তাই নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যি প্রমাণিত করার দুরন্ত ইচ্ছায় অভীকবাবু 'খাঁচাকে' অনুবাদ করলেন 'মুখচ্ছেদ', আর ইতিহাস বদলে দিয়ে হেনরির কপালের আঘাতকে বানিয়ে দিলেন চোখের আঘাত। তার পরের লাইনটা, অর্থাৎ—'একই যায়গায় দুটো ক্ষত'কে অভীকবাবু তাঁর অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েই বেরিয়ে গেলেন, কেননা তিনি ভালো করেই জানেন হেনরির কপালে, এক জায়গায় দুটো ক্ষত হয়নি।

'তারপর সে বীভৎসভাবে মরবে'—এই লাইটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা 'সে' এখানে অল্পবয়সী সিংহটা, অর্থাৎ মনটোগোমারি। 'সে বীভৎসভাবে মরবে' বলতে বোঝা যাচ্ছে মনটোগোমারিই বীভৎসভাবে মরবে। কিন্তু মরেছিল মনটোগোমারি নয়, হেনরি। তাহলে

আর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে ইতিহাসের কী মিললো? কিছুই না।

কিন্তু অভীক মজুমদার ও এরিকা চিটহ্যামের মতো সুবিধাবাদী, অসৎ লেখকদের হাতে নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব পড়েই হয়েছে মুস্কিল। এঁরা এঁদের নাম ও লেখার বিপুল প্রচার পাওয়ার জন্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল অর্থাগমের প্রচেষ্টায় ইচ্ছেমতো ভবিষ্যদ্বাণীগুলি, এবং ইতিহাসকে বিকৃত করে নিয়েছেন। তার প্রমাণ এইমাত্র দিলাম।

এঁদের মতো অনুবাদকেরা ষোড়শ শতকের জ্যোতিষী নস্ট্রাডামুসের থেকেও বড় মাপের অপরাধী॥

নস্ট্রাডামুসের পরিচয়, ও 'সেঞ্চুরিস' প্রসঙ্গে ঃ

নস্ট্রাডামুসের জন্ম ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর ফ্রান্সের সেন্ট রিমি-ডে-প্রভেন্স-এ। চাব ভাই। নস্ট্রাডামুসই সবাব বড়। আসল নাম—মিশেল-ডে-নস্ট্রেডেম। ছেলেবেলায় শিক্ষাদীক্ষা হয় দাদুর কাছেই। দাদু মারা যাবার পর তাকে পাঠিযে দেওযা হল ঠাকুর্দার কাছে। বাকি শিক্ষা ওই ঠাকুর্দার কাছেই প্রাপ্ত। ডাক্তারীব ছাত্র নস্ট্রাডামুসের জ্যোতিষের প্রতি টান ছিল অল্প বযস থেকেই। নস্ট্রাডামুসের প্রথম বিযে ১৫৩৪ সালে। এক ছেলে, আর এক মেযে হযেছিল নস্ট্রাডামুসের। কিন্তু প্লেগে নস্ট্রাডামুসের স্ত্রী এবং ছেলেমেযেরা মারা যান।

১১৫৪ সালের নভেম্বব মাসে 'সালোন' শহরেব এক ধনী বিধবাকে বিযে করলেন নস্ট্রাডামুস। বিধবার নাম অ্যানি পোনসার্ট গেমেলে। গেমেলের বাড়িতেই থাকতেন নস্ট্রাডামুস। এই নতুন বাড়িতে এসে নস্ট্রাডামুস ডাইনিবিদ্যা, এবং জ্যোতিষের বই নিযে পড়াশুনো করার অঢেল অবসব পেলেন। শোনা যায় সালোনের এই বাড়ির আগাগোড়াই নস্ট্রাডামুস বইপত্রে ঠেসে ফেলেছিলেন।

নস্ট্রাডামুস লিখেছেন যে, তিনি রাত্রে তাঁর জ্যোতিষ এবং ডাইনিবিদ্যার বইগুলি পড়তেন। এও লিখেছেন যে বইগুলি তাঁর পড়া হযে যেত, সে বইগুলি তিনি পুড়িযে ফেলতেন। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, তাঁর যাদুবিদ্যার সেরা উৎস ছিল একটি বই, যার নাম—'ডে মিষ্টেরীস ইজিপ্টোরাম'।

নস্ট্রাডামুস তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণীতেই এই বইটা থেকে লাইন হুবহু টুকে গেছেন।

নস্ট্রাডামুস এরপর নিজে বই লিখতে আবম্ভ করলেন। তাঁর সংকল্প ছিল দশটা বই বার করবেন। প্রত্যেক বইতে থাকবে একশোটা করে ভবিষ্যদ্বাণী। বইগুলির নাম তিনি দিলেন 'সেঞ্চুবিস'। 'সেঞ্চুরিস'এব সঙ্গে এখানে একশো বছরের কোনো সম্পর্ক নেই। 'সেঞ্চুরিস' নাম এখানে এইজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক 'সেঞ্চুরি'তে একশোটা কবে ভবিষ্যদ্বাণী থাকত।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ছিল চার লাইনের কবিতার আকাবে। প্রথম সেঞ্চুরি বেবোয ১৫৫৫ সালে। নস্ট্রাডামুসের কথা অনুযায়ী প্রথম সেঞ্চুরিতেই তাঁর নিজের সময থেকে পৃথিবী শেষ হবার সময অবধি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

নস্ট্রাডামুসের বই খুব একটা বিক্রি হযনি, কেননা বই ছাপানো তখনকাব দিনে ছিল

দারুণ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে একএকটা বইয়ের দাম হত প্রচুর। অল্প কিছু ধনী পরিবার তাঁর বই কিনলেন। রাজপরিবারেও তাঁর বই কেনা হল। রাজপরিবাবে তাঁর নাম পরিচিত হল, এবং ১৫৫৬ সালে রাণী ক্যাথেরিন-ডে-মেডিসি তাঁকে ডেকে পাঠালেন রাজপরিবারের সাতটা বাচ্চার কুষ্ঠি তৈরি করার জন্য। নস্ট্রাডামুস ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন, রাণীর সাতটা শিশুই ভবিষ্যতে রাজা হবে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলেনি। সাতজনই রাজা হন নি। একজন তো ছোটবেলাতেই মারা গেছিলেন।

নস্ট্রাডামুস ঠিকুজি, কুষ্ঠি তৈরি করতেন। এটাই সম্ভবত তাঁর জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল। তিনি এরই মধ্যে দশটা সেঞ্চুরি লিখে ফেললেন। কিন্তু দশটা সেঞ্চুরি একসঙ্গে ছেপে বেরুলো ১৫৬৮ সালে, নস্ট্রাডামুসের মৃত্যুর দু'বছর পর। কোনো বিশেষ কারণে নস্ট্রাডামুস তাঁর সপ্তম 'সেঞ্চুরি' বইটা শেষ করতে পারেন নি। ফলে সপ্তম 'সেঞ্চুরি'তে একশোর বদলে কবিতা-ভবিষ্যদ্বাণী আছে মাত্র ৪২টা।

নস্ট্রাডামুস মারা যান ১৫৬৬ সালের ২ জুলাই। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধেও একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন নস্ট্রাডামুস। ভবিষ্যদ্বাণীটা এই :

বেঞ্চে থাকব শুয়ে শেষদিন, বিছানায় নয়....
পরনে থাকবে নীল আলখাল্লা।
পাদ্রী এসে পৌঁছবে দেরিতে....
রাত্রে নামবে বৃষ্টি। (১৪ নভেম্বর ১৯৯০ আনন্দমেলা)

এই ভবিষ্যদ্বাণীটা ঠিক প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন নস্ট্রাডামুস। অসুস্থ অবস্থাতে বিছানা ছেড়ে বেঞ্চে এসে শুয়েছিলেন। কিন্তু না, বৃষ্টি নামেনি সেদিন॥

কেমন করে ভবিষ্যৎ দেখতেন নস্ট্রাডামুস ?

নস্ট্রাডামুস তাঁর ভবিষ্যৎ-দর্শনের কায়দা লিখে গেছেন প্রথম 'সেঞ্চুরি'র প্রথম আর দ্বিতীয় কবিতাতে। প্রথম কবিতা হল এই :

Estant assis de nuict secret estude
Seul repose sur la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude
Fait prosperer qui n'est a croire vain

এর অর্থ হল :—

রাত্রে একা গোপন বই পড়তে বসে
এটাকে চাপানো হয় পেতলের তেপায়ার ওপর ;
ফাঁকার মধ্যে থেকে একটা মৃদু আলো বেরোয়
আর অবিশ্বাস্য সব তথ্য দিয়ে যায়, যা কষ্ট করেও জানা যায় না।

এই পদ্ধতি নস্ট্রাডামুস স্পষ্টতই জানতে পেরেছেন 'ডে মিস্টেরীস ইজিপ্টোরাম' বইটা থেকে। কারণ ওই বইতেও এই পদ্ধতির কথা হুবহু এভাবেই লেখা আছে। নস্ট্রাডামুসের

প্রথম সেঞ্চুরির প্রথম কবিতা অনুযায়ী, যিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তিনি রাত্রে, পড়ার ঘরে ডাকিনীবিদ্যার গোপন বইগুলি পড়ার সময়ে একটা পেতলের তেপায়ার ওপর একবাটি জল রেখে, সেই জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে জলটা ঘোলা হয়ে ওঠে, আর সেই ঘোলা জলের মধ্যেই নাকি দেখা যায় ভবিষ্যতের ঘটনাবলী।

দ্বিতীয় কবিতাতেও নস্ট্রাডামুস ভবিষ্যৎ-দর্শনের পদ্ধতির কথাই বলে গেছেন। প্রথম কবিতার পরিপূরক হল দ্বিতীয় কবিতাটা। কবিতাটা হল এই :

La verge en main mise au milieu des BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied :
Un peur & voix fremissant par les manches ·
Splendeur divine. Le divin pres s'assied.

এব মানে :

হাতের যাদুদণ্ডটা ঠেকানো হয় তেপায়া টুলের পায়াতে
বাটির জলে ভিজিয়ে নেওয়া হয় আলখাল্লার হাতা, আর পায়ের পাতা :
খুব কাছে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কাঁপেন ভয়ে :
দৈবশক্তি ভর করে তার শরীরে ; দেবতা নিজে এসে বসেন তার পাশে।

এই পদ্ধতিতে সত্যিই ভবিষ্যৎ-দর্শন করা যায় কিনা, তা পাঠকরাই একবার বাড়িতে চেষ্টা করে দেখতে পারেন ॥



অধ্যায় দুই :



সেঞ্চুরি—১

১ :

১। কবিতা—৩ : ফরাসিবিপ্লব।

২। কবিতা—৪ : নেপোলিয়নের আবির্ভাব।

৩। কবিতা—১০ : হেনরি III-র মৃত্যু।

৪। কবিতা—১৭ : খরা ও বন্যা।

৫। কবিতা—২৩ : ওয়াটারলু'র যুদ্ধ।

৬। কবিতা—২৬ : কেনেডিহত্যা।

৭। কবিতা—৩৪ : হিটলার।

৮। কবিতা—৩৫ : হেনরি II-র মৃত্যু।

৯। কবিতা—৫০ : আয়াতুল্লা খুমেইনী/হিন্দু ধর্মনেতা।

সেঞ্চুরি—১ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেঞ্চুরি, কারণ এতে বেশ কিছু বিখ্যাত ঘটনার ব্যাখ্যা আছে। তাই সেঞ্চুরি—১ থেকে ন'টা কবিতার বিশ্লেষণ করলাম। অন্যান্য সেঞ্চুরিতে এত ঘটনার ঘনঘটা নেই। তাই অন্যান্য সেঞ্চুরি থেকে গোটাপাঁচেক করে কবিতার বিশ্লেষণ করেছি॥

সেঞ্চুরি এক

ভূমিকাতেই বলেছি, কলেবর ও দামের কথা ভেবে আমি নস্ট্রাডামুসের সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এই বইতে হাজির কবলাম না। তবে যে-সব পৃথিবী কাঁপানো শ্লোকের ব্যাখ্যা হাজির করব, আশা করি তা থেকেই পাঠক-পাঠিকাদের নস্ট্রাডামুস-রহস্য ভেদ করা কঠিন হবে না।

প্রথম সেঞ্চুরিব কবিতা বা শ্লোক এক আর দুই সমন্ধে গোড়াতেই আলোচনা করেছি। তাই ওই দুটো বাদ দিয়ে পরবর্তী শ্লোকগুলোতে চলে যাচ্ছি।

কবিতা—৩(সেঃ—১)

Quand la licture du tourbillon versee.
Et serout faces de leurs manteaur convers
La republique par gens noubeaur vexce,
Lors blancs & rouges jugerout a l'envers

এর অর্থ :

ঘূর্ণিঝড়ে যখন বিছানাপত্তর ওলটপালট হয়ে যাবে,
তখন মানুষজন কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকবে :
নতুন রাজ্যে অশান্তি লেগে থাকবে,
আর লাল-সাদাবা এলোমেলো রাজ্যশাসন করবে।

ব্যাখ্যাকারদেব ব্যাখা : ফরাসিবিপ্লব

ব্যাখ্যাকার এরিকা চিটহ্যামের মতে এখানে নাকি ফরাসি-বিপ্লবেব কথা বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মানেই ফবাসি-বিপ্লব। আর কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকবে বলতে নাকি নস্ট্রাডামুস বলতে চেযেছিলেন, লোকজনেব মুন্ডু গিলোটিনে কেটে ফেলা হবে। (বুঝুন ব্যাপার) আর ফবাসি[illegible] সময়ে বাজ্যে অশান্তি তো ছিলই।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এই কবিতাটা আর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ নাই বা করলাম। পাঠকরা তো দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাখ্যাকাবের ব্যাখ্যাটা কেমন বিভৎসরকম হাস্যকর। বিছানাপত্তর এলোমেলো করা ঘূর্ণিঝড় মানেই ফবাসিবিপ্লব? আর কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা মানেই গিলোটিনে মানুষের মুন্ডু কাটা

যাবে। হায়।। লাল-সাদারা তাহলে কে?

সত্যি বলতে কি, মাথায় একটু বুদ্ধি থাকলে, আর একটু ইতিহাস জানা থাকলে, নস্ট্রাডামুসের যে কোনো কবিতার যা খুশি ব্যাখ্যা করে, ইতিহাসের যে কোনো একটা ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। আর ব্যাখ্যাকাররা সেটাই করছেন॥

কবিতা–৪ (সেঃ–১)

Par l'univers sera faict un monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement,
Lors se perldra la fiscature barque,
Sera regie en plus grand detriment

মানেঃ *পৃথিবীর কোনো এক জায়গায় শাসন করবে এক রাজা,*
যে শান্তি পাবে না,
আর তার রাজ্যকালও হবে ছোট্ট :
শান্তি আসবে না তার রাজত্বে।

ব্যাখাকারের ব্যাখ্যা : নেপোলিয়ানের আবির্ভাব শ্লোকে সূচিত হয়েছে।

সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার এরিকা'র মতে এই কবিতাতে নেপোলিযানের কথাই ব হয়েছে। কেন না নেপোলিয়ান মাত্র দশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি নিজে শান্তি নি, প্রজাদেরও পেতে দেন নি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

প্রথম দর্শনে এই ব্যাখ্যা পাঠকদের ঘাবড়ে দিতেই পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, পৃথি বেশিরভাগ রাজাই তো অল্প কয়েক বছর (চার-পাঁচ বছর) রাজত্ব করে সিংহাসন হাতছ করেছেন। বেশিরভাগ রাজাই তো শান্তি পান নি, প্রজাদেরও শান্তি দেন নি। এ বিশেষভাবে নেপোলিযনের নাম আসছে কেমন করে? নেপোলিযন তো বরং বেশ অ বছরই রাজত্ব করেছিলেন, এই সব অসংখ্য ছোট ছোট রাজাদের তুলনায়। তাহলে?

কবিতা–১০ (সেঃ–১)

Serpens transmis dans la caige de fer,
Ou les enfans septaines du Roy sont pris
Les vieux & peres sortiront bas de l'enfer,
Ains mourir voir de fruict mort & cris.

অর্থাৎ :

লোহার ভল্টে রাখা হবে এক কফিন
মৃত রাজা তার মৃত ছয় বোনের দেখা পাবে সেখানেই :

পাতাল থেকে উঠে আসবে পূর্বপুরুষরা,
তাদের বংশধরদের এ-হেন মৃত্যুতে শোক করতে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : তৃতীয় হেনরীর মৃত্যু

এরিকার মতে এই কবিতাতে রাজা তৃতীয় হেনরীর মৃত্যুর কথাই বলা হয়েছে। হেনরীর ছিল ছয় ভাই-বোন। 'পাতাল থেকে উঠে আসবে পূর্বপুরুষরা' লাইনটা একটু গোলমাল বাধিয়েছে, এরিকা স্বীকার করেছেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

শেষ দুটো লাইন অবাস্তব। ও লাইন দুটো নিয়ে আর কিছু বললাম না। প্রথম আর দ্বিতীয় লাইন দুটো দেখা যাক। তৃতীয় হেনরি এবং তার ছয় ভাইবোনের জন্ম নস্ট্রডামুসের চোখের সামনেই। এমনকি নস্ট্রাডামুস তাদের বাড়িতে গেছিলেনও, এই সাত শিশুব ঠিকুজি, কুষ্ঠি তৈবি করতে (আগেও বলেছি)। তাই এদের নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা আশ্চর্যজনক কিছু ব্যাপার নয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা আছে তৃতীয় হেনরী তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে সবার শেষে মারা যাবেন। এটাও ঠিক নয। তৃতীয় হেনরী সবার শেষে মারা যান নি॥

কবিতা—১৭ (সেঃ—১)

Par quarante ans l'Iris n' apparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu ·
La terre aride en siccite croistra,
Et grans deluges quand sera aperceu

এর অর্থ :—

চল্লিশ বছর ধরে আকাশে দেখা যাবে না রামধনু,
তারপর চল্লিশ বছর ধরে রোজ দেখা যাবে রামধনু :
শুকনো পৃথিবী আস্তে আস্তে সবুজ হযে উঠবে,
তারপর চারদিক ভেসে যাবে বন্যায।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : খরা ও বন্যা

এরিকা স্বীকার করেছেন যে, তিনি এই কবিতার ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। পৃথিবীর কোথাও চল্লিশ বছব খবার পর টানা চল্লিশ বছব বন্যার খবর পাওযা যাযনি। অতএব.....

কবিতা —২৩ (সেঃ—১)

Au mois troisiesme se levant le soleil,
Sanglier, Liepard au champ Mars pour combattre
Liepard laisse, an ciel extend son oeil,
Un aigle outour du Soleil voit s'esbattre

অর্থাৎ :

তৃতীয় মাসে, সূর্যোদযেব সময়ে

শুয়োর আর চিতাবাঘ
ক্লান্ত চিতাবাঘ স্বর্গের দিকে তাকাবে,
দেখবে একটা ঈগলপাখি সূর্যের আশেপাশে খেলে বেড়াচ্ছে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা :— ওয়াটারলু'র যুদ্ধ

এরিকা দেবীর মতে এই কবিতাতে নেপোলিযানের 'ওয়াটারলু'র যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে শুয়োর মানে হ'ল পারস্যের রাজা—ব্লুচার। চিতাবাঘ বলতে নাকি ব্রিটিশদের কথা বলা হযেছে। আর ঈগলপাখি মানেই নাকি ফরাসি শক্তি। ওয়াটারলু'র যুদ্ধ হয়েছিল ১৮১৫ সালের জুন মাসে। কবিতার প্রথম লাইনে নাকি এই তারিখটারও উল্লেখ আছে।

"তৃতীয মাসে, সূর্যোদযের সমযে"—মানেই জুন মাসে। কেন ? তারও এক জব্বর ব্যাখ্যা কবেছেন এরিকা দেবী। সূর্যোদয় মানেই মার্চ মাস ; কেননা মার্চ মাসে পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান দৈর্ঘ্যের হয। "তৃতীয মাসে" মানে মার্চ মাসের থেকে গুণতে আরম্ভ করে তৃতীয মাস ; অর্থাৎ—জুন মাস।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণঃ

যুক্তিবাদী পাঠকরা, এরিকা চিটহ্যাম-এর ব্যাখ্যা পড়ে কি সত্যিই আপনাদের মনে হচ্ছে যে, এই কবিতাতে নস্ট্রাডামুস নেপোলিযানের ওযাটারলু'ব যুদ্ধের কথা বলতে চেযেছিলেন ? শুযোর মানে পারস্যের রাজা, চিতাবাঘ মানে ইংরেজরা, আর ঈগল মানে ফরাসিরা ? এটা কি চ্যাংড়ামো নাকি ? এই উদ্ভট ব্যাখ্যার কোনো ভিত্তিই নেই। আর তারিখের ব্যাখ্যাটার তো কোনো মাথামুন্ডুই নেই। 'সূর্যোদয' কথাটার অর্থ কোন্ যুক্তিতে মার্চ মাস ? পৃথিবীর সর্বত্র সমান দৈর্ঘ্যের দিন-রাত্রি হওয়া মানেই "সূর্যোদয" ? এই যদি হ্য, তবে তো সেপ্টেম্বর মাসেব কথাও তোলা যায। কারণ সেপ্টেম্বর মাসেও পৃথিবীর সর্বত্র দিন-বাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। সেপ্টেম্বর থেকে গুনতে শুরু করে তৃতীয মাস হয় ডিসেম্বব। তাহলে এবিকা দেবী কী কবে জোর গলায বলতে পাবলেন যে এখানে ডিসেম্বর নয, জুন মাসেব কথাই বলা হযেছে ? জবাব নেই॥

কবিতা—২৬ (সেঃ-১)

Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Suivant presage tumbe d'heure nocturne,
Conflict Reims, Londres, Etrusque pestifere

অর্থাৎ :

মস্ত মানুষটা একদিন মারা পড়বে বজ্রপাতে,
একজন আবেদনকারী আগেই এ বিষয়ে সাবধান করবে,
সাবধানবাণী অনুসারে আরও একজন মরবে রাতে,
দ্বন্দ্ব দেখা দেবে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা :—কেনেডি হত্যার পূর্বাভাষ

এরিকা জানিযেছেন, এই শ্লোকে নস্ট্রাডামুস নাকি আমেরিকাব রাষ্ট্রপতি জন এফ

কেনেডির হত্যার কথাই বলতে চেয়েছেন। আরও একজন মরবে বলে যে বলা হয়েছে, সে নাকি জন এফ. কেনেডির ভাই রবার্ট অফ. কেনেডি। "একজন আবেদনকারী আগেই ও বিষয়ে সাবধান করবে"—এই লাইনটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরিকা একটু বেশিই গোঁজামিল দিযে ফেলেছেন। বলেছেন—কেনেডি মারা যাবার আগে একাধিকবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। আর ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালিতে মারামারি লাগবে বলে যে শেষ লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মানে নাকি এই যে, এই ঘটনাতে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যাবে?

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :–

এরিকার ব্যাখ্যার প্রথম লাইন থেকেই গোঁজামিল শুরু। কেনেডি কিন্তু বজ্রপাতে মারা যান নি। তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় লাইনেরও কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এন কোনো আবেদনকারীর খবরই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, যে কেনেডিকে মৃত্যু বা হত্যার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান করেছিল। তৃতীয় লাইনটার ব্যাখ্যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। "আরও একজন মরবে রাত্রে"—এই লাইনটা পড়ে মনে হচ্ছে নস্ট্রাডামুস সেই রাত্রেই অন্য কারো মারা যাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেনেডির ভাই রবার্ট. এফ. কেনেডি মারা গেছিলেন পাঁচ বছর পরে। এক ভোরবেলায়। "আরও একজন মরবে" বলাতে এরিকা জন-এর ভাইয়ের কথাই বা ভাবলেন কেন? জনের ভাই-ই যে মরবে, এমন কথা তো কবিতাতে বলা নেই? চতুর্থ লাইনটাও আর একটা বিদঘুটে গোঁজামিল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড আর ইতালিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেবার কথা বলা হয়েছে কবিতাতে। হইচই পড়ে যাবে বলা হয়নি। নস্ট্রাডামুস স্পষ্টতই 'Conflict' কথাটা ব্যবহার করেছেন। 'কনফ্লিক্ট' মানে কোনো অর্থেই 'হইচই' নয়। আর ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি মানেই কি সারা পৃথিবী?

অবশেষে আর একটা কথা না বলে পারছি না। এরিকাদেবী এই কবিতাতে কেনেডির নাম বিশেষভাবে পেলেন কোথায়? এই কবিতাতে যে রাজীব গান্ধীর হত্যার কথা বলা হয়নি, তা কি প্রমাণ করতে পারবেন? এই কবিতার বিশাল মানুষটি রাজীব হলেও তো মেলে বেশি, যিনি বজ্রপাতের মত এক বিস্ফোরণে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর তামিলনাড়ুর গোয়েন্দা দপ্তরকে সচেতন করে দিয়েছিল—ওখানে রাজীবের জীবনের ওপর আক্রমণ হতে পারে বলে। সে রাতে আরও একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ মারা গিয়েছিলেন; তিনি হলেন হত্যাকারী মেয়েটি। রাজীবের মৃত্যুতে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালিসহ পৃথিবীর বহুদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল—ভারতবর্ষে গণতন্ত্র টিঁকবে তো? লক্ষ্যণীয়, ইতালিতেই রাজীব গান্ধীর শ্বশুরবাড়ি।

এভাবে নস্ট্রাডামুসের যে কোনো কবিতার যা খুশি ব্যাখ্যা করে ইতিহাসের যে কোনও ঘটনার সঙ্গে ইচ্ছে মতো জুড়ে দেওয়াটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

কবিতা—৩৪ (সেঃ-১)

L'oiseau de proie volant a la semestre,
Avant conflict faict aux Francois pareure
L'un bon prendra l'un ambigue sinistre,

La partie foible tiendra par bon augure.

মানে :

অপরাজেয় পাখি বাঁদিক দিয়ে উড়ছে,
ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের আগে নেবে প্রস্তুতি :
কারো-কারো কাছে সে হবে নায়ক, অন্যদের কাছে খলনায়ক,
দুর্বল-শক্তি তাকে শুভ বলে মনে করবে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : হিটলার

এরিকার এই কবিতার ব্যাখ্যা প্রথম নজরে আচ্ছা-আচ্ছা লোকের মাথা ঘুরিযে দিতে পারে। এরিকা বলেছেন, এখানে হিটলারের কথা বলা হয়েছে। 'অপরাজেয় পাখি'টি হল হিটলার। ফরাসিদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। তৃতীয় লাইনটা ইতিহাস-বিরোধী হয়ে গেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী এরিকা তারও ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন। বলেছেন যে, চতুর্থ লাইনে 'দুর্বল-শক্তি' বলতে জার্মানদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন নস্ট্রাডামুস। (জার্মানদের এরিকা দুর্বল-শক্তি কেমন করে মনে করলেন জানি না। হিটলারের সময়ে জার্মানী এক মহাশক্তি ছিল বলেই তো জানি।)

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এ কবিতার ব্যাখ্যায় প্রথমেই একটা মারাত্মক গোলমাল রয়ে গেছে। নস্ট্রাডামুস কিন্তু তাঁর সমস্ত সেঞ্চুরিতে যতবার 'অপরাজেয পাখি' কথাটা ব্যবহার করেছেন, ততবারই এরিকা নেপোলিযনের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এরিকা বলেছেন যে, 'অপরাজেয় পাখি' মানেই নেপোলিযন। তাহলে এই ৩৪নং কবিতাতে 'অপরাজেয পাখি' নেপোলিযন না হয়ে হিটলার হল কেন ? দ্বিতীয় লাইনটার জন্য ?

হিটলার কেন ? ইংরেজরা নয় কেন ? ইংরেজরাও তো ছিল অপরাজেয়। ইংরেজরা ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে একাধিকবার। ইংরেজরা কারো কারো কাছে ছিল নায়ক, কারো কাছে খলনাযক। এদেশের 'বাবু' সম্প্রদায়রা ইংরেজদের মনে করতেন নায়ক, আবার এদেশেরই বিপ্লবীদের কাছে তারা ছিল খলনাযক। 'দুর্বল-শক্তি তাকে শুভ বলে মনে করবে'—এটাও ইংরেজদের ক্ষেত্রে ঘটানো যায়। কারণ ইংরেজরা এমন অনেক দুর্বল রাজ্য দখল করেছিল, যারা ইংরেজদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হযে পড়েছিল। তাদের কাছে ইংরেজরা অবশ্যই শুভ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

তাহলে এই কবিতাতে যে ইংরেজদের কথা বলা হযনি, এরিকা দেবী তা জোরগলায় বলেন কী করে ? পাঠকরা, একটু ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করলে অন্য কারোর সঙ্গেও এই কবিতাটা আপনারা জুড়ে দিতে পারবেন। নস্ট্রাডামুসের কবিতাগুলির মজা এইখানেই॥

কবিতা—৩৫ (সেঃ-১)

এই কবিতাটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বইয়ের ৩১২ পৃষ্ঠাতে, তাই আর দ্বিতীয়বার আলোচনায় গেলাম না। তবে চতুর ব্যাখ্যাকারদের দৌলতে কবিতাটা সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই কবিতাতে (হেনরি- II র মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে বলে দাবী করা হয়েছে॥

কবিতা—৫০ (সেঃ-১)

De l'aquatique triplicite naistra,
D'un qui fera le jeudi pour sa feste ·
Son b..ut, loz, regne, sa puissance coistra,
Par terre & mer aux Oriens tempeste

এর অর্থ হল :

তিনটে জলের সঙ্কেত থেকে জন্মাবে এক মানুষ,
যে বৃহস্পতিবারকে তার ছুটির দিন হিসেবে পালন করবে।
তার বিক্রম ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে,
আর, পশ্চিমে সে নানা ঝামেলা ডেকে আনবে।

ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা : আয়াতুল্লা খুয়েমিনী/হিন্দু ধর্মনেতা

এই কবিতাটির দুটি ব্যাখ্যা আমার নজরে এসেছে। ব্যাখ্যাকার দুই ভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম ব্যাখ্যাকার অবশ্যই অদ্বিতীয়া এরিকা চিটহ্যাম। তাঁর মতে এই কবিতায় নস্ট্রাডামুস মুসলিম ধর্মনেতা আযাতুল্লা খুযেমিনীর আবির্ভাব ও ছড়িয়ে পড়া বিক্রমের কথা বলেছেন। কিন্তু এরিকা এই কবিতাটির ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো ব্যাখ্যা হাজির করতে পাবেন নি। ব্যাখ্যাতে অনেক অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এরিকার মতে, 'তিনটি জলের সঙ্কেত' মানে—মীন, কর্কট, আর বৃশ্চিক। আযাতুল্লার কুষ্ঠিতে নাকি ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এই 'তিনটে জলের সঙ্কেত'-এর উল্লেখ আছে। সুতবাং এই কবিতাটা আয়াতুল্লা সম্বন্ধেই। আযাতুল্লা পশ্চিমে ঝামেলাও ডেকে এনেছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এক দক্ষিণভারতীযের। তাঁব নাম—শ্রী হিরন্নাপ্পা। ব্যাঙ্গালোরবাসী এই ব্যাখ্যাকারেব বই—'হিন্দু ডেস্টিনি ইন নস্ত্রাদামু'তে এই কবিতার একটা জব্বর ব্যাখ্যা আছে। সেটিই ছাপা হয় 'আলোকপাত'এব পাতায। সেই 'আলোকপাত' থেকে পড়ে আবার হুবহু কবিতাটার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা টুকে গেছেন অন্য এক লেখক—সুধীর বেরা। প্রসঙ্গত, এই সুধীব বেরা তাঁর চটি বই—'নস্ট্রাডামের ভবিষ্যদ্বাণী ও ভারতের ভবিষ্যৎ'এ 'আনন্দমেলা' (১৪ নভেম্বর ১৯৯০ সংখ্যা) ও 'আলোকপাত' থেকে ঢালাও প্রেরণা পেযেছেন, বইটা পড়লে তা বুঝতে অসুবিধে হয না বিন্দুমাত্র। তাঁর বই নিয়ে পবে আলোচনায় আসব। এখন বরং ফিবে চলুন হিরন্নাপ্পায। শ্রী হিরন্নাপ্পাব মতে এই কবিতাতে কোনও এক হিন্দু ধর্মনেতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কারণ তিনটে জলের সঙ্কেত মানে হিবন্নাপ্পার মতে আরব-সাগর, বঙ্গোপসাগর, আব ভারত মহাসাগব। সেখানে থেকে জন্ম নেওযা মানে ভাবতবর্ষে জন্মানো। হিন্দুবা বৃহস্পতিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে পালন কবেন। কাজেই এ কবিতাতে নির্ঘাৎ কোনো হিন্দু মহর্ষির আগমনবার্তা দেওয়া আছে। কিন্তু কোন্ মহর্ষি তা অবশ্য বলেননি শ্রী হিবন্নাপ্পা।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এরিকার ব্যাখ্যাব কোনো মাথামুণ্ডুই নেই। তিনটে জলের সঙ্কেত মানেই বৃশ্চিক, কর্কট, আব মীন? গ্লাস, বোতল আর গামলা নয় কেন? ওই তিনটে জিনিসেও তো জল বাখা হয? অথবা পুকুর, নদী, সমুদ্র নয কেন? এই তিনটেকেও তো জলের সঙ্কেত বলা যেতে পাবে? বৃশ্চিক, কর্কট, মীন—এই তিনটে সঙ্কেত কাবও ঠিকুজিতে কিভাবে একসঙ্গে ঠাঁই পেল জানি না, কিন্তু এতে যে আযাতুল্লা খুযেমিনীব কথাই বলা হয়েছে, এটা কিন্তু স্পষ্ট

হল না। এরিকা একটা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন কবিতাটাকে আয়াতুল্লার সঙ্গে সম্পর্কিত করার। কিন্তু তাঁর যুক্তি যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয়।

শ্রীহিরন্নাপ্পার ব্যাখ্যাকে সত্যি ধরলেও ঝঞ্ঝাট অনেক। সেই মহাপুরুষটি কে? মহর্ষি রজনীশ, মহর্ষি মহেশযোগী, স্বামী বিবেকানন্দ—এঁরা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের ধর্মীয় নেতা। এবং এঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী বা বিক্রমশালী ধর্মবেত্তা ছিলেন। এঁদের চিন্তায় আকর্ষিত হয়েছিলেন এবং হযেছেন বহু পশ্চিমী অর্থাৎ পাশ্চাত্যের মানুষ। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। ইসকনের জয়ের রথ যে বীর বিক্রমে পশ্চিমের দেশগুলো পরিক্রমারত, তাতে এদের যে কোনও একজনকেই তো নস্ট্রাডামুসের কবিতাব লক্ষ্য বলে ধরা যায়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাউকে কি আমরা পেলাম? অবশ্যই না। কারণ তিনজনেব বাইবেও অন্য কেউ হতে পারেন, অথবা অন্য অনেকেই হতে পারেন। ভারতবর্ষ বাবাজী-মাতাজীর অফুরন্ত সরবরাহকারী দেশ। এঁদের অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে পশ্চিমী দেশগুলোর প্রতি। আর সে-সব দেশে যে সব বাবাজী-মাতাজীরা যান, তাঁদের প্রত্যেকেই বেশ-কিছু পশ্চিমী শিষ্য-শিষ্যা জুটিযেই থাকেন। সুতবাং আজ যদি কেউ দাবি করেন, "নস্ট্রাডামুস এই কবিতায স্বামী বিবেকানন্দেব আবির্ভাবের কথা বলেছিলেন", অন্য কেউ নিশ্চযই একই যুক্তিতে পাল্টা দাবি করতে পাবেন, "ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হযেছিল মহেষযোগীকে লক্ষ্য কবে।" অতএব? এখানেও সেই একই মুস্কিল—যার সঙ্গে খুশি তাব সঙ্গেই শ্লোকটাকে জুড়ে দেওযা যায়।

অধ্যায় তিন

সেঞ্চুরি—২

সূচি ঃ

১। কবিতা—৫ ঃ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৮৬ সালে ?

২। কবিতা—৬ ঃ হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমাবর্ষণ।

৩। কবিতা—৩৫ ঃ ২২ ডিসেম্বরের একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

৪। কবিতা—৪০ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৫। কবিতা—৫১ ঃ লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।



সেঞ্চুরি—দুই

কবিতা—৫ (সেঃ—২)

Qu'en dans poisson, fer & lettres enfermee,
Hors sortira qui puis fera la guerre
Aura par mer se classe bien pramee,
Apparoissant pres de Latine terre

অর্থাৎ :

অস্ত্রশস্ত্র আর দলিলপত্র রয়েছে একটা মাছের পেটে,
আবির্ভাব হবে এক মানুষের, যে শুরু করবে যুদ্ধ :
তার সেনাদল সাগর পেরিয়ে এগিয়ে যাবে অনেকটা,
এগিয়ে যাবে ইতালির উপকূল অবধি।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৮৬ সালে ?

এরিকার ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাছ বলতে আসলে নস্ট্রাডামুস আধুনিক সাবমেরিন-এর কথা বলতে চেয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্র আর দলিলপত্র তো সাবমেরিনের পেটে থাকেই। আর এই যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা লেখা হয়েছে, এটা সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারিখটাও এরিকা উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৬ সাল। কেমন করে ? এরিকার মতে, প্রথম লাইনটার একটা দ্বিতীয় মানেও হতে পাবে। সেই দ্বিতীয় মানেটা জ্যোতিষ-নির্ভর। দ্বিতীয়ভাবে ব্যাখ্যা করলে প্রথম লাইনটার ব্যাখ্যা দাঁড়ায়—"When Mars and Mercury are in conjunction in Pisces." 'conjunction'টা আবার ঘটবে ১৯৮৬ সালে। (এখানে মনে রাখতে হবে, এরিকা তাঁর ব্যাখ্যার বইটা লিখেছিলেন ১৯৮৬'-র আগে।) সুতরাং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবে ১৯৮৬ সালে। আর এই যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে সাবমেরিন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

আমার কিন্তু কবিতাটা পড়ে একবারও মনে হয়নি যে 'মাছ' বলে নস্ট্রাডামুস আসলে ডুবোজাহাজ বোঝাতে চেয়েছিলেন। কবিতাতে স্পষ্টতই মাছের কথাই বলা আছে। কবিতাতে আরও অনেক কিছুই বলা আছে। কিন্তু এরিকা কবিতার সব লাইনের আলোচনা না করেই কেমন করে দুম করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন যে এখানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা আছে, —বুঝলাম না।

১৯৮৬ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু লাগেনি॥

কবিতা—৬ (সেঃ—২)

Aupres des portes & dedans deux cites.
Seront deux fleaux & oncques n'apperceu un tel
Faim, dedans peste, de fer hors gens boutes,
Crier secours au grand Dieu immortel

মানে :

সমুদ্রের কাছে এবং দুটি শহরে পড়বে দেবতাদের শাস্তি
ভয়াবহ সে শাস্তি ঃ
তলোয়ারের খোঁচায় জর্জরিত হবে ক্ষুধার্ত প্লেগ-আক্রান্ত লোকগুলো
তারা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবে অমর দেবতার কাছে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ঃ হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর আনবিক বোমা-বর্ষণ।

চিটহ্যামের মতে এই কবিতায় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর আমেরিকা যে বোমাবর্ষণ করবে, সে কথারই ইংগিত দেওযা রয়েছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টি সমুদ্রের কাছে। "দেবতাদের শাস্তি" বলতে আণবিক বোমা বিস্ফারণের কথাই বলা হযেছে। "তলোযারের খোঁচায" বলতে বোঝাতে চেযেছিলেন বোমার আঘাতকেই। বোমাবর্ষণের আণবিক তেজস্ক্রিযার ফলে শহর দুটির আশে-পাশের মানুষদের চেহারা হযেছিল প্লেগ-রোগীর মত, তাইতেই কবিতায 'প্লেগ-আক্রান্ত" শব্দটিকে রূপক আকারে ব্যবহার করা হযেছে। অমর দেবতার কাছে প্রার্থনা—সে ও সত্যি। দেবতারা অমর এবং তেজস্ক্রিযার ফলে রোগগ্রস্ত মানুষগুলো দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাবে, এটাও স্বাভাবিক।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

আমি এর আগে বারবার বলেছি—ব্যাখ্যাকাররা যা-তা ব্যাখ্যা করে একটা ঘটনার সঙ্গে কবিতাগুলোকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেন ; এই কবিতাটার ব্যাখ্যা তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ব্যাখ্যাকার কিভাবে কবিতার অর্থকে বদলেছেন লক্ষ্য করুন। প্রথম লাইনে স্পষ্টতই আছে— "সমুদ্রের কাছে, এবং দুটো শহরে ... ।" এই এবং শব্দটার প্রযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মানে দাঁড়াচ্ছে, দেবতার শাস্তি পড়বে দুটো শহরে, এবং সমুদ্রের কাছে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেছেন—আণবিক বোমা পড়বে সমুদ্রের কাছে দুটো শহরে। দুটো বাক্যের অর্থগত তফাত আছে।

'দেবতার শাস্তি' মানে আণবিক বোমা বিস্ফোরণই কেন ? কেন আগ্নেযগিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয নয কেন ? জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় কেন নয় ? বোমাবর্ষণের চেযে এই প্রাকৃতিক বিপর্যযকে অনেক বেশি 'দেবতার শাস্তি' বলে আপাত মনে হয না কী ?

তলোযারের খোঁচা হিসেবে বোমার আঘাতকে মেনে নিতে বেশ কষ্ট হয। তলোযারের খোঁচার সঙ্গে বরং মিশাইলের খোঁচাকে মেলালে এরিকা ভালো করতেন। অথবা তলোযারের খোঁচা বলতে 'লেখকের ধোরাল লেখনি' বা 'ডাক্তারের হাতের ইঞ্জেকসন'কে মেলালে বোমার আঘাতের চেযে মিল খেত ভাল। এই কবিতাকেই কুযেত নিযে ইরাকের যুদ্ধ এবং বাগদাদ ও কুযেত শহরে নেমে আসা শাস্তি, মিশাইলের অনবরত খোঁচা, খাদ্য ও পানীযের অভাবে পেটের রোগ ছড়ান, অসহায মানুষগুলোর দেবতার কাছে প্রার্থনা—এই সবের সঙ্গে মেলালে হিরোসিমা, নাগাসিকার চেযেও ভাল মিলছে না কী ? উৎসাহী পাঠক-পাঠিকরা একটু চেষ্টা করলেই আমার চেযেও আরো ভালো মেলাবার মত অনেক ঘটনা পেযে যাবেন। তাহলে এরিকাদেবী, কিভাবে বুঝলেন, নস্ট্রাডামুস এই কবিতাতে সুনির্দিষ্টভাবে হিরোসিমা,

নাগাসাকিকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন?

নস্ত্রাডামুস যে এ-যুগের জ্যোতিষীদের মতই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানী' নীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ সেঞ্চুরির কবিতাগুলোই। প্রতিটি কবিতাই এমন হেঁয়ালী করে লিখে গেছেন, যার সঙ্গে চেষ্টা-চরিত্তির করলে অনেক ঘটনাকেই মিলিয়ে দেওয়া যাবে।

নস্ট্রাডামুস তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেখেছিলেন যুদ্ধ, দেখেছিলেন এ-সবের ধ্বংস করার ক্ষমতা। বুঝে ছিলেন, এমন ঘটনা আবারও ঘটবে বহুবারই ঘটবে, আর সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই নস্ট্রাডামুস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এমনটা ঘটবে। ব্যাখ্যাকাররা নস্ট্রাডামুসকে আরো বড় করে তুলতে কোনো একটি করে ঘটনার সঙ্গে কবিতাগুলোকে জুড়ে দিয়েছেন। এখানে যেমন জোড়া হয়েছে হিরোসিমা-নাগাসাকির নাম।

কবিতা—৩৫ (সেঃ—২)

Dans deux logis de nuict le feu prendra,
Plusieurs dedans estouffes & rostis
Pres de deux fleuves pour seul il aviendra
Sol, l'Arq & Caper tous seront amortis.

মানে :

আগুন লাগাবে দুটো বাড়িতে রাত্রে,
ভেতবে বহু লোক পুড়ে, বা শ্বাসরুদ্ধ হযে মাবা পডবে :
এ ঘটনা ঘটবে দুটো নদীর কাছে, নিঃসন্দেহে :
যখন সূর্য দাঁড়াবে মকব-ক্রান্তিব ঠিক উপরে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ২২ ডিসেম্বরের একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

ব্যাখ্যাকারের মতে এই ঘটনা ঘটেছে, বা ঘটবে বাইশে ডিসেম্বর, যে কোন বছর। কেননা বাইশে ডিসেম্বব সূর্যেব অবস্থান থাকে ঠিক মরক-ক্রান্তি (TROPIC OF CAPRICON)-এব উপরে। তবে ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছে, বা ঘটবে, তা অবশ্য বলতে পাবেন নি শ্রীমতী চিটহ্যাম। তিনি স্বীকার কবেছেন যে, এমন অনেক শহর আছে, যা দুটো নদীর কাছে অবস্থিত। সেই সব শহবে ডিসেম্বর মাসে দুটো বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা অশ্চর্যজনক কিছু ব্যাপার নয়।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

এরিকা নিজেই যখন সব স্বীকার করেছেন, তখন আমার আর বলার জন্য কিছু থাকে না। কবিতাটাতে আশ্চর্য হবার মতো কোনো ব্যাপার নেই। বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন, কেননা এমন ঘটনা আকছারই ঘটে॥

কবিতা–৪০ (সেঃ–২)

Un peu apres non point longue intervalle
Par mer & terre sera faict grand tumulte .
Beaucoup plus grande sera pugne navalle,
Feux, animaux, qui plus feront d'insulte.

অর্থাৎ ঃ

শীঘ্রই, বেশিদিন পরে নয়
জলে-স্থলে জেগে উঠবে এক ভয়ানক কম্পন ঃ
এমন নৌ-যুদ্ধ হবে, যা আগে দেখা যায়নি,
আগুন, পোকামাকড়রা নানারকম ঝামেলা পাকাবে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

এরিকা মনে করেন, হয়তো এই কবিতাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা আছে। "শীঘ্রই, বেশিদিন পরে নয়"—মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশিদিন পরে নয়। বাস্তবিকই জলে-স্থলে, যুদ্ধ হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জব্বর নৌ-যুদ্ধও হয়েছিল বটে। "আগুন, পোকামাকড়রা ঝামেলা পাকাবে"—বলতে হয়তো নস্ট্রাডামুস বলতে চেয়েছিলেন—বোমাবর্ষণ, এবং সাবমেরিন জাহাজ নানারকম ঝামেলা পাকাবে। আগুন মানে বোমা, আর পোকামাকড় মানে সাবমেরিন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

নস্ট্রাডামুস হয়তো সত্যিই কোনো যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কবিতার কোনো জায়গাতে লেখা দেখলাম না, এই যুদ্ধটার নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জানিনা, ব্যাখ্যাকার কী দেখে সিদ্ধান্তে এলেন যে, এই কবিতাতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে যেরকম নৌ-যুদ্ধ হয়েছিল, তার থেকেও ভয়াবহ নৌ-যুদ্ধ ইতিহাসে হয়েছে। তাহলে তৃতীয় লাইনটা মিথ্যা প্রমাণিত হল।

চতুর্থ লাইনের আগুন, আর পোকামাকড়কে যথাক্রমে বোমা আর সাবমেরিন বলাটা ব্যাখ্যাকারের গতানুগতিক বজ্জাতি। এর আগেও ব্যাখ্যাকার সাধারণ শব্দকে অর্থ বদলে বর্তমান যুগের শব্দ বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

নস্ট্রাডামুস যদি কোথাও লেখেন—"বজ্রপাত ঘটবে', ধূর্ত ব্যাখ্যাকাররা হয়ত বোঝাবেন যে এখানে 'লেসার-গান'এর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা রয়েছে। এরকম চমকদার ব্যাখ্যায় প্রতারিত হবেন না। যুক্তি দিয়ে বিচার করে, যাচাই করে,

তবেই কোনো সিদ্ধান্তে আসুন।

পাঠকরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে বলুন তো, এই কবিতাতে সত্যিই ২য় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা আছে বলে আপনারা মনে করেন?

কবিতা—৫১ (সেঃ—২)

(এই কবিতাটা নস্ট্রাডামুসের প্রচারকদের এক মস্ত হাতিয়ার। এই কবিতাটা তারা সুযোগ পেলেই উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। এই কবিতাটার ব্যাখ্যা প্রবীর ঘোষের কাছে এসেছে। দেখা যাক কেন এই কবিতাটা এত বিখ্যাত....)

Le sang de juste a londres sera faulte,
Brusles par fouldres de vingt trois les six
La dame antique cherra de place haute,
Des mesme secte plusieurs seront occis

'আনন্দমেলা' ১৪ নভেম্বর '৯১, সংখ্যায় অভীক মজুমদার এই কবিতার অনুবাদ করেছেনঃ

লন্ডনে ঘটবে এক প্রবল অশুভ,
পুড়বে আগুনে সব তিনগুন কুড়ি যোগ ছয়ে :
সুপ্রাচীন স্থাপত্য পড়বে বিদীর্ণ হয়ে উঁচু থেকে,
মরবে অনেক লোক, পালাবে অনেকে তার ভয়ে।

ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা : লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

অভীক মজুমদার এই কবিতার ব্যাখ্যা করেছেন (এরিকার বই পড়ে, সম্ভবত) লন্ডনের ১৬৬৬ সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বলে। তিনি বলেছেন—" সত্যিই লন্ডনে ভয়াবহ আগুন ছড়িয়েছিল ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে (৬৬ মানে, তিনগুণ কুড়ি যোগ ছয়)। অন্যান্য সুপ্রাচীন গির্জার সঙ্গে ভেঙে পড়েছিল সুবিশাল সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল। মানুষজন কাঠের বাড়ি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল উর্ধ্বশ্বাসে, মারা গিয়েছিল বহু মানুষ।"

এরিকার ব্যাখ্যাটাও মোটামুটি একই রকম। একটু তফাত আছে। কী তফাত, সেটা যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে বলছি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

অভীক মজুমদার কবিতাটার যে অনুবাদ করেছেন, তাতে মূল কবিতাকে বিকৃত করা হয়েছে। অবিকৃত অনুবাদ করলে কবিতাটা দাঁড়ায় :

লন্ডনে ঘটবে এক অশুভ ঘটনা,
আগুনে পুড়বে তিনগুন কুড়ি, যোগ ছয় :
বয়স্ক মহিলার পতন হবে তাঁর উচ্চাসন থেকে,
তাঁরই বংশের আরও অনেকে পড়বে মারা।

এরিকা চিটহ্যাম প্রথম দু-লাইন ব্যাখ্যা করেছেন একদম অভীক মজুমদারের মতোই। তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরিকা বলেছেন 'বয়স্ক মহিলা' মানে এখানে সেন্ট

পলস্ ক্যাথিড্রাল। আগুনে ক্যাথিড্রালের পতন হয়েছিল।

'তাঁরই বংশের আরও অনেকে পড়বে মারা'—এই লাইনের মানে এরিকার মতে এই যে, আগুনে সেন্ট পলস্ গির্জার মতো আরও কিছু ছোট ছোট গির্জা শেষ হয়ে যাবে। পাঠকরা ভেবে দেখুন তো, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে নস্ট্রাডামুস সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, আর অন্যান্য গির্জা ভেঙে যাবার কথা বলেছেন বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই নয়। নস্ট্রাডামুস হয়তো বলতে চেয়েছিলেন—লন্ডনে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটবে। সেই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ইংলন্ডের রাণী তাঁর স্থান হারাবেন। রাণীর বংশের অনেকে আগুনে মারা পড়বে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। তাই চতুর ব্যাখ্যাকাররা বয়স্কা মহিলা বলতে সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের নাম উল্লেখ করে বসলেন। অভীকবাবু আর এক ডিগ্রি উপর দিয়ে চলেন। তৃতীয় আর চতুর্থ লাইন মূল কবিতাতে যথেষ্ট জোরদার নয় বলে তিনি ওইদুটো লাইনের বয়ানই বদলে দিলেন অনুবাদের সময়ে! চমৎকার! এই না করলে কিশোর-পাঠকদের মাথা খাবেন কেমন করে? তাদের আবাব অন্ধকার-যুগে নিয়ে যাবেন কেমন করে?

"তিনগুণ কুড়ি যোগ ছয়"। মানে ছেষট্টি। সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে কোথায় বলা হয়েছে যে, আগুন লাগবে ১৬৬৬ সালে? দ্বিতীয় লাইনের দ্বাবা হয়তো নস্ট্রাডামুস বলতে চেয়েছিলেন ৬৬টা বাড়ি পুড়বে, অথবা ৬৬টা মানুষ পুড়বে,.... অন্তত কবিতা পড়লে, সেরকমই মনে হচ্ছে। কবিতার দ্বিতীয় লাইন পড়লে কখনোই মনে হচ্ছে না নস্ট্রাডামুস বলতে চেযছিলেন—১৬৬৬ সালে লন্ডন আগুনে পুড়বে। ৬৬ মানে ১৬৬৬-ই হবে কেন? কেন ১৪৬৬ বা ১৫৬৬ নয়? কেনই বা ১৭৬৬, ১৮৬৬ হবে না? এমন কি কবিতাতে কোথাও লেখা নেই আগুন লাগবে ৬৬তে। বরং বলা হযেছে আগুনে পুড়বে ৬৬। নস্ট্রাডামুস সম্ভবত ভরসা রেখেছিলেন ভবিষ্যতের জ্যোতিষীরা এই কবিতাকে শেষ পর্যন্ত ঠিকই মিশিযে দেবেন, ৬৬টা গাউন পুড়েছে, বা ৬৬টি জুতো পুড়েছিল বলে মিলিযে দেওয়া এমন কোনও কঠিন কাজ হবে না; শুধু ৬৬ নিয়ে তো কথা।

অধ্যায় চার

সেঞ্চুরি—৩

সূচি :

১। কবিতা—১১ : চতুর্থ হেনরীর হত্যাকাণ্ড।

২। কবিতা—১৩ : ডুবোজাহাজ।

৩। কবিতা—২৭ : প্রেসিডেন্ট গদ্দাফী।

৪। কবিতা—৪৪ : বেতার যোগযোগ ও বিদ্যুৎ।

৫। কবিতা—৬০ : সাদ্দাম হুসেন।



গদ্দাফি

সেঞ্চুরি তিন

কবিতা—১১ (সেঃ—৩)

Les armes battre au ciel longue saison,
L'arbre au milieu de la cite tombe.
Verbine, rongne, glaive en face, Tison,
Lors le monarque d'Hadrie succombe

অর্থাৎ :

আকাশে অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ হবে অনেকক্ষণ,
শহরের মাঝখানের গাছটা পড়ে যাবে :
পবিত্র ডালটাকে কেটে ফেলা হবে ধারলো অস্ত্র দিয়ে,
তারপর রাজা হাদ্রী পড়ে যাবেন।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : হেনরীর হত্যাকাণ্ড।

চিটহ্যাম মনে করেন এটা চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী। চতুর্থ হেনরী মারা যান ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে। হেনরীকে হত্যা করেছিলেন 'রাভাইলাক' নামের এক ব্যক্তি।

চিটহ্যাম স্বীকার করেছেন যে, প্রথম লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মহা ফ্যাঁসাদে পড়েছেন, কেননা প্রথম লাইন পড়লে কোনো আধুনিক যুদ্ধের বর্ণনা বলে মনে হয়। তাই প্রথম লাইন এড়িয়ে গেছেন তিনি।

দ্বিতীয় লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিটহ্যাম বলেছেন যে, 'শহরের মাঝখানের গাছটাই হলো চতুর্থ হেনরী। তিনি এক গাছের মতো ব্যক্তিত্ব। গাছটা পড়ে যাবে, মানে হেনরীকে হত্যা করা হবে।'

তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিটহ্যাম বলেছেন যে 'পবিত্র ডাল' মানে হলো চতুর্থ হেনরীর দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র—ত্রয়োদশ লুইস। তার মন ছিল পবিত্র। আর তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

চতুর্থ লাইনে 'হাদ্রী' বলতে চতুর্থ হেনরীকেই বোঝান হয়েছে। 'হাদ্রী' আর 'চতুর্থ হেনরী' নাম দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ আছে কী?—প্রশ্নটা করেছেন চিটহ্যাম।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :—

চিটহ্যাম এই ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, নস্ট্রাডামুসের সেঞ্চুরি তিনের কবিতা ১১ও নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল। আসুন আমরা আর একটা দেশের ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েও মিলিয়ে দিচ্ছি নস্ট্রাডামুসের ওই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অভ্রান্ত।

আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসকে বেছে নিয়েই বরং দেখি।

মহীশুরের শাসক হায়দার আলি ১৭৮২তে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। এটা আমাদের সকলেরই জানা। এবার কবিতার লাইনগুলোর সঙ্গে মেলান—

"আকাশে অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ হবে অনেকক্ষণ"

তাই হয়েছিল।

"শহরের মাঝখানের গাছটা পড়ে যাবে।"

মহীশুরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনমের মাঝখানের গাছই হলো হায়দার আলি।

"পবিত্র ডালটাকে কেটে ফেলা হবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে।"

অর্থাৎ হায়দার আলির মত এক পবিত্র হৃদয়ের মুসলমানকে অস্ত্রাঘাত করে ছেঁটে ফেলাটা হবে হায়দার বংশের একটি পবিত্র ডালকেই কেটে ফেলা।

"তারপর রাজা হাদ্রী পড়ে যাবেন।"

তারপর রাজা হাদ্রী অর্থাৎ হায়দার মারা যাবেন। 'হাদ্রী'র সঙ্গে 'হায়দার' শব্দের মিল অতি সুস্পষ্ট নয়?

এমনিভাবে বিশ্ব-ইতিহাস ঘাঁটলে কত কত শাসকদের পরিচয় আমরা খুঁজে বের করে প্রমাণ করতে পারব-নস্ট্রাডামুসের কবিতার অসাধারণ সত্যতা, আশ্চর্য মিল। আর এইসব মিলের অনেকগুলোই চিটহ্যামের মিলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মিলতেই পাবে। এইভাবেই তো নস্ট্রাডামুসের কবিতার ব্যাখ্যা করতে হয়। একথা ধ্রুব সত্যি যে :

নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যৎবাণীগুলির সাফল্যের জন্য নস্ট্রাডামুসের থেকে অনেক-গুণ বেশি কৃতিত্ব তাঁর ব্যাখ্যাকারদের ॥

কবিতা—১১'র বে-মিলগুলো এবার দেখা যাক। প্রথম লাইনটা একদম মেলেনি। হেনরীর মৃত্যুর সময়ে আকাশে অস্ত্রশস্ত্রর কোনো যুদ্ধই হয়নি।

দ্বিতীয় লাইনে 'গাছ' মানে 'রাজা', বলেছেন চিটহ্যাম। এ সেই "বজ্রপাত মানে লেসার বীম" বৃত্তান্ত। সারা বই জুড়ে চিটহ্যাম এ ধরনের উদ্ভট ব্যাখ্যা বহু করেছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'ধান্দাবাজী' ছাড়া আর কী বলবো?

তৃতীয় লাইনে 'পবিত্র ডাল' বলতে চতুর্থ হেনরীর পুত্র ত্রয়োদশ লুইস-এর কথা বলা হয়েছে (আবার ধান্দাবাজী)। কিন্তু এখানে না বলে পারছি না যে, লুইস কিন্তু হেনরীর সঙ্গে মারা যান নি। হেনরী মারা যাবার বহু বছর পরে মারা গেছিলেন। তাহলে এই তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যাটাও একদম পান্সে হয়ে গেল। তাই না?

'হাদ্রী' মানেই কি 'চতুর্থ হেনরী' হতে হবে? তৃতীয় হেনরী, দ্বিতীয় হেনরী, বা প্রথম হেনরী হতে বাধা কোথায়? অথবা হায়দার নয় কেন? এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। ব্যাখ্যাকাররা কবিতা মিলিয়েই খালাস। যুক্তি তুলে ব্যাখ্যা চাইলে তাঁরা জবাব দিতে নারাজ। তাদের মুখোশ খুলে যাবে যে। কারণ, জবাব থাকলে তো জবাব দেবেন।

কবিতা—১৩ (সেঃ—৩)

Par fouldre en l'arche or & argent fondu,
De deux captufs l'un l'autre mangera
De la cite le plus grand estendu,
Quand submergee la classe nagera.

মানে :

বাক্সের ভেতর বজ্রপাতে সোনা-রুপো গলে যাবে,
দুই বন্দী একে অপরকে ভক্ষণ করবে ঃ
শহরের সবচেয়ে বড়-জনকে টেনে লম্বা করা হবে,
যখন নৌবহর যাত্রা করবে জলের তলা দিয়ে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ঃ ডুবোজাহাজ

এই কবিতাটার যে ব্যাখ্যা করেছেন চিটহ্যাম, সেটা বেশ মজাদার। মানে হাস্যকর। শেষ লাইনটাই মোটামুটি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রথম তিনটে লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিমসিম খেযে লেজেগোবরে করে ছেড়েছেন।

শেষ লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এখানে ডুবোজাহাজের কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। প্রথম লাইন মানে সম্ভবত দু-তিন রকম ধাতু গলিয়ে, জুড়ে ডুবোজাহাজ তৈরি হবে। মাঝের দু'লাইনের কোনো ব্যাখ্যা চিটহ্যাম করতে পারেন নি। তিনি বইতে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ও দুটো লাইনের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি। এই হলো নস্ট্রাডামুসের ডুবোজাহাজ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

আমাব মনে হয না এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করার প্রযোজন আছে। প্রথম তিনটে লাইন তো অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক। চতুর্থ লাইনে বলা হয়েছে 'নৌবহর যাত্রা করবে জলের তলা দিয়ে।'

এই প্রসঙ্গে বলি যে, কোনো কল্পনাশক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে ভবিষ্যতের কিছু কিছু আবিষ্কার সম্বন্ধে আন্দাজ করাটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপাব নয। আমরা দেখেছি জুল ভার্নও তাঁর উপন্যাস—'টোযেন্টি থাউজেন্ড লীগ্স্ আন্ডাব দ্য সী'তে ডুবোজাহাজ সম্বন্ধে লিখেছেন, ডুবোজাহাজ আবিষ্কৃত হবার বহু আগে। তিনি এটা কবেছেন তাঁর কল্পনাশক্তির সাহায্যে ; অলৌকিক ক্ষমতায নয। একইভাবে নস্ট্রাডামুসও তাঁর কল্পনা শক্তির সাহায্যেই ডুবোজাহাজের কল্পনা করেছেন ; অলৌকিক ক্ষমতায নয। আমরাও আগামী দিনের সম্বন্ধে কিছু কিছু কল্পনা করে রেখেছি। আগামী দিনে প্রায সকলের কাছেই থাকবে তার ব্যক্তিগত আকাশযান ; চাঁদে মানুষ আগামী দিনে বসতি গাড়বে ; আগামী দিনে এমন টেলিফোন আসবে, যাতে যার সঙ্গে কথা বলছি, তাকে দেখাও যাবে ;—এরকম কল্পনা আমার বাবা ছোটোবেলায করতেন, শুনেছি ঠাকুমার কাছে। থ্রি-ডাইমেনশন্ ছবিরও কল্পনা করতেন বাবা, বাবার ছোটোবেলাকাব গল্প শোনাতে গিযে বলেছে সোনা-পিসি। এমনই সব চিন্তা বা আরও অনেক উদ্ভট চিন্তা নিশ্চয বহু মানুষের মাথাতেই এসেছিল, আসছে, আসবে। কিন্তু এইসব কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাওযা কি-নিখুঁৎ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণযোগ্য ? অবশ্যই নয।

কবিতা—২৭ (সেঃ—৩)

Prince libinique puissant en occident,
Francois d'Arabe viendra tant enflammer,
Seavans aux lettres sera condescendant,
La langue Arabe en Francois translater

মানে :

লিবিয়ার রাজকুমার শক্তিশালী হয়ে উঠবে পশ্চিমে গিয়ে,
ফরাসিরা বন্ধুত্ব স্থাপন করবে আরবীয়দের সঙ্গে,
অতি উচ্চশিক্ষিত এই ব্যক্তি স্বয়ং,
ফরাসিতে অনুবাদ করবে আরবীয় বই।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : প্রেসিডেন্ট গদ্দাফী

প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার এরিকা মনে করেন এই কবিতাতে প্রসিডেন্ট গদ্দাফীর আগমনবার্তা আগাম জানানো হয়েছে। লিবিয়ার রাজকুমার মানে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট গদ্দাফী। 'শক্তিশালী হয়ে উঠবে পশ্চিমে গিয়ে' বলে নস্ট্রাডামুস নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিলেন যে গদ্দাফীর নাম-যশ পশ্চিমে ছড়াবে।

পরের তিন লাইন আবার অপ্রাসঙ্গিক। অন্য প্রসঙ্গে। এরিকা এই তিন লাইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একদম কিঙ্কর্তব্যবিমূঢ় (puzzled) হয়ে পড়েছিলেন ; তাঁর বইতেই একথা স্বীকার করেছেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন লাইনগুলি গদ্দাফীর প্রসঙ্গের সঙ্গে জোড়ার। (কিন্তু এ জোড় ধোপে টেঁকে না।)

বলেছেন—তৃতীয় লাইনের 'অতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিটি সম্ভবত প্রেসিডেন্ট গদ্দাফীই। চতুর্থ লাইন প্রসঙ্গে বলেছেন, ফরাসিতে কোনও আরব্য বই অনুবাদ হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই ; তবে ১৫০৫ সালে ফরাসি-আরবীয় একটা ডিকশনারী বেরিয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে সেটা অবশ্যই প্রেসিডেন্ট গদ্দাফী লেখেন নি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

কবিতাটার ব্যাখ্যার মধ্যে সত্যি বলতে কি, কিছুই নেই। লিবিয়াতে বহু রাজকুমার জন্মেছেন, শাসনেও এসেছেন। গদ্দাফী কিন্তু রাজকুমার নন। তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী উগ্রপন্থী একনায়ক প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাম পশ্চিমে ছড়িয়েছিল, ঠিক ; কিন্তু কবিতার শর্ত অনুযায়ী তিনি কিন্তু পশ্চিমে গিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন নি। কবিতাতে লেখা আছে রাজকুমারটি পশ্চিমে গিয়ে শক্তিশালী হবে। পশ্চিমে নাম ছড়াবে—এমন কথা বলা হয়নি। ওটা এরিকা'র চালাকী।

দ্বিতীয় লাইন এড়িয়ে গেছেন এরিকা। তৃতীয় লাইনটাও ঠিক নয়। গদ্দাফী এমন কিছু শিক্ষিত নন। চতুর্থ লাইনটাও যে ভুল, তা এরিকাও স্বীকার করেছেন। গদ্দাফী কোনো ফরাসি বই অনুবাদ করেন নি।

একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এরিকা গদ্দাফীর নাম জুড়লেন কেন ? কোথাও তো গদ্দাফী, বা ওই জাতীয় নামের উল্লেখ নেই কবিতাতে ? উত্তর একটাই। বিশিষ্ট লোকেদের নাম ব্যবহার করলে বই বাজারে ভালো চলবে। "গদ্দাফীর নামে নস্ট্রাডামুস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন"—এই কথাটা বলে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহলে লোকে বইটা কিনতে চাইবে। বাড়বে বইয়ের বিক্রি। এই চিন্তা মাথায় রেখেই বিশিষ্ট লোকেদের নামের সঙ্গে একেকটা কবিতা জুড়ে দেওয়া হয়॥

কবিতা—৪৪ (সেঃ—৩)

Quand l'animal a l'homme domestique,

Apres grands peines & sauts viendra parler,

De fouldre a veirge sera si malefique,

De terre prinse & suspvndue en l'air

অর্থাৎ :

যখন মানুষের পোষা সেই জানোয়ারটা

কথা বলতে শিখবে অনেক চেষ্টার পর,

বজ্রপাত, যা দণ্ডর (রড) পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক,

তাকে পৃথিবী থেকে বার করে মেলে ধরা হবে শূন্যে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : বেতার যোগাযোগ ও বিদ্যুতের আবিষ্কার

এরিকা মনে করেন এই কবিতাতে বেতার যোগযোগ, ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রথম দু'লাইনে বেতাব যোগাযোগের কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নস্ট্রাডামুস। 'সেই জানোযাবটা' আসলে কোনো জানোয়ারই নয়। 'জানোয়ার' বলতে আসলে বলতে চাওযা হয়েছে বেতার-যন্ত্রের স্পিকাবের কথা।

তৃতীয আর চতুর্থ লাইনে বলতে চাওযা হযেছে বিদ্যুতের কথা। বজ্রপাত মানেই বিদ্যুৎ। দণ্ড মানে সম্ভবত বিদ্যুৎ-নিরোধক ধাতব রড, যা বাড়ির ছাদে দেখা যায। 'মেলে ধরা হবে শন্যে', মানে বিদ্যুৎবাহী তারগুলো ঝোলানো হবে শূন্যে।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

"যখন মানুষের পোষা সেই জানোযারটা

কথা বলতে শিখবে অনেক চেষ্টাব পর,"

এখানে 'জানোযার' নিশ্চযই কাকাতুযা, টিযা, মযনা জাতীয কোনও পাখি, যাবা পোষ মানে, যাদের কথা বলতে শেখান যায় চেষ্টা করলে। কিন্তু মানুষেব পোষা সেই পাখিকে অনেক চেষ্টায কথা বলা শেখানর পর কী ? উত্তব নেই। আছে বিরাট ধাঁধাঁ অথবা নেহাতই পাগলামো।

শেষ দু'টি লাইনে আছে—দণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকারক বজ্রকে বের করে আবার ছুঁড়ে দেওযা হবে শূন্যে। অর্থাৎ নস্ট্রাডামুসের কল্পনার মতনই প্রতিফলনের সাহায্যে বজ্রকে ছুঁড়ে ফেবৎ পাঠান হবে আবার শূন্যেই।

ভাল কথা। বজ্রকে শূন্যে প্রতিফলনের সাহায্যে ফেরৎ পাঠাবার কোনও যন্ত্রের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন নস্ট্রাডামুস—এরিকা এমনতর দাবি কবলে কবিতার অর্থের সঙ্গে অনেক বেশি মিল খুঁজে পাওযা যেত। তাই নয কী ?

কবিতা—৬০ (সেঃ—৩)

Par toute Asie grand proscription,

Mesme en Mysie, Lysie & Pamphylie .

Sang versera par absolution,

D'un jeune noir rempli de felonnie

অর্থাৎ :

সারা এশিয়া জুড়ে লাগবে অশান্তি,
অশান্তি ছড়াবে মাইসিয়া, লাইসিয়া, প্যামফালিয়াতেও :
রক্ত বইবে এক কালো-চামড়া অল্পবয়সী ব্যক্তির জন্য,
যার মন অশুভ-চিন্তায় ভরা।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : সাদ্দাম হুসেন

নতুন ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন এই কবিতাতে সাদ্দাম হুসেনের কথা বলে গেছেন চারশো বছর আগের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—নস্ট্রাডামুস। এই ব্যাখ্যাটা বেরিয়েছে মাত্র ক'দিন আগে; উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হবার পরে।

সাদ্দাম হুসেনের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে মোটামুটি কবিতাটা মিলে যাচ্ছে। ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন—মাইসিয়া লাইসিয়া ও প্যামফালিয়া দেশগুলি ইরাকের কাছেই। তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ—একটু বলবেন কী, এই দেশগুলির বর্তমান নাম কী? কারণ ওই নামের কোনো দেশ এশিযাতে আছে বলে আমার জানা নেই।

ব্যাখ্যাকারদের মতে, অল্পবযসী কালো-চামড়া ব্যক্তিটিই হল সাদ্দাম হুসেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এই একটা কবিতা, যেখানে শুধু ব্যাখ্যাকারের নয়, নস্ট্রাডামুসেরও ধূর্ততা মেশানো আছে। নস্ট্রাডামুস ভালোই জানতেন যে, এশিয়ার মতো মস্তবড় জায়গায় কোনোদিন অশান্তি—রক্তপাত না হয়ে যেতে পাবে না। আর অশান্তি হলে, তার নেতৃত্ব যে কোনো কালো-চামড়া ব্যক্তিই দেবে এটাও আন্দাজ করা কঠিন নয়, কেননা সিংহভাগ এশিয়দেরই গাঢ় রঙের চামড়া। তাই সব রকম আন্দাজ মিশিয়ে লিখেছেন এ কবিতা। সফল হতে বাধ্য।

তবুধ খুঁজলে ভুল বার করা যায়। সাদ্দামকে কি কালো চামড়া বলা চলে? পাঠকরাই বলুন। সাদ্দামকে কি অল্পবযসী বলা চলে? তিরিশের মধ্যে বয়স হলে তাকে অল্পবযসী বলা যায়। সাদ্দামের বয়স, আর যাই হোক, তিরিশের মধ্যে নয়। আর গায়ের রঙটি তো খাঁটি দুধে-আলতা। অতএব....

পাঠকরা এশিয়ার ইতিহাস ঘাঁটলে অন্তত একশোটা আলাদা আলাদা 'অশান্তি'র ঘটনাব সঙ্গে এই কবিতা জুড়তে পারবেন। কবিতাটা চালাকী করে সেভাবেই লেখা।

অবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ব্যাখ্যাকাররা উপসাগরীয় যুদ্ধের আগে কেন পৃথিবীবাসীকে সাবধান কবলেন না যে, একটা মস্ত যুদ্ধ লাগতে চলেছে, সাবধান। তাহলে বহু লোক সাবধান হয়ে ইরাক বা কুযেত ছেড়ে চলে আসতো, এবং যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা পড়তো না। কেন?

মজার ব্যাপার এই যে, কোনো ঘটনা ঘটার আগে ব্যাখ্যাকাররা বিশ্ববাসীকে সাবধান করতে পারে না। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর তারা শোরগোল তোলেন যে, 'নস্ট্রাডামুস এ ঘটনার কথা আগেই বলেছিলেন'।

কেন এমন হয়, আশাকরি পাঠকরা এতক্ষণে বুঝতে পেবেছেন।

অধ্যায় পাঁচ

সেঞ্চুরি—৪

সূচি :



[illegible]

সেঞ্চুরি চার

কবিতা—১৪ (সেঃ—৪)

La mort subite du premier personnage,

Aura change & mis un autre au regne ;

Tost, tard venu a si haut & bas aage,

Que terre & mer faudra que on le craigne

এর অর্থ হল :

এক বিশাল ব্যক্তিত্বের সহসা মৃত্যুব ফলে,

এক নতুন ব্যক্তিত্ব আসবে শাসনে

এই উঁচু পদ সে পাবে অতি অল্প বয়সেই,

জলে, স্থলে, সকলেই তাঁকে করবে সমীহ।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : জন. এফ. কেনেডি

"আমেবিকার বাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডির আগমনের কথাই সম্ভবত নস্ট্রাডামুস তাব অতিন্দ্রীয় দৃষ্টিতে দেখে এই কবিতাতে লিখে গেছেন"—এরিকার ধারণা। তিনি অবশ্য এও স্বীকার করেছেন যে, এই কবিতা অন্য ঘটনার সঙ্গেও 'সম্পর্কিত' করা যেতে পাবে।

বযস্ক জেনারেল আইসেন হাওয়াবের মৃত্যুর পর শাসনে আসেন অল্পবযসী জন এফ. কেনেডি। কাজেই, হতে পারে, এই কবিতাটা কেনেডির সম্বন্ধেই লেখা।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এই কবিতাতে আর একবাব নস্ট্রাডামুসের ধূর্ততার প্রমাণ পেলাম। কবিতাটা আসলে একদম সাধারণ, যাকে বলে সাদামাটা। অতি সাধারণ বুদ্ধিতেই আন্দাজ করা যায় যে, পৃথিবীব কোথাও, কখনো এক বড় ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য এক অল্পবযসী ব্যক্তি তাঁব জায়গা নেবেন। এতো সাধারণ ঘটনা। এতো আকছারই ঘটছে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর অল্পবযসী রাজীব গান্ধী এসেছিলেন। বোমা বিস্ফোরণ হাযদার আলির মৃত্যুর পর এসেছিলেন অল্পবয়সী টিপু সুলতান।

কিন্তু নস্ট্রাডামুস কবিতাটা এমনভাবে গুরুত্ব সহকারে লিখলেন যে এই ঘটনা তিনি তাঁর অতিন্দ্রীয দৃষ্টির সাহায্যে দেখেছেন। এখানেই তাঁর ধূর্ততা। আব ব্যাখ্যাকার এরিকা কবিতাটা জুড়ে দিলেন জন এফ. কেনেডিব জীবনের সঙ্গে। এরিকার বোধহয পশ্চিমী ইতিহাসটাই বেশি জানা, তাই বেশিরভাগ কবিতাই জুড়েছেন পশ্চিমেব ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। ভাবতের ইতিহাস জানা থাকলে হযতো টিপু সুলতান, বা রাজীব গান্ধীর সঙ্গেই কবিতাটা 'সম্পর্কিত' কবে দিতেন।

পাঠকরা, আশা করি বুঝতে পেবেছেন আমি কী বলতে চাইছি।

কবিতা—৩৪ (সেঃ—৪)

Le grand mene captif d'estrange terre,

D'or enchaine au Roy CHYREN offert ·

Qui dans Ausone, Milan perdra la guerre,

Et tout son ost mis a feu & a fer

অর্থাৎ :

মস্ত মানুষটাকে বিদেশ থেকে বন্দী করে আনা হবে,

সোনার শিকলে বেঁধে তাঁকে আনা হবে রাজা CHYREN-এর কাছে :

তাঁর সমস্ত সৈন্য অসোনিয়া আর মিলান-এর কাছে পরাজিত হবে।

পরাজিত সৈন্যবা শেষ হয়ে যাবে আগুন, আর তলোয়ারের কোপে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ডঃ হেনরী কিসিন্জার

চিটহ্যাম এই কবিতার এক বিটকেল ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। কেন বিটকেল, পড়লেই বুঝবেন। তাঁর ধারণা এই কবিতাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ-সচিব ডঃ হেনরী কিসিন্জারের কথা বলতে চেয়েছেন নস্ট্রাডামুস। CHYREN' কথাটার অক্ষরগুলো অন্যরকমভাবে যদি সাজানো যায়, তাহলে HENRYC কথাটা আমরা পেতে পারি। বেশ কিছু ব্যাখ্যাকার মনে করেন HENRYC মানে চতুর্থ হেনরী। ব্যাখ্যাকাররা নতুন আরও মনে করেন এখানে এমন এক রাজার কথা বলতে চাওযা হয়েছে, যিনি এখনও জন্মান নি। ভবিষ্যতে আসবেন। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার এরিকা চিটহ্যাম বলেন 'HENRY-C' মানে প্রায় 'HENRY-K',HENRY-K মানে নিশ্চয 'HENRY KISSINGER, যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা বিদেশ সচিব।

এরিকা এর বেশি কিছু ব্যাখ্যা করতে পাবেন নি। এক লাইনও ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এই কবিতার কি-ই বা বিশ্লেষণ করবো? ব্যাখ্যার যুক্তি এত দুর্বল যে, বিশ্লেষণের প্রযোজনই রাখে না। একেই বোধহয বলে 'আনতাবড়ি মেলানোর চেষ্টা'। যুক্তির মাথা-মুণ্ডু নেই। কিসিন্জাবের জীবনের সঙ্গে কবিতার একটি লাইনও মেলে না। আরও বিদঘুটে ব্যাপার হল এই যে, কবিতার দ্বিতীয় লাইনে লেখা আছে—'রাজা CHYREN'। তাহলে মানতে হয ডঃ কিসিন্জাব রাজা ছিলেন।

এই খ্যাপাটে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাযিত্ব যুক্তিবাদী পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম॥

কবিতা—৫৯ (সেঃ—৪)

Deux assiegez en ardente ferveur,

De soif estaincts pour deux plaines tasses

Le fort lime & un vieillart resveur,

Au Genevois de Nira monstra trasse

মানে :

দুজন, জ্বলন্ত আগুনের দ্বাবা ঘেরাও হযে,

মারা পড়বে, দু কাপ পানীযর অভাবে :

কেল্লাব সৈনিকদেব এক বৃদ্ধ ভাবুক পথ দেখাবে,

'Nira থেকে জেনেভা-বাসীদেব কাছে যাবাব।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ইরান, এবং আয়াতুল্লা খুমেয়িনী

এরিকা বেশ ব্যাখ্যা করেছেন কবিতাটার। বেশ সহজ সরল। 'বৃদ্ধ ভাবুক' মানে তাঁর মতে আয়াতুল্লা খুমেয়িনী। কেন? কারণ Nira কথটার অক্ষরগুলো অন্যরকমভাবে সাজালে Iran (ইরান) কথাটা পাওয়া যায়। আর আয়াতুল্লা ইরানের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এইটুকুই ব্যাখ্যা। এরপর বাকী কবিতাটা ব্যাখ্যা করার ঝামেলার মধ্যে তিনি যাননি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

আবার হেনরী কিসিঞ্জারের কবিতাটার মতো (সেঃ—৪ ; কবিতা—৩৪) মেলানোর কায়দা। শব্দের অক্ষর অন্যরকমভাবে সাজিয়ে। এভাবে যদি 'ইরান' শব্দটা পাওয়াও যায়, তাতেই বা কী হয়েছে? তাতে কি কবিতাটা ইরানের ইতিহাসের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিলছে? প্রথম লাইন, দ্বিতীয় লাইনের ব্যাখ্যা কই? ব্যাখ্যা নেই, কেননা ব্যাখ্যা করা যায়নি। 'জ্বলন্ত আগুন', 'পানীযের অভাব',—এই কথাগুলোর মানে তাহলে কী?

আর 'বৃদ্ধ ভাবুক' মানেই আযাতুল্লা? কেন? ইরানে আর কোনো ভাবুক বৃদ্ধ নেই? বরং আযাতুল্লা তো 'ভাবুক'ই ছিলেন না। তাহলে কেন ওঁর নাম ব্যবহার করা হল? কারণ:

বিখ্যাত লোকেদের নাম ব্যবহার করলে পাঠকরা 'খায়' ভালো। অখ্যাত, অচেনা নাম ব্যবহার করলে পাঠকরা "দুর ছাই' বলে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে যে! তাই নস্ট্রাডামুসের কবিতার সঙ্গে শুধুমাত্র ঘটনার কথাই জোড়ার ধান্দা করেন ব্যাখ্যাকাররা॥

কবিতা—৯২ (সেঃ—৪)

Teste tranchee du vaillant capitaine,
Sera gettee devant son adversaire.
Son corps pendu de la classe a l'antenne,
Confus fuira par rames a vent contraire.

অর্থাৎ :

জাহাজের সাহসী ক্যাপ্টেনের মাথাটা কেটে,
ছুঁড়ে দেওয়া হবে তাঁর নাবিকদের সামনে :
তাঁর ধড়টা ঝুলিয়ে রাখা হবে মাস্তুলের সঙ্গে,
নাবিকরা দাঁড় টেনে পালাবে, বাতাসের উল্টোদিকে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : রেডিও, বা রাডারযন্ত্র আবিষ্কার

'রেডিও, বা বাডারযন্ত্র'—এই হেডিংটা কবিতার পর পড়ে নিশ্চয অবাক হয়ে যাচ্ছেন? আমিও এরিকার বই—THE PROPHECIES OF NOSTRADAMUS-এ কবিতাটির এই ব্যাখ্যা পড়ে হতবাক হযে গিযেছিলাম। কবিতাটা স্পষ্টতই কোনো জাহাজ ও তার নাবিকদের

সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী চিটহ্যাম মনে করেন তৃতীয় লাইনে যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ—"তাঁর ধড়টা ঝুলিয়ে রাখা হবে মাস্তুলের সঙ্গে", তার দ্বারা নস্ট্রাডামুস বলতে চেয়েছিলেন রেডিও, বা রাডার যন্ত্রের কথা। কেননা রাডারযন্ত্রও ওভাবেই লাগানো থাকে কোনো মাস্তুলের মতো দেখতে 'টাওয়ার'এর সঙ্গে।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

চিটহ্যামের এইরকম সাংঘাতিক যুক্তি পড়ে আমি-ই আমার যুক্তি হারিয়ে ফেলছি। এই কবিতার এমনতরো ব্যাখ্যা পড়ে হাসবো না কাঁদবো, বুঝতেই পারছি না। এটা কি কোনো ব্যাখ্যা হল?

জাহাজের ক্যাপ্টেনটি কে? তার মুণ্ডু কেটে নাবিকদের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া হবে, মানে কী? নাবিকরা দাঁড় টেনে পালাবে কেন? —এসব প্রশ্নের জবাব মেলে না শ্রীমতী চিটহ্যাম-এর ব্যাখ্যাতে। এক একটা লাইনের এক একটা আজগুবি ব্যাখ্যা করেই তিনি খালাস। এ ব্যাখ্যা ধোপে টেকে কই?

অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এরিকা গম্ভীর মুখে বলে গেলেন যে নস্ট্রাডামুস রাডারযন্ত্র সম্পর্কে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন! ভবিষ্যদ্বাণীটা আসলে কী, তা কিন্তু তিনি বললেন না। (অনুষ্ঠানটার ভিডিওক্যাসেট আনিয়ে দেখেছি।)

এই কবিতার কি আর খোলসা করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে? মনে হয় না। যুক্তিবাদী পাঠকরা, নিশ্চয়ই এর বিশ্লেষণ নিজেরাই করে নিতে পারবেন। যুক্তি দিয়ে বিচার করে যদি মনে হয় এরিকার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য, তাহলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। গ্রহণযোগ্য মনে না হলে অবশ্যই করবেন বর্জন॥

কবিতা—১৯ (সে:—৪)

L'aisne vaillant de la fille du Roy,
Repoussera si profond les Celtiques
Qu'il mettra foudres, combien en tel arroi,
Peu & loing puis Profond es Hesperiques.

এর অর্থ :

এক রাজার কন্যার বড় ছেলে,
ফরাসিদের তাড়াবে দূরে :
সে ব্যবহার করবে বজ্রপাত,
আঘাত হানবে সুদূর পশ্চিমেও।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : মিসাইল, রকেট

এই কবিতাতেও আবার এরিকার অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। প্রথম দু-লাইনের ব্যাখ্যা নেই। পরের দু-লাইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরিকা বলেছেন, তাঁর ধারণা এখানে মিসাইল, রকেট ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। 'বজ্রপাত' মানে আসলে মিসাইল, বা রকেট।

বজ্রপাত দ্রুত ছুটে গিয়ে যেখানে পড়ে, সেখানে তছনছ করে দেয় তেমনি রকেট, বা মিসাইলও দ্রুত ছুটে গিয়ে যেখানে পড়ে, সেখানে করে তছনছ। অতএব এখানে নির্ঘাৎ মিসাইল বা রকেটের কথাই বলতে চেয়েছেন নস্ট্রাডামুস।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

প্রথমেই জানতে ইচ্ছে করছে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের ব্যাখ্যা কোথায়। এরিকা যেটুকু ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, করেছেন। যেটুকু করতে অসুবিধা হয়েছে, করেন নি। বাঃ! একজন ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাঁর কর্তব্য হল,—অবশ্যই পুরো কবিতাটার ব্যাখ্যা করা নতুবা ব্যাখ্যাদানে বিরত থাকা।

যাহোক, 'বজ্রপাত' মানে এখানে মিসাইল বা রকেট। ভালো। 'বজ্রপাত' মানেই আবার সেঞ্চুরি—১এর কবিতা—২৬এ (এই বইতেই কবিতাটা আছে) এরিকার মতে-বুলেট। আবার অন্য এক ব্যাখ্যাকার সি. ডেলটা (C.Delta)-র মতে 'বজ্রপাত' মানে লেসারগান থেকে ছোঁড়া লেসার-রশ্মি।

একটা শব্দের এত রকম ব্যাখ্যা হয়? সেঞ্চুরি—১এর কবিতা—২৬-এ যদি 'বজ্রপাত' মানে বুলেট হয়, তাহলে এই কবিতাতেও 'বজ্রপাত' মানে বুলেট হবে না কেন?

এরিকার মতো সুবিধেবাদী ব্যাখ্যাকাররা শব্দের ব্যাখ্যা নিজেদের সুবিধেমতো করে কিছু মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ঠকতে পারেন; কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্য ঠকাতে পারেন; সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ঠকাতে পারেন; কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য ঠকাতে পারবেন না!

কেন এরিকাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি

পাঠকদের মনে হতে পারে, আমি এরিকা চিটহ্যামকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি। অন্যান্য ব্যাখ্যাকাররাও তো আছেন। তাদের কথা তো অত তুলছি না?

কারণ, ওয়াকিবহাল পাঠকরা হয়তো জানেন যে, এরিকা চিটহ্যাম হল নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এমন একটা কিংবদন্তী নাম, যে নামের ধারে কাছে অন্য কোনো নাম আসেই না। এরিকা তাঁর তিনটে বই—THE PROPHECIES OF NOSTRADAMUS, THE FURTHER PROPHECIES OF NOSTRADAMUS; এবং THE FINAL PROPHECIES OF NOSTRADAMUS লিখে যে বিপুল পরিমাণ খ্যাতি, যশ ও অর্থ পেয়েছেন, তার হাজার ভাগের একভাগও অন্য কোনো ব্যাখ্যাকার পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। অতএব এরিকাকে গুরুত্ব দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তথাপি আমি অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাও জায়গায় জায়গায় হাজির করেছি, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি প্রায় সব ব্যাখ্যাকাররাই এরিকা ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। যাকে বলে টুকে মারা আর কী।



এরিকা চিটহ্যাম



এরিকার তিনটি বই—

অধ্যায় ছয়

সেঞ্চুরি—৫

সূচি :

১। কবিতা—৮ : বোমা।

২। কবিতা—১১ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৩। কবিতা—২৪ : (ব্যাখ্যাকারের একটি ডিগবাজি।)

৪। কবিতা—৪৪ : অসফল ভবিষ্যদ্বাণী।

৫। কবিতা—৬৮ : ইরানের শাহ।



সেঞ্চুরি—পাঁচ

কবিতা—৮ (সেঃ—৫)

Sera laisse le feu vif, mort cache,
Dedans les globes horrible espouvantable,
De muict a classe cite en poudre lasche,
La cite a feu, l'ennemi favorable

অর্থাৎ :

মৃত্যু আর আগুন লুকিয়ে থাকবে
ওই ভয়ানক গোলকগুলিতে,
রাতারাতি সৈন্যদল শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে,
জ্বলতে থাকবে শহর, উল্লাস করবে শত্রুরা।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : বোমা

চিটহ্যাম বলেছেন, এই কবিতাতে যে গোলকের কথা বলা হয়েছে, তা বোমা ছাড়া আব কিছুই নয়। বোমাই পারে শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে, আর একই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে। ভবিষ্যতে বোমা তৈরি হবে—তাও জানতে পেরেছিলেন নস্ট্রাডামুস ?

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :—

পাঠকরা, কবিতাটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে? মিলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? কিন্তু না, আপনারা শুনলে হযতো নিরাশ হবেন যে, নস্ট্রাডামুসের সময়েও গোলাবারুদ, কামান ইত্যাদি ছিল। এবং সেগুলি যুদ্ধে বিপুলভাবে ব্যবহার করা হত। নস্ট্রাডামুস যখন কামান, গোলাবারুদ দেখেইছেন, তখন তাঁব পক্ষে বোমা-গোছেব কোনো বস্তুর আগমন কল্পনা কবে নেওযা কঠিন, বা অসম্ভব কাজ ছিল না, কেননা তিনি ছিলেন বেশ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। (কল্পনাশক্তি সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা আছে সেঞ্চুরি—৩এর কবিতা—১৩-র বিশ্লেষণে। প্রযোজন অনুভব করলে দযা কবে সেই অংশটা আবাব পড়ুন।

কবিতা—১১ (সেঃ—৫)

Mer par solaires seure ne passera,
Ceux de Venus tiendront toute l'Affrique
Leur regne plus Saturne n'occupera,
Et changera la part Asiatique.

এব মানে হল :

সূর্যের মানুষবা নিবাপদে সমুদ্র-পারাপাব করতে পারবে না,
শুক্রেব মানুষরা দখল নেবে গোটা আফ্রিকার :
শনি তাদের রাজ্যকে বেশিদিন ধবে রাখতে পারবে না,
আব, এশিযার চেহাবা অনেকটাই যাবে বদলে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সূর্যে মানুষ থাকতে পারে না, তাই 'সূর্যের মানুষরা' মানে আসলে জাপানের মানুষরা। এই সিদ্ধান্তে এসেছেন শ্রীমতী এরিকা চিটহ্যাম। কারণ জাপানের পতাকায় সূর্য আছে। প্রথম লাইনের ব্যাখ্যা হল এই যে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পরমুহূর্ত থেকেই জাপানের জাহাজগুলোর নিরাপত্তা গিয়েছিল কমে। সব সময়ে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে তটস্থ হয়ে সমুদ্র পারাপার করতে হত জাপানী জাহাজগুলিকে।

দ্বিতীয় লাইনের ব্যাখ্যাটা আরও মজাদার। এরিকা বলেছেন, এখানে Venus মানে শুক্রগ্রহ নয়। এখানে 'ভেনাস' বলে নস্ট্রাডামুস আসলে 'ভেনিস' শহরের কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ইতালির কথা। অর্থাৎ কিনা ইতালি দখল নেবে গোটা আফ্রিকার।

এরিকা বলেছেন যে, তৃতীয় লাইনের অর্থটা একটু বুদ্ধি করে বুঝে নিতে হবে। তৃতীয় লাইনে আসলে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, শনির প্রকোপের ফলে ইতালি বেশিদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না।

চতুর্থ লাইন—'আর এশিয়ার চেহারা অনেকটাই যাবে বদলে। 'চেহারা' মানে আসলে 'অবস্থা' অর্থাৎ কিনা এশিয়াতে লোকজনের অবস্থা যাবে বদলে। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, ইত্যাদি।

মোট কথা এই কবিতাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলতে চাওযা হযেছে।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :–

এই কবিতাতে এরিকা যেভাবে গাদাগাদি জাযগায 'এই মানে আসলে এই বলতে চাওয়া হযেছে'—বলে গেছেন, তাতে ব্যাখ্যাতে আসল কতিবতাটির ছিঁটেফোঁটাও স্বাদগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায না। আমার আশ্চর্য লাগছে, পৃথিবীর যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এরিকার ব্যাখ্যা পড়ে প্রভাবিত হযেছেন তাঁরা এরিকার প্রতারণার ফাঁদে এতটাই জড়িযে পড়েছিলেন যে, সামান্য ফাঁক এবং ফাঁকিগুলো ও ধরতে সক্ষম হন নি। মানুষ অলৌকিক গল্প শুনতে ভালোবাসে, ভাবতে ভালোবাসে যে, অলৌকিক উপাযে অবাস্তব ঘটনা ঘটানো সম্ভব। সেই জন্যেই এরিকাব অপব্যাখ্যাগুলি তামাম দুনিয়ার মানুষ এত গোগ্রাসে গিলেছে, এবং বিশ্বাস করেছে।

সূর্যের মানুষরা মানে জাপানের মানুষই শুধু কেন ? কেন বাংলাদেশের নয ? বাংলাদেশের পতাকাতেও তো সূর্য আছে ; আছে কোরিযার পতাকাতেও। এর কোনো উত্তর নেই।

শুক্রগ্রহকে (VENUS) যেভাবে এরিকা "ভেনিস' বুঝিয়েছেন, তা দেখে মনে হচ্ছে বুধ গ্রহকে (MERCURY) উনি 'মরোক্কো' (MOROCCO) দেশ বলে বুঝিযে দিতে পাবতেন। বলে রাখা ভালো যে, ইতালি কোনোদিনই গোটা আফ্রিকা কেন, আফ্রিকার অংশবিশেষকেও জয করতে পাবেনি।

'শনিব প্রকোপ'—এই কথাটা কতটা অসার, তা এই অলৌকিক নয লৌকিক, ৩য খণ্ডের প্রথম ভাগটা পডলেই বোধকবি বুঝতে পারবেন। ' ..তাদের রাজ্যকে বেশিদিন ধবে রাখতে পারবে না'—এই দুটো কথা কি কবে এক হয ? এরিকা বলেছেন একটু বুদ্ধি করে বুঝে নিতে হবে। কই, আমি তো অনেক বুদ্ধি খাটিযেও বুঝতে পারছি না ? আসলে বোধহয আমারই বুদ্ধি কম।

চতুর্থ লাইনে 'চেহারা' আব 'অবস্থা' শব্দ দুটো নিয়ে একই কাযদা কবেছেন এরিকা।

কবিতা—২৪ (সেঃ—৫)

(গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। কেননা কবিতা—১১র সঙ্গে এই কবিতাটার দারুণ মিল। অথচ ব্যাখ্যা একেবারে অন্যরকম)

Le regne & lois souz Venus esleve,
Saturne aura sus Jupiter empire
La loi & regne par le Soleil leve,
Par Saturnins endurera le pire

অর্থ :

শুক্রের শাসনকালে রাজ্যের অবস্থা, ও আইন নিয়ে প্রশ্ন উঠবে,
শনির প্রভাব হবে বৃহস্পতির থেকে বেশি :
সূর্যের সময়ে রাজ্যের অবস্থা ও আইনের উন্নতি হবে,
শনির সময়টাই হবে সবচেয়ে খারাপ সময়।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : (ব্যাখ্যাকারের একটি ডিগবাজি।)

এরিকা এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা জব্বর ডিগবাজি খেয়েছেন। এর ঠিক আগে যে কবিতাটা বিশ্লেষণ করেছি, অর্থাৎ কবিতা—১১, (সেঞ্চুরি—৫) সেটাতেও সূর্য, শুক্র, শনি ইত্যাদি শব্দগুলি আছে, আপনারা দেখেছেন। তার কী কী ব্যাখ্যা করেছেন এরিকা, তাও আপনারা দেখেছেন। এবার এই কবিতাতেও সেই একই শব্দগুলির কী কী ব্যাখ্যা করেছেন, দেখুন :

এরিকা বলেছেন তিনি এই কবিতার কোনো 'সন্তোষজনক ব্যাখ্যা' খুঁজে পান নি। বলেছেন এখানে সূর্য, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বলে বোধহয় কোনো একটা সময় বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য 'সূর্য' বলতে এখানে রাজা পঞ্চম চার্লস বা ক্যাথলিক গির্জার কথাও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে।

এরিকার ব্যাখ্যা এখানেই শেষ। বেশ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা'কে সম্পর্কিত করতে পারেননি তিনি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

ডিগবাজিটা লক্ষ্য করেছেন? কবিতা—১১তে 'শুক্র' মানে ইতালি, আর এখানে কবিতা—২৪এ 'শুক্র' মানে 'শুক্রগ্রহ'? মজা তো! আর কবিতা—১১তে 'সূর্য' মানে জাপান, আর কবিতা—২৪এ 'সূর্য' মানে পঞ্চম চার্লস, অথবা ক্যাথলিক চার্চ?

এরিকার এই বিভিন্ন কবিতায় একই শব্দের বিভিন্ন রকমের মানে তৈরি করার স্বভাবের সঙ্গে আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভালোই পরিচিত হয়ে গেছেন। নস্ট্রাডামুসের কবিতাগুলিকে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলে চালানোর জন্য, আর পাঠকদের বোকা বানানোর জন্য এরিকার এই চালবাজিটা অত্যন্ত জরুরী।

কবিতা—৪৪ (সেঃ—৫)

Par mer le rouge sera prins de pirates,

La paix sera par son moyen troublee :

L'ire & l'avare commettra par fainct acte,

Au grand pontife sera l'armee doublee.

অর্থাৎ

সমুদ্রের ওপর লাল-মানুষটিকে হরণ করবে জলদস্যুরা,

ফলে, আসবে অশান্তি, খারাপ সময় :

সে একটা মিথ্যে অভিনয়ের মাধ্যমে রাগ ও লোভ দেখাবে,

পোপ-এর সৈন্য দ্বিগুণ করা হবে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : অসফল ভবিষ্যৎবাণী

এরিকা এখানে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অসফল। অর্থাৎ তিনি তাঁর জানা কোনো ঘটনার সঙ্গে কবিতাটিকে জুড়তে ব্যর্থ হয়েছেন। কবিতাটায 'লাল মানুষটি' মানে পোপ*। ষোড়শ শতক পর্যন্ত পোপদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী থাকত। এরিকা স্বীকার করেছেন, ষোড়শ শতক বা তারও পর অবধি কোন পোপকে জলদস্যুরা হরণ করেন নি॥ অতএব ভবিষ্যদ্বাণীটি অসফল। (বলে রাখা ভালো, সব সেঞ্চুরিতেই কযেকটি করে কবিতাকে এরিকা 'অসফল ভবিষ্যদ্বাণী' বলে ঘোষণা করেছেন। আমি তাদেব মধ্যে থেকে শুধু একটা বেছে নিলাম আপনাদের উদাহরণ দেবার জন্য।)

---

* পোপ : বিশ্বের সমস্ত ক্যাথলিক খ্রিশ্চান ধর্মযাজকদের মধ্যে সবচেযে উঁচু পদাধিকাবী ব্যক্তি।

কবিতা—৬৮

Dans le Danube & du Rhin viendra boire,

Le grand Chameau ne s'en repentura .

Trembler du Rosne & plus fort ceux de Loire,

Et pres des Alpes coq le ruinera.

এব মানে দাঁড়ায় :

মস্তবড় উট আসবে দানিয়ুব, আর রাইন এর জলপান করতে,

এজন্য তার কোনো লজ্জা বা অনুতাপ হবে না :

রোন, আর লয়ার-এর লোকজন ভয়ে কাঁপবে থরথর,

আল্পস পর্বতের কাছে এক মোরগ তাকে করবে পরাজিত।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ইরানের শাহ্

আবার এরিকার ছোট্ট ব্যাখ্যা। মাত্র চার লাইনের। এই চার লাইনে এরিকার যা বক্তব্য, তা হল এই :

কবিতাটা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তবে 'উট' বলে হয়ত কোনো আরব্য-নেতার কথা বলতে চাওযা হযেছে, কেননা আরব দেশগুলিতে অঢেল উট। এই নেতাটি হযত বা ইরানেব বিখ্যাত শাহ্। কেননা শাহ্'র জীবনে ফ্রান্সের গুরুত্ব আছে। আর কবিতাতেও ফ্রান্সের একটা নদী (বোন) 'র কথা বলা হযেছে। তবে জার্মানির সঙ্গে শাহ্'র যে সম্পর্কের কথা কবিতাতে বলা হযেছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। (রাইন জার্মানি দিয়ে বয়ে যায়।)

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এরিকা কবিতাটার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। যেটুকু করেছেন, সেটুকুও নড়বড়ে। 'উট' মানে যদি আরব্য নেতাই ধরি, তাহলে ইরানের নেতার নাম করলেন কেন? ইরান আব আরব কী এক? আর ইরানের শাহ্'ব কথাই বলা হযেছে বলে যদি ধরে নিই, তাহলেই বা গোটা কবিতাটার অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? দানিযুব, আব রাইন-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? দ্বিতীয লাইনেব 'লজ্জা' বা 'অনুতাপ'এর প্রশ্নই বা উঠছে কেন?

সর্বশেষ সওযাল, আল্পস্-এর কাছে মোরগটি কে? শাহ তো কখনও আল্পস্-এর কাছে কোনো যুদ্ধে পবাজিত হন নি। তাহলে এমন ব্যাখ্যা করার প্রযোজন কী? এ কবিতার প্রায সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গেই তো শাহ্'র জীবন একেবারেই মিলছে না। অথচ এরিকা'র বইয়ের পেছনেব মলাটে কালোর ওপর সাদা দিযে লেখা :

"..'তাঁব অতীন্দ্রিয দৃষ্টিতে দেখেছিলেন লন্ডনের ভযাবহ অগ্নিকাণ্ড', দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ, এবোপ্লেন আবিষ্কার, জন এফ. কেনেডির হত্যাকাণ্ড, আযাতুল্লা খুযেমিনী, এবং ইরানের শাহ ..... ।"



অধ্যায় সাত

সেঞ্চুরি—৬

সূচি ঃ

১। কবিতা—৭ ঃ হিটলার ও মুসোলিনী।
২। কবিতা—২১ ঃ এইড্‌স্ রোগ।
৩। কবিতা—৫ ঃ এইড্‌স্ রোগের ওষুধ।
৪। কবিতা—২৩ ঃ ফরাসি বিপ্লব।
৫। কবিতা—৪৯ ঃ স্বস্তিক চিহ্ন।



সেঞ্চুরি—ছয়

কবিতা—৭ (সেঃ—৬)

Norneigre & Dace, & l'isle Britannique,
Par les unis freres seront vexees ·
Le chef Romain issue de sang Gallique,
Et les copies au forestz repoulsees.

অর্থ :

অবস্থার অবনতি হবে নরওয়ে, ডাসিয়া ও ব্রিটেনের,
এই দুই সম্মিলিত ভাইযের জন্য :
এই রোমান নেতা, যার জন্ম আসলে ফ্রান্সে,
বিপক্ষ সৈন্যদের পিছু হটিযে ঢুকিযে দেবেন অরণ্যে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : হিটলার ও মুসোলিনী

এরিকা চিটহ্যামে'র মতে, এখানে যে দুই ভাইযেব কথা বলতে চাওযা হয়েছে, বাস্তবে তাঁরা ভাই-ই নন। আসলে এখানে বলতে চাওযা হযেছে হিটলার আর মুসোলিনী'র কথা। তাঁদের সম্মিলিত শক্তির জন্য যে সব জাযগার অবস্থার অবনতি হযেছিল, তার মধ্যে ছিল নরওযে, ডাসিযা (বুমানিযা) ও ব্রিটেন। আর চতুর্থ লাইনে যে 'বিপক্ষ সৈন্য'দের কথা বলা হযেছে, তা আসলে তাঁদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জন-আন্দোলন। সে আন্দোলনকে তাঁরা পিছু হটাতে পেবেছিলেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এই ব্যাখ্যার সবচেযে বড খুঁতই হচ্ছে তৃতীয় লাইনটা—"এই বোমান নেতা, যাব জন্ম আসলে ফ্রান্সে", যেটাকে সাবধানে এড়িযে গেছেন এরিকা। হিটলার বা মুসেলিনী, কেউই বোমান নেতা ছিলেন না, ফ্রান্সেও জন্মান নি।

নস্ট্রাডামুস এই কবিতাতে স্পষ্টতই দুই ভাই, অর্থাৎ সহোদরেব কথা বলতে চেয়েছেন। হিটলাব-মুসোলিনী মোটেই ভাই ছিলেন না। এবিকা তাঁর ছলচাতুরীর দ্বারা আমাদের বোঝাবাব চেষ্টা করেছেন, এখানে 'ভাই' কথাটা ভিন্ন অর্থে প্রযোগ করা হয়েছে। কিন্তু যুক্তিবাদী হিসেবে আমবা তা মেনে নিতে পারি না।

একইভাবে এরিকা আমাদের মধ্যে 'বিপক্ষ সৈন্য', আর 'বিবোধী জন-আন্দোলন' শব্দেব মানে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা কবেছেন। 'অবণ্য'টা তাহলে কী ?—এ প্রশ্নেরও উত্তর মেলে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে এ কবিতাতে এরিকার ব্যাখ্যায় মিলের চেযে গরমিলই বেশি।

কবিতা—২১ (সেঃ—৬)

Quant ceux du polle artiq unis ensemble,
En Orient grand effrayeur & crainte

Eslun nauveae, soustenu le grand tremble,

Rhodes, Bısance de sang Barbare taıncte.

এর মানে :

যখন উত্তরমেরুর মানুষরা এক হবে,

তখন পূর্বে ছড়াবে ভয় আর বিভীষিকা :

নতুন একজন নির্বাচিত হবেন, তাকে সমর্থন

করবেন ভীতসন্ত্রস্ত আর এক ব্যক্তি,

রোডস ও বাইজানটিয়ামে ছড়িয়ে পড়বে ইতরদের রক্ত।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : এইড্‌স্ রোগ

এরিকার নতুন বই "THE FINAL PROPHECIES OF NOSTRADAMNS'-এ তিনি লিখেছেন যে, এ কবিতা বলতে চাইছে 'এইড্‌স্' রোগের কথা। প্রথম দুটো লাইনের দ্বারা বোঝাতে চাওযা হয়েছে যে এইড্‌স্ রোগের বিরুদ্ধে উত্তর মেরুর সমস্ত মানুষ একত্রিত হবেন ; 'এইড্‌স্'-এর বিভীষিকার ভযে। তৃতীয ও চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা নেই।

এরিকা আরও বলেছেন যে, এই কবিতবাটির সঙ্গে এই সেঞ্চুরিরই কবিতা—৫ কে মিলিয়ে পড়তে হবে। কেননা কবিতা—৬এর সঙ্গে এই কবিতার বেশ মিল আছে। দেখা যাক কবিতা পাঁচ-এ কী বলা হযেছে :

কবিতা—৫ (সেঃ—৬)

Sı grand famıne par unde pestifere,

Par pluıe longue le long du polle arctıque,

Samarobrın cent lıeux de l'hemısphere,

Vıvront sans loı exempt de pollıtıque.

অর্থাৎ :

মস্ত দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে প্লেগ রোগের পর,

ছড়াবে গোটা উত্তর মেরুতে,

সামারোবির্ন, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একশো লীগ দূরে*

তারা আইনমান্য করবে না, অবসর নেবে রাজনীতি থেকে।

---

*লীগ : দূরত্বের মাপবিশেষ (প্রায় ৩১/২ মাইল)

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : এইড্‌স্ রোগের ওষুধ

চিটহ্যাম মনে করেন, এই কবিতাতে এইড্‌স্ রোগের ওষুধের হদিশ দেওযা আছে। তাঁর মতে, নস্ত্রাডামুস যাকে প্লেগ রোগ বলেছেন, সেটা আসলে এইড্‌স্। এইড্‌স্ ছড়াবে গোটা উত্তর মেরুতে।

তৃতীয় লাইনে যে 'সামারোর্বিন'-এর কথা বলা হয়েছে, সেইটাই হয়ত এইড্স্-এর ওষুধের নাম। এবং এই ওষুধ হয়ত তৈরি হবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দূরে, কোনো মহাকাশে ভাসমান ল্যাবরেটরিতে।

চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা নেই।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ (কবিতা—২১, এবং ৫এর) :

এরিকা এইড্স্'-এর ওপরই এত জোর দিলেন কেন বুঝলাম না। কবিতা—২১-এ তো কোথাও কোনো রোগ ছড়াবার কথা লেখা নেই? কবিতা—৫-এ প্লেগ রোগের উল্লেখ আছে; কিন্তু প্লেগ আর এইড্স্-এ তো আসমান-জমিন ফারাক। এরিকা তাঁর বইতে সময়োপযোগী তথ্য ঢোকানোর ইচ্ছায় এই 'প্লেগ'কে 'এইড্স্' বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাহলে কবিতা—২১-এর তরতীয় ও চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা কী? কবিতা—৫-এর চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা কী?

সত্যি বলতে কি, কবিতা—২১-এর সঙ্গে এইড্স্-এর কোনো যোগাযোগই খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা কবিতাটা আবার পড়ে দেখুন তো, কোনো যোগাযোগ পান কি না এইড্স্'এর সঙ্গে?

কবিতা—৫-এর 'প্লেগ' ও 'এইড্স্' নিয়ে এইমাত্র আলোচনা করেছি। আর তৃতীয় লাইনটার সত্যতা যেহেতু এখনও যাচাই করার সময় আসেনি, সেহেতু আমরা অপেক্ষায় রইলাম। দেখা যাক, এইড্স্-এর ওষুধের নাম 'সামারোর্বিন' হয় নাকি, এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরে কোনা মহাকাশে-ভাসমান গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয় নাকি?

কবিতা—২৩ (সেঃ—৬)

D'esprit de regne munismes descriees,
Et seront peuples esmuez contre leur Roi
Paix faict nouveau, sainctes loix empirees,
Rapis onc fut en si tres dur arroi

এর মানে দাঁড়ায় :

সরকারী প্রতিরোধ পড়বে ভেঙে,
দেশের মানুষ খেপে উঠবে রাজার বিরুদ্ধে :
নতুন করে শান্তি আসার পর আইনকানুন হয়ে যাবে আরও খারাপ,
রাপিসে আগে কখনও এমন অশান্তি ঘটেনি।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ফরাসি—বিপ্লব

চার লাইনের ছোট্ট ব্যাখ্যায় এরিকা ঘোষণা করেছেন যে, এই কবিতাতে ফরাসি-বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, প্রথম তিনটে লাইন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। চতুর্থ লাইনে

'রাপিস' বলে নস্ট্রাডামুস সম্ভবত 'প্যারিস', অর্থাৎ ফ্রান্সের নাম বলতে চেয়েছিলেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

খেয়াল করলেই দেখবেন, কবিতাটা এমনভাবে লেখা যে, এটা বহুদেশের বহু ঘটনার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ কবিতাটা খুবই সার্বজনীন, ইংলিশে যাকে বলে, 'VERY GENERAL', কেননা, যে ঘটনা কবিতাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে বহু ঘটে। নস্ট্রাডামুসের সময়েও ঘটতো, এখনও ঘটে। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ; এমন উদাহরণ এত বেশি যে, বলে শেষ করা যাবে না। (যেমন, চাউসেস্কুকে সরানো।) কিন্তু তবু এরিকা কবিতাটার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘটনা (এক্ষেত্রে ফরাসি-বিপ্লব)-র সঙ্গে জুড়ে দিলেন। প্রমাণ করার জন্য বোঝালেন যে, 'রাপিস' মানে আসলে 'প্যারিস'। কেন তা হবে? নস্ট্রাডামুস নিজে ফ্রান্সে থাকতেন। ফ্রান্সকে বোঝাতে হলে 'ফ্রান্স'ই লিখতেন। 'রাপিস' লিখতে যাবেন কেন? অতএব এরিকার যুক্তিটা ঠিক মানতে পারলাম না।

তৃতীয় লাইনের আলাদা করে ব্যাখ্যা করেন নি এরিকা। জানতে ইচ্ছে হয়, তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যা কী, কেননা তৃতীয় লাইনটা কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের যুক্তিকে সমর্থন করছে না॥

কবিতা—৪৯ (সেঃ—৬)

De la parue de Mammer grand Pontufe,
Subjugera les confins du Danube
Chasser les croix par fer raffe ne riffe,
Capitfz, or, bagues plus de cent mille rubes.

অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

মহান পোপ, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে,
দখল নেবেন দানিয়ুব নদীর তীর :
ক্রুসের দায়িত্ব পেয়েছিলেন যেমন—তেমনভাবে,
পাবেন বন্দী, সোনা-গয়না, এবং একশোরও বেশি চুনি।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : স্বস্তিক-চিহ্ন

অবাক হয়ে যাচ্ছেন? ভাবছেন,—এ কি রে বাবা? এই কবিতাতে আবার স্বস্তিক-চিহ্নের কথা কোথায়? আমিও তাই ভেবেছিলাম। এরিকা চিটহ্যাম কিন্তু মনে করেন যে, নস্ট্রাডামুস এ কবিতাতে হিটলার ও তাঁর স্বস্তিক চিহ্নেরই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

ব্যাখ্যাতে পোপ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। থুড়ি, আছে। শুধু এইটুকুই বলা আছে যে, পোপ-এর স্থানটা এই কবিতাতে পরিস্কার নয়।

এরিকা বলেছেন যে, হিটলারের বাহিনী দানিয়ুবের তীর দিয়ে গেছেন। তাঁরা ইহুদি বন্দীদের কাছ থেকে অনেক সোনা-গয়না কেড়েও নিয়েছিলেন।

তৃতীয় লাইনটা একটু বুঝে নিতে হবে। 'যেমন-তেমনভাবে' কথাটা বলা হয়েছে কবিতার তৃতীয় লাইনে (raffe ne riffe)। 'যেমন-তেমনভাবে'র আধুনিক ইংরাজী করলে বলা যায় 'by hook, or by crook'। এখানে 'crook' শব্দটা একটু পাল্টে দিলে হয় crooked, অর্থাৎ 'বাঁকা'। এই লাইনেই আবার 'ক্রস' কথাটাও আছে। দুটো শব্দ যদি আমরা জুড়ে দিই, তাহলে পাই—বাঁকানো ক্রস। ক্রস হল + এইরকম। আর স্বস্তিক চিহ্ন হল এইরকম। অর্থাৎ বাঁকানো ক্রসই হল স্বস্তিক চিহ্ন। —এই ছিল শ্রীমতী চিটহ্যামের ব্যাখ্যা।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

কবিতাটা পড়ে আমার মনে হয়েছে নস্ট্রাডামুস এমন কোনো পোপেব ভবিষ্যদ্বাণী করতে চেয়েছিলেন, যিনি নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে নানা অমানবিক কাজকর্ম করবেন। কিন্তু এমনটি আজ পর্যন্ত ঘটেনি। তাই এরিকা কবিতাটাকে মেলাবার চেষ্টা কবেছেন অন্য ঘটনার সঙ্গে। হিটলার, তাঁর নাৎসিবাহিনী ও স্বস্তিক চিহ্নের সঙ্গে।

কিন্তু কবিতাতে উল্লিখিত 'মহান পোপ'-এর জায়গায় আমরা কী কবে হিটলারকে কল্পনা কবে নিই? আমরা তো একেবারে গাধা নই যে, এরিকা যা খাওযাবেন, তাই খাবো।

'ক্রসের দ্বায়িত্ব পেয়েছিলেন যেমন-তেমনভাবে'—এই লাইনের যেভাবে ব্যাখ্যা কবে এরিকা বুঝিয়েছেন যে, এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে হিটলারের চিহ্ন হবে স্বস্তিক চিহ্ন, সে ব্যাখ্যা পড়ে আমারই মাথা ঝিমঝিম কবেছে। এরিকার মনোবলেব প্রশংসা করতেই হয়। বলতেই হয়, মগজধোলাইয়ের চেষ্টায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর চেষ্টাব ঘাটতি নেই। ঘাটতি যতটুকুর, তা হলো যুক্তিব।

কিন্তু না, তৃতীয় লাইনেব ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করে আর আপনাদের বিবক্ত কববো না। ওব বিশ্লেষণ আপনারাই কবে নিতে পারবেন বলে আমাব বিশ্বাস।

এরিকা কোন্ সেঞ্চুরির ক'টি করে কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন

সেঞ্চুরি এক—৭৪টি কবিতা
সেঞ্চুরি দুই—৬৫টি কবিতা
সেঞ্চুবি তিন—৬৮টি কবিতা
সেঞ্চুরি চার—৫১টি কবিতা
সেঞ্চুবি পাঁচ—৬১টি কবিতা
সেঞ্চুরি ছয—৪৬টি কবিতা
সেঞ্চুরি সাত—১৯টি কবিতা
সেঞ্চুবি আট—৫১টি কবিতা
সেঞ্চুরি নয—৩৭টি কবিতা
সেঞ্চুরি দশ—৪৮টি কবিতা
অর্থাৎ এবিকা ব্যাখ্যা কবেছেন মাত্র ৫৫% কবিতা।

অধ্যায় আট

সেঞ্চুরি—৭

এটা একমাত্র অসম্পূর্ণ সেঞ্চুরি। এতে ১০০-র বদলে কবিতার সংখ্যা মাত্র ৪২। তাই পাঁচটার বদলে আমি এই সেঞ্চুরি থেকে বিশ্লেষণ করছি মাত্র দুটো কবিতার।

সূচী ঃ

১। কবিতা—৭ ঃ ইসলামের পতন।

২। কবিতা—৪২ ঃ একটি রাজহত্যার চক্রান্ত।



সেঞ্চুরি—সাত

কবিতা—৭ (সেঃ—৭)

Sur le combat des grans cheveux legiers,

On criera le grand croissant confond :

De nuict tuer monts, habits de bergiers,

Ablismes rouges dans le fosse profond.

এর অর্থ হল :

ঘোড়ায় ঘোড়ায় লাগবে মহাযুদ্ধ,

এই সময় অর্ধ-চন্দ্রকে শেষ করে দেবার দাবি উঠবে।

রাত্রে পাহাড়ের ওপর তারা হত্যা করতে আসবে মেষপালকের পোশাকে.

মাটির মাঝে গর্তগুলি হয়ে উঠবে এক একটি লাল সমুদ্র।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : ইসলামের পতন

ঘটনাটা এখনও ঘটেনি, তবে ঘটবে। এমন ধারণা এরিকার। ঘটনাটা হল ইসলামের সম্ভাব্য পতন। তবে কবে তা ঘটবে, তা বলতে পারেন নি নস্ট্রাডামুস (অর্থাৎ এরিকা)।

প্রথম লাইনে ঘোড়ার উল্লেখ কেন করা হল, তা ব্যাখ্যা করেন নি এরিকা। দ্বিতীয় লাইনে যে অর্ধচন্দ্রের উল্লেখ আছে, সেই অর্ধচন্দ্র দ্বারা নস্ট্রাডামুস সম্ভবত ইসলাম-ধর্মকে বোঝাবার চেষ্টা কবেছিলেন :—মন্তব্য করেছেন ব্যাখ্যকার। অর্থাৎ ইসলামকে শেষ করার দাবি উঠবে। এবিকাব ধারণা, ইসলামের পতন ঘটাবে একদল আক্রমণকারী, যাদেব পরণে থাকবে মেষপালকেব ছদ্মবেশ। চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা হল এই যে, মাটির মাঝে গর্তগুলি ভবে যাবে মুসলমানদের তাজা রক্তে।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :—

ঘটনাটা যেহেতু ঘটেনি এখনও, তাই তাকে খণ্ডন করারও প্রশ্ন ওঠে না। তবু দু'-একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মেষপালকের পোশাক পরা কয়েকজন আক্রমণকারীর জন্য সারা বিশ্বে ইসলামেব পতন ঘটবে,—এমন কথা কী বিশ্বাসযোগ্য? পাঠকরা কী মনে কবেন?

প্রথম লাইনেরই বা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক কী?

কবিতা—৪২ (সেঃ—৭)

একেই এই সেঞ্চুরিতে কবিতা মাত্র ৪২টি। তার ওপর এরিকা আবার বেশিরভাগই ব্যাখ্যা কবতে পারেন নি। ব্যাখ্যা করা কবিতার সংখ্যা মাত্র ১৮। তাই আপনাদের কাছে পরিবেশন কবাব মতো ভালো কবিতা এই সেঞ্চুরি থেকে বিশেষ পেলাম না। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আরো একটি কথা—নস্ট্রাডামুসের সব কবিতার ব্যাখ্যা কিন্তু এখনও কেউ করেন নি। অর্থাৎ এখনও গোঁজামিলের সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে পারেন নি।

Deux de poison saisiz nouveau venuz,

Dans la cuisine du grand Prince verser

Par le souillard tous deux au faicts congneuz,

Prins que cuidoit le mort l'aisne vexer

অর্থাৎ :

যে দুজন নতুন এসেছে, তারা বিষের পাত্র নেবে তুলে,

রাজার রান্নাঘরে যাবে সে বিষ-পাত্র নিয়ে :

যে বাসন পরিষ্কার করে, সে হাতেনাতে ধরবে তাদের,

নিয়ে আসবে রাজার সামনে একজনকে, পালাবে অন্যজন।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : একটি রাজহত্যার চক্রান্ত

ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কেননা কবিতার বক্তব্য স্পষ্ট।—বলেছেন চিটহ্যাম। তবে ঘটনাটা কোথায়, কবে ঘটবে, তা বলতে পারেন নি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

ঘটনাটা ঘটেনি, তাই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কী? তবে খেয়াল করুন, ঘটনাটা এমনই, যা নস্ট্রাডামুসের সময়ে, বা তার আগে প্রচুর ঘটতো। আমাদের দেশেও রাজা, সম্রাটদের আমলে এ ধরনের ঘটনা, অর্থাৎ খাবারে বিষ মিশিয়ে রাজহত্যার চক্রান্ত ঘটতো। নস্ট্রাডামুস নিজেও এখানে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে, কোনো না কোনো দিন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। তাই তা উল্লেখ করে এ কবিতা লিখেছেন।

কিন্তু এরিকা বলেছেন যে, এ ধরনের ঘটনা কোথাও এখনও ঘটেনি। আমার মনে হয় এরিকা আর একটু খাটলে, আর একটু ইতিহাস-বই ঘাঁটাঘাঁটি করলে এর সঙ্গে 'জুড়ে দেবার' মতো অনেক ঘটনাই পেয়ে যেতেন।

আর একটা কথা। রাজাদের দিন কিন্তু প্রায় শেষ হয়েছে। অতএব এই কবিতার ভবিষ্যতে সাফল্যলাভের সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ কেননা এতে একজন 'রাজা'কে হত্যার চেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে॥

অধ্যায় নয়

সেঞ্চুরি—৮

সূচী :

১। কবিতা—১ : নেপোলিয়ন।

২। কবিতা—১৭ : কেনেডি ভাইরা।

৩। কবিতা—৬৪ : ব্রিটেন ও নাৎসিরা।

৪। কবিতা—৭৭ : তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী বা থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট।

* থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট সম্বন্ধে আরও কিছু ভবিষ্যদ্বাণী।



সেঞ্চুরি—আট
কবিতা—১ (সেঃ—৮)

PAU, NAY, LORON Plus feu qu'a sang sera.
Laude nager, fuir grand au surrez.
Les agassas entree refusera
Pampon, Durande les tiendra enserrez.

অর্থাৎ কিনা :

পও, নে, লরন রক্তের থেকেও আগুন নিয়েই বেশি খেলা করবে।
বিখ্যাত মানুষটা পালাতে বাধ্য হবে সঙ্গমে।
তারা ম্যাগপাই পাখিকে ঢুকতে দেবে না রাজ্যে।
Pampon, আর ডুরেন্স তাদের সীমাবদ্ধ রাখবে।*

---

* এই শব্দটার মানে কোনো ডিকশেনারিতেই পাওয়া গেল না। এটা ইংরেজী শব্দ তো নয়ই, ফরাসিও নয়, লাতিনও নয়। গ্রীক হতে পারে। কোনো জায়গার নাম নয়।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : নেপোলিয়ন

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ সংখ্যা আনন্দমেলায় অভীক মজুমদার দাবি করেছেন যে, এই কবিতাতে নেপোলিয়নের কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। এরিকা চিটহ্যামও তাঁর পুরনো বই—THE PROPHECIES OF NOSTRADAMUS এবং তাঁর নতুন বই—THE FINAL PROPHECIES OF NOSTRADAMUS-এ বোঝাতে চেয়েছেন যে এখানে নেপোলিয়ানের কথাই ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখা আছে। এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ওই যে 'পও, নে, লরন', ওটাই তো 'নেপোলিয়ান'। 'নেপোলিয়ান', আর 'পিও, নে, লরন', কথা দুটোয় কত মিল না?

আনন্দমেলায় শুধু প্রথম দুটো লাইনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাও আবার ঠিকমতো অনুবাদ করা হয়নি। শেষ দু'লাইনের ব্যাখ্যা আনন্দমেলায় নেই। তবে এরিকা সবটাই অনুবাদ করেছেন। এবং ব্যাখ্যাও করেছেন।

তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যাটা বেশ মজাদার। 'ম্যাগপাই' এক রকম পাখি ; এদেশে পাওয়া যায় না ; সাদা কালো রং ; শালিখের মতো দেখতে ; চকচকে জিনিস দেখলে আকৃষ্ট হয়। তৃতীয় লাইনে agassas মানে ম্যাগপাই পাখি। কিন্তু এরিকা বলেছেন ম্যাগপাই-এর 'ম্যাগ' বাদ দিলে থাকে 'পাই'। আর 'পাই'কে একটু বদলালে পাওয়া যায় 'পায়াস'। ষষ্ঠ পায়াস, আর সপ্তম পায়াসকে বন্দী করেছিলেন নেপোলিয়ান। (কেমন হল ব্যাখ্যাটা?)

ষষ্ঠ পায়াসকে ১৭৯৯ সালে হত্যা করা হয়েছিল রোন, আর ভ্যালেন্স নদীর সঙ্গমের কাছেই।

তবে ডুরেন্স (একটা জায়াগর নাম)-এর সঙ্গে এই কবিতার কোনো সম্পর্ক নেই। এই

কবিতাতে ওই একটুই যা ভুল :— বলেছেন এরিকা।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

Agassas থেকে ম্যাগপাই। ম্যাগপাই থেকে পাই। পাই থেকে পাযাস। পায়াস থেকে ষষ্ঠ পাযাস, আর সপ্তম। বাঃ! স্বীকার করতেই হয় এরিকা ভাষা নিয়ে চমৎকার খেলতে পারেন। কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারলেন কী? এরকম ভাষার খেলার বই তো বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে আমরা তা কিনে নিতে পারবো। এরিকার বইতে আমরা ভাষার খেলা নয়, যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ (authentic proof) চাই, নস্ট্রাডামুসের ক্ষমতার। এসব ছেলেভুলানো ব্যাখ্যা আর কত দেখাবেন এরিকা?

'পও, নে, লরন',—তিনটে ভিন্ন শব্দ। একটা নয়। 'পও, নে, লরন' মানে যদি 'লেপোলিয়ান' হতে পারে, তাহলে 'এরিকা' মানে 'একজন' এবং 'চিটহ্যাম' মানে 'চিটিংবাজ'ও হতে পারে! পারে না?

কবিতা—১৭ (সেঃ—৮)

Les bien aisez subit seront desmis
Par les trois freres le monde mis en trouble,
Cite marine saisiront ennemis,
Faim, feu, sang, peste & de tous maux le double

এব অর্থ হল :

যাবা সুখে ছিল, তাদের অবস্থার হঠাৎ অবনতি হবে
পৃথিবীকে বিপদে ফেলবে তিন ভাই,
তাদের শত্রু ছিনিয়ে নেবে সামুদ্রিক শহরটিকে,
ক্ষুধা, আগুন, রক্ত, প্লেগ, এবং পাপ হবে দ্বিগুণ।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : কেনেডি ভাইরা

এরিকা চিটহ্যাম ধারণা পোষণ করেন যে, এই কবিতাতে হযতো তিন কেনেডি ভাই, অর্থাৎ জন এফ. কেনেডি, রবার্ট এফ. কেনেডি, এবং এডওযার্ড কেনেডির কথা বলতে চাওযা হযেছে। এরিকার এ-কথা বলাব পেছনে যুক্তি হল এই যে, নামকরা তিন ভাই বলতে এদেব নামই চট করে মাথায আসে। দুর্ভাগ্যবশত (।) দুই ভাইকে হত্যা করা হযেছে। বেঁচে আছেন ছোটটি—এডওযার্ড কেনেডি। এরিকা বলেছেন, এই তিন ভাই বেঁচে থাকলে আমেরিকায নানা গণ্ডগোল হবে; তাই নাকি বলতে চাওয়া হযেছে প্রথম লাইনে। দ্বিতীয লাইন সম্বন্ধে বলেছেন যে, ছোট ভাইটি, যিনি এখনও বেঁচে আছেন, তিনি হয়ত ভবিষ্যতে আমেরিকাকে বিপদে ফেলবেন। এরিকা তৃতীয লাইনের মানে করেছেন এই বকম—'হংকং'কে ছিনিযে নেবে চীন। হংকং সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত; তাই সামুদ্রিক-শহর বলা যেতেই পাবে।

চতুর্থ লাইনের কোনো ব্যাখ্যা নেই।



জন এফ. কেনেডি



রবার্ট এফ. কেনেডি

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

পৃথিবীর ইতিহাসে নামজাদা তিন ভাই বহু এসেছেন। কেনেডিরাই একমাত্র নন, বলা বাহুল্য। কেনেডিরা বেঁচে থাকাকালীন আমেরিকায় নানা গণ্ডগোল হবে—এতে আশ্চর্যের কী আছে? ছোট-বড়, নানা মাপের গণ্ডগোল তো পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বদাই হচ্ছে। রোজই হচ্ছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে নস্ট্রাডামুস বা এরিকা, কারোরই বিশেষ কৃতিত্ব দেখতে পাচ্ছি না।

এরিকা বলেছেন পৃথিবীকে বিপদে ফেলবেন ছোট ভাই—এডওয়ার্ড কেনেডি। কিন্তু কবিতাতে তো তিন ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। লাইনটা আবার দেখুন— "পৃথিবীকে বিপদে ফেলবে তিন ভাই"। তাছাড়া এডওয়ার্ড কেনেডির প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে এক সময়ে থাকলেও, এখন প্রায় নেই। এই প্রভাবহীন মানুষটা ভবিষ্যতে আমেরিকাকে বা পৃথিবীকে বিপদে ফেলবেন, এমন ভাবাটা কষ্টকর।

তৃতীয় লাইনের ব্যাখ্যাটা বেশ খাপছাড়া হয়ে গেল না? এরিকা বলেছেন, 'হংকং'কে ছিনিয়ে নেবে চীন। কবিতাতে বলা আছে, "তাদের শত্রু ছিনিয়ে নেবে সামুদ্রিক শহরটিকে"। 'সামুদ্রিক শহর' কথাটাই এখানে পরিস্কার নয়। সামুদ্রিক শহর মানে যদি সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত শহর হয়, তাহলে সেরকম 'সামুদ্রিক শহর' তো পৃথিবীতে হাজার হাজার আছে। শুধু হংকং কেন? আর চীন কী আমেরিকার শত্রু? এ ব্যাখ্যা ধোপে টেঁকে না।

চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা কোথায়?

কবিতা–৬৪ (সেঃ–৮)

Dedans les Isles les enfans transportez,
Les deux de sept seront en desepoir,
Ceux du terrouer en seront supportez,
Nom pelle prins, des ligues fui l'espoir.

এর মানে দাঁড়ায় এইরকম :

শিশুদের সরিয়ে ফেলা হবে দ্বীপগুলিতে,
সাতজনের মধ্যে দু'জন হয়ে পড়বে হতাশ,
যারা সেই দেশের বাসিন্দা, তারা পাবে সমর্থন,
'pelle' নাম নিযে তারা কাজ করবে, কিন্তু অসমর্থ হবে।*

---

*pelle : এর কোনো অর্থ পাওয়া যাযনি। এর অর্থ আজও অজানা। ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেছেন এর কাছাকাছি শব্দ Montpellierএর অর্থ 'শাবল'। pelle মানে শাবল ?

ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা : ব্রিটেন ও নাৎসিরা

আধুনিক ব্যাখ্যাকাররা (এবং এরিকা চিটহ্যামও) মনে করেন এখানে নাৎসিদের দ্বারা ব্রিটেন ঘেরাও-এর কথা কিছু বলতে চাওযা হয়েছে। কী বলতে চাওযা হযেছে, তা তাঁরা খোলসা করে বলেন নি। কী দেখে তাঁদের একথা মনে হল তাও বলেন নি। লাইন ধরে ধরে পুরো কবিতাটার ব্যাখ্যাও নেই এরিকার বইতে। তিন লাইনের ব্যাখ্যাতে শ্রেফ এইটুকুই বলা হযেছে। আর বলা হযেছে যে, 'pelle' শব্দটার তাৎপর্য বুঝতে তাঁরা ব্যর্থ হযেছেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ : কবিতাটার এরকম ব্যাখ্যা করার কাবণ বোধগম্য হল না। কোথায় শিশু, কারা শিশু ? 'সাতজনের মধ্যে দুজন' কথাটারই বা তাৎপর্য কী ? তৃতীয ও চতুর্থ লাইনই বা কী অর্থ বহন করে ? গোটা কবিতাটাই তো ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। কী দেখে ব্যাখ্যাকাববা সিদ্ধান্তে এলেন যে, কবিতাটা ব্রিটেন ও নাৎসি-সংক্রান্ত ?

বাংলা পত্রপত্রিকাগুলোতে নস্ট্রাডামুস-সংক্রান্ত লেখায আসল কবিতাগুলি দেওযা হয না। যা খুশি বাংলা অনুবাদ পেশ করা হয। কোনো কোনো বই ও পত্রিকায আবার কবিতার বাংলা অনুবাদটুকুও দেওযা হয না। কেবল ফলাও করে বলা হয যে, নস্ট্রাডামুস সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হিটলার, নেপোলিযান, আযাতুল্লা, ফরাসী-বিপ্লব.... প্রভৃতি সম্পর্কে। বিশাল সংখ্যায মানুষ এই গুলগুলিকে খেযে এসেছে। এবং হজমও কবেছে। এখন আমাব যোগাড কবা আসল ফ্রেঞ্চ কবিতা, এবং তার সঠিক বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে নিশ্চযই বুঝতে পারছেন মানুষকে এতদিন কিভাবে ঠকানো হচ্ছিল। কিভাবে ভুল বোঝানো হচ্ছিল। কিভাবে সাধাবণ, পাগলাটে কবিতাগুলোকে অতিরঞ্জিত কবে অসাধাবণ কবে তোলা হচ্ছিল। এই হল নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণীব রহস্য॥

কবিতা—৭৭ (সেঃ—৮)

L'antechrist trois bien tost annichilez,
Vingt & sept ans sang durera sa guerre
Les heretiques mortz, captifs, exilez,
Sang corps humain ean rougi gresler terre

মানে হচ্ছে :

খ্রিস্টবিরোধী শীঘ্রই তিনজনকে শেষ করবে,
সাতাশ বছর তার যুদ্ধ স্থায়ী হবে।
অবিশ্বাসীরা মৃত, বন্দী বা নির্বাসিত হবে।
রক্তাক্ত শব, জল, লাল শিলাতে পৃথিবী যাবে ছেয়ে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : তৃতীয় খ্রিস্টবরোধী বা থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট

(নস্ট্রাডামুসের সেঞ্চুরিস-এ থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট এক উল্লেখযোগ্য নাম। এ নিয়ে একটু পরেই আলোচনায় আসছি। কেননা নস্ট্রাডামুসের বেশ কিছু কবিতায় এই অ্যান্টিখ্রাইস্ট বা খ্রিস্টবিরোধী আসবেন। ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন, প্রথম দুজন হলেন নেপোলিয়ান এবং হিটলার। তৃতীয়জন এখনও আসেন নি। ফলে তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধীকে নিয়ে ব্যাখ্যাকারদের নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী-সংক্রান্ত একটি কবিতা আপনাদের সামনে পেশ করলাম।)

শ্রীমতী চিটহ্যাম মনে করেন এ কবিতাতে নস্ট্রাডামুস থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর ধারণা এই থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট যে তিনজনকে শেষ করবে, তারা সম্ভবত কেনেডি ভাইরা। তবে প্রথম দুই কেনেডি-ভাই এখন মৃত। এবং তাঁদেরকে একই লোক হত্যা করেনি। তৃতীয় কেনেডিকেও যদি হত্যা করা হয়, তাহলেও তিনি প্রথম ও দ্বিতীয়'র আততায়ীর হাতে খুন হবেন না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ এই দুই আততায়ী আমেরিকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তবুও কী কবে এরিকার মনে হল যে, থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্টই এই তিন ভাইযের মৃত্যুর কারণ হবেন? তার জবাবও দিযেছেন এরিকা যদিও জবাবটা সন্তোষজনক নয।

এরিকা মনে করেন, থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট কোনো মানুষ নাও হতে পারে। হতে পা কোনো আন্দোলন বা দর্শন। এই আন্দোলন বা দর্শনের সমর্থকরাই হয়ত এই তিন ভাইযে মৃত্যুর কারণ হবেন। এরিকা অবশ্য তাঁর এই ব্যাখ্যার সততার প্রতি নিজেই সন্দেহ প্রকা করে বলেছেন। "…. অবশ্য মনে হয় নস্ট্রাডামুস থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট বলে কোনো মানুষে কথাই বলতে চেয়েছিলেন।" "মনে হলে" এরিকা ওরকম ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন এসব ঘটনা এরিকার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাচ্ছে না কি?

দ্বিতীয ও তৃতীয় লাইনের বক্তব্য পরিস্কার। অবশ্য 'অবিশ্বাসীরা' মানে ঠিক কারা, বুঝে পারলাম না। আমরা, যুক্তিবাদীরা কী? তাহলে বলতে হয নস্ট্রাডামুস আমাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

তৃতীয খ্রিস্টবিবোধী কি মানুষ, না আন্দোলন, না দর্শন, সে ব্যাপারে এরিকার বক্ত স্পষ্ট নয। ধোঁয়া-ধোঁয়া বেখে দেওযাটা এরিকার চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়। বক্তব্য ধোঁয ধোঁযা বেখে দিলে পরে তা পাল্টানো সহজ হয। তাই এই কৌশল।

ব্যাখ্যাটা এমন হলে কেমন হয়, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা একটু ভেবে দেখতে পাবেন :

খ্রীস্টবিরোধী বা অ্যান্টিখ্রাইস্ট বলতে নস্ট্রাডামুস বাস্তবিকই এক দর্শন, এক মতাদর্শগত আন্দোলনের কথাই বলেছিলেন। আর এই দর্শনেরর নাম 'যুক্তিবাদ' এবং আন্দোলনের নাম 'যুক্তিবাদী আন্দোলন'। এই আন্দোলন শুরু হয়েছে ১৯৮৫ তে ভারতে নব-যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে। চলবে ২৭ বছর ধরে এই সংগ্রাম। পরিণতিতে খ্রীস্টবিরোধী অর্থাৎ যুক্তিবাদী চিন্তাধারা শেষ করবে তিনজনকে অর্থে তিন বিজ্ঞান-বিরোধী, সত্য-বিরোধী পৃথিবীর প্রধান ধর্ম বিশ্বাসকে। 'অবিশ্বাসীরা' অর্থাৎ সত্যে যারা বিশ্বাস করে না, মানে ওই তিন অন্ধ-বিশ্বাসে আবদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসীরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ঠেকাতে গিয়ে নিপীড়িত মানুষদের হাতে মরবে, বন্দী হবে, অথবা হবে নির্বাসিত। সাতাশ বছরব্যাপী এই আদর্শ বনাম অনাদর্শের লড়াইতে পৃথিবী রক্তে লাল হবে। তবে জয় শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিখ্রাইস্টরাই পাবে।

যুক্তিবাদী আন্দোলন যেভাবে এগুচ্ছে, মনে হচ্ছে এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। এরিকা আমার এই ব্যাখ্যাটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। পরবর্তী সংস্করণে তাঁকে এই ব্যাখ্যাটা ব্যবহার করার আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলাম।

থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট সম্বন্ধে আরও কিছু ভবিষ্যদ্বাণী

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে নস্ট্রাডামুসের ব্যাখ্যাকাররা ধেইধেই করে নেচে উঠে প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন যে, সাদ্দাম হুসেনই তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী, বা থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট ; এবং উপসাগরীয যুদ্ধ চলবে ২৭ বছর। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে উপসাগরীয যুদ্ধ শেষ এবং সাদ্দামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রচারের বেলুন ফুটুস করে ফেটে চুপসে গেছিল।

এরিকা চিটহ্যামের দ্বিতীয বই THE FURTHER PROPHECIES OF NOSTRADAMUS-এ তৃতীয খ্রিস্টবিরোধীকে নিয়ে তিনি একটা আলাদা দীর্ঘ অধ্যাযই বচনা করে ফেলেছেন। সেই বই আবার বাংলায় অনুবাদ হযেছে। বইযের নাম, 'নস্ত্রাদামুসের আরো ভবিষ্যদ্বাণী'। অনুবাদক—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায। সন্তোষবাবু এরিকার বইটা প্রায লাইন-টু-লাইন অনুবাদ করেও কোথাও স্বীকার করার সৌজন্যতাবোধটুকুও দেখান নি যে, তিনি এরিকা চিটহ্যামের THE FURTHER PROPHECIES OF NOSTRADAMUS থেকেই অনুবাদ করেছেন। এক জায়গায় স্রেফ ছোট করে লিখেছেন, 'এরিকা চিঠাম অনুসরণে'। যাহোক, আসল কথায ফিরে আসা যাক। এই বাংলা বইটিতেও স্বভাবতই তৃতীয খ্রিস্টবিরোধীকে নিয়ে একটা আলাদা অধ্যায রয়েছে। এই অধ্যাযে তৃতীয খ্রিস্টবিরোধীকে নিযে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হযেছে বলে দাবি করেন এরিকা, তা এরকম ঃ

১। তৃতীয বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে নিউ ইযর্ক শহরের আর রাজ্যের উপর প্রচণ্ড আক্রমণের মধ্য দিযে। ধ্বংস হযে যাবে নিউ ইযর্ক। দাযী—থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট ? (সেঃ—৬ ; কবিতা—৯৭)

২। নিউ ইয়র্কের জল বিষাক্ত হযে পড়বে রাসায়নিক হাতিযারের আক্রমণের ফলে। (সেঃ—১০ ; কবিতা—৪৯)

৩। তৃতীয খ্রিস্টবিরোধী খ্রিস্টান হবেন না। সম্ভবত একজন ইসলামধর্মীয এশিযার মানুষ (সেঃ—২ ; কবিতা—২৮)

৪। তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধীর নাম হবে সম্ভবত 'মেবাস'। (সেঃ—২ ; কবিতা—৬২)
৫। তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধীর নাম 'অ্যালাস'ও হতে পারে। (সেঃ—৬ ; কবিতা—৩৩)
৬। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনও এই তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী হতে পারেন। (সেঃ—১০ ; কবিতা—৬৬)
৭। কোনো সন্দেহই নেই যে, তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী জন্মাবেন এশিয়াতে। (সেঃ—১০ ; কবিতা—৭৫)
৮। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগবে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তে। (সেঃ—১ ; কবিতা—৫১)
৯। তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধী হবেন একজন মঙ্গলীয়, এবং তাঁকে আমরা দেখতে পাব ১৯৯৯ সালে। (সেঃ—১০ ; কবিতা—৭২)
১০। তৃতীয় খ্রিস্টবিরোধীই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হবেন প্রধানত দায়ী ; এবং এই যুদ্ধ চলবে ২৭ বছর ধরে ! (সেঃ—৮ ; কবিতা—৭৭)

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নিয়ে দু-একটা কথা :

ভবিষ্যদ্বাণীগুলি দেখলেন। তা বলে মনে করবেন না যে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ঠিক এইরকমভাবেই লিখে গেছিলেন নস্ট্রাডামুস। তিনি লিখে গেছিলেন অন্য কিছু। তার ব্যাখ্যা করে এরিকা চিটহ্যাম এই দাঁড় করিয়েছেন। যেমন, নস্ট্রাডামুস একটা কবিতায় লিখেছিলেন—'নতুন শহর'। এরিকা ব্যাখ্যা করলেন, নতুন শহর মানে new city। New city মানে New York। এইভাবেই নিউ ইয়র্ক নামটা ভবিষ্যদ্বাণীতে পাওয়া গেল। নতুন শহর মানে পশ্চিমবাংলার সল্ট লেক কেন নয়, তা জানি না।

আর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে চূড়ান্ত স্ব-বিরোধীতা তো প্রকট। কোথাও বলা হয়েছে থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্টের নাম 'মেবাস' কোথাও 'অ্যালাস', কোথাও বা রোনাল্ড রেগন। থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট যদি এশিয়ান, মঙ্গলীয় এবং অ-খ্রিস্টানই হল, তাহলে তিনি রোনাল্ড রেগন কি করে হবেন ?

আর একটা কথা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখ কিন্তু 'সেঞ্চুরিস'এর কোথাও নেই। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাকে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বলে কোথাও তকমা আঁটেন নি নস্ট্রাডামুস। ও কাজটা করেছেন ব্যাখ্যাকাররা।

অপেক্ষা করে দেখুন থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট সংক্রান্ত ক'টা ভবিষ্যদ্বাণী মেলে ॥

অধ্যায় দশ

সেঞ্চুরি—৯

সূচি :

১। কবিতা—৫১ : রাশিয়ান ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ।

২। কবিতা—৬২ : জাদুবিদ্যা বা ডাইনিবিদ্যা সংক্রান্ত কবিতা।

৩। কবিতা—৯২ : নিউ ইয়র্ক শহরের বিপদ।

৪। কবিতা—১০০ : পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ



সেঞ্চুরি–নয়
কবিতা–৫১ (সেঃ–৯)

Contre le rouges sectes se banderont,
Few, eau, fer, corde par paix se manera,
Au point mourir, ceux qui machineront,
Fors un que monde sur tout ruinera.

অর্থাৎ ঃ

লাল মানুষদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে,
আগুন, জল, লোহা, শান্তি এলে বাঁধন হবে আলগা,
চক্রান্ত-রচনাকারীরা একে একে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে,
একজন বাদে ; যে পৃথিবীকে শেষ করে দেবে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ঃ রাশিয়ান ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ

ব্যাখ্যাকার এরিকা চিটহ্যাম এই কবিতার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বলেছেন, এখানে কোনো যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। যুদ্ধে 'লাল মানুষরা' মানে নির্ঘাৎ রাশিয়ানরা। কারণ কমিউনিস্টদেব পতাকা ইত্যাদির রং লাল। আর শেষ লাইনে বর্ণিত ব্যক্তিটি নির্ঘাৎ তৃতীয় অ্যান্টিখ্রাইস্ট। অর্থাৎ যুদ্ধটা হচ্ছে রাশিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যে ; কেননা অন্য একটা কবিতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তৃতীয় অ্যানিটখ্রাইস্ট হবেন সম্ভবত মুসলমান। তবে এ-যুদ্ধে কারা জয়ী হবেন বলা যাচ্ছে না। ঘটনাটা ভবিষ্যতে ঘটবে।

ব্যাস, ব্যাখ্যা বলতে এইটুকুই।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

কবিতার প্রথম আর শেষ লাইনের ব্যাখ্যা করলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। মাঝেও দুটো বেযাড়া লাইন আছে। সে দুটো লাইনের ব্যাখ্যা না করলে তো কবিতার মানে আমূল বদলেও যেতে পাবে। সে দুটো লাইন কে ব্যাখ্যা করবে ?

লাল মানুষ মানে রাশিয়ান হবে কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। নস্ত্রাডামুসের সময়ে ব্রিটিশ সৈন্য, বা স্প্যানিশ সৈন্যদেব পোশাক ছিল লাল। নস্ত্রাডামুস হয়ত এদের কারো কথা বলতে চেয়েছিলেন ; এটাই স্বাভাবিক। রাশিযা তো বরং লাল রং আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিদাযই জানিয়েছে। ওরা তো এখন আর লালের প্রতীক নয। ব্যাখ্যাকাররা এবং লাল বলতে 'লাল চীন', বা 'লাল পশ্চিমবাংলা'র নামটা নতুন সংস্করণে রাখতে পারেন।

রাশিযাই যেখানে লাল রঙ ছেড়েছে, সেখানে ভবিষ্যতে মুসলমানদেব সঙ্গে 'লাল'এর লড়াইযের ব্যাপারটাই তো মাঠে মারা গেছে।

আরও একটা কথা। কবিতাতে কিন্তু 'থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট' কথাটা উল্লেখ করেন নি নস্ট্রাডামুস। কাজেই আমবা কি করে ধরে নিই, কবিতাতে বর্ণিত যুদ্ধে মুসলমানরা অংশগ্রহণ করবে ? তাহলে 'রাশিযান'ও মিললো না, 'মুসলমান'ও মিললো না। কবিতাটায মিললো

তাহলে কী?

কবিতা—৬২ (সেঃ—৯)

Au grand de cheramon agora
Seront croisez par ranc tous attachez
Le pertinax Oppie, & Mandragora,
Rougon d'Octobre le tiers seront laschez

মানে :

চেয়ারমন আগোরার বিশাল ব্যক্তিত্বটির কাছে
ক্রসগুলি সাজানো থাকবে পরপর,
অনেকদিন রাখা যায়, এমন অফিস, এবং ম্যানড্রেক,*
*Rougon**থেকে ছাড়া পাবে তৃতীয় অক্টোবরে।*

---

* ম্যানড্রেক : এক রকম গাছ, যা খেলে নেশা হয়।

** Rougon : বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন, কোনো অজানা জায়গার নাম।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : জাদুবিদ্যা, বা ডাইনিবিদ্যা সংক্রান্ত কবিতা

এই কবিতাটা শ্রেফ উদাহরণ হিসেবে দিলাম। এটা সম্ভবত কোনও ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এরকম জাদুবিদ্যা বা ডাইনিবিদ্যা সংক্রান্ত কবিতা সব সেঞ্চুরিতেই কয়েকটা করে আছে। সবচেয়ে বেশি এরকম কবিতা আছে সম্ভবত সেঞ্চুরি চার-এ। এরকম কবিতা কেন সেঞ্চুরিস এ লিপিবদ্ধ করলেন নস্ট্রাডামুস, তা বলা মুস্কিল। তবে করেছেন। ফলে এরকম কবিতার উদাহরণ আপনাদের দেওয়া উচিত মনে হল। তাই দিলাম। এর আগেও আপনারা সেঞ্চুরি এক-এব কবিতা—১ ও কবিতা—২ দেখেছেন। সেগুলিও এই ধরনের জাদুবিদ্যা বা ডাইনিবিদ্যা সংক্রান্ত।

এই কবিতাটিতে যে ঠিক কী বলতে চাওযা হয়েছে, তা বোঝা খুব মুস্কিল। তবে 'চেরামন আগোবা' একটা প্রাচীন এশিয়-শহরের নাম। এখন সে শহরের অস্তিত্ব নেই। নস্ট্রাডামুসের সময়ে ছিল। দ্বিতীয় লাইনের ক্রসগুলি কোনো জাদু বা আধিভৌতিক ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। (এসব কিন্তু এরিকা চিটহ্যামের কথা।) আফিম-গাছ বা ম্যানড্রেক : এগুলো জাদুসংক্রান্ত কাজকর্মে তখন ব্যবহৃত হত। চতুর্থ লাইনেব অর্থ ঠিক পরিস্কার নয়।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এটা একটা উদাহরণ-কবিতা। এর কোনো বিশ্লেষণের সত্যিই প্রয়োজন নেই। শুধু একটা কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করলাম বলেই এই 'যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ' হেডিং'টা লিখতে হল।

কথাটা হল এই যে, এরিকা চিটহ্যামের 'জাদু' সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারনাই নেই। জাদু

যে সাধারণ কয়েকটা যান্ত্রিক ও হাতের কৌশলে হয়, তাই তিনি জানেন না। তাঁর ধারণা—জাদু মানেই মন্ত্রতন্ত্র, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার। অন্তত কবিতার ব্যাখ্যা পড়ে তো তাই মনে হচ্ছে। যাঁর জাদু সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানটুকুও নেই, তিনি নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আমাদের কী জ্ঞান দেবেন ? যাঁর নিজের চিন্তাই অস্বচ্ছ, তিনি আমাদের স্বচ্ছ চেতনার উন্মেষ ঘটাবেন কী করে ?

কবিতা—৯২ (সেঃ—৯)

Le roi vouldra dans cite neuf entrer
Par ennemis expugner lon viendra
Captif libere faulx dire & Perpetrer
Roi dehors estre, loin d'ennemis tiendra

এর মানে :

রাজা প্রবেশ করতে চাইবেন নতুন শহরে
তাঁরা শত্রুদের হাত থেকে শহরকে ফেরত পাবার চেষ্টা চালাবেন
এক বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হবে অভিনয় করতে ও কথা বলার জন্য
রাজা থাকবেন বাইরে, শত্রুদের হাত থেকে অনেক দূরে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : নিউ ইয়র্ক শহরের বিপদ

কবিতার বক্তব্য থেকে এটা মোটামুটি স্পষ্ট, ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে কোনো একটি শহর শত্রু করলে চলে যাবার আভাস। রাজা শহরটাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করবেন, দূর থেকে।

এখন এরিকা ব্যাখ্যা করেছেন, শহরটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক। কেন ? কারণ নতুন শহর মানে New City, New City মানেই New York। বুঝুন ব্যাপার।

আর 'রাজা' মানে এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টে। তিনি দূরে থাকবেন মানে এই যে, তিনি মাটির তলায় গুপ্ত কোনো আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। এসব ঘটবে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। (আরও দু-একটা কবিতাতে এরিকা New city 'র মানে করেছেন New York)

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

নতুন শহর কিভাবে নিউ ইয়র্ক হল আপনারা দেখলেন। নতুন শহর মানে তো পশ্চিমবাংলার সল্ট লেকও হতে পারে। আরও শয়ে শয়ে নতুন শহর আছে, তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সেসব তর্ক আর করছি না। সারা বইতে অনেক তো, তর্ক করলাম। এবার এই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণের জন্য আর তর্ক নাই বা করলাম। আপনারা তো এরিকার, এবং অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে এখন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তাই আপনারাই বিচার করে স্থির করুন, নতুন শহর মানে নিউ ইয়র্ক হতে পারে কিনা।

আর একটা স্ববিরোধীতার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। সেঞ্চুরি ছয়ের ৯৭ নম্বর কবিতাতে (কবিতাটার সারমর্ম 'থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট সম্বন্ধে আরও কিছু ভবিষ্যদ্বাণী' হেডিং'এর ১ নম্বর পয়েন্টে লিখেছি। প্রয়োজন অনুভবে দেখে

নিন।) এরিকা বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই নিউ ইয়র্ক আক্রমণ হবে, আর ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে এই কবিতাটা খাটে কি করে? এখানে তো বলা হয়েছে নিউ ইয়র্ক শত্রুদের দখলে চলে যাবে। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাকে ফেরত পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক ধ্বংস হবে না। তাহলে কোন্ ভবিষ্যদ্বাণীটা ঠিক?

কবিতা—১০০ (সেঃ—৯)

Navalle pugne nuit sera superee,
Le feu aux naves a l'Occident ruine
Rubriche neufue la grand nef coloree,
Ire a vaincu, & victoire en brume.

অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

এক রাতে একটা নৌযুদ্ধ শেষ হবে
পশ্চিমের জাহাজের ধ্বংসস্তূপে আগুন
বিশাল রঙিন জাহাজে নতুন সংকেত
পরাজিতরা হবে ক্রুদ্ধ, জয় কুয়াশার মধ্যে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ

পার্ল হারবারের কথা মনে আছে তো? ১৯৪১ সালে এই যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ করলো জাপান। এর ফলেই আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং হিরোসিমা, নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ। এই সমস্ত ঘটনাই একের পর এক ছবির মতই ভেসে উঠেছিল নস্ট্রাডামুসের চোখের সামনে। নস্ট্রাডামুস তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় দেখে ছিলেন ভবিষ্যতে পার্ল হারবারের বোমা বর্ষণের দৃশ্য।

এরিকার ব্যাখ্যা : ভোরবেলায় জাপানি প্লেনগুলো এসে বোমাবর্ষণ করেছিল পার্ল হারবারে। জ্বলে উঠেছিল মার্কিনী রণতরীগুলো অর্থাৎ পশ্চিমী জাহাজগুলো। এমনটা যে ঘটবে সে কথা বহু আগেই বলে গিয়েছিলেন নস্ট্রাডামুস তাঁর এই কবিতায়। 'এক রাতে' মানে আসলে 'ভোর'-এ। 'রাত' আর 'ভোর'-এ এইটুকুই যা তফাৎ।

'নতুন সংকেত' মানেটা স্পষ্ট নয়। তবে হতে পাবে জাপানের এই আক্রমণের একটা সাংকেতিক নাম ছিল। হয়ত তাই বলতে চেয়েছেন নস্ট্রাডামুস।

'রঙীন জাহাজ' বলতে কি জাহাজের ক্যামোফ্লেজ-রং *-এর কথা বলতে চাওয়া হয়েছে?

শেষ লাইনের মানে : শেষ পর্যন্ত জাপান হবে পরাজিত এবং ক্রুদ্ধ; হিরোসিমা এবং নাগাসাকিকে হারিয়ে। আমেরিকার এ-জয় কিছুটা যেন কুয়াশার মধ্যে। (কেন?)

---

*ক্যামোফ্লেজ-রং : আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে সমরবস্তুর রং করা হয় যুদ্ধের সময়, যাতে পরিবেশের সঙ্গে সেই সব সমরবস্তু যুদ্ধের সময় শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে। এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে রং করাকেই ক্যামোফ্লেজ-রং বলা হয়। সেনা-

পোশাক, সেনা-গাড়ি, যুদ্ধবিমান ইত্যাদিতে ক্যামোফ্লেজ-রং হয়।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

জব্বর ভুলে ভরা লজ্‌ঝর ব্যাখ্যা। মাথা খারাপ করে দেওয়া ভুলগুলোর দিকে একটু দেখুন ঃ

১। কবিতাতে স্পষ্টই বলা হযেছে এক রাতে নৌযুদ্ধ শেষ হবে। পার্ল হারবারে নৌ-যুদ্ধই হযনি, তার শেষ হবে কী? এখানে বোমাবর্ষণ করেছিল বিমান।

২। কবিতায বলা হয়েছে 'এক রাতে', এরিকার বেলায, তবে এর রাতে-কে দুপুর ভাবতেই বা অসুবিধে কোথায়? কারণ তখন তো পার্ল হারবারের বিপরীত গোলার্ধে ভর-দুপুরই।

৩। 'পশ্চিম' মানে ফ্রান্সের পশ্চিম দিকটা হওযাই স্বাভাবিক, কেননা নস্ট্রাডামুস ছিলেন ফরাসি। 'পশ্চিম' মানে আমেরিকা হবার সম্ভাবনাটাই বরং কম। চিন্তাশীল পাঠকরা ভেবে দেখুন।

৪। 'নতুন সঙ্কেত' আর 'জাহাজের রং'—ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবিকা হিমসিম খেয়েছেন। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয, যুক্তিগ্রাহ্য নয ; কেননা, পার্ল হারবাবে ক্যামোফ্লেজ-রং করা কোনো জাহাজ ছিল বলে জানা যায়নি।

৫। আমেরিকার জয় কখন হল ? ঐ রাতে ? আর তা কুযাশায আচ্ছন্ন জয়ই বা কেন, পরিস্কার হল না॥

অধ্যায়—এগারো

সেঞ্চুরি—১০

সূচী :

১। কবিতা—১০ : নেপেলিয়ান।

২। কবিতা—৭৪ : অলিম্পিক গেমস।

৩। কবিতা—৮৪ : এলিজাবেথ—১।

৪। কবিতা—১০০ : গ্রেট ব্রিটেন।



সেঞ্চুরি–দশ

কবিতা–১০ (সেঃ–১০)

Tasche de murdre enormes adulteres,
Grand ennemi de tout le genre humain
Que sera pire qu'ayeulx, oncles ne peres
En, fer, feu, eau, sanguin & inhumain.

অর্থ হল :

খুন, ব্যাভিচারে জড়িয়ে থাকা এই মানুষ
গোটা মানুষ-জাতের শত্রু
এ-হবে পূর্বপুরুষ বাবা-কাকাদের চেয়েও খারাপ
ইস্পাত, আগুন, জল ; বদমায়েশ আর অমানবিক

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : নেপোলিয়ান

ভেনিসের বাসিন্দা এক অ্যাম্বাস্যাডর, মিঃ মোরেনিগো এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিযে বলেছেন, এই কবিতাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হযেছে, নেপোলিযান বোনাপার্টের কথা। দ্বিতীয় লাইনটা পড়লেই নাকি তা বোঝা যাচ্ছে। ব্যাস, আর এর বেশি কিছু ব্যাখ্যা করেন নি।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এ কবিতাতে স্পষ্ট করে না বলা হযেছে কোনো স্থানের নাম, না কোনো মানুষের নাম। তাহলে কি করে মোরেনিগো বললেন নেপোলিয়ানেব আগমন সম্পর্কে নস্ট্রাডামুস আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন ? এমন এক 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের ধোঁযাশা ব্যাখ্যার সঙ্গে পৃথিবীর শতাধিক মানুষের জীবনকে মিলিযে দেওযা মোটেই কঠিন নয়। কবিতাটা সেভাবেই লেখা। আমি যদি দাবি করি, এই কবিতাতে নস্ট্রাডামুস সাহেব ঔরঙ্গজেব বা হিটলার অথবা সাদ্দাম হুসেনের কথা বলে গেছেন, সেটাই বা কী এমন মন্দ ব্যাখ্যা হবে ? অন্তত মোবেনিগোর ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য মনে হলে আমার ব্যাখ্যাকে ওই একই যুক্তিতে গ্রহণ করতেই হবে।

কবিতা–৭৪ (সেঃ–১০)

An revolu du grand nombre septiesme
Apparoistra au temps Jeux d'Hecatombe,
Non esloigne du grand eage milliesme
Que les entres soruront de leur tombe

মানে :

যে বছর পা দেবে সাত-এ
একে দেখা যাবে হত্যাব খেলার মাঝে,
নতুন হাজার-বছরের কাছাকছি

যখন মৃতরা উঠে আসবে কবর থেকে।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : অলিম্পিক গেমস।

এরিকা ইতস্তত ভাবের সঙ্গে মতপ্রকাশ করেছেন, এটা ১৯৭৬এর অলিম্পিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হ'তে পারে। ১৯৭৬-অলিম্পিকে কয়েকজন ইসরায়েলী খেলোয়াড় খুন হয়েছিলেন। এখানে হয়ত সেই 'হত্যার খেলা'র কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। 'নতুন হাজার-বছরের' মানে ২০০০ সাল থেকে ২৯৯৯ সাল অবধি। 'নতুন হাজার বছরের কাছাকছি' নামে ২০০০ সালের কাছাকাছি ঘটবে ঘটনাটা। ১৯৭৬ সালটা নতুন হাজার বছরের কাছাকাছি নয় কী ?

'যে বছর পা দেবে সাত'এ—এর মানে এই হ'তে পারে যে, ১৯৭৬-এ '৭' সংখ্যাটা রয়েছে।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

আমার ধারণা কবিতাটা 'থার্ড অ্যান্টিখ্রাইস্ট' সংক্রান্ত। ১৯৮৬এর অলিম্পিক ছিল ২১তম অলিম্পিক ; ফলে যে বছর পা দেবে সাত-'এ—এই বাক্যটা তো মোটেই খাটবে না। 'একে দেখা যাবে'—'এ' কে ? 'হত্যাব খেলা' মানেই অলিম্পিক ? অলিম্পিকে কি শুধু হত্যাই হয় ? 'নতুন হাজার বছর'—কথাটাও পরিস্কার নয়। ৩০০০ সালের কাছাকাছিও তো নতুন হাজার বছরের কাছাকাছি।

আচ্ছা, ব্যাখ্যাটা যদি এমনভাবে করি—'নতুন হাজার বছরের কাছাকছি' 'যে বছর পা দেবে সাত'এ—একথার অর্থ ১৯৯৭। সে-বছর মানুষ হত্যার খেলায় মেতে উঠে নিজেদের করবে ধ্বংস। আসবে 'ডুমস্ ডে'। মৃতেরা উঠে আসবে কবর থেকে।

ধর্মভীরু খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন, একদিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আসবে 'ডুমস্ ডে,' যেদিন করব ফুঁড়ে সমস্ত আত্মারা উঠে আসবে, এবং তাদের প্রত্যেকের বিচার হবে ঈশ্বরের (?) দরবারে, সেদিনই ঠিক হবে কারা স্বর্গে যাবে, আর কারাই বা যাবে নরকে। নস্ট্রাডামুস হয়ত 'ডুমস্ ডে' এবং পৃথিবী ধ্বংস হওযার বছরটি কবে, সে বিষয়েই ভবিষ্যম্বাণী করেছিলেন ? কিন্তু আমার মত ব্যাখ্যাকারের বদলে ফালতু ব্যাখ্যাকারের হাতে পড়ে 'ডুমস ডে' হয়ে গেছে 'অলিম্পিক'।

আর একটা কথা চুপি চুপি বলছি—'ওটা ১৯৯৭-এর বদলে ২৯৯৭ বা ৩৯৯৭ নয় কেন ?' এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমিও ওদের মত ফেঁসে যাব।

কবিতা—৮৪ (সেঃ—১০)

La naturelle a si hault hault non bas
Le tard retour fera martis contens,
Le Recloingne sera sans debatz
En empliant & pendant tous son temps

অর্থাৎ :

জাবজ কন্যাটিব স্থান হবে উচুঁতে, নিচে নয় মোটেই,

দেরিতে তার প্রত্যাবর্তন আনন্দিত করবে দুঃখীদের,
প্রত্যাবর্তিতাকে নিযে সমালোচনা হবে প্রচুর
অঢেল চাকরি দেওয়া, ও সময় নষ্ট করার জন্য।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : এলিজাবেথ—১

এরিকা বলেছেন, কিছু লোকের ধারণা, এই কবিতা এলিজাবেথ—১ সম্পর্কে। কেননা পোপ চতুর্থ পল তাঁকে জারজ সন্তান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ব্যাস, এর বেশি যুক্তি দেননি এরিকা।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ :

এলিজাবেথ—১ আদৌ জারজ ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মা প্রথাগত বিয়ে করেন নি। তাই তাঁর বিয়েটা আইনসম্মত নয়, ফলে প্রথম এলিজাবেথ জারজ-সন্তান ছাড়া আর কিছুই নন।

এ সম্পর্কে বলি, আমরা যুক্তিবাদীরাও প্রথাগতভাবে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করি না, বিয়ে করি না মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তাহলে তো আমাদের সন্তানরাও 'জারজ' ?

কবিতার পরবর্তী তিন লাইনের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাকাররা দেননি। কারণটা বোধহয়, পরবর্তী তিনটি লাইন ইতিহাসের সঙ্গে বড় একটা মেলে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রথম লাইনের ওপর নির্ভর করেই ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেছেন এই কবিতার। এ হেন ব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য ? পাঠকরা কী বলেন ?

কবিতা—১০০ (সেঃ—১০)

Le grand empire sera par Angleterre,
Le pempotam des ans plus de trois cens
Grandes copies passer par mer & terre,
Les Lusitains n'en seront pas contens

এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

ইংল্যান্ডের জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্য,
তিনশো বছরের অধিক সময় ধরে শক্তিশালী :
বিশাল বাহিনী হেঁটে যাবে স্থল, আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে,
পর্তুগিজরা হবে না সন্তুষ্ট।

ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা : গ্রেট ব্রিটেন

এরিকা মনে করেন, নস্ট্রাডামুস ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর অতিন্দ্রীয় দৃষ্টিতে। এ কবিতাতে ইংল্যান্ডের তিনশো বছরব্যাপী ভবিষ্যতের কথা লেখা আছে। বর্ণিত এই তিনশো বছর, এরিকার মতে, এলিজাবেথের সময় থেকে ভিক্টোরিয়ার সময় অবধি।

এরিকা অবশ্য আবার পুরো কবিতার একটা জুৎসই ব্যাখ্যা খাড়া করতে অক্ষম হয়েছেন।

তৃতীয় আর চতুর্থ লাইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেজায় লেজেগোবরে হয়েছেন। বলেছেন তৃতীয় লাইনটা বেশ চালাকিতে ভরা। 'বিশাল বাহিনী' মানে হয়ত ব্রিটিশ ফৌজ, অথবা তাদের ফৌজ, যারা ব্রিটেনকে শেষ করবে। আর পর্তুগিজদের কথা এ কবিতায় কেন এল, বুঝতে পাবেন নি এরিকা। অর্থাৎ এলিজাবেথের সময় থেকে ভিকটোরিয়ার সময় অবধি যে ব্রিটেনের ভালো সময় যাবে, সেকথাই আগেভাগে এই কবিতায় বলে রেখেছেন নস্ট্রাডামুস।

যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ঃ

একটা মস্ত ভুল লক্ষ্য কবুন। প্রথম দু'লাইন আবার পড়ুন। লাইন দুটোর মানে কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো ? মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইংল্যান্ডের জন্য অন্য কোনো এক বিশাল দেশ তিনশোর বেশি বছরের জন্য শক্তিশালী হযে উঠবে। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের মদত পেযে দেশটির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ইংল্যান্ড শক্তিশালী হয়ে উঠবে ; এমন কিন্তু মানে দাঁড়াচ্ছে না।

এলিজাবেথের সময় থেকে ভিকটোবিযার সময—মানে সাড়ে তিনশো বছর। 'তিনশো বছবের অধিক সময' ; ঠিক। কিন্তু সময়কালটা গুনতে আরম্ভ করতে হবে এলিজাবেথ থেকে, এবং গোনা শেষ করতে হবে ভিকটোরিয়াতে ; এ সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যাকার এলেন কিভাবে ? কবিতায তো এমন কোনো ইঙ্গিত নেই ? অর্থাৎ এই তিনশো বছরটা কবে থেকে কবে অবধি—তা বোঝার কোনো উপায নেই। তাই ব্যাখ্যাকারী তাঁর সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে পাঠকদের মগজধোলাই করার চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয লাইনেব ব্যাখ্যা করতে পারেননি এবিকা। পারেন নি চতুর্থ লাইনেরও। অতএব ব্যাখ্যার সমস্তটাই বিরাট গোঁজামিলে ভরা।

নস্ট্রাডামুখের দশ সেঞ্চুরি পর্যন্ত কবিতাগুলো পড়ে এবং সে-সব কবিতার ব্যাখ্যাগুলো শুনে এ-কথা আমরা প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ অবশ্যই বলতে পারি—নস্ট্রাডামুস ছিলেন ছোট-মাপের এক বুজবুক, আর তাঁর কবিতার ব্যাখ্যাকাররা এক একটি বিশাল বিশাল বুজরুক, এক একটি ধাড়ি ধাড়ি ধান্দাবাজ, এক একটি সমাজবিরোধী।

অধ্যায় —বার

এ-দেশের পত্র-পত্রিকায় নস্ট্রাডামুস নিয়ে গাল-গপ্পো বা গুল-গপ্পো

ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে নস্ট্রাডামুস নিয়ে গাল-গপ্পো বা গুল-গপ্পোর পথিকৃৎ দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'অর্গানাইজার' ও বোম্বে থেকে প্রকাশিত 'তরুণ ভারত' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বস্তিকা' পত্রিকা। এইসব পত্রিকাগুলোর তেমন জনপ্রিয়তা না থাকায় লেখাগুলোর তেমন প্রভাব পড়েনি সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমাদের দেশে নস্ট্রাডামুসের গাল-গপ্পোর প্রথম অ্যাটোমবোমাটি ফাটালেন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'মায়া' ও 'আলোকপাত' পত্রিকা। লেখা দু'টি প্রকাশিত হতেই দেশব্যাপী বিশাল এক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এমন কথাটি লিখলাম, কারণ তারপর দেশের বহু ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকাই 'হাঁউ-মাঁউ-কাঁউ' করে লোভনীয় খাবারের গন্ধ পাওয়া গল্পের রাক্ষসের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই একটিই লক্ষ্য ছিল-'ম্যাটারটা পাবলিক খাবে ভাল'। লক্ষ্য যখন যে কোনও উপায়ে পত্রিকার বিক্রি বাড়ান, অতএব পাবলিককে খাওয়াও। যতখানি রহস্যময়, যতখানি গা শিরশিরে করে পাতে ফেলা যাবে, ততই উপাদেয় হবে, পাঠক-পাঠিকারা হাপুস-হুপুস করে চেটে-পুটে খাবে। ফলে শুরু হয়ে গেল অলিখিত এক বিশাল গাল-গপ্পো, গুল-গল্পের সর্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতা। তাতে এ বলে, 'আমায় দ্যাখ্' তো, ও বলে, 'আমায় দ্যাখ্'। পত্রিকাগুলো নেমেছে ব্যবসা করতে। ওরা তো আর 'দেশ সেবা' করতে পত্রিকার ব্যবসা খোলেনি। অতএব সব জেনেও এইসব গপ্পো লেখক, সম্পাদক ও মালিকরা সত্যের দিক থেকে চোখ উল্টে রেখে নীতিকে ঝাঁট-কাট করে নিজের জুতোর সুখতলায় বসিয়ে নিয়েছে। সবারই অবস্থা প্রায়, 'এলোমেলো করে দে মা, লুটে-পুটে খাই'।

এমনই সময়ে আর একটি গুলের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল বাংলা ভাষার জনপ্রিয় পত্রিকা 'আনন্দমেলা'। পাঠক-পাঠিকা যে-হেতু 'গুঁড়ো থেকে বুড়ো', তাই প্রতিক্রিয়াও হলো ব্যাপক। যে পড়ে, সেই ধরে নেয়—'নস্ট্রাডামুস মানেই এক অভ্রান্ত জ্যোতিষী।' এমন এক আগা-পাশতলা গুল-গপ্পো পড়ে ও শুনে কত লক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ যে পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী হয়ে গেল, একটা পরিপূর্ণ মিথ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল, তার হিসেব কে রাখে? মগজ ধোলাই করে এমন এক সর্বনাশা মিথ্যা বিশ্বাস মানুষের মাথায় ঢোকাতে পেরে কারো

কারো আরও কোনও বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে, তারই এক নিষ্ঠুর উদাহরণ 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মুর্শিদাবাদ শাখা কর্তৃক প্রচারিত' বই 'নোস্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরি ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ'। অনুবাদক শম্ভুনাথ বাগচী, এম. কম্, এল. এল. বি. (এ্যাডভোকেট)। বইটির ১১ পৃষ্ঠার একটু অংশ তুলে দিচ্ছি :

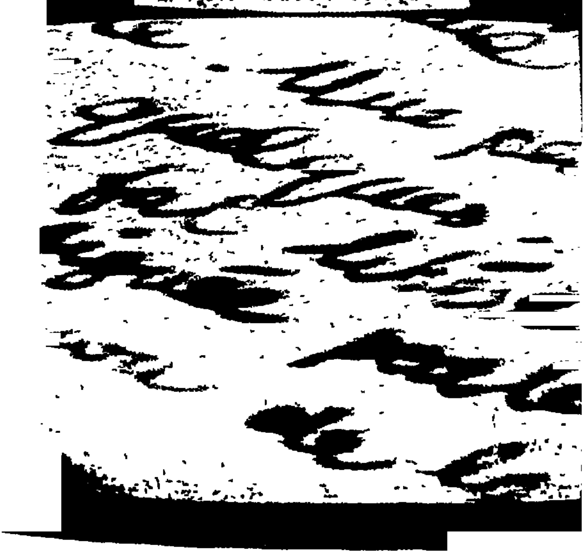
চতুষ্পদী নং ৯৫—শতক নং ৩

মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস
হবে হিন্দুদের হাতে
বেশীর ভাগ মুসলমানই
হবে নিহত,
ভারত করবে আনবিক
বোমা বিস্ফোরণ,
মহম্মদ হবে চিরদিনের
তরে নিথর ও নিস্তব্ধ।

'আলোকপাত' পত্রিকায় এই চতুষ্পদী নং ৯৫—শতক নং—৩-এর অনুবাদ করা হয়েছে এই ভাবে :—

মূরদের মতাদর্শ চলে যাবে বিলুপ্তির পথে
জনপ্রিয়তর কোন অন্য এক অমিয় আহ্বানে
নীপার নদীটির কোলে সেই জন্মলব্ধ শিশু
সর্বত্র ভরিয়ে দেবে অন্য সুরে অন্য কোন গান।

নস্ট্রাডামুসের ফরাসী ভাষায় লেখা মূল শ্লোক



মূল শ্লোক ও এরিকা চিটহ্যামের অনুবাদের সঙ্গে 'আলোকপাত' এর অনুবাদের মিল খুঁজে পেলেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষে হাজির করা শ্লোকের মিল নেই তো শতকরা এক ভাগও। এই শ্লোকটির রচয়িতা যখন শম্ভুনাথ বাগচী এম. কম্., এল. এল. বি. (এ্যাডভোকেট) স্বয়ং, তখন কেন যে নিজের রচনাকে নস্ট্রাডামুসের রচনা বলে চালাতে চাইছেন, এটা নিয়ে নিশ্চয়ই গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। এ কি লেখকের অতি বিনয়ের ফল ? না কি, লেখক ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের 'জাতের নাম বজ্জাতি' ?

'আলোকপাত'-এর কথা মত কবিতাটিতে নস্ট্রাডামুসের নাকি 'মূর' কথাটা ব্যবহার কারণ শ্রীলঙ্কা, ইউরোপ ও এশিয়ার এইসব অঞ্চলের মুসলমানরা 'মূর' নামেও পরিচিত। ফরাসী ভাষায় 'মূর' শব্দটির প্রয়োগ না থাকলেও এই কারণেই নস্ট্রাডামুস 'মূর' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন বলে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ধরনের যুক্তির ওপর নির্ভর করলে ব্যাখ্যাটা একটু অন্য রকমও হতে পারে। 'মূর' ও 'মূঢ়' কথাটার উচ্চারণগত মিল লক্ষনীয়। কবিতায় 'মূঢ' কথাটিকেই যে নস্ট্রাডামুস ব্যবহার করেছিলেন, এমনটি ভাবার মত যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতবর্ষের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে 'মূঢ়' শব্দটি অর্থবহ, 'মূঢ়' অর্থে 'নির্বোধ'। আর 'নিপার নদীর' অর্থে নিশ্চয় এ-পার থেকে ও-পার দেখা যায় না, এমনই এক পারহীন নদীর কথাই বলতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে 'পার' কথাটিও প্রচলিত। নস্ট্রাডামুস ভারতবর্ষকে বোঝাতেই ভারতের বহুল প্রচারিত শব্দ দুটি এই শ্লোকে ব্যবহার করেছিলেন। তাহলে কবিতা বা শ্লোকটি থেকে আমরা কি অর্থ পেলাম ?

নির্বোধদের মতাদর্শ শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে,
বোধযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবাদের অমোঘ জনপ্রিয়তায়
এ-পার ও-পার দেখা যায় না, এমনই এক নদীর পারে জন্মাবে এক শিশু
যার দর্শন, নতুন এক দর্শন ভরিয়ে দেবে সারা পৃথিবীকে নতুন ভাবে, সুন্দর ভাবে।

নস্ট্রাডামুস যুক্তিহীন, অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর নির্বোধদের গড়ে তোলা তথাকথিত মতাদর্শের পতন অবশ্যম্ভাবি, এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন যুক্তিবাদের নির্ভর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পাল্টে যাবে সমাজের পরিবেশ, শোষিত মানুষদের সচেতনতার কাছে ধরা পড়ে যেতে থাকবে একের পর এক শোষণ কৌশল। ফলে যে আন্দোলন, জনজাগরণের যে আন্দোলন, তা জয় যুক্ত হবেই। সেনা দিয়ে জন-আন্দোলন কখনই রোখা যায়নি ; ইউরোপের দেশগুলো থেকে মার্কসবাদের নামে কিছু 'এলোমেলা করে দে মা, লুটে-পুটে খাই' পার্টিদের রাজ্য-পাট হারাণ তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

নস্ট্রাডামুস এ-কবিতায় বলেছিলেন, এই যুক্তিবাদী দর্শন, নিপীড়িত মানুষকে সচেতন করার দর্শন, শোষণ-মুক্তির দর্শনের স্রষ্টা জন্মাবেন 'নিপার' নদীর তীরে। বাস্তব ঘটনাও তো তাই-ই। আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শনের স্রষ্টা, বন্ধু ও নির্দেশক প্রবীর ঘোষ জন্মে ছিলেন পদ্মা নদীর পাড়ে ফরিদপুর জেলার উমেদপুর গ্রামে। উমেদপুর আজ বাংলাদেশে হলেও প্রবীর ঘোষের জন্মের সময় তা ছিল ভারতের এক গ্রাম। আর পদ্মা, এ-পার, ও-পার দেখা যায় না, এমনই এক নদী। অতএব আমার এই ব্যাখ্যাটা অন্য ব্যাখ্যার থেকে যখন

আরো বেশি গ্রহণযোগ্য তখন এই ব্যাখ্যাটিকেই তো লুফে নেওয়া উচিত ব্যাখ্যাকারদের। তাহলে অন্তত একটি ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়ে হলেও মেলাবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ওঁরা। কারণ এরিকা চিটহ্যাম ও তাঁর ব্যাখ্যার সূত্র ধরে লেখা গণ্ডা-গুচ্ছের লেখক ও আলোকপাত এই কবিতাটির যে ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন, সে তো এখন পা হড়কে গোবরে। এদের মতে কবিতাটিতে না কি মুসলমানদের মতাদর্শকে বিনষ্ট করে সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসবাদের অনন্ত জয়যাত্রার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে না থেকে কাগজে-কলমে, নামে যতটুকুও বা ছিল গোরবাচেভ ও ইয়েলেতসিন-এর নেতৃত্বে মার্কসবাদের 'শবযাত্রা'র সঙ্গে সঙ্গে নস্ট্রাডামুসের এই কবিতার ব্যাখ্যাটাও যে ফালতু হয়ে গেল? এর পর চিটহ্যাম, তাঁর অনুগামীরা এবং আলোকপাত কি বলবেন? সত্যিই বলছি জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

শম্ভুবাবুর চটি বইতে এমনি সব উল্টো-পাল্টা ব্যাখ্যার ফাটাফাটি। নস্ট্রাডামুসের কবিতা ব্যাখ্যার নামে যত বই-ই প্রকাশিত হয়েছে, সবই এমনি গুল-গপ্পো ঠাসা, পড়তে লাগে খাসা।

'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র ১৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৭, ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠার হাজার হাজার জেরক্স কপি কলকাতার মানুষদের হাতে-হাতে ঘুরেছে। শিরোনাম ছিল, "হিন্দুরাষ্ট্র হবে বিশ্বের ত্রাণকর্তা—নস্ত্রাদামাস"। তারপর বিশাল একটা বক্স করে তাতে লেখা ছিল :

নস্ত্রাদামাসের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী

১। ১৯৯৯ সালে চীন আণবিক যুদ্ধ বাধাবে
২। ধর্মান্ধ মুসলমানরা চীনেব সঙ্গে হাত মেলাবে
৩। ভাবত, আমেরিকা ও রাশিযা মিত্রশক্তি হবে
৪। ২০০৬ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হবে
৫। চীন ও মুসলমানরা ধ্বংস হবে
৬। রাশিযা কম্যুনিজম বর্জন করবে
৭। ২০০৬ সালের পর ইউরোপ খৃষ্টধর্ম বিসর্জন দেবে
৮। ভারত হিন্দু-শিখ রাষ্ট্র হবে
৯। দক্ষিণ ভারত থেকে এক নেতার আবির্ভাব হবে যিনি সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবেন
১০। ২০০৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর দুই তৃতীযাশ লোক মারা যাবে
১১। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-শিখ ও ইহুদীদেব মিলিত প্রয়াসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হবে
১২। নানা শাখা-প্রশাখা দিযে হিন্দুধর্ম সারা বিশ্বে ছড়িযে পড়বে

নস্ট্রাডামুসের কোনও ভবিষ্যৎবাণীতে যে-হেতু সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনও কিছুই বলা হযনি, সুতরাং তাঁর ভবিষ্যৎবাণীগুলোর মধ্যে অন্তত একটি সত্যি হযেছিল, এমন কথা জোর কবে বলাব মত কোনও সুযোগই নেই। তাই এমন কথাও আদৌ বলা চলবে না, "নস্ট্রাডামুসের আগের ভবিষ্যৎবাণীগুলো যে-হেতু ঠিক হযেছে, সুতরাং পবেবগুলোও ঠিক হওযার সম্ভাবনা রযেছে।" তবু এমন কথা কেউ কেউ বলে। এমন কথা তাবাই বলে-যাবা হয রজক-বন্ধু গর্দভ, অথবা রজত-বন্ধু খচ্চব।

যদি এমনটা সত্যিই হতো যে, নস্ট্রাডামুসের অতীতের প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক হয়েছে; তবুও বলা চলত না—"অতএব এই এক ডজন ভবিষ্যৎবাণীও ঠিক হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল", কারণ ওই এক ডজন ভবিষ্যৎবাণী তো নস্ট্রাডামুসের লেখাই নয়, তাঁর কোনও সেঞ্চুরিতেই নেই। আর দশজন নস্ট্রাডামুসের কবিতার ব্যাখ্যাকারের মতই এই এক ডজন ব্যাখ্যার লেখকও নস্ট্রাডামুসের নাম ভাঙিয়ে নিজের ইচ্ছে মত যা খুশি তাই লিখে গেছেন। তবে অনেক লেখকের লক্ষ্যের সঙ্গে এই লেখকের লক্ষ্যের অনেক পার্থক্য আছে বলেই মনে হয়। অন্যেরা গুল-গপ্পো ফেঁদে ছিলেন কিছু কামিয়ে নিতে, কিছু ফালতু নাম কুড়োতে; আর ইনি গুল-গপ্পো ফেঁদেছেন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে।

ডঃ সুধীর বেরা'র 'নস্ট্রাডামের ভবিষ্যৎবাণী ও ভারতের ভবিষ্যৎ' তো 'হট্ কেকে'র মতই বিক্রি হয়েছে। তাঁর বইয়ে তাই-ই আছে যা বইটি প্রকাশের আগে আলোকপাত ও আনন্দমেলা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। বাড়তির মধ্যে আছে একটি বড় খবর; খবরটা ওর বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠা থেকে তুলে দিচ্ছি:

"প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিং নস্ট্রাডামের ভবিষ্যৎবাণীগুলি অভ্রান্ত এ কথা বিশ্বাস করতে চাননি। তিনি লিখেছিলেন যারা বিশ্বাস করেন তাদের মাথার স্বাভাবিকত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। পরে নস্ট্রাডামের আগাম ভবিষ্যৎবাণীগুলির হিরণ্যাপ্পা ও অন্যান্যদের কৃত অনুবাদগুলি পড়ে এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখে তিনি তাঁর পূর্বের মত আমূল পরিবর্তন করেন।"

নস্ট্রাডামুসের কবিতার ব্যাখ্যার নামে দু-মলাটের মাঝে এত গুল-গপ্পের দাপাদাপি দেখে আমার বাবার (প্রবীর ঘোষের) কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদ্বেগ হয়েছিল—খুশবন্ত সিং-এর ব্যাপারটাও আবার....

বইটা পড়েই বাবা একটা চিঠি লিখলেন খুশবন্ত সিং'কে। ডঃ সুধীর বেরা'র বইয়ের ওই অংশটা তুলে দিয়ে এই বিষয়ে তার বক্তব্য জানতে চাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাঠালেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংবাদিক খুশবন্ত সিং। ছোট্ট চিঠি।

তারিখ ২৩ জুলাই '৯১

প্রিয় শ্রীঘোষ

ডঃ সুধীর বেরা একজন মিথ্যেবাদী, অথবা হিরণ্যাপ্পা একটি আরও বড় মিথ্যেবাদী। আমি মনে করি নস্ট্রাডামুস একটা ফালতু ব্যাপার।.....

মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ভাঙিয়ে অনেকে যেমন ভালই করে-কম্মে খাচ্ছেন, নস্ট্রাডামুসও তেমনই এক রহস্যবাদ, যা ভাঙিয়ে অনেকেই দিব্বি করে-কম্মে খাচ্ছেন। নস্ট্রাডামুস নিশ্চিতভাবেই একজন বুজরুক জ্যোতিষী, প্রতারক ভবিষ্যৎবক্তা। কিন্তু কথাটা হলো নস্ট্রাডামুস ৪২০ হলে তার ব্যাখ্যাকারেরা অর্থাৎ আরো বড় বুজরুকেরা, মিথ্যাচারীরা কী? পাঠক-পাঠিকারা কী বলেন?

এইসব ধান্ধাবাজ মিথ্যেবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি সৎ মানুষ কেন ধিক্কার জানাবেন না? কেন ওদের প্রতি বর্ষিত হবে না ঘৃণা? কেন এইসব সমাজ-বিরোধীদের সামাজিকভাবে বয়কট

করা হবে না? আমরা কাদা-নরম মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত আপোস করতে করতে পাপোশ হয়ে অত্যাচারী, বঞ্চনাকারীদের পায়ের তলায় থেকেই বাধিত হবো, না কি শক্ত সবল পায়ে, আপোসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার আনন্দকে উপভোগ করব—তা ঠিক করতে হবে আপনাকে, আমাকে, আমাদেরকে।

KHUSHWANT SINGH

49-E, SUJAN SINGH PARK
NEW DELHI-110003

Date 23 July 91

Dear Mr. Ghosh,

Dr. Sudhir Bera is a liar, or two or a bigger liar. I regard Nostradamus as nonsense. I have never heard of Kalkamrita Prakasani. Welcome to publish this fact.

There was no form with your letter.

Yours
Khushwant Singh

সত্যিকথাগুলো লেখার জন্য আমার ওপর যদি কোনও আক্রমণ নেমেই আসে, সে-দিন আপনারা প্রত্যেকে আমার পাশে থাকবেন, বিশ্বাস রাখি। মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসই আমাকে লড়াই চালাবার শক্তি দিয়েছে, দেবে।

151 Content

বিষয় সূচি

অলৌকিক নয় লৌকিক

২য় পর্ব ৩০৬